রূপক সাহা

জিহাদি

রূপক সাহা

জিহাদি

রূপক সাহা

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

JIHADEE

(A novel writen by Rupak Saha)

Code : 72 J 29

Dev sahitya Kutir (Pvt.) Ltd.

21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009

www.devsahityakutir.com

Email : dev_sahitya@rediffmail.com

Tel : 2350-4294/4295/7887

© রূপক সাহা

ISBN. 978-81-942496-3-4

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ২০২০, মাঘ ১৪২৬

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
থেকে শ্রী রাজর্ষি মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত
এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক
এ্রি. টি. দেব প্রাঃ লিঃ
থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

লেখকের অন্যান্য বই

কালকেতু সমগ্র

উৎসর্গ

ছোটো জামাই অভিষেক চৌধুরীকে

ভূমিকা

রহস্যভেদ করার জন্য কোনো বাঙালি গোয়েন্দা কি কখনো আমেরিকায় গেছেন? গতবছর আমেরিকায় বেড়াতে গিয়ে এই প্রশ্নটাই আমার মনে জেগেছিল। নিউইয়র্কে ম্যানহাটনের রাস্তায় হাঁটার সময়, হলিউডের বিভারলি হিলস বা লাসভেগাসের অনতিদূরে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতে গিয়েও বারবার এ কথা মনে হত। অপরাধ জগতের গল্প জমানোর আদর্শ জায়গা। আমার কালকেতু নন্দী কি ওখানে গিয়ে রহস্যভেদে সফল হতে পারত? গতবছর আমেরিকায় থাকার সময় প্রচুর ওয়েব সিরিজ দেখেছি। মনে হত, অপরাধ জগতেও কর্পোরেট ছোঁয়া লেগে গেছে। সাইবার ক্রাইমের এমন টানটান গল্প যে, টিভি-র সামনে থেকে তখন উঠতে ইচ্ছে করত না। আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ানোর সময় কিন্তু কখনোই মনে হত না, লোকচক্ষুর আড়ালে প্রতি মুহূর্তে দেশটাতে কী ভয়ানক ধরনের অপরাধ ঘটে যাচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এক ম্যানহাটন ছাড়া আর কোথাও কিন্তু উর্দিপরা পুলিশ দেখতে পাইনি। আকাশপথে হেলিকপ্টার উড়তে দেখেছি। নজরদারি রাখার ব্যাপারে কপ্টার পুলিশ নাকি এতটাই দক্ষ যে, সাধারণ লোকদের আতঙ্কিত না করেও, চুপিসারে তারা কর্তব্যটা করে যায়।

স্পোর্টস ক্লাব বা পাব-এ লোকজনের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, অনেকেই বিশ্বাস করেন, আমেরিকায় কোনো অপরাধ করে নাকি কেউ পার পায় না। স্টেট পুলিশ আছে, এফবিআই আছে। নানা ধরনের সিকিউরিটি এজেন্সিও কম নেই। তবুও, অস্বস্তির চোরাস্রোত অনেকের মনে। এক হল, কলম্বিয়ান ড্রাগ মাফিয়াদের নিয়ে ভয়। দুই, অনুপ্রবেশকারী মেক্সিকানদের অত্যাচার। ডালাসের একটি স্কুলে গিয়ে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়েছিল, 'এটা একটা ড্রাগ ফ্রি, গান ফ্রি স্কুল।' অর্থাৎ কি না বাবা-মাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা, এই

স্কুলের কোনো ছাত্র মাদক নেয় না। অস্ত্র নিয়ে স্কুলে আসে না। অতি সম্প্রতি আইএসআইএস জিহাদিদের নিয়েও মারাত্মক বিব্রত আমেরিকা। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন অবশ্য অভয় দিচ্ছে, সিরিয়া থেকে জিহাদিদের উৎখাত করা হচ্ছে, সারা বিশ্ব থেকে ওদের নির্মূল করে দেওয়া হবে। তবুও, প্রায়ই টিভি খবরে দেখতাম, আমেরিকার কোথাও না কোথাও জিহাদি ধরা পড়েছে।

আমার এই উপন্যাসটি আমেরিকার পটভূমিকায় বাংলাভাষী দুই জিহাদিকে নিয়ে লেখা। একজন বাংলাদেশি ইমন, অন্যজন অসমের চিরাগ। দুজনেই ইসলামিক স্টেটস-এর (আইএস) টোপে পড়ে সিরিয়ায় চলে গেছিল। ট্রেনিং দিয়ে তাদের আমেরিকায় পাঠানো হয়, ইউনিসেফ-এর এক বয়স্কা কর্ত্রী লিলি গডউইনকে খুন করার জন্য। নায়গারা জলপ্রপাতের কাছে ঠিক ওইসময়ে হাজির ছিল কালকেতু। সে লিলি গডউইনকে বাঁচায় এবং জিহাদিদের কোপে পড়ে। কালকেতুকে অবশ্য আমেরিকায় নিয়ে যান বাংলাদেশের এক কোটিপতি ব্যবসায়ী পলাশ রায়চৌধুরী। তাঁর ছয় বছর বয়সি দিদি শিউলি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আহত অবস্থায় ঢাকার কাছাকাছি এক গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর তাঁকে খুঁজে বের করা, মানে খড়ের গাদায় সূঁচ সন্ধান করা। তবুও, এই দায়িত্বটা কাঁধে নেয় কালকেতু। জিহাদিদের নজর এড়িয়ে সে কীভাবে শিউলি দিদির খোঁজ পেল, জিহাদি ইমনকে আবার সুস্থজীবনে ফিরিয়ে আনল, সেই ঘটনাবলি নিয়েই এই উপন্যাস।

সাংবাদিকতার সূত্রে বিদেশে গিয়ে অনেক সময় মনে হত, এমন একটা গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করলে কেমন হয়, যে রহস্যভেদের প্রয়োজনে টোকিও থেকে টেক্সাস, আলাস্কা থেকে অস্ট্রেলিয়া চষে বেড়াবে! এমন আন্তর্জাতিক মানের গোয়েন্দা বাঙালিদের মধ্যে নেই বললেই চলে। সেই তাগিদেই এই জিহাদি উপন্যাস। সত্যি কথা বলতে কি, আমেরিকার পটভূমিতে কোনোদিন কোনো উপন্যাস লিখব, স্বপ্নেও তা ভাবিনি। সেই সুযোগটা হাতের কাছে

এসে গেল টেক্সাসের ডালাস শহরে গিয়ে। কৈশোরে বেশ কিছু হলিউডি ফিল্ম দেখেছি ওখানকার র‍্যাঞ্চ জীবন নিয়ে। মেট্রো সিনেমা হলে বসে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত তখন কাউবয়দের গান-ফাইট দেখে। গত পঞ্চাশ বছরে ডালাস এখন অনেকটাই কসমোপলিটান। এবং আমেরিকার অন্যতম সেরা বাণিজ্যিক নগরী। ফরচুন ৫০০ কোম্পানির মধ্যে ১০টার সদর দফতর এখন ওখানে। প্রচুর ভারতীয় এবং বাংলাদেশি ডালাসে বসবাস করেন। হনুমান মন্দির, সাঁইবাবার মন্দিরও চোখে পড়ে। ওখানে না গেলে জানতেই পারতাম না, নভেম্বর মাসে দাড়ি-গোঁফ-চুল না কেটে, সেই টাকা আমেরিকানরা ক্যানসার রোগীদের সাহায্যে দান করেন।

আমেরিকা সত্যিই একটা বিশ্বজনীন দেশ। সারা বিশ্বে কোথায় কী ঘটছে, তা ওখানে জানা যায়। প্লেনোতে বার্নস অ্যান্ড নোবেল-এর একটা বুক স্টোরে গিয়ে একবার মাথা ঘুরে গেছিল। আইএস জিহাদিদের নিয়ে অসংখ্য বই বিক্রি হচ্ছে সেখানে। কেনার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু একজন পরামর্শ দিলেন, জিহাদিদের সম্পর্কে বই কিনলে আপনার পিছনে এফবিআই যে চরবৃত্তি করবে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। তাই লোভ সংবরণ করেছিলাম। মিডিয়া মারফত পাওয়া আইএস অনুগামীদের নিয়ে অনেক অজানা তথ্য আমার এই উপন্যাসে আছে। মনে হয়, পাঠকদের ভালো লাগবে। কালকেতু সিরিজের এটি দ্বিতীয় খণ্ড। প্রকাশ করার জন্য দেব সাহিত্য কুটীরের সম্পাদক রূপা মজুমদারকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

—রূপক সাহা

জিহাদি

নায়গারা ন্যাশনাল স্টেট পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পলাশভাই বললেন, 'কাইলকেতুভাই, গাড়িডা কোথায় রাখসিলাম, আপনের কি মনে আসে?'

শুনে মনে মনে হাসল কালকেতু। প্রশ্নটা করার কথা তো ওর। পলাশভাই-ই ওকে নায়গারা ফলস দেখাতে নিয়ে এসেছেন। সেই ক্লিভল্যান্ড থেকে নিজে ড্রাইভ করে। সক্কালবেলায় দুজনে বেরিয়ে পড়েছিল। বেলা দেড়টা নাগাদ বাফেলো শহরের একটা হোটেলে এসে উঠেছে। ঝকঝকে রোদ্দুর। গাড়িতে আসার সময় পলাশভাই ওকে অন্তত বারচারেক শুনিয়েছেন, 'এই নিয়া আমার পাঁইচবার হইয়া গেল। আমাগো কপাল ভালা বোঝলেন। আইজ ওয়েদার ডিসটার্ব করব না। মোবাইলে দ্যাখলাম, পুরা দিনডাই সানি ডে। আগে যে কয়বার নায়গারায় আইসিলাম, প্রতিবারই বৃষ্টি পাইসি।'

অন্য কোথাও হলে ওয়েদার ফোরকাস্ট-এ বিশ্বাস করত না কালকেতু। কিন্তু আমেরিকার আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের ও উড়িয়ে দিতে পারছে না। ওরা যা বলেন, তা একশোভাগ ঠিক হয়। নিউ ইয়র্কের আকাশে একদিন ঘন মেঘ। যখন তখন বৃষ্টি নামতে পারে। কয়েকটা জিনিস কেনার জন্য প্লাজায় যাওয়া দরকার ছিল। কালকেতু বেরোবে কি না ইতস্তত করছে, এমন সময় মোবাইলে ওয়েদার চার্ট দেখে পলাশভাই বললেন, 'বেলা তিনডার আগে বৃষ্টি নাইমব না। চলেন কাইলকেতুভাই। শপিং কইর‍্যা আসি।' সত্যিই, সেদিন বৃষ্টি নামল ঠিক তিনটের সময়। দশ মিনিট আগে বা পরে নয়।

নায়গারা স্টেট পার্কের অনতিদূরেই ফুটপাতে বিমূঢ় অবস্থায় পলাশভাইয়ের পাশে কালকেতু দাঁড়িয়ে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল, রাত প্রায়

আটটা। পলাশভাই মনে করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, তাঁর মার্সিডিজ গাড়িটা কোথায় রেখেছেন। যে মানুষ আগে আরও চারবার নায়গারায় এসেছেন, তাঁর অন্তত ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কালকেতুর মনে পড়ল, আজ পার্কের ঠিক বাইরে পৌঁছে পলাশভাই একবার বলেছিলেন, 'স্ট্রেঞ্জ। একে উইক এন্ড, তার উপর সানি ডে। তাও পার্কিং স্পেস ফাঁকা! ট্যুরিস্ট গো হইলডা কী?'

কথাগুলো বলতে বলতে উনি একটা পার্কিং স্পেসে গাড়ি লাগিয়ে ওকে নামতে বলেছিলেন। খুশি খুশি গলায় তখন বলেছিলেন, নায়গারা ফলস-এর এত কাছে না কি আগে কোনোবার গাড়ি রাখতে পারেননি। কোথাও কোনও ট্যুরিস্টের দেখা নেই। রাস্তার ধারে শুধু একটা পার্কিং মিটার দাঁড় করানো আছে। সেখানেই আগেভাগে পার্কিং ফি দিয়ে রাখতে হয়। সেই মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে, কী সব পড়ে এসে পলাশভাই বেজার গলায় বলেছিলেন, 'না, এহানে গাড়ি রাখা যাইব না। হ্যাঁরা নতুন নিয়ম করসে। আপনে যতক্ষণই গাড়ি রাখেন না ক্যান, পুরা দিনের ভাড়া দিতে অইব।'

টাকা-পয়সার উপর যে পলাশভাইয়ের খুব মায়া, তা কখনও মনে হয়নি কালকেতুর। সারাদিনের জন্য পার্কিং ভাড়া দিতে হলে উনি যে খুব মুশকিলে পড়বেন, তাও নয়। মানুষটাই অদ্ভুত। যাকে বলে 'ফুল অফ কন্ট্রাডিকশনস।' বাফেলোয় যে হোটেলটায় এসে উঠেছেন, রাত পিছু তার ভাড়া হাজার ডলার। এত বিলাস বহুল হোটেলে কালকেতু অন্তত কখনও থাকার সুযোগ পায়নি। অথচ সামান্য বাড়তি পার্কিং ফি দেওয়া নিয়ে পলাশভাই এত ইতস্তত করছেন! এই ক'দিনে টুকরো টুকরো কথাবার্তায় ওঁর মুখে কালকেতু শুনেছে, খুব সাধারণ অবস্থা থেকে আজ উনি হাজার হাজার কোটি ডলারের মালিক। হতে পারে, দারিদ্রের দিনগুলোর কথা উনি ভুলতে পারেননি।

কালকেতুর স্মৃতিশক্তি অবশ্য অতটা খারাপ নয়। চট করে ওর মনে পড়ল, পলাশভাই কাছাকাছি কোথাও একটা পাঁচতলা পার্কোম্যাট-এর দোতলায় উঠে গাড়িটা রেখেছিলেন। সেই পার্কোম্যাট-এর পাশেই একটা ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ ছিল। তার নামটাও কালকেতুর মাথা থেকে হারিয়ে যায়নি। দ্য হাউস অফ ইন্ডিয়া। এদিক ওদিক তাকাতেই ওর চোখে পড়ল, রাস্তায় বাঁকের মুখে ওরা দুজন সেই রেস্তোরাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। রাত্তির বলে বুঝতে পারেনি। লাল-নীল নিওনের আলোয় রেস্তোরাঁর নামটা জ্বলজ্বল করছে। কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রচুর লোক আহারে ব্যস্ত।

বেলা দেড়টা থেকে দু'জনের পেটে সলিড কিছু পড়েনি। পলাশভাই বলেই দিয়েছিলেন, 'নায়গারা দেখার পর খিদা-টিদা সব ভুইল্যা যাইবেন কাইলকেতুভাই। হ্যায় অইল প্রকৃতির বিস্ময়... স্পট ছাইড়্যা আপনের আসতেই ইচ্ছা করব না।'

সত্যিই তাই, এতক্ষণ খাওয়ার কথা মনেই ছিল না কালকেতুর। রেস্তোরাঁ দেখে ওর খিদে মোচড় দিয়ে উঠল। পলাশভাইকে ও বলল, 'চলুন, আগে ডিনারটা সেরে নিই। আপনার গাড়ি কাছাকাছিই আছে।'

পলাশভাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ঠিক কইসেন। ঠান্ডা বাতাস দিতাসে। চলেন, আগে ভিতরে গিয়া বসি।'

বাইরে থেকে অতটা বোঝা যাচ্ছিল না। ভিতরে ঢুকে কালকেতু দেখল, প্রায় শ'খানেক লোক একসঙ্গে বসে খাচ্ছেন। বেশিরভাগই দক্ষিণ ভারতীয়। সারাদিন ধরে নায়গারা ফলস দেখে তাঁরা এসে রেস্তোরাঁয় ঢুকেছেন। সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও ট্যুরিস্টরা ফলস-এর আশপাশ ছেড়ে যান না। রাতে উল্টো দিকের অংশ কানাডা থেকে নায়গারার গায়ে লাল-নীল-হলুদ আলো ফেলা হয়। তখন খুব সুন্দর লাগে দেখতে। নায়গারার আরও একটা আকর্ষণ আছে। রাত্তির ঠিক দশটার সময় আতসবাজির খেলা দেখানো হয়। বেশিক্ষণের জন্য নয়। মাত্তর পাঁচ মিনিট। সেটা দেখার জন্যও অনেকে

আশপাশে অপেক্ষা করেন। কালকেতু বুঝতে পারল, সেই কারণে অনেকে রেস্তোরাঁয় বসে গল্পগুজব করছেন।

পলাশভাই রেস্তোরাঁর ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছেন। নিশ্চয়ই খাবারের দাম নিয়ে। একটু পরে হয়তো এসে বলবেন, 'নিউ ইয়র্কে ষোলো আনা বেঙ্গলি ফুডের একটা রেস্টুরেন্ট খুললে ক্যামন হয়, ক'ন তো কাইলকেতুভাই? মেইন আইটেম থাইকব পদ্মার টাটকা ইলিশ। দাঁড়ান, কাইলই রোজিনা ম্যাডামের সাথে একবার আলোচনা করুম।' এই রোজিনা মহিলাটিকে কালকেতু এখনও চোখে দেখেনি। পলাশভাইয়ের কে হন, উনি তাও বলেননি। কথাবার্তায় ওর মনে হয়েছে, রোজিনা পলাশভাইয়ের বিজনেস অ্যাডভাইসার। ভদ্রমহিলা নিউ ইয়র্কে থাকেন। কাল সকালে ম্যানহাটনে সেই বাড়িতেই গিয়ে ওরা উঠবে।

কোণের দিকে দুটো ফাঁকা চেয়ার দেখে, একটাতে কালকেতু বসে পড়ল। তখনই সেই ভদ্রমহিলার দিকে ওর চোখ গেল। পরনে ঘিয়ে রঙের লেডিস স্যুট। মাথায় চকোলেট রঙের ফেডোরা হ্যাট। গায়ের রং একবারে মাখনের মতো। বয়স কত হবে? পঞ্চাশের উপরে নিশ্চয়ই নয়। মুখ জুড়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের মতো অদ্ভুত প্রশান্তি। চেহারায় মঙ্গোলিয়ান আদল। কালকেতু বুঝতে পারল না উনি কোন দেশের। এক একজনকে দেখলেই কালকেতুর মনে হয়, ইনি আলাদা। ভগবান এঁকে বিশেষ কোনও কাজে পাঠিয়েছেন। কেন জানে না, ভদ্রমহিলাকে দেখেও ওর তাই মনে হল।

ভদ্রমহিলাকে কালকেতুর প্রথম চোখে পড়ে বেলা দু'টো-আড়াইটের সময়। ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে তখন নায়গারা ফলস-এর দিকে অবাক বিস্ময়ে ও তাকিয়ে আছে। বিশাল জলরাশি প্রায় দু'শো ফুট উপর থেকে সশব্দে আছড়ে পড়ছে। সূক্ষ্ম জলকণা মেঘের মতো আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। বাতাসে ভেসে সেই জলবিন্দু ওদের চোখ-মুখেও এসে লাগছে। পলাশভাই তখন একবার বলেছিলেন, 'পার মিনিট সিক্সটি থাউজেন্ড গ্যালন পানি উপর

থেইক্যা নিচে পড়তাসে। অনন্ত কাল ধইর‍্যা পইড়াই যাইতাসে। দ্যাখেন, নিচের দিকটা ক্যামন কুয়াশায় মতোন হইয়া গ্যাসে। চলেন কাইলকেতুভাই, নিচে যাই। একটা লঞ্চ ট্রিপ আসে। হ্যারে কয়, মেইড অফ দ্য মিস্ট। ফলস-এর এক্কেরে নিচে আমাগো লইয়্যা যাইব।'

ব্রিজের উপর থেকেই কালকেতু দেখতে পাচ্ছিল, নায়গারা একটামাত্র জলপ্রপাত নয়। পাশাপাশি তিন তিনটে জলপ্রপাতের সমাহার। পলাশভাই বলেছিলেন, সবথেকে বড় যেটা, সেটা হল কানাডা আর আমেরিকার সীমান্তে। তার নাম হর্সশু ফলস। বাকি দুটো... আমেরিকান ফলস আর ব্রাইডাল ভেইল ফলস আমেরিকার মাটিতে। নদীর এ পারে নিউ ইয়র্ক স্টেট। উল্টো দিকে, কানাডার ওন্টারিও শহরটার বাড়ি ঘর দেখে কালকেতুর মনে হচ্ছিল, খুবই সমৃদ্ধ। ব্রিজ থেকে কালকেতুর চোখে পড়ছিল, নদীর ওপারে একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংসের উপর থেকে নিচে...পুরোটাতেই নিওন আলোয় ক্যাসিনোর বিজ্ঞাপন। যাতে ট্যুরিস্টদের চোখে পড়ে। ক্যাসিনোর টোপ দেখিয়ে তাঁদের কানাডায় নিয়ে যাওয়া যায়।

নদীর এপার থেকে দুটো লঞ্চ ছাড়ে ফলস-এর উদ্দেশে। জলের ছিটেয় যাতে শরীর ভিজে না যায়, সেজন্য সওয়ারি ট্যুরিস্টদের সবার গায়ে নীল রঙের উইঞ্চেটার। নদীর ওপারে ওন্টারিও থেকে আরও দুটো লঞ্চ যাতায়াত করছে ফলস-এর কাছাকাছি। তার ট্যুরিস্টদের গায়ে লাল রঙের উইঞ্চেটার। দু'রকম রং কেন, জানতে চাওয়ায় পলাশভাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ওন্টারিওর দিক থেকে নায়গারাকে আরও সুন্দর লাগে বলে অনেক ট্যুরিস্টই ওখানে যেতে চান। কিন্তু আমেরিকান ভিসা নিয়ে ও দেশে ঢোকা যাবে না। আবার কানাডার ট্যুরিস্টরাও ভিসা ছাড়া আমেরিকায় ঢুকে পড়তে পারেন না। জলপথে কেউ যাতে ওদিক থেকে এ দিকে বা উল্টোটা না করতে পারেন, সেই কারণে দু'দেশের ট্যুরিস্টদের জন্য দু'রঙের উইঞ্চেটার।

ব্রিজের উপর লোকজনের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। পলাশভাই মিনিটে মিনিটে সেলফি তুলছেন। রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে উনি হঠাৎ এক ভদ্রমহিলার হাতে মোবাইল সেট এগিয়ে গিয়ে অনুরোধ করলেন, 'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, উইল ইউ টেক পিকচার ফর আস?'

এমন কিছু অন্যায় আবদার পলাশভাই করেননি। অপরিচিতের হাতে মোবাইল সেট তুলে দিয়ে অনেক ট্যুরিস্টই নিজেদের ছবি তোলাচ্ছেন। কিন্তু ভদ্রমহিলাকে অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে পলাশভাইয়ের হাত থেকে সেটটা কেড়ে নিয়ে একজন খুব রূঢ়গলায় বললেন, 'গো অ্যাওয়ে ম্যান। ডোন্ট ডিসটার্ব হার।'

পরনে সাধারণ পোশাক। লম্বা-চওড়া কালো লোকটা এমন বিচ্ছিরিভাবে মেজাজ দেখাল, কালকেতু অবাক হয়ে গেছিল। ভদ্রমহিলার বডিগার্ড না কি? পরক্ষণেই ও টের পেল, লোকটা একা নয়। সাদা চামড়ার আরও একজন কড়া চোখে পলাশভাইয়ের দিকে তাকিয়ে। তার কোমরে আবার রিভলবার গোঁজা। সে পলাশভাইকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। আশ্চর্য, ভদ্রমহিলা কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখের ইশারায় বডিগার্ড দু'জনকে সরে দাঁড়াতে বলে, হাত বাড়িয়ে কালকেতুর মোবাইল সেটটা চেয়ে নিলেন। তার পর দু'জনের ছবি তুলে দিয়ে স্মিত হেসে বললেন, 'কাম ক্লোজ সন, লেট আস হ্যাভ আ গ্রুপফি টুগেদার।'

মাত্তর পনেরো-কুড়ি সেকেন্ডের ব্যাপার। একটু অবাক হলেও, পলাশভাই হয়তো খেয়ালই করেননি। কিন্তু ভদ্রমহিলা অন্যদিকে চলে যাওয়ার পর কালকেতুর মনে হয়েছিল, ওঁর নিরাপত্তা বলয়টা আরও বড়। আরও কয়েকজন ওঁকে ঘিরে আছেন। তবে বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় নেই। উনি নিশ্চয়ই কোনও ভিভিআইপি হবেন।

রেস্তোরাঁর ভিতর অবশ্য উনি এখন একাই বসে। আশপাশের চার-পাঁচটা সিট ফাঁকা। বডিগার্ডদের কেউ বোধহয় ওঁর জন্য খাবার আনতে গেছেন।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে একবার কালকেতুর চোখাচোখি হল। কিন্তু উনি চিনতে পারলেন বলে কালকেতুর মনে হল না। একটু পরে পলাশভাই এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খাইবেন, কন কাইলকেতুভাই? ইন্ডিয়ান ছাড়া আর কিৎসু পাওয়া যাইব না। যদি মেক্সিকান অথবা কন্টিনেন্টাল খাইতে চান, তাইলে হোটেলে ফিইরা যাইতে অইব।'

সকালে ক্লিভল্যান্ড থেকে আসার সময় কোনও একটা রেস্ট এরিয়ায় মেক্সিকান ফুড খাইয়েছিলেন পলাশভাই। নাচোস, টাকো... কালকেতুর মন্দ লাগেনি। ক্লিভল্যান্ড শহরে ইতিমধ্যেই বার তিনেক কন্টিনেন্টাল খাওয়া হয়ে গেছে ওর। মন প্রাণ ভাত-ডাল চাইছে। ও তাই বলল, 'আজ ইন্দো-বাংলা টেস্ট করা যাক।'

পলাশভাই বললেন, 'ইন্দো-বাংলা পাইবেন কোথায়? এহানে পঞ্জাবি ফুড-এর থালি। তবে সব ভেজ আইটেম। ব্যুফের ব্যবস্থা আসে। দেরহাদুন চালের ভাত, ডাল মাখনি, ভাজি, পালক পনির, ডিমের ঝোল, গোলাপ জামুন আর কাস্টার্ড। আপনে বসেন। আমি গিয়া নিয়া আসি।'

বলার ভঙ্গি দেখে মনে হল, আইটেমগুলো পলাশভাইয়ের খুব পছন্দ হয়নি। একটু অসন্তুষ্ট মুখেই উনি থালি আনতে গেলেন। তখনই কালকেতুর চোখে পড়ল, ভিভিআইপি মহিলার টেবলে আরও একজন মহিলা এসে হাজির হয়েছেন। দু'জনে নিচুগলায় কথা বলছেন। আর মাঝে মাঝে লস্যির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। একটা ব্যাপার লক্ষ করে কালকেতু চমকে উঠল, ভিভিআইপি মহিলার পরনে এখন আকাশ-নীল রঙের লেডিস স্যুট। টুপির রঙও বদলে গেছে। চকোলেট রঙের বদলে সাদা টুপি। অবাক কাণ্ড, ওঁর পরনের আগের পোশাক অর্থাৎ ঘিয়ে রঙের স্যুট, এখন পাশের মহিলার গায়ে। ওঁরা কি পোশাক বদলাবদলি করে নিয়েছেন? কখন করলেন?

অপরাধ জগতের খোঁজ খবর রাখে বলে কালকেতুর মনে হল, নিরাপত্তার কারণেই এই পোশাক বদলের ছক। হাই প্রোফাইল রাষ্ট্রনায়কদের জন্য

ডামি-র ব্যবস্থা থাকেই। কিন্তু এই ভিভিআইপি মহিলা আসলে কে? উনি কি উগ্রপন্থীদের হিট লিস্টে আছেন? না হলে আমেরিকার মতো জায়গায় ওঁর জন্য এত সিকিউরিটির ব্যবস্থা থাকবে কেন? মনে মনে কালকেতু ঠিক করে নিল, ভদ্রমহিলার ছবি ওর মোবাইলে আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একবার খোঁজ করে দেখতে হবে, কোনও পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় কি না?

আধঘণ্টা পর খাওয়া শেষ করে কালকেতু যখন রেস্তোরাঁর বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন হু হু করে বাতাস বইছে। পলাশভাই পার্কোম্যাট থেকে গাড়ি আনতে গেছেন। গায়ে জ্যাকেট, মাথায় হুডি চাপিয়ে কালকেতু আয়েস করে সিগারেট ধরাল। তখনই ওর চোখে পড়ল, ঠান্ডার প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য রেস্তোরাঁর দুই ভদ্রমহিলা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। কালকেতুর কানে এল, ভিভিআইপি মহিলা বলছেন, 'খুব শিগগির আমাগো একটা ডিসিশনে আইসতে অইব। অগো জানাইয়া দ্যান, য্যান ভায়েলেন্সে জড়াইয়া না পড়ে।' কথাগুলো শুনে কালকেতু চমকে উঠল। ভদ্রমহিলা বাংলায় কথা বলছেন! তা হলে কি উনি বাংলাদেশি! নিশ্চিত হওয়ার জন্য ও আরও দু'পা এগিয়ে গেল।

এ দিকে, রাস্তার বাঁকের মুখে একটা কালো মার্সিডিজ রেস্তোরাঁর দিকে টার্ন নিয়েছে। কালকেতু দেখতে পেল, ড্রাইভারের দরজার কাচ ধীরে ধীরে নেমে আসছে। ড্রাইভারের মুখে ভূতের মুখোশ। আর ক'দিন পরেই আমেরিকায় হ্যালোইন উৎসব। ভূত বা মৃত প্রিয়জনকে স্মরণ করার দিন। লোকে ভূতের মুখোশ, প্রেতাত্মার পোশাক পরে অন্যদের ভয় দেখায়, মজা করে। কালকেতুর সে রকমই কিছু মনে হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ ও লক্ষ করল, স্টিয়ারিংয়ের উপর রাখা ড্রাইভারের ডান হাতের পাশ দিয়ে আরেকটা হাত উঠে আসছে। সেই হাতে ধরা একটা পিস্তল। জানলার কাচ ধীরে ধীরে নিচে নামছে। পলকেই কালকেতু বুঝতে পারল, নলটা কার দিকে তাক করা হতে পারে।

গাড়ির জানলাটা পুরো খোলার আগেই এক ঝটকায় ভিভিআইপি মহিলাকে ও নিজের দিকে টেনে আনল। সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁর জানলার কাচ বিরাট শব্দে ভেঙে পড়ল। তা হলে ওর ধারণাই ঠিক। ভূতের মুখোশ পরা লোকটা ভদ্রমহিলাকেই লক্ষ করেই গুলি চালিয়েছে! চলন্ত গাড়ি থেকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফের গুলির শব্দ। অন্য ভদ্রমহিলা চওড়া ফুটপাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। রক্তে ফুটপাত ভিজে যাচ্ছে। স্পিড বাড়িয়ে গাড়িটা অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। কালকেতু স্পষ্ট শুনতে পেল, গাড়ির ভিতর থেকে কেউ বা কারা অজানা ভাষায় স্লোগান দিচ্ছে।

ওর দু'হাতের মধ্যে ভিভিআইপি মহিলা তখন থরথর করে কাঁপছেন। রেস্তোরাঁ থেকে হুড়োহুড়ি করে ট্যুরিস্টরা সবাই বেরিয়ে এসেছেন। কোনও রকমে তাঁদের ভিড় কাটিয়ে ভদ্রমহিলাকে পাঁজকোলা করে তুলে নিয়ে কালকেতু রেস্তোরাঁর ভিতরে ঢুকে এল। ভদ্রমহিলার মাথা থেকে টুপি খুলে গেছে। সেইসঙ্গে সোনালি রঙের পরচুলাও। ওঁর হ্যান্ডব্যাগটা বাইরে কোথাও পড়ে গেছিল। কেউ একজন তুলে এনে ওঁর হাতে দিলেন। চোখ বুঁজে ভদ্রমহিলা বিড়বিড় করে কী যেন বলছিলেন। ওঁকে চেয়ারে বসিয়ে দেওয়ার পর কেউ একজন জলের বোতল এগিয়ে দিতেই, এক ঢোঁক গলায় দিয়ে, উনি মোলায়ম স্বরে কালকেতুকে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ মাই সন। ইউ হ্যাভ সেভড মাই লাইফ।'

(দুই)

বাফেলো মেডিক্যাল সেন্টারে কেবিনের ভিতর বসে নিউ ইয়র্ক টাইমসে চোখ বোলাচ্ছেন লিলি গডউইন। নায়গারায় শ্যুট আউটের খবরটা কাগজে বেরিয়েছে কি না, তা দেখার জন্য। তিনি চাননি, খবরটা মিডিয়ার কাছে যাক। চিফ সিকিউরিটি স্টাফ স্ট্যানলি গর্ডনকে তিনি বলেই দিয়েছিলেন সে কথা। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর হেড লাইনগুলো দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন,

নাহ্ খবরটা বেরোয়নি। কাল রাত বারোটার সময়ই এফবিআইয়ের দুজন অফিসার হাসপাতালে তাঁর বয়ান নিতে এসেছিলেন। কিন্তু তখন তিনি গুলিবিদ্ধ রোকেয়া সুলতানাকে নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। অপারেশন থিয়েটারের বাইরে পায়চারি করছেন। কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না। তাই অফিসারদের তিনি আজ সকালে আসতে বলেছেন।

রোকেয়া সুলতানা হলেন বাংলাদেশের নামকরা একজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। তাঁর চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি। বহুদিনের পরিচিত। আসলে ওর সঙ্গে একান্তে কথা বলার জন্য লিলি গডউইনের নায়গারা দেখতে যাওয়া। রোকেয়া বলেছিল, ব্যাপারটা সিরিয়াস এবং খুব আর্জেন্ট। ইচ্ছে করলে লিলি নিউইয়র্কে ওঁর ফাউন্ডেশনের অফিসেই রোকেয়াকে ডেকে নিতে পারতেন। কিন্তু প্রোটোকল মেনে মিটিংটা করতে গেলে অনেক সময় লেগে যেত। তাছাড়া মিডিয়ার উৎপাত তো ছিলই। তখন রোকেয়াই বলেছিল, 'আমি এখন কানাডার ওন্টারিওতে আছি। মিটিংটা নায়গারাতে করা যেতে পারে। আপনার কোনও অসুবিধে না থাকলে আমি ওখানে চলে যেতে পারি।' রোকেয়ার কপাল ভাল। এই সময়ে জার্মানদের বিয়ার ফেস্টিভ্যাল চলছে নায়গারাতে। জার্মানরা এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন লিলিকে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার কাজটা হয়ে যাবে ভেবে, লিলি রাজি হয়ে গেছিলেন।

ঠিক হয়েছিল, দুজনে দেখা করবেন এমন একটা জায়গায়, যেখানে পরিচিত কোনও মানুষজনের চোখে পড়বেন না। তখনই সিকিউরিটি গার্ডদের তিনি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের নামটা বলে দেন। নায়গারা দেখতে এসে একবার ওখানে পাঞ্জাবি লস্যি খেয়েছিলেন। স্বাদটা য়োগার্তের মতো, কিন্তু মিষ্টি। জমাট দইয়ের মতো নয়, চুমুক দিয়ে খেতে হয়। গার্ডরা একবার নিরাপত্তার কথা তুলেছিল। তবুও লিলি পাত্তা দেননি। কিন্তু গোপনে কথা বলতে এসে যে এমন বিপদের মধ্যে পড়বেন, তা তিনি ভাবতেও পারেননি। রেস্তোরাঁর

বাইরে অচেনা ছেলেটা আচমকা যদি হাত ধরে না টানত, তা হলে এতক্ষণে তিনি মর্গে পড়ে থাকতেন। ছেলেটা যেন ঈশ্বরের দূত হয়ে হাজির হয়েছিল।

এ নিয়ে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন লিলি। গত বছর প্যারিসেও তিনি ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারতেন। ইউনিসেফের গুডউইল অ্যাম্বাস্যাডার হয়ে তিনি গেছিলেন স্টেটলেস কুর্দদের সমস্যার কথা শুনতে। নতরডম ক্যাথিড্রালের কাছে সেবার বোমা বিস্ফোরণ করেছিল উগ্রপন্থীরা। কিন্তু সিকিউরিটি গার্ডদের কাছে আগাম খবর দিয়ে রেখেছিল এফবিআই। শেষ মুহূর্তে তাঁর কনভয় বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি তাতে যাননি। ফলে লিলি বেঁচে যান।

ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজেও গুলিগোলার কোনও খবর নেই। কিন্তু প্রথম পৃষ্ঠায় একটা হেডলাইন দেখে লিলি চমকে উঠলেন। তুরস্কের সৌদি দূতাবাসের ভিতর ওয়াশিংটন পোস্ট-এর এক সাংবাদিক জামাল খাস্তোগিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইনি সৌদি আরবের প্রিন্স মহম্মদ বিন সালমানের কট্টর সমালোচক ছিলেন। রাজরোষে পড়ে বছর দুয়েক আগে খাস্তোগি রিয়াধ থেকে পালিয়ে এসে আমেরিকায় আশ্রয় নেন। তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, সৌদিতে ফিরে গেলে খুন করা হবে। কয়েকদিন আগে বিবাহবিচ্ছেদের কাগজপত্র আনার জন্য খাস্তোগি ইস্তানবুলে সৌদি দূতাবাসে যান। ওয়াশিংটন পোস্ট লিখেছে, খাস্তোগি ইস্তানবুলে যাচ্ছেন জেনে প্রিন্স সালমান তাঁর দেশের উনিশজন গুপ্তঘাতককে কূটনীতিকের ছদ্মবেশে সেখানে আগে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে একজন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞও ছিলেন। দূতাবাসের ভিতর খাস্তোগি ঢোকার পর তাঁকে খুন করা হয়। তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে না কি গুপ্তঘাতকরা সৌদি আরবে নিয়ে গেছে। প্রিন্স সালমানের সন্তুষ্টির জন্য।

রুদ্ধশ্বাসে খবরটা পড়ে লিলি গডউইন চমকে উঠলেন। এ তো হলিউড ব্লক বাস্টারের গল্প! জামাল খাস্তোগিকে তিনি ভাল করে চেনেন। তাঁর প্রেস

কনফারেন্সে নিয়মিত আসতেন। খাস্তোগির বহু লেখা তিনি ওয়াশিংটন পোস্ট-এ পড়েওছেন। সত্যিই নির্ভীক সাংবাদিক বলতে যা বোঝায়, তাই ছিলেন। সৌদি আরবে মানবাধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা কীভাবে পদপিষ্ট করা হচ্ছে, তা নিয়ে খাস্তোগি মাঝে মধ্যেই সোচ্চার হতেন। তাঁর একটা খবর তো সারা বিশ্ব তোলপাড় করে দিয়েছিল। গরিব দেশগুলো থেকে শিশুদের কিনে নিয়ে গিয়ে বিপদজনক ক্যামেল রেস-এ জকির কাজ করানো। উটদের দৌড়ে জকির কাজ করতে গিয়ে অনেক শিশু মারা যায় প্রতি বছর। ইউনিসেফকে জড়িয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আরব দেশে ওই মারণ খেল বন্ধ করতে পেরেছিলেন লিলি গডউইন।

খাস্তোগির মৃত্যুর খবরটা ওয়াশিংটন পোস্ট-এ ধৈর্য ধরে পড়ে লিলি আন্দাজ করতে পারলেন, আমেরিকার রাজনীতিতে আরেকটা ঝড় আসছে। মিডিয়া এই কলঙ্কজনক ঘটনার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিকি অ্যাডামসকে জড়ানোর চেষ্টা করবে। কেন তিনি খাস্তোগির রহস্যজনক মৃত্যুর ব্যাপারে কৈফিয়ত চেয়ে প্রিন্স সালমানের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন না? মিডিয়ায় এমনও বলা হবে, প্রিন্স সালমানের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সম্পর্ক মধুর। আমেরিকার কাছ থেকে সৌদি একশো দশ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনছে বলে প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস কিছুতেই সৌদি প্রিন্সকে চটাবেন না। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্ন তুলে শেষ পর্যন্ত ইউনিসেফের কোর্টে বল ঠেলে দেওয়া হবে।

কেবিনের দরজায় নক করার শব্দ শুনে লিলি গডউইন বললেন, 'কাম ইন।'

হাসপাতালেরই একজন নার্সিং স্টাফ। হাতে ফুলের তোড়া। হাসিমুখে মেয়েটা বলল, 'গুড মর্নিং ম্যাম। এ তোড়াটা বাম কিম সু নামে একজন আপনার জন্য পাঠিয়েছেন।'

রেনবো রোজেস ব্যোকে। সাদা-লাল-হলুদ-নীল...চার-পাঁচ রঙের গোলাপ দিয়ে বানানো। লিলি এই ধরনের তোড়া খুব পছন্দ করেন। শুভেচ্ছা

জানানোর জন্য লোকে পাঠায়। হাতে নেওয়ার আগে লিলি নার্সকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, সিকিউরিটি স্টাফরা ফুলের তোড়া পরীক্ষা করে দেখেছে কি না। কথাটা মুখ থেকে বেরোনোর আগে তিনি দেখলেন, সিকিউরিটি চিফ স্ট্যানলি গর্ডন কেবিনের মধ্যে ঢুকে এসেছে। মাথা ঝুঁকিয়ে গুড মর্নিং জানিয়ে স্ট্যানলি চোখের ইশারায় জানাল, ফুলের তোড়া ওরা পরীক্ষা করে দেখেছে। তোড়াটা বাম কিম সু পাঠিয়ে থাকলে কোনও সমস্যা নেই। তাঁর নাম করে কুমতলবে কেউ পাঠাতেই পারে। বাম কিম চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনে তাঁর সহকর্মী। কাল রাতেই নিউ ইয়র্ক থেকে উনি ফোন করেছিলেন। হামলার কথা শুনে বলেছিলেন, ভোরবেলায় বাফেলোর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বেন। নিউ ইয়র্ক থেকে প্লেনে দেড় ঘণ্টার বেশি সময় লাগার কথা নয়। হয়তো এতক্ষণে এসেও গেছেন।

ফুলদানিতে তোড়াটা গুছিয়ে দিয়ে নার্স ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর স্ট্যানলি বিনম্র গলায় বলল, 'ম্যাম, কাল রাতে যা ঘটেছে, তার জন্য আমরা দুঃখিত।'

লিলি বললেন, 'নেভার মাইন্ড। কারা অ্যাটাক করেছিল, জানা গেছে?'

'এফবিআই থেকে দু'জন সিনিয়র অফিসার এসে বসে আছেন। তাঁদের মুখেই শুনতে পাবেন। ম্যাম আমরা কি তাঁদের পাঠিয়ে দেব?'

লিলি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। সত্যি কথা বলতে কী, উগ্রপন্থীরা নিউ ইয়র্ক স্টেট-এ ঘোরাফেরা করছে, এ কথা তিনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না। নাইন-ইলেভেনে টুইন টাওয়ার ভেঙে পড়ার পর বুশ প্রশাসন থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, উগ্রপন্থা কার্যকলাপ আমেরিকা থেকে সমূলে উচ্ছেদ করা হবে। প্রেসিডেন্ট তো স্লোগানই দিয়েছিলেন, 'ওয়ার অন টেরর।' কী হল সেই প্রতিশ্রুতির? লিলি জানেন, তাঁর উপর আক্রমণের খবর মিডিয়া জানতে পারলে বিরাট প্রতিক্রিয়া হবে। তারা প্রেসিডেন্ট অ্যাডামসকে তুলোধোনা করে ছাড়বে। ফের চ্যানেলে চ্যানেলে দেশের দুই

নিরাপত্তা সংস্থা সিআইএ আর এফবিআইয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের কথা উঠবে।

উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার জন্য নতুন একটা ফোর্স তৈরি করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ওবামার আমলে। মিডিয়া এমন প্রশ্নও তুলবে, সেই ফোর্সের অফিসাররা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন? তাঁরা জানতে পারলেন না কেন, উগ্রপন্থীরা খোদ নিউ ইয়র্ক স্টেট-এ বসে ষড়যন্ত্র করছে? তাঁর এসব ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই কেবিনের ভিতর ঢুকে এলেন এফবিআইয়ের দুই অফিসার। একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। পুরুষ অফিসার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'ম্যাম, আমার নাম জন মিকেল। আর এ আমার কলিগ সুশান ব্রাউন। আপনাকে একটা সুখবর দিই। কাল যে মার্সিডিজ গাড়ি থেকে শ্যুট আউট হয়েছিল, চুরি করা সেই গাড়িটা পাওয়া গেছে।'

আমেরিকায় কোনও অপরাধ করে পার পাওয়া কঠিন। লোকাল পুলিশ বা এফবিআই অফিসাররা এমন দক্ষ, অপরাধীদের ঠিক খুঁজে বের করবেই। লিলি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পাওয়া গেল?'

'গোট আইল্যান্ডসে। গাড়িটা জঙ্গলের ভিতর অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল ।'

গোট আইল্যান্ডস জায়গাটা নায়গারা নদীর ধারে। হর্সশু ফলস দেখার জন্য ওখান দিয়ে যেতে হয়। রাস্তার সর্বত্র ক্যামেরা বসানো আছে। মনিটরে ক্লিপিংস দেখে সহজেই বের করা সম্ভব গাড়ির গতিবিধি। লিলি জিজ্ঞেস করলেন, 'টেররিস্টদের কেউ কি ধরা পড়েছে?'

'ম্যাম, আজ দুপুরের মধ্যেই তারা ধরা পড়ে যাবে। আমাদের ধারণা, ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ দিয়ে একটু আগে তারা কানাডায় ঢুকে পড়েছে। ওখানকার হেলিকপ্টার পুলিশ ফ্রিওয়েতে সেই গাড়ি ফলো করছে।'

আমেরিকা আর কানাডার সংযোগকারী সেতু হল ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ। লিলি জিজ্ঞেস করলেন, 'ক'জন রয়েছে সেই গাড়িতে?'

‘পার্কোম্যাটের ক্যামেরায় ছবি দেখে আমাদের মনে হচ্ছে, মার্সিডিজ গাড়িটা চুরি করার সময় ওরা তিনজন ছিল। ওরা কোন দেশের এখনও আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারিনি। ছেলেগুলোর বয়স অবশ্য পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়। ইন্টারপোল সন্দেহ করছে, ওরা জিহাদি। ওদের সম্পর্কে আরও তথ্য আমাদের দেবে বলেছে।’

‘হামলাটা কারা করেছিল, কেউ দাবি করেছে?’

‘হ্যাঁ ম্যাম। আই এস-এর বাংলাদেশ উইং। কাতারের আল জাজিরা চ্যানেলে ফোন করে এরা দাবি করেছে, মায়ানমারে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় নিয়ে আপনার একটা কড়া মন্তব্যের জন্য আপনার উপর এই আক্রমণ। যাতে সারা বিশ্বের নজর কাড়া যায়। আল জাজিরা এখনও খবরটা টেলিকাস্ট করেনি। গোপন রেখে আমাদের সাহায্য চেয়েছে, দাবিটা কতখানি অথেনটিক যাচাই করার জন্য।’

‘আই সি।’ লিলি চিন্তিত মুখে জন মিকেলের দিক থেকে চোখ সরালেন। আইএস জঙ্গিরা তা হলে বাংলাদেশেও সংগঠন বাড়াচ্ছে! এটা আগে তিনি কখনও শোনেননি। নিশ্চয় তাঁর উপর হামলাকারীরা কেউ বাংলাদেশের। রোহিঙ্গাও হতে পারে। এমনিতে কাউকে উগ্রপন্থায় সামিল করাটা মারাত্মক অপরাধ। বাংলাদেশি অথবা রোহিঙ্গা ছেলেটিকে হয়তো বিরাট কোনও প্রলোভন দেওয়া হয়েছে। মায়ানমার থেকে তাড়া খেয়ে রাখাইন অঞ্চলের মুসলমান অর্থাৎ রোহিঙ্গারা নানা দেশে বেআইনিভাবে ঢুকে পড়ছে। এই স্টেটলেস রোহিঙ্গাদের নিয়ে কী করা যায়, তা নিয়ে ইউনিসেফ গভীর চিন্তায়।

রোহিঙ্গারা সত্যিই অত্যাচারিত হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ইউনিসেফের হয়ে লিলি মাস দুয়েক আগে ইয়াঙ্গনে গিয়েছিলেন। সেখানে ভাল অভ্যর্থনা পাননি। বৌদ্ধভিক্ষুরা তাঁকে কালো পতাকা দেখিয়েছিলেন। রোহিঙ্গারাও তাঁর উপর প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট। কেননা, এত অরাজকতার মাঝেও প্রতি বছর রোহিঙ্গা মহিলারা কেন গাদা গাদা বাচ্চার জন্ম দিচ্ছেন, এ প্রশ্নটা

তিনি তুলেছিলেন। তাতে হয়তো ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা চটেছেন। মায়ানমারে ঘটনাপ্রবাহ যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে লিলি বুঝতেই পারছিলেন, ইসলামিক দেশগুলোর ইন্ধনে এ বার রোহিঙ্গারা হিংসার পথ নেবে। আল জাজিরার খবরটা শুনে এ বার তিনি নিশ্চিত হলেন, আইএস জঙ্গিরা কেন তাঁকে টার্গেট করেছে। জন মিকেলকে তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'যে গাড়ি থেকে শ্যুট আউট করা হয়েছিল, সেটা কার, তা কি জানা গেছে?'

মিকেল বললেন, 'গাড়িটা আসলে অ্যাভিস কোম্পানির। দু'দিন আগে ক্লিভল্যান্ড এয়ারপোর্ট থেকে অ্যাভিস কোম্পানির ওই মার্সিডিজ গাড়িটা যিনি ভাড়া নিয়েছিলেন, তিনিও একজন বাংলাদেশি। ম্যাম, তাঁর নাম পলাশ চাউডুরি। গাড়িটা আজই নিউইয়র্ক এয়ারপোর্টে অ্যাভিস কোম্পানিকে তার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটা তিনি দিতে পারেননি। উনি বলছেন, রেস্তোরাঁর পাশে যে পার্কোম্যাটে উনি গাড়িটা রেখেছিলেন, সেটা আনতে গিয়ে দেখেন, নেই। শুনে আমাদের বিশ্বাস হয়নি। আপাতত আমরা নায়গারায় শেরিফের অফিসে মি. পলাশকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি।'

'মি. মিকেল, আমার উপর হামলার খবরটা কি মিডিয়া জানে?'

'এখনও পর্যন্ত, না। তবে ঘটনার সময় ওখানে যারা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখি করলে, আমাদের কিছু করার নেই।'

'মি. মিকেল, আমি চাই না, কাল রাতের ঘটনা নিয়ে মিডিয়ায় একটা লাইনও বেরোক। টেররিস্টরা নিউ ইয়র্ক স্টেটে হামলা করেছে, এই খবরটা ডেমোক্রাটদের কানে গেলে গভর্মেন্ট অস্বস্তিতে পড়বে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ম্যাম। মিডিয়ার কেউ জানতে পারবে না। শেরিফের কাছ থেকে যখন আমরা খবরটা পাই, তখনই বুঝতে পারি, এটা ফেডারেল ক্রাইম। এফবিআইয়ের এক্তিয়ারে। স্টেট পুলিশের নাক গলানোর দরকার নেই। ফলে খবরটা লিক হওয়ার সম্ভাবনা কম।'

'আপনাদের কি মনে হচ্ছে অফিসার, প্রাইম টার্গেটটা কি আমিই ছিলাম?'

মিকেল ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'ম্যাম, আপনার কি অন্য কিছু মনে হচ্ছে?'

'গুলিটা যার গায়ে লেগেছে, তিনি... রোকেয়া সুলতানাও কিন্তু বাংলাদেশি। তাই প্রশ্নটা মনে এল।'

'ওঁর সঙ্গে কথা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখনও উনি ট্রমা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। ওঁর সম্পর্কে যদি আমাদের কিছু ইনফর্মেশন দিতে পারেন, ভাল হয়।'

'ঢাকায় রোকেয়ার একটা এনজিও আছে, যার নাম বন্ধু। উনি আমাদের ফাউন্ডেশনের সঙ্গেও যুক্ত। আমার অফিসে বাম কিম সু-কে ফোন করলেই রোকেয়া সম্পর্কে ডিটেল তথ্য পেয়ে যাবেন। বাম কিম অবশ্য আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে এসে পড়বেন।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই দরজায় বাম কিম সু-র সহাস্য মুখটা দেখতে পেয়ে লিলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক, এমন একজন এলেন, যাকে ভরসা করা যায়।

(তিন)

গাড়িটা বাফেলো শহরে ঢোকার আগে চিরাগ নিচু গলায় একবার বলল, 'ইমন দ্যাখ তো, ধারে-কাছে কোনও রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ে কি না?'

সাই সাই করে ঘণ্টায় সত্তর মাইল গতিতে গাড়ি ছুটছে ফ্রিওয়ে ধরে। স্টিয়ারিং কামালের হাতে। পিছনের সিটে জড়োসড়ো হয়ে বসে ওরা দু'জন। কোথায় যাবে, তার ঠিক নেই। যে কাজের জন্য ওরা তিনজন নায়গারায় এসেছিল, তাতে সফল হয়নি। রেস্টুরেন্টের কথা তুললেই কামাল খিস্তি দেবে। বলবে, 'এই আখো ইল শারমুতাহ... তোদের লজ্জা করে না। একে তো জিহাদিদের নাম ডোবালি। তার উপর খেতে চাইছিস!' আরবি ভাষায়, 'আখো ইল শারমুতাহ' কথাটার মানে হল, কুত্তীর ভাই। কোনও ভুল-ভ্রান্তি হলে প্রায়ই এই গালটা ইমনদের খেতে হয়।

আজ কানাডার দিক থেকে ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ পেরিয়ে যখন ওরা তিন জিহাদি নায়গারা ফলস-এ যায়, তখন বেলা আড়াইটে বাজে। তিনজন তিন দেশের। ইমন বাংলাদেশি, কামাল ইরাকি, আর চিরাগ অসমের করিমগঞ্জের ছেলে। নায়গারা স্টেট পার্কে ঢোকার আগে একটা রোডসাইড স্টল থেকে ওরা সেইসময় মাত্র একটা করে বার্গার খেয়েছিল। সেটা অনেক আগে হজম হয়ে গেছে। এখন রাত সাড়ে দশটা। খিদে পাওয়াটা স্বাভাবিক। ইমনেরও পেট চুইচুই করছে। কথাটা বলবে না, বলবে না করেও ইমন বলে ফেলল। দেখল, কামালও অনীহা দেখাল না। ফ্রিওয়ের ধারে দু'তিনটে রেস্তোরাঁয় ঢুঁ মেরে ওরা বুঝতে পারল, বাফেলো শহরে রাত দশটার মধ্যেই রেস্টুরেন্টগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তখন কামালই বলল, 'ওয়ালমার্টে চল, আমি জানি রাত দুটো অবধি খোলা থাকে।'

শহরের কোথায় ওয়ালমার্ট আছে, জিপিএস-এর মাধ্যমে খুঁজে বের করা যায়। ওয়ালমার্টে ঢুকে ওরা দেখে, সাবওয়ে রেস্তোরাঁটা খোলা আছে। চেয়ারে বসতেই ইমনের শরীরটা ছেড়ে দিল। সারাটা দিন মারাত্মক ধকলের মধ্যে দিয়ে গেছে। কম্যান্ডারের নির্দেশ মতো ওরা তিনজন আজ খুন করতে এসেছিল লিলি গডউইন বলে এক বয়স্ক মহিলাকে। বেলা তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ওরা ভদ্রমহিলাকে স্রেফ ফলো করে গেছে। খুন করার সুযোগ পায়নি। বেলা বাড়ার সঙ্গেসঙ্গে ট্যুরিস্টদের ভিড় শুরু হল নায়গারা ফলস-এর পার্কে। অন্ধকার হওয়ার আগে পর্যন্ত চিরাগ শ্যুটিং রেঞ্জের মধ্যে আনতেই পারল না ভদ্রমহিলাকে। ওই গিজগিজে ভিড়ের মাঝেই কামাল মাঝে মধ্যে চিরাগকে ওস্কাচ্ছিল, 'এইবার ঝেড়ে দে।' চিরাগের হাতে যা টিপ, তাতে হয়তো কাজটা হাসিল করতে পারত। কিন্তু ও সাহস পায়নি। তা হলে ভিড় এড়িয়ে শেষ পর্যন্ত পার্কিং স্পেস অবধি পৌঁছতে পারত না। তার আগেই ভদ্রমহিলার সিকিউরিটি গার্ডরা গুলিতে ওদের তিনজনকেই ঝাঁঝরা করে দিত।

সাবওয়ের কাউন্টারে বসা মেয়েটার কাছে খাবারের অর্ডার দিতে গেল কামাল। এর আগে ও একবার আমেরিকায় ঘুরে গেছে। এখানকার নিয়মকানুন সব জানে। চেয়ারে বসে থাকতে থাকতেই একটু পরে ইমন দেখল, কামাল পছন্দমতো সবজি দিয়ে স্যান্ডউইচ বানাতে ব্যস্ত। ও যেমন যেমন বলছে, মেয়েটা তেমনভাবেই বানিয়ে দিচ্ছে। সাবওয়ে হল বিরাট ফুড চেন। ইমন শুনেছে, এদের স্যান্ডউইচ খুব বিখ্যাত। বিশেষত্ব হল, খদ্দেররা পছন্দমতো সেটা বানিয়ে নিতে পারেন। একেকটা স্যান্ডউইচ সাইজে এত বড় যে, একটা খেলেই পেট ভর্তি হয়ে যায়।

ওর উল্টোদিকের চেয়ারে চিরাগ মুখ শুকনো করে বসে আছে। এক পলক তাকিয়েই ইমন বুঝতে পারল, ছেলেটা মারাত্মক টেনশনে। লিলি গডউইনকে খুন করার দায়িত্ব ছিল ওর উপর। পারেনি বলে অপরাধবোধে নয়, চিরাগ গুটিয়ে রয়েছে আশঙ্কায়। ব্যর্থতার জন্য কম্যান্ডাররা ওকে প্রচণ্ড মারধর করবেন ভেবে। সত্যি বলতে কী, খুন করার মতো গুরু দায়িত্ব ওদের স্তরের জিহাদিদের পক্ষে চট করে পাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু কম্যান্ডাররা চিরাগের উপর আস্থা রেখেছিলেন, কেননা মানুষকে খুন করতে ওর হাত কাঁপে না। অসাধারণ ওর হাতের টিপ। কাবুলে একবার এক মাইল দূর থেকে অদ্ভুত নিশানায় এক আমেরিকান জওয়ানকে ও হত্যা করেছিল স্যাস স্নাইপার দিয়ে। বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সেই গুলি। ওর এই দক্ষতাটা দেখে কম্যান্ডাররা খুব খুশি হন। সেই কারণেই কসোভোর ক্যাম্প থেকে ওকে পাঠানো হয়েছে নায়গারায়।

কার গাফিলতিতে চিরাগ টার্গেট মিস করল, ইমনকে সেটা ভাবাচ্ছে। লক ভেঙে গাড়ি চুরি করার ভার পড়েছিল ওর উপর। এটা ওর বাঁ হাতের খেল। পার্কোম্যাটে মার্সিডিজ গাড়িটা চুরি করার পরই ওর পিছনের সিটে বসে থাকার কথা ছিল। দক্ষ ড্রাইভার, তাই পালানোর সময় স্টিয়ারিং কামালের হাতে। এই ছিল প্ল্যান। কিন্তু নায়গারা পৌঁছনোর পর কামাল ফোনে কারও

কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানাল, লিলি গডউইন এখনও হোটেল থেকেই বেরোননি। তখন ও-ই পরামর্শ দিল, 'চল, ততক্ষণ আমরা নায়গারা ফলস দেখে নিই। এত কাছে এসেছি। জীবনে আর দেখার সুযোগ পাব কি না সন্দেহ।' কিন্তু ফলস দেখার জন্য ফুটব্রিজে গিয়ে ওরা অবাক। দেখে লিলি গডউইন সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! সেইসময় ভুল খবর দেওয়ার জন্য চিরাগ চটে গিয়ে কামালকে আরবি ভাষায় খিস্তি মেরেছিল, 'ইবন ইল শারমুতাহ।' মানে, কুত্তীর ছেলে। ভাগ্যিস, কথাটা কামালের কানে যায়নি। গেলে হাতাহাতি হয়ে যেত দু'জনের মধ্যে।

ক্যালিফেট থেকে নির্দেশ এসেছিল, তিনজনের গ্রুপের ক্যাপ্টেন কামাল। ও যা বলবে, বাকি দুজনকে তা শুনতে হবে। কিন্তু কামালের উপর ভরসা রাখতে পারছিল না চিরাগ। লিলি গডউইনের গতিবিধি সম্পর্কে ও যা বলছিল, তা ভুলভাল। ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় উনি ঢোকার পর কোত্থেকে এক মহিলা এসে ওর সঙ্গে আড্ডা দিতে বসলেন। এটা কামাল জানত না। রেস্তোরাঁ থেকে লিলি গডউইনের বেরিয়ে আসা আর মার্সিডিজ চালিয়ে কামালের রেস্তোরাঁর দোরগোড়ায় পৌঁছনোর মাঝে কয়েক সেকেন্ডের দেরি। তাতেই সব প্ল্যান ভেস্তে গেল। কামাল ওইসময়টায় স্পিড তোলায় বাঁকের মুখে গাড়ির টাল সামলাতে পারেনি। মনে হয়, এই কারণেই চিরাগও নিশানা ঠিক রাখতে পারেনি। ইমনের অবশ্য একবার মনে হয়েছিল, কামাল ইচ্ছে করেই এটা করল। ও চায়নি, কাফের নিধনের জন্য চিরাগ প্রশংসা পাক কম্যান্ডারের কাছে?

তার পর গোট আইল্যান্ডসে পৌঁছে গাড়ির ওই অ্যাক্সিডেন্ট? পুলিশ ওদের তাড়া করেনি। অথচ গাড়ির গতি সামলাতে না পেরে কামাল গাছের গুঁড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারল। কী বিপদেই না পড়েছিল ওরা তখন। ভাগ্যিস, সেইসময় আকাশে আতসবাজির খেলা চলছে। বাজির আওয়াজে চাপা পড়ে গিয়েছিল ধাক্কা মারার বুউম শব্দ। অত রাতে গোট আইল্যান্ডসে লোকজন

থাকে না বললেই চলে। জঙ্গলের মাঝে জায়গাটায় ঘন অন্ধকারও। ওরা কী করে পার্কের বাইরে বেরিয়ে আসবে, সেটা ভেবে তিনজনের মুখই শুকিয়ে গেছিল। তখন কামালই বলল, 'এখানে যে কোনও একটা গাড়িতে ব্রেক ইন কর ইমন। যাতে আমরা বাফেলোর মোটেল অবধি পৌঁছতে পারি।' ফলে ইমনকে ফের একবার বাঁ হাতে খেল দেখাতেই হল। লক খোলার ব্যাপারে ও এমন ওস্তাদ, সামান্য একটা লোহার পিন দিয়েও কাজটা ও সারতে পারে।

দ্বিতীয়বার চুরি করা ফোর্ড গাড়িটা করেই ওরা ওয়ালমার্টে এসেছে। কামাল ঠিক করেছে, এই গাড়িটা ওরা এখানেই ফেলে রেখে যাবে। নিউ ইয়র্ক স্টেট পুলিশ নিশ্চয়ই এতক্ষণে দুটো গাড়ি চুরির কমপ্লেন পেয়ে গেছে। ইতিমধ্যে হয়তো খোঁজাখুজিও শুরু করে দিয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় সর্বত্র ক্যামেরা বসানো, ঘাপটি মেরে বসে থাকা পুলিশ পেট্রোল। হুটার বাজিয়ে যে কোনও সময় ফোর্ড গাড়িটাকে আটকাতে পারে। ওয়ালমার্ট থেকে বেরিয়ে ওরা কোথায় যাবে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ক্যাপ্টেন কামালের। ঘাড় ঘুরিয়ে ও দেখল, কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কামাল ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে। হয়তো কম্যান্ডারদের কাছ থেকে ফোন এসেছে। কার্যসিদ্ধি হল কি না, ওরা তা জানতে চাইছে।

'ইবন ইল শারমুতাহ।' কামালের দিকে তাকিয়ে চিরাগ ফের আরবি গালটা দিল। বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠেছে, ওর চোখ-মুখ থেকে রাগ আর ঘৃণা ফুটে বেরচ্ছে। সকালবেলায় অন্টারিওর হোটেল থেকে ওরা তিনজন যখন বেরোচ্ছিল, তখন আত্মবিশ্বাসে চিরাগের মুখটা ঝকমক করছিল। এখন তার চিহ্নমাত্র নেই।

ইমন ওকে বলল, 'এত চেইত্যা গেছস ক্যান ভাই?'

'শুয়ারের বাচ্চাটাকে খুন করার জন্য আমার হাত নিসপিস করছে।'

‘চিরাগ, অহন উল্টাপাল্টা চিন্তা করিস না। আমাগো দুই হাত পিছনেই কিন্তু পুলিশ। মাথায় রাখিস।’

চিরাগ পাল্টা কী বলতে যাচ্ছিল, কামালের ডাক শুনে চুপ করে গেল। কাউন্টার থেকে কামাল তাচ্ছিল্য দেখিয়ে ডাকল, ‘হুই ইয়া মনাশেফ বেঙ্গলিস, তোদের খাবারটাও আমাকে নিয়ে যেতে হবে না কি। পেট ভরাতে চাস তো এখানে এসে ট্রে নিয়ে যা।’

ইরাকের ছেলে কামাল আরবি, কুর্দ, আর্মেনিয়ান ছাড়াও ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। কিন্তু যখন গাল দেয়, তখন আরবিতে। ইমন জানে, ইয়া মনাশেফ কথাটার মানে বীর্যহীন। ক্যালিফেটে বহুবার ওরা শুনেছে। কামালের কথায় পাত্তা দেবে না বলে চিরাগ গোঁ ধরে বসে আছে। গ্রুপ ক্যাপ্টেনের কথা না শোনার মূল্য ক্যালিফেটে গিয়ে দিতে হবে। ভেবে, ইমন সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে ওর আর চিরাগের ট্রে দুটো নিয়ে এল। যা ভেবেছিল, তাই হল। ওদের সঙ্গে এক টেবলে না বসে কামাল গিয়ে বসল দূরের একটা টেবলে। ক্যালিফেটেও ইমনরা দেখেছে, আরবিরা সবসময় বুঝিয়ে দেয়, ওরা উঁচু স্তরের জিহাদি। যারা আরব নয়, এমন মুসলমানরা ওদের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসার যোগ্য নয়।

অপমান হজম করে ইমন চুপচাপ স্যান্ডউইচে কামড় দিল। সাবওয়েতে ওরা ছাড়া আর কোনও খদ্দের নেই। অত রাতে বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটাও প্রায় ফাঁকা। চিরাগ ট্রে-র সামনে চুপ করে বসে। স্যান্ডউইচ মুখে দেওয়ার কোনও তাগিদ দেখাচ্ছে না। মাথা গরম ছেলে। ওর মাথায় কী ঘুরছে, কে জানে? সেটা বোঝার জন্য ইমন সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, ‘তর এত বড় ভুল হইল ক্যান ভাই?’

‘ভুল তো আমার হয়নি।’ চিরাগ ফোঁস করে উঠল। কামালের দিকে একবার তাকিয়ে তার পর বলল, ‘ভুল যার হয়েছে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। আমি ঠিক টার্গেটেই মেরেছি। কিন্তু লিলি গডউইন যে অন্য একজনের

সঙ্গে ড্রেস বদলে নিয়েছিলেন, এই ইনফর্মেশন খানকির ছেলেটা আমায় দেয়নি। ও আমাকে ডিসক্রেডিট করতে চেয়েছিল। আমি যখন ভুল বুঝতে পারলাম, তখন সময় নষ্ট করিনি। আমার সেকেন্ড বুলেটটা যার গায়ে লেগেছে, সে আর উঠে দাঁড়াবে না।'

'মাকারভ পিস্তলটা কি তোর সঙ্গেই আছে?'

'না। কামাল হ্যান্ডওভার করতে বলেছিল। এটাই না কি কম্যান্ডারের অর্ডার ছিল। শুয়ারটা আমার মোবাইল ফোনটাও কেড়ে নিয়েছে।'

শুনে ইমন আর কথা বাড়াল না। চুপচাপ স্যান্ডউইচ শেষ করে চিরাগের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ওর ঘুম ঘুম পাচ্ছে। কোনও একটা নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে এখনই বিশ্রাম নেওয়া উচিত। কামালের দোষ নেই। ও ফোর্ড গাড়িটা আগে মোটেল পর্যন্ত নিয়ে যেতে চেয়েছিল। পরে বোধহয় ও চিন্তা করে দেখেছে, গাড়ি খুঁজতে খুঁজতে পুলিশ মোটেলে পৌঁছে যেতে পারে। কী দরকার ঝুঁকি নিয়ে? নায়গারার মতো একটা ট্যুরিস্ট স্পট-এ শ্যুট আউট হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনাটাকে মোটেই সহজ ভাবে নেবে না। তার চেয়েও বড় কথা, অ্যাটাকটা হয়েছে ভিভিআইপি এক মহিলার উপর। এই বিপদ থেকে ওদের উদ্ধার পাওয়ার জন্য ইমনের মনে হচ্ছে, যা করার তা রাতের মধ্যে ওদের করে ফেলা উচিত।

ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে কামাল ওদের সামনে এল। তার পর লাইন কেটে দিয়ে রূঢ় গলায় বলল, 'এই কুত্তারা শোন, তোদের জন্য একটা ভাল খবর আছে।'

ইমন মুখ তুলে তাকাল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করল না।

কামাল বলল, 'কম্যান্ডারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এখানকার খবর শুনে উনি বললেন, পাছায় লাথি মেরে তোদের প্যাসিফিক ওশানে ফেলে দেওয়া উচিত। জিহাদি হয়ে তোদের লাভ নেই। বরং দেশে ফিরে গিয়ে তোরা মায়ের... মুখ দিয়ে শুয়ে থাক।'

কথাটা আরবিতে ও বলল, 'কেসস ইমাক'। অর্থাৎ কী না মায়ের যৌনাঙ্গে। শুনে ইমন চট করে একবার চিরাগের দিকে তাকাল। দেখল, ওর হাতের মুঠি শক্ত হয়ে গেছে। যে কোনও মুহূর্তে রাগে ও ফেটে পড়তে পারে। কিন্তু প্রকাশ্যে মারামারিতে জড়িয়ে পড়লে ফল ভাল হবে না।

'অপদার্থ, জঞ্জাল। হাঁ করে দেখছিস কী? চল, পার্কিংয়ে আমাদের জন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের এখন বাফেলো মেডিক্যাল হাসপাতালে যেতে হবে।'

ইমন প্রশ্ন করল, 'হাসপাতালে কেন?'

মুখ খিঁচিয়ে কামাল বলল, 'তোরা মরদ কী না, সেটা পরীক্ষা করার জন্য রে বেজন্মা। ইয়েলান এল কিস হালি খালাকাক। মায়ের যেখান থেকে বেরিয়েছিস, তার দিব্যি। শোন যে আমেরিকান বেশ্যাটাকে মারতে এসেছিস, সে এখন হাসপাতালে। কম্যান্ডার অর্ডার দিয়েছে, তাকে তো মারতেই হবে। সেইসঙ্গে যে ওই বেশ্যাটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে, তাকেও খাল্লাস করতে হবে। এ দুটো কাজ যদি না পারিস, তা হলে কম্যান্ডার বলল, তোদের দিয়ে লিঙ্গ চোষাবে।'

শেষের বাক্যটা চিরাগ শুনতে পায়নি। তার আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে ও সাবওয়ে থেকে বেরিয়ে গেছে। কামালের কথা শুনে চট করে রেস্তোরাঁর দৃশ্যটা ইমনের চোখের সামনে ভেসে উঠল। চিরাগ গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে যে লোকটা লিলি গডউইনের হাত ধরে টেনেছিল, তাকে দেখেছে ও। বয়স তিরিশের এ পাশেই হবে। নীল রঙের হুডি পরেছিল। তবে মজবুত শরীরের। ইমনের মনে হয়েছিল, সিকিউরিটি স্টাফ নয়। অর্ডিনারি পাবলিক। ইন্ডিয়া অথবা পাকিস্তানের হবে। লোকটার রিফ্লেক্স ঈর্ষা করার মতো। কিন্তু সেই লোকটাকে ওরা পাবে কোথায়?

একটু ইতস্তত করে প্রশ্নটা ও করতেই কামাল বলল, 'লোকটা বাফেলোয় লা কুইতা বলে একটা হোটেলে এসে উঠেছে। ওর নাম-ধাম, ছবি, সব

একটু পরেই আমার পকেটে এসে যাবে। তোদের চিন্তা করার দরকার নেই। এখন চল, আগে হাসপাতালে গিয়ে বেশ্যা মাগিটাকে সাবাড় করি।'

অবসাদে উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে না ইমনের। শরীর একটা নরম বিছানা চাইছে। হায় রে জিহাদি জীবন! ইমন মনে মনে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল, এই জীবন থেকে কি আদৌ মুক্তি পাবে?

(চার)

এফবিআই অফিসারদের বিরুদ্ধে রাগ উগড়ে দিচ্ছেন পলাশভাই। তাঁর ছেলেমানুষি কথাগুলো শুনে হাসি পাচ্ছে কালকেতুর। 'আমেরিকায় আর বিজনেস করুম না কালকেতুভাই। পুলিশের ব্যাভার দ্যাখলেন? হ্যারা থার্ড ওয়ার্ল্ডের কাউরে মানুষ বইল্যাই মনে করে না। হালায় আমি ফোন করলে ঢাকার পুলিশ কমিশনার নিজে ফোন তুলে। আর এহানে দ্যাখলেন তো, পুলিশ হারা রাত্তির বসাইয়া রাখল। আমাগো কুনো কথাই বিশ্বাস করল না!'

গাড়ি ড্রাইভ করছেন রোজিনা। তাঁর ডান পাশে বসে পলাশভাই। বেলা এগারোটা বাজে। গাড়ি ক্লিভল্যান্ড এয়ারপার্টের দিকে যাচ্ছে। সারা রাত্তির দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি কালকেতু। অসম্ভব উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে। এফবিআই অফিসাররা পলাশভাইকে একা একটা ঘরে বসিয়ে রেখেছিল। দফায় দফায় খুব রগড়েছে। এমন ব্যবহার করছিল যেন উনি টেররিস্ট। ঘাবড়ে গিয়ে পলাশভাইও ওদের প্রশ্নের উত্তরগুলো এমন ভাসা ভাসা দিচ্ছিলেন, শুনে কালকেতুও অবাক। যেমন, আপনি আমেরিকায় বিজনেস করেন বলছেন, কাদের সঙ্গে করেন? পলাশভাই বললেন, 'সবার নাম মনে পড়ছে না। একটা কোম্পানির কথা বলতে পারি... ওয়ালমার্ট। ওখানে গারমেন্টস সাপ্লাই করি।' শুনে এফবিআই অফিসাররা বিশ্বাস করছিলেন না।

ওয়ালমার্ট হল বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। যেখানে শাক সবজি, ফল, ফুল থেকে শুরু করে পোশাক, পানীয়, ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস, উপহার

সামগ্রী... সব পাওয়া যায়। সারা আমেরিকা জুড়ে ওদের প্রচুর শাখা। অফিসাররা জানতে চান, আমেরিকায় আপনার কোনও পরিচিত মানুষ থাকেন কি না? ভাগ্যিস, পলাশভাই তখন রোজিনার নামটা করেছিলেন। উনি তাচ্ছিল্যভরেই উত্তর দিয়েছিলেন, 'ইচ্ছে করলে ওর সঙ্গে আপনারা কথা বলতে পারেন। চেলসিতে থাকেন, উনি আমার বিজনেস অ্যাডভাইসার।' নিউ ইয়র্কে ফোন করে রোজিনার সঙ্গে কথা বলার পর অবশ্য এফবিআই অফিসারদের মনোভাব বদলেছিল। ওঁরা আর রূঢ় আচরণ করেননি। উল্টে, কফি আর স্যান্ডউইচ খাইয়ে ভোরবেলায় ওদের লা কুইতা হোটেলে পৌঁছে দেন। ওই খাতিরদারিটাও পলাশভাইয়ের যথেষ্ট বলে মনে হয়নি।

'নাইন ইলেভেনে আল কায়দার টেররিস্টরা ঠিইক করসিল, বোঝলেন কালকেতুভাই। দম্ভ, দম্ভই শেষ কইর‍্যা দিব এই দ্যাশটারে। অফিসারগুলান আমার সাথে কথা কইত্যাসিল, য্যান আমি হ্যাগো চাকর-বাকর।' পলাশভাই রাগ চাপতে পারছেন না।

গাড়িতে ওঠার পর থেকে রোজিনা এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। এ বার বললেন, 'আপনে শান্ত হন পলাশ। এফবিআই নিয়া না ভাইব্যা বরং চিন্তা করেন অ্যাভিস কোম্পানিরে ঠাণ্ডা কইরবেন কী কইর‍্যা?'

পলাশভাই বললেন, 'ক্যান? হ্যাগো আবার হইলডা কী ম্যাডাম?'

'হ্যাগো মার্সিডিজ গাড়িডার কী হাল হইসে, আপনে দ্যাখসেন? পলাইতে গিয়া টেররিস্টরা গাছে ধাক্কা মারসিল। সামনের দিকডা তুবরাইয়া গ্যাসে। আমাগো হিউস কমপেনসেশন দিতে অইব। আমি ইনসুরেন্স কোম্পানির সাথে কথা কইসি। হ্যারা গাড়িডার কারেন্ট ভ্যালু ডিম্যান্ড কইরব, কইল।'

'হালায় ড্যামেজ কইরল একজন, গুণাগার দিতে অইব আমারে। কী বিচার কন দেহি কাইলকেতুভাই।'

প্রশ্নটা যে ওর উদ্দেশেই করা কালকেতু বুঝতে পারেনি। পিছনের সিটে বসে লুকিং মিররে ও তখন রোজিনার দিকেই তাকিয়ে। ভদ্রমহিলা যে যথেষ্ট সুন্দরী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গায়ের রং, পোশাক-আশাক, হেয়ার স্টাইল, বাচনভঙ্গি... সব মিলিয়ে আর যা-ই হোক, রোজিনাকে বাঙালি মেয়ে বলে ও মেলাতে পারছিল না। বয়স তিরিশ-বত্রিশের মধ্যে। উনি যথেষ্ঠ শিক্ষিত, অনেকগুলো ভাষা জানেন। গাড়িতে ওঠার পরই ওঁর কাছে একটা ফোন এসেছিল। তখন উনি স্প্যানিশে কথা বলছিলেন। একটু আধটু স্প্যানিশ জানে বলে, কালকেতু বুঝতে পারছিল, রোজিনা ওর লইয়ারের সঙ্গে কথা বলছেন। পলাশভাইকে যে সাময়িক ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা লইয়ারকে উনি জানালেন। এর পরই এমন চোস্ত ইয়াঙ্কি উচ্চারণে একজনের সঙ্গে রোজিনা কথা বললেন, তাতে কালকেতুর মনে হল, ভদ্রমহিলা জন্ম থেকেই আমেরিকায়।

'ঘুমাইয়া পড়লেন নাহি কাইলকেতুভাই।' সামনের সিট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে পলাশভাই আরও বললেন, 'ম্যাডাম কী কইল, হুনলেন না হি?'

অর্থাৎ গাড়ির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা। কালকেতু বলল, 'শুনেছি। যে দেশের যা নিয়ম, আপনাকে তো মানতে হবেই।'

'মগের মুলুক না হি? রোজিনা ম্যাডাম, আফনে একডা ট্যাহাও দিবেন না। আর কাইলই য্যান আমি দ্যাশে ফিরতে পারি, হ্যার ব্যবস্থা করেন।'

শান্ত গলায় রোজিনা বললেন, 'অহন আফনের দ্যাশে ফেরা অইব না পলাশ। এফবিআই গ্রিন সিগন্যাল না দেওয়া পর্যন্ত আফনেগো এ দ্যাশে থাইকতে অইব।'

পলাশভাই চুপ করে থাকার পাত্তর নন। জেদ দেখিয়ে উনি বললেন, 'আপনে তাইলে মিডিয়ার লোকজনরে ডাকেন। এনবিসি চ্যানেলের লিন্ডা গার্ডনাররে। আপনের সাথে তো হ্যার ভাল সম্পর্ক। বুঝাইয়া দ্যান, এফবিআই যারে তারে হ্যারাস করতে পারে না।'

এবার রোজিনা সামান্য বিরক্ত গলায় বললেন, 'আফনে চুপ কইর‍্যা বসেন তো। এত চেইত্যা গেলে কাম চলে? লিন্ডারে বিরক্ত করনের কুনও দরকার নাই।'

'তা ইলে আর কী, হাত-পা গুটাইয়া বইস্যা থাকেন।'

পলাশভাইয়ের গলায় অসন্তোষের সুর শুনে রোজিনা এ বার বোঝানোর ভঙ্গিতে বললেন, 'যে কেসে আফনেরে ইন্টারোগেশনের জন্য হ্যারা ডাকছিল, ইচ্ছা কইরলে নাইন্টি নাইন ইয়ারস জেলে ঢুকাইয়া দিতে পারে। যে ভদ্রমহিলার উফর হামলা হইসিল, হ্যায় কে জানেন? ইউনিসেফের ভেরি ভেরি ইম্পরট্যান্ট একজন লেডি... লিলি গডউইন। পুরা ইন্সিডেন্টডা ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু হইয়া যাইব। মিডিয়ারে এর মধ্যে টাইনলে আফনের বিজনেস লাটে উইঠব। বোঝার চেষ্টা করেন।'

পলাশভাই মিউমিউ করে বললেন, 'নাইনটি নাইন ইয়ারস ইন প্রিজন! কন কী ম্যাডাম?'

'হান্ড্রেড ফিফটি ইয়ারসও অইতে পারে। টুইন টাওয়ার ভাইঙ্গা পড়ার পর একজন টেররিস্টের দ্যাড়শো বৎসর পানিশমেন্ট হইসিল। কী, হুইন্যা ডর লাগে না হি?' কথাটা বলে রোজিনা হাসতে লাগলেন।

লুকিং মিররে রোজিনা ম্যাডামের মুখটা দেখে কালকেতুর মনে হল, এমন সুন্দর হাসি আর কখনও ওর চোখে পড়েনি। ভদ্রমহিলার সঙ্গে এখনও অবশ্য পলাশভাই পরিচয় করিয়ে দেননি। টেনশনে হয়তো ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক ধরে ওঁকে দেখার পর একটা জিনিস কালকেতু বুঝতে পেরেছে, রোজিনা ম্যাডামের উপর পলাশভাই খুব নির্ভরশীল। কে যেন একবার বলেছিল, পলাশভাই না কি বাংলাদেশের গৌরী সেন। দশ বারোটা গারমেন্টস কোম্পানি, দশটা চা বাগান এবং ঢাকা আর চিটাগাংয়ে দুটো বিশাল শপিং মলের মালিক। আসল ইনকাম এক্সপোর্টের ব্যাবসা। পলাশভাই বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই না কি

প্রাইম মিনিস্টার বিলকিস বেগমের সঙ্গে উনি দেখা করতে পারেন। কিন্তু এখানে ওঁর ছেলেমানুষি দেখে কালকেতু সতিই মেলাতে পারছে না, ব্যাবসার অত বড় সাম্রাজ্য ভদ্রলোক সামলান কী করে?

নায়গারায় হোটেল ছাড়ার আগে পলাশভাই যখন রোজিনার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন ওঁদের কথাবার্তায় কালকেতু জানতে পেরেছিল, গাড়িতে করে ওঁরা প্রথমে ক্লিভল্যান্ড এয়ারপোর্টে যাবেন। তার পর প্লেনে করে নিউ ইয়র্কে। জেলে যাওয়ার কথা শুনে পলাশভাই সেই যে মুখে কুলুপ এঁটেছেন, তার পর থেকে আর খোলেননি। জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে লাগল কালকেতু। ফ্রিওয়ের দু'পাশ দিগন্তব্যাপী সবুজ। জিপিএস দেখে গাড়ি চালাতে চালাতে ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ এক্সিট দিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়লেন রোজিনা। একটা রেস্ট এরিয়ায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললেন, 'নামেন আফনেরা। এড্ডু কফি খাওয়া যাক।'

ফ্রি ওয়ের মাঝে মাঝে রেস্ট এরিয়া করা আছে। হাইওয়ে বা ফ্রিওয়ে দিয়ে গাড়িতে যাঁরা যাতায়াত করেন, তাদের সুবিধার্থে। রেস্ট এরিয়ায় ওয়াশরুম আছে, কিছু দোকানপত্তরও। টয়লেটে ঘুরে আসা যায়, হালকা স্ন্যাকস খেয়ে নেওয়া যায়। ধূমপানের ইচ্ছেটাও মেটানো সম্ভব। গাড়ি থেকে নেমে কালকেতু সিগারেট ধরাল। রোজিনা ওয়াশরুমে ফ্রেশ হতে গেলেন। ভদ্রমহিলা মনে হয়, খুব ভোরে বাফেলোর প্লেন ধরেছিলেন। পলাশভাই স্টার বাকস-এ ঢুকলেন পছন্দমতো ব্রাজিলিয়ান কফি আনতে। খানিক পরে রোজিনা বাইরে বেরিয়ে পলাশভাইকে ধারে কাছে দেখতে না পেয়ে কালকেতুর কাছে এসে বললেন, 'মি. নন্দী, কাল রাতে যা ঘটেছে, সে ব্যাপারে আমাদের ল'ইয়ার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আজ রাতে উনি আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে আসবেন। আপনি কিন্তু অন্য কোনও এনগেজমেন্ট রাখবেন না।'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল কালকেতু। বিকেলের দিকে ওদের গ্রাউন্ড জিরো দেখতে যাওয়ার কথা। নাইন ইলেভেনে টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর, একই জায়গায় দুটো এখন জলাধার করা হয়েছে। তার গায়ে মৃত লোকদের নাম লেখা। জলাধারের উপর চারপাশ থেকে ক্রমাগত জলের ধারা নিচে নামছে মৃত লোকদের আত্মার শান্তির জন্য। পলাশভাই বলেছিলেন, ওখান থেকে সোজা নিয়ে যাবেন কাছেই রুচি বলে একটা ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয়। একেবারে ডিনার সেরে ওরা বাড়িতে ফিরবেন। কিন্তু তখন তো জানতেন না, এমন একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন! দরকার হলে গ্রাউন্ড জিরো দেখার প্ল্যান বাতিল করে দিতে হবে। কেননা, উকিলের সঙ্গে পরামর্শটা অনেক বেশি জরুরি। ভেবে কালকেতু বলল, 'নিশ্চয়ই। তবে আপনি কিন্তু একবার পলাশভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে রাখবেন।'

রোজিনা জিজ্ঞেস করলেন, 'মি. নন্দী, কথাটা অন্যভাবে নেবেন না। কাল রাতে পলাশ এফবিআইয়ের সঙ্গে কী এমন বিহেভিয়ার করেছিলেন, যাতে ওরা চটে গেছিলেন?'

কালকেতু বলল, 'আরে না...হোটেলে এসে কিন্তু ওঁরাই প্রথম দিকে খুব খারাপ ব্যবহার করে। পরে লোকাল পুলিশ যখন জানতে পারে, লিলি গডউইনকে আমিই বাঁচিয়েছি, তখন আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে অফিসাররা খানিকটা নরম হন।'

রোজিনা বললেন, 'পলাশ এমনি খুব সিম্পল মাইন্ডের। কিন্তু একটু খ্যাপা টাইপেরও। কাকে কী বলছেন তখন ওর মনে থাকে না। ওকে সামলাতে গিয়ে আমি অনেক সময় অসুবিধেয় পড়ে যাই।'

কালকেতু হেসে বলল, 'সেটা আমিও টের পাচ্ছি। আসলে এফবিআই অফিসাররা যা জিজ্ঞেস করছিলেন, উনি যদি সাফ সাফ উত্তর দিতেন, তা হলে পরিস্থিতি অন্য-রকম হতো।'

'তাই না কি? একটা উদাহরণ দিন তো।'

‘যেমন ধরুন, শেরিফের অফিসে একজন অফিসার ওকে জিজ্ঞেস করলেন, ডকুমেন্ট বলছে, মি. নন্দীকে আপনিই স্পনসর করে আমেরিকায় নিয়ে এসেছেন। কেন? পলাশভাই ইচ্ছে করলে সত্যি কথাটা বলে দিলে পারতেন। কিন্তু উনি বললেন, এটা পার্সোনাল ম্যাটার। উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।’

‘পলাশের মাথায় মাঝে মধ্যে অদ্ভুত খেয়াল চাপে, জানেন? উনি যে কেন ইন্ডিয়া থেকে আপনাকে নিয়ে এসেছেন, আমাকেও তখন তা বলেননি। ঢাকা থেকে ফোন করে আপনার নাম আর বায়োডেটা দিয়ে উনি শুধু বলেছিলেন, স্পনসরশিপের সব ডকুমেন্টস পাঠিয়ে দিতে।’

কালকেতু একটু অবাক হয়েই বলল, ‘সত্যিই আপনি জানতেন না, কেন আমাকে উনি নিয়ে এসেছেন?’

‘না। আজই উনি আমাকে বললেন। সে কথা থাক, আপনি বলুন, নায়গারা কেমন দেখলেন?’

‘অসাধারণ। একেকটা জায়গা আছে, একবার দেখে আশ মেটে না। দ্বিতীয়... তৃতীয়বার গেলেও সমান ভাল লাগে। আমারও ফের যেতে ইচ্ছে করবে। এই তো পলাশভাইও বলছিলেন, উনি বেশ কয়েকবার নায়গারায় গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, এবারও ওর মধ্যে সমান উচ্ছ্বাস দেখলাম।’

‘সে তো অন্য কারণে। ওই যে বললাম, ওঁর অদ্ভুত খেয়াল। এই দেখুন না, গত ডিসেম্বরে এখানে তখন বরফ পড়ছে। ঢাকা থেকে উনি তিনজনকে নিয়ে এলেন, যারা অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের এক্সপার্ট। ওদের নিয়ে নায়গারায় গিয়ে পলাশ জিদ ধরলেন, জানুয়ারি মাসে ফলস-এর উপর দিয়ে হাঁটবেন। অনেক কষ্টে শেষ পযন্ত ওকে আমি থামাই।’

‘নায়গারার উপর দিয়ে হাঁটবেন মানে?’

রোজিনা হাসিমুখে বললেন, ‘কেন, আপনাকে উনি এই ইচ্ছেটার কথা বলেননি? বছরের শেষদিকে নায়গারা ফলস জমে যখন বরফ হয়ে যায়,

তখন তার উপর দিয়ে হেঁটে উনি কানাডায় গিয়ে উঠতে চান। আজ পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডের কেউ যা করতে পারেননি, উনি তা করে দেখাবেন। সে এক কাণ্ড, অ্যাডভেঞ্চার এক্সপার্টদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন উনি শলাপরামর্শ করলেন। প্রচুর টাকা-পয়সাও খরচা করেন। কিন্তু নিউ ইয়র্ক সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওঁকে করতে দেননি।'

'বাধা দেয় কেন?'

'আরে, ওই সময়টায় নায়গারায় কোথাও কোথাও বরফের স্তর খুব পাতলা থাকে। তলায় তখন ঠান্ডা জলের চোরা স্রোত বয়। উপর থেকে কিছু বোঝা যায় না। একবার তলিয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। একবার একজন সাউথ ইন্ডিয়ান ছেলে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়, পার্মিশন না নিয়েই নায়গারা ফলস-এর উপর থেকে ঝাঁপ মেরেছিল। তার বডি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমন ডেঞ্জারাস এক্সপিডিশনে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেন অনুমতি দেবে, বলুন তো?'

রোজিনা কথাটা শেষ করার সঙ্গেসঙ্গে কালকেতুর চোখে পড়ল, দু'হাতে ট্রে-তে তিন গ্লাস কফি নিয়ে স্টার বাকস কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পলাশভাই। একটা ইয়াং ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন। একটু পরেই কাছে এসে উনি বললেন, 'দ্যাখেন কাণ্ড। দ্যাশ থেইক্যা পলাইয়া আইসে। অহন দ্যাশের লোক দ্যাখলেই সাহায্য চায়।'

রোজিনা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই পোলাডা? কার সাথে কথা কইত্যাসিলেন?'

কফিতে চুমুক দিয়ে পলাশভাই বললেন, 'কইল তো ঢাকার পোলা। আমাগো দ্যাশের বাসা আমোদপুরের। এজেন্ট ধইর‍্যা ক্যানাডায় গ্যাসিল। কাজ-কাম পায় নাই। পলাইয়া আমেরিকায় ঢুইক্যা আইসে। হালা, হ্যারাই দ্যাশের বদনাম কইর‍্যা দ্যায়।'

ব্রাজিলিয়ান কফির অনবদ্য স্বাদ, দু'চুমুক দিতেই তিনজনের মনে যেন ফুরফুরে ভাবটা ফিরে এল। তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। কফিশপের জানলা দিয়ে ওরা দেখতে পেল, পার্কিং এরিয়ায় একটা পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকে যিনি নেমে এলেন, তাঁকে দেখে তিনজনই চমকে উঠল। এফবিআই অফিসার জন মিকেল। পার্কিং স্পেসে ওদের গাড়ির ভেতর উঁকি মেরে কাউকে দেখতে না পেয়ে মিকেল কফি শপে ঢুকে এলেন। ভদ্রলোককে দেখে রোজিনা উঠে দাঁড়িয়েছেন। পলাশভাইয়ের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। কালকেতু বুঝতে পারল না, আবার কোনও পুলিশি ঝামেলায় পড়তে হবে কি না?

রোজিনা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার অফিসার? আপনি এখানে?'

'একটা খারাপ খবর আছে ম্যাম। ইন্টারপোল সূত্রে একটু আগে আমরা খবর পেলাম, আইএস টেররিস্টরা আপনাদের পিছু ধাওয়া করেছে।'

শুনে রোজিনার মুখে আতঙ্কের ছাপ। বলেই ফেললেন, 'মাই গুডনেস, এখন কী হবে?'

'কী আর হবে।' মিকেল বললেন, 'ওরা খ্যাপা কুত্তার মতো হয়ে গেছে। আমরা জানতে পেরেছি, হিট লিস্টে মি. ন্যান্ডিও ঢুকে পড়েছেন। ওঁর জন্য টার্গেট মিস করায় টেররিস্টদের রাগটা এখন গিয়ে পড়েছে মি. ন্যান্ডির উপর। তাই আপনাদের প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য আমাকে এখানে আসতে হল। নিউ ইয়র্ক সিটি পর্যন্ত পুলিশ আপনাদের এসকর্ট করবে।

(পাঁচ)

আমেরিকায় হ্যালোইন বলে একটা উৎসব আছে। তারই একটা পার্টিতে যাবেন বলে তৈরি পলাশভাই। পরনে কালো রঙের থ্রি-পিস স্যুট। বো টাই। মানুষটাকে চেনাই যাচ্ছে না। গায়ের রং বেশ ফর্সা। তার উপর মেকআপ করেছেন। স্বচ্ছন্দে ওকে এখন আমেরিকান বা মেক্সিকান বলে চালিয়ে

দেওয়া যায়। হাতে ভুতের মুখোশ। সেটা মুখে দিয়ে পলাশভাই বললেন, ‘দ্যাহেন তো, আমারে চিনতে পারেন না হি?’

কিম্ভুতকিমাকার চেহারাটা দেখে কালকেতুর হাসি পেয়ে গেল। দুপুরে পলাশভাই ওকে ওয়ালমার্টে নিয়ে গেছিলেন। ওই ভূতের মুখোশটা কেনার জন্য। হ্যালোইন উপলক্ষে নানা ধরনের অদ্ভুত কস্টিউম দোকানে দোকানে বিক্রি হয়। পলাশভাই একটা কিংকংয়ের মুখোশ কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রোজিনা ম্যাডাম পছন্দ করবেন না ভেবে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান। রোজিনার জন্য উনি উইচ হ্যাট আর ক্যাটস আই কিনেছেন। ডাইনিদের টুপি আর কালো বেড়ালের চোখ। এইসব কস্টিউম পরেই না কি পার্টিতে যেতে হয়।

ওয়ালমার্টে কস্টিউমের বাজার বেশ জোরদার। ছোট থেকে বড় সাইজের নরকঙ্কাল, করোটি, সাদা জালের উপর কালো মাকড়সা, কাক, কালো বেড়াল বিক্রি হচ্ছে। কালকেতুর চোখে পড়েছিল, প্রচুর মানুষ বেছে বেছে বিভিন্ন ধরনের ভূত-প্রেত, দত্যি দানোর কস্টিউম কিনছেন। ওয়ালমার্ট স্টোরের সামনে ডাঁই করা হলুদ কুমড়ো। একেকটার চার-পাঁচ কিলোর মতো ওজন হবে। কুমড়োগুলোর গায়ে বিদঘুটে চোখ আর মুখ আঁকা। লোকে নাকি বাড়ির সামনে কুমড়ো বসিয়ে রাখে হ্যালোইনের কয়েকদিন আগে থেকে।

হ্যালোইনের আনন্দে টেররিস্টদের কথা মনেও নেই কালকেতুদের। লাঞ্চের সময় রোজিনা কালকেতুকে হ্যালোইন ডে সম্পর্কে খানিকটা আইডিয়া দিয়েছেন। ভূত-প্রেতের দিন। এই দিনে মৃত প্রিয়জনদের লোকে স্মরণ করে। পাড়ায়, পার্কে এবং হোটেলের বলরুমগুলোতে সন্ধেবেলায় পার্টি। ভূত সেজে মানুষ জনকে ভয় দেখানোও চলে। ছেলেছোকরারা না কি অদ্ভুত কস্টিউম পরে হানা দেয় প্রতিবেশীদের বাড়িতে। শুনে রোজিনাকে কালকেতু বলেছিল, ‘এ রকম একটা দিন বাঙালিরা হিন্দুরাও পালন করে।

কালীপুজোর সময় ভূত চর্তুদশীতে। মা আর বাবার দিকের মৃত চৌদ্দো পুরুষকে তর্পণের দিন।'

শুনে রোজিনা মন্তব্য করেছিলেন, কলকাতায় আপনারাও ওইদিন হ্যালোইন পার্টি চালু করে দিন না। কস্টিউম বিক্রি করে কিছু ব্যবসা তো হবে। ইউরোপ, আমেরিকাকে দেখে আপনারা শেখেন না কেন? এই দুটো কন্টিনেন্টে এমন কোনও উৎসব নেই, যার সঙ্গে বাণিজ্য নেই। কায়দা করে থার্ড ওয়ার্ল্ডে এরা কী করে ভ্যালেন্টাইনস ডে-র সেলিব্রেশনটা ঢুকিয়ে দিল, কখনও ভেবেছেন?'

হ্যালোইন পার্টিতে যাওয়ার জন্য সেজে গুজে রোজিনাও বেরিয়ে এসেছেন। পার্টিতে না কি একটা কনটেস্ট হয়, কার কস্টিউম সেরা। ডাইনির সাজে রোজিনাকে দেখে কালকেতুর মনে হল, পৃথিবীর সেরা ডাইনি সুন্দরী। মাথায় ছুঁচোলো, লম্বা কালো টুপি। চোখে আধমুখ ঢাকা বেড়াল-চশমা। পলাশভাইয়ের হাতে হাত ধরে দু'জনে র‍্যাম্পে হাঁটার মতো কয়েক পা এগিয়ে এলেন। স্টেজে না কি এমন ভাবেই ওঁদের হাঁটতে হবে। বেরিয়ে যাওয়ার আগেও রোজিনা একবার ওকে বললেন, 'ফাঁকা বাড়িতে একা বসে আপনি কী করবেন? আমাদের সঙ্গে আপনি কিন্তু যেতে পারতেন। গেলে আপনার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হত।'

দুপুরে আরও একবার এই অনুরোধটা উনি করেছিলেন। কিন্তু কালকেতু রাজি হয়নি। ওর কাছে অনেক বেশি ইম্পরট্যান্ট ফোনে সুদীশ নাগের সঙ্গে কথা বলা। কালকেতুর দীর্ঘদিনের বন্ধু সুদীশ এখন ইন্টারপোল-এর অফিসার। ওর ফোন করার কথা ফ্রান্সের লিওঁ থেকে। ইন্টারপোল হল আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনি। তাদের হেড কোয়ার্টার লিওঁতে। দু'দিন আগে কলকাতা থেকে সুদীশ লিওঁতে পৌছেছে। ওর কাছে কয়েকটা তথ্য চেয়ে কালকেতু একটা মেল করেছিল। এখন সুদীশের সঙ্গে ওকে কথা বলতেই

হবে। না হলে যে কাজের জন্য ওকে পলাশভাই আমেরিকায় নিয়ে এসেছেন, তা একবিন্দু এগোবে না।

বাফেলোয় পুলিশের ঝামেলায় সেই কাজে মাঝে বাধা পড়েছিল। পলাশভাইয়েরা হ্যালোইন পার্টিতে বেরিয়ে যাওয়ার পর কালকেতু নিশ্চিন্তে ল্যাপটপ নিয়ে বসল। মাস দেড়েক আগেও ও চিনত না পলাশভাইকে। পরিচয় হওয়ার দিনটার কথা ওর স্পষ্ট মনে আছে। গল্ফগ্রিনে ওর হাউসিং কমপ্লেক্সের সিকিউরিটি গার্ড রণজিৎ একদিন নীচ থেকে ফোন করে বলল, 'স্যার, আপনার কাছে দু'জন ভিজিটর এসেছেন। উপরে পাঠিয়ে দেব?'

কালকেতু জিজ্ঞেস করছিল, 'কী নাম বলল?'

'একজনের নাম টুলটুল চাকলাদার। উনি বলছেন, ওঁকে আপনি চেনেন না। কিন্তু ওঁর বাবা নাকি আপনার খুব পরিচিত।'

'বাবার নামটা কী, জিজ্ঞেস করো তো?'

কয়েক সেকেন্ড পর রণজিৎ বলেছিল, 'রমাপ্রসাদ চাকলাদার। উনি নাকি আপনাদের সঙ্গে চাকরি করতেন।'

চট করে মনে পড়ে গেছিল কালকেতুর। আরে, রমাদা। একটা সময় ওদের কাগজে চিফ ফোটোগ্রাফার ছিলেন। ওদের থেকে অনেক সিনিয়র। বছর খানেক আগে উনি মারা গেছেন। একটা সময় কাগজের জন্য দারুণ দারুণ ছবি তুলেছেন রমাদা। ওঁর একটা ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পেয়েছিল। সেই রমাদার ছেলে হঠাৎ ওর কাছে! রণজিৎকে ও বলেছিল, 'ভদ্রলোকদের উপরে পাঠিয়ে দাও।'

মিনিট তিনেক পরে রণজিতের সঙ্গে দরজার সামনে যে দু'জন এসে দাঁড়াল, তাঁদের একজনের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি না। তার পরনে জিনসের প্যান্ট আর হাফ হাতা পাঞ্জাবি। মাথার চুল পিছন দিকে ঝুটি বাঁধা। চশমার ফাঁকে উজ্জ্বল দুটো চোখ। মুখের আদল রমাদার মতোই। কালকেতুর বুঝতে অসুবিধে হয়নি, এ রমাদার ছেলে টুলটুল।

অন্যজনের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পরনে থ্রি পিস স্যুট। সম্ভ্রান্ত চেহারা, দেখেই বোঝা যায়, প্রচুর পয়সাকড়ির মালিক। আট আঙুলে সোনা-রূপার আংটিতে রত্ন বসানো। গ্রহদের কবজা করার জন্য ধারণ করেছেন। নিশ্চয়ই বড় বিজনেসম্যান। প্রোমোটারও হতে পারেন। ভদ্রলোকের একহাতে বিরাট একটা মিষ্টির বাক্স। আসার সময় লেক গার্ডেন্সের মোড়ে বলরাম মল্লিকের দোকান থেকে কিনে এনেছেন। অন্য হাতে, চকচকে রঙিন পলিথিনের প্যাকেট। তার গায়ে লেখা পলাশ গারমেন্টস। টুলটুলের হাতে একটা বড় খাম। প্রণাম করার চেষ্টায় ও মাথা নীচু করতেই কালকেতু বলল, 'থাক থাক। ভেতরে এসো।'

টুলটুল এমন একটা দিনে এসেছিল, যেদিন কালকেতুর টাইট সিডিউল। ক্যালকাটা ক্লাবে একজন ওর জন্য অপেক্ষা করবেন। মিনিট পনেরোর মধ্যে বেরতে না পারলে, ওঁর কাছে পৌঁছনো যাবে না। ড্রয়িং রুমে সোফায় বসার পর কালকেতু তাই টুলটুলকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিল, 'বলো, কী কারণে দেখা করতে এসেছ।'

শুনে টুলটুল লজ্জিত মুখে বলল, 'আঙ্কল, আমি জানি, আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু আপনার খুব বেশি সময় নেব না। যে কারণে এসেছি, সেটা বলার আগে আপনার সঙ্গে পলাশবাবুর আলাপ করিয়ে দিই। ইনি পলাশ চৌধুরী...'

টুলটুল কথাটা শেষ করার আগেই হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন ভদ্রলোক। তার পর বলে উঠলেন, 'ঢাকায় আমার ছুটো বিজনেস আসে। অ্যাকচুয়ালি আমার দরকারেই টুলটুলভাই আমারে আফনের এহানে লইয়্যা আইসে।' কথাটা বলতে বলতেই ভদ্রলোক পলিথিনের ব্যাগটা কালকেতুর দিকে এগিয়ে দিলেন। তার পর বললেন, 'আফনের লইগ্যা পদ্মার কয়েকডা ইলিশ আনসি। বিশ কেজির মতো উজন অইব। অহনই ফ্রিজে ঢুকাইয়া দেন। গ্যারান্টি দিয়া কইতে পারি, কইলকাত্তার মার্কেটে এই ইলিশ পাইবেন না।'

বাংলাদেশিরা এমনিতেই খুব দিলদরিয়া টাইপের হন। পলাশবাবু ওকে চেনেন না, জানেন না। তা সত্ত্বেও এত ইলিশ বয়ে এনেছেন। কাজের মেয়ে রেণুকে ডেকে কালকেতু বলেছিল, মাছগুলো ফ্রিজে তুলে রাখতে। তার পর পলাশবাবুর প্রয়োজনটা কী, তা জানার জন্য ও টুলটুলের দিকে তাকিয়েছিল। হাতে ধরে রাখা খাম থেকে একটা ছবি বের করে, সেটা এগিয়ে দিয়ে টুলুটুল বলেছিল, 'এই ছবিটা আপনি আগে দেখুন। তার পর বলব, কেন এসেছি?'

ছবিটার দিকে তাকাতেই কালকেতুর স্মৃতির কোঠরে কে যেন ঘণ্টা বাজাতে শুরু করেছিল। এর আগেও কোথায় যেন দেখেছে। ছবিতে একজন ছয়-সাত বছরের মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে নদীর ঘাট থেকে দৌড়ে উঠে আসছে। তার পরনে শুধু ইজের। অনাবৃত উর্ধাঙ্গের কোনও কোনও অংশ আগুনে ঝলসে গেছে। তার চোখ- মুখে প্রচণ্ড আতঙ্ক। মেয়েটার পিছনে বিরাট কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। তারই মাঝে বাড়ি ঘরদোর জ্বলছে। কাছেই একটা মন্দিরের একাংশ দেখা যাচ্ছে। মেয়েটার আশপাশে আরও কয়েকজন দৌড়ে পালাচ্ছে। দু'একটা দেহ রাস্তায় পড়ে। ছবিটা দেখেই কালকেতুর মনে হল, সাধারণ দাঙ্গা বা লুটপাটের সময় তোলা নয়। তার থেকে আরও অনেক বড় দুর্ঘটনার সময়কার। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর বিশালত্বই তার প্রমাণ। মোট কথা, একটা অসাধারণ ছবি। নিশ্চয়ই রমাদার তোলা। না হলে টুলটুল পাবে কী করে? কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'রমাদা এই ছবিটা কবে তুলেছিলেন?'

টুলটুল বলল, 'একাত্তর সালে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়।'

শুনে সঙ্গে সঙ্গে কালকেতুর মনে পড়ে গেল। ছিয়ানববুই সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ওদের কাগজে সাপ্লিমেটারি বেরিয়েছিল। তাতে রমাদার এই পুরনো ছবিটা হাফ পেজ ছাপা হয়েছিল। সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আর্টিকেল লিখেছিলেন বরুণদা।

রিপোর্টার বরুণ গাংগুলি। সেই সময় ইন্ডিয়ান আর্মি মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধই শুরু হয়ে গেছিল ভারতের। বরুণদা সেই যুদ্ধ কভার করার জন্য ঢাকায় গিয়েছিলেন। অনেক পরে বরুণদার মুখে কালকেতু শুনেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের ভয় দেখানোর জন্য পাক সেনাবাহিনী লোকালয়ে বোমা ফেলেছিল। টুলটুলের আনা ছবিটা তা হলে সেইসময়কার।

'এ ছবিটা অ্যাদ্দিন পর তুমি পেলে কোথায় টুলটুল?'

প্রশ্নটা করতেই টুলটুল বলেছিল, 'আপনি তো জানেন, বাবার স্টুডিয়ো ছিল পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছে। বাবা রিটায়ার করার পর থেকে সেই স্টুডিয়োটা অ্যাদ্দিন আমিই চালাচ্ছিলাম। কিছুদিন আগে সেখানে আগুন লাগে। বাবার তোলা বহু মূল্যবান ছবি পুড়ে যায়। আমি কিছু বাঁচাতে পেরেছিলাম। সেগুলো গুছিয়ে রাখতে গিয়ে হঠাৎ একটা খামে এই বাচ্চা মেয়েটার ছবি আমার চোখে পড়ে। খুব যত্ন করে ছবিটা একটা ড্রয়ারে রাখা ছিল। সঙ্গে একটা চিঠিও। সেই চিঠির ফোটো কপি আমি নিয়ে এসেছি। পড়লেই বুঝতে পারবেন, আমি বা পলাশবাবু কেন আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।'

কথাগুলো বলেই টুলটুল চিঠির খামটা এগিয়ে দিয়েছিল। সেটা হাতে নিয়ে কালকেতু জিজ্ঞেস করে, 'এই ছবিটার কথা পলাশবাবু জানলেন কী করে? উনি তো ঢাকায় থাকেন।'

ফের কথার মাঝে পলাশবাবু বলে উঠলেন, 'সোশ্যাল নেট ওয়ার্কের মাইধ্যমে। টুলটুলভাই ফেসবুকে ছবিডা আপলোড কইর‍্যা একডা অ্যাপিল করসিলেন। কেউ যুদি মাইয়্যাডারে চিইনতে পারেন, জানান। আমার বুড়া মা ছবিডা দেইখ্যাই কাঁইন্দ্যা ফ্যালায়। কয়, পলাশ রে... হ্যায় তর শিউলিদিদি। আমাগো বড়কি। বাবার মুখে হুনতাম, মুক্তিযুইদ্ধের সুময় আমাগো

আমোদপুরে বোমা পড়সিল। হ্যার পর থেইক্যা শিউলিদিদিরে আর পাওয়া যায় নাই। তহন অবশ্য আমার জন্ম হয় নাই।'

পলাশভাইকে বাধা দিয়ে কালকেতু জিজ্ঞেস করে, 'এতদিন পর আপনার শিউলিদিদির ছবিটা দেখে আপনার মা চিনতে পারলেন কী করে?'

পলাশভাই বলেছিলেন, 'ক্যান জানেন, এই ছবিডা মক্তিযুইদ্ধের সময় কইলকাতার কাগজে বাইর হইসিল। রিফুজি হইয়া তহন আমাগো ফেমিলি কইলকাতায়। তহন দ্যাখসিল বইল্যা ছবিডার কথা মায়ের মনে সিল। আমোদপুরে বম্বিংয়ের পর শিউলিদিদি হারাইয়্যা যায়। আমার বাবা আর তার খোঁজ পায় নাই।'

পলাশবাবু চুপ করতেই টুলটুল বলেছিল, 'আসলে এটা আমারই কৌতূহল বলতে পারেন। বাবার তোলা ছবিটা দেখার পরই আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে। পরিবারের শিকড় থেকে যে মেয়েটা উপড়ে গেছে, সে এখন কোথায়, কীভাবে বেঁচে আছে, সেটা খোঁজ করে দেখলে কেমন হয়। পরিবারের সঙ্গে ফের মেয়েটাকে কি মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব? বাবাও এই রকম একটা ইচ্ছের কথা চিঠিতে লিখে গেছেন। মূলত, এই কারণে ছবিটা আমি ফেসবুকে দিয়েছিলাম। আমার ভাগ্য ভাল, পরিবারটাকে খুঁজে বের করতে পেরেছি। এবার টার্গেট মহিলাকে খুঁজে পাওয়া। আর এজন্যই আপনার কাছে আমাদের আসা। পলাশবাবুর ধারণা, পারলে আপনিই পারবেন, ওর দিদিকে খুঁজে বের করে দিতে।'

'আরে মশয়, আফনে তো হুধু রিপোর্টার না।' কথার সূত্র ধরে পলাশভাই বলেছিলেন, 'আফনেগো ভাষায় কী য্যান কয়, রহস্যভেদীও। অনেক আশা নিয়া আফনের কাসে আইসি। আমারে ফিরাইয়া দিবেন না। যত ট্যাহা লাগে, আমি খরচা করুম। আমার দিদিকে যে খুঁইজ্যা দিতে পাইরব, আমি ঠিক করসি, তারে আমি এক কোটি ট্যাহা ইনাম দিমু।'

শুনে কালকেতুর হাসি পেয়ে গেছিল। বহু মানুষ ওর কাছে বহু সমস্যা নিয়ে আসেন। আজ পর্যন্ত তাঁদের কেউ এমন টাকার টোপ দেননি। সত্যি বলতে কী, কাজটা তো সহজ নয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ঢাকার কাছাকাছি কোনও গ্রাম থেকে, যুদ্ধের ডামাডোলে একটা বাচ্চা মেয়ে হারিয়ে গেছিল। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে শরণার্থীরা এ পার বাংলায় চলে এসেছিলেন। বাংলাদেশের জন্ম হওয়ার পর খুব বেশি মানুষ ফিরে যাওয়া নিরাপদ মনে করেননি। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন। তাঁদের মধ্যে ছবির এই বাচ্চা মেয়েটা কোথায় আশ্রয় পেয়েছিল, কে জানে? এখন তাঁর বয়স তিপ্পান্নের উপর। প্রৌঢ়াই বলা যায়। চেহারায়ও অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই বিশাল পৃথিবীতে এখন তিনি কোথায়, আদৌও বেঁচে আছেন কি না, বলা মুশকিল। তাঁকে খুঁজে বের করা শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভব।

তবুও, জগতে কত রকম মিরাকলও তো আজও ঘটে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার রামপলের কথা কালকেতুর তখন মনে পড়েছিল। ইডেনে টেস্ট ম্যাচ খেলতে এসে রামপল কয়েক ঘণ্টার জন্য হারিয়ে গেছিল। খুঁজতে খুঁজতে কুমারটুলির এক প্রাচীন বাড়িতে তাকে আবিষ্কার করে কালকেতু জানতে পেরেছিল, রামপল তার পূর্বপুরুষদের সন্ধানে ওই বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। দশপুরুষ আগে কুমারটুলি পাড়ার অভয় পাল নামে একজন, জীবিকার সন্ধানে চাঁদপাল ঘাট থেকে জাহাজে করে চলে গেছিলেন ত্রিনিদাদে। কলকাতায় খেলতে এসে পরিবারের শিকড় খুঁজতে খুঁজতে রামপল ঠিক পৌঁছে গেছিলেন পাল বাড়িতে। পলাশভাইয়ের অনুরোধ ফেলতে পারেনি কালকেতু। ভেবেছিল, তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। শিউলিদিদির খোঁজ পাওয়া গেলেও যেতে পারে। তাই দায়িত্বটা ঘাড়ে নিয়েছিল। সেই সূত্রেই ওর নিউ ইয়র্কে আসা।

পলাশভাইয়ের নির্জন অ্যাপার্টমেন্টে বসে নিবিষ্ট মনে ল্যাপটপে গুগল সার্চ করছে কালকেতু। হঠাৎ ওর মনে হল, দরজায় কেউ নক করছে। পলাশভাইরা কি তা হলে ফিরে এলেন? তা কী করে সম্ভব? আধ ঘণ্টাও হয়নি ওঁরা পার্টিতে গেছেন। যাওয়ার সময় বলেও গেছিলেন, ফিরতে অনেক রাত হবে। নিঃশধে হেঁটে ও সদর দরজার কাছে এল। আই হোল দিয়ে দেখল, ভূতের মুখোশ পরা দু'জন বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাঞ্চ করার সময় কথায় কথায় রোজিনা একবার বলেছিলেন, প্রতিবেশী ছেলে ছোকরারা হ্যালোইনের রাতে ভূত-প্রেত, দত্যি-দানোর সাজে এসে হাজির হয়। নিয়ম হচ্ছে, তাদের লজেন্স, ক্যান্ডি বা চকোলেট দিয়ে বিদেয় করা। কিন্তু দরজার বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দেখে কালকেতুর মনে হল না, নিছক মজা করার জন্য হাজির হয়েছে। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল, শিয়রে বিপদ। আগে বাঁচার কথা ভাবো। হ্যালোইনের রাতে মুখোশ পরে কেউ মার্ডার করে গেলে, সিসিটিভির ছবিও কাজে আসবে না।

(ছয়)

কাল রাত থেকে গুম মেরে আছে কামাল। তুচ্ছ কারণে অহেতুক মেজাজ দেখাচ্ছে। ইমন বুঝতে পারছিল না, আর কতটা সহ্য করতে পারবে। চিরাগই বলল, 'শূয়ারটা গাড্ডায় পড়েছে। মেজাজ তো খারাপ হবেই। এখন ওকে কিছু বলতে যাস না। ওকে হ্যান্ডেল করার ভার আমার উপর ছেড়ে দে।'

ইমন জিজ্ঞেস করল, 'গাড্ডায় পড়সে মানে?'

'বউয়ের জন্য ঝামেলা। দামাস্কাস থেকে ঘনঘন ফোন আসছে, তুই শুনতে পাচ্ছিস না? আমি তো কান খাড়া করে রয়েছি। কামালের যে আঠারো বছরের একটা ছেলে আছে, জানতামই না। তাকে জিহাদি করবে বলে ও রাক্কার ক্যালিফেটে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু বউ ছেলেকে আসতে

দেবে না। যেদিন ছেলেটার রওনা হওয়ার কথা, সেদিন ওর বউ ইচ্ছে করে ছেলেকে কোনও জড়িবুটি খাইয়েছিল। ফলে ছেলেটা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এটা জানাজানি হওয়াতে দামাস্কাস পুলিশ কামালের বউকে অ্যারেস্ট করেছে।'

চিরাগের চোখ-মুখে প্রচণ্ড খুশির ছাপ। দেখে ইমনের ভাল লাগল না। কামাল ওদের থেকে অন্তত দশ বছরের বড়। মোসুল ক্যাম্পে একবার বেশ কিছুদিন ওরা একসঙ্গে ছিল। তখন ইমন শুনেছে, কামালের বউ কুর্দ। জিহাদি হওয়ার আগে, দামাস্কাসে কী একটা কাজে ও গেছিল। তখন প্রেমে পড়ে এবং বিয়ে করে নেয়। মোসুল ক্যাম্পে ওর বিছানার পাশে বউ আর ছেলের ছবিও ইমন দেখেছে। কোনও অ্যাকশনে যাওয়ার আগে ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে কামাল কী যেন বিড়বিড় করে বলত। বাচ্চাটার মুখ মনে পড়ায় ইমন জিজ্ঞেস করল, 'পোলাটা অহন কেমন আসে, হুনছস কিছু?'

'শুনলাম, বাঁচবে কি না সন্দেহ। এটাকে কী বলে জানিস? আল্লাহর বিচার। কামাল শূয়ারটা কত মায়ের কোল থেকে বাচ্চাকে কেড়ে নিয়েছে, সে তো নিজের চোখেই দেখেছিস। প্রতিদান পেতে হবে না? ওর ঘরে গিয়ে মজাটা একবার দেখে আয়। ছেলের কথা ভেবে হাউ হাউ করে কাঁদছে।'

বাফেলো থেকে নিউ ইয়র্কে আসার পর তিন-চারদিন ধরে ইমনরা একটা পাবলিক স্টোরেজের বেসমেন্টে লুকিয়ে আছে। জায়গাটা ব্রুকলিন ব্রিজের এ পারে। স্টোরেজের আশপাশটায় ঘন অন্ধকার। সন্ধে হলেই গাড়ি চলাচল কমে যায়। স্টোরেজের তিনতলায় নিওন বাতিটা ছাড়া আর কোনও আলো থাকে না। পুরো জায়গাটা যেন কেমন ভুতুড়ে মনে হয়। দিনের বেলাতেও বিশেষ লোকজন ইমনের চোখে পড়েনি। পড়বে কী করে? স্টোরেজ মানে সুন্দর সাজানো গোজানো বড় দোতলা-তিনতলা গুদাম, যেখানে বাড়ির বাড়তি আসবাবপত্র রাখার জন্য লোকে ভাড়া নেয়। বেশিরভাগ ঘরই দিনের পর দিন তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকে।

স্টোরেজের চোরাকুঠুরিতে একটা ঘরে ইমনের সঙ্গে রয়েছে চিরাগ। অন্য একটা ঘরে কামাল আর সিরিয়ার এক জিহাদি ইমাদ খামিস। এই দু'জন আরব বলে আলাদা খাতির। ওদের ঘর রোজ পরিষ্কার করার জন্য রুম ক্লিনার আসে। পোশাক ধোয়া আর ইস্ত্রি করার জন্য লোকও। স্টোরেজের ম্যানেজার যে ছেলেটা, সেই তৌফিক অবশ্য সামনাসামনি কোনও ভেদাভেদ করে না। সে মাঝে মধ্যেই ইমনদের ঘরে আড্ডা মারতে আসে। নিউইয়র্ক সম্পর্কে নানা রকম ধারণা দেয়। একদিন ওকে আর চিরাগকে শহর দেখাতেও নিয়ে গেছে। ওদের প্রতি তৌফিক এত সহানুভূতিসম্পন্ন কেন, ইমন জানে না।

মাঝে মাঝে এ দিক সে দিক থেকে জিহাদিরা আসে। দলের লোকেদের কথাবার্তায় ইমন শুনেছে, এই স্টোরেজটা একজন মিশরীয়র। তিনি আইএস-এর সমর্থক। নিউইয়র্কে যে সব জিহাদি যাতায়াত করে, গোপনে তাদের তিনি আশ্রয় দেন। তাঁর লোকেরাই জিহাদিদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা, উগ্রপন্থী কার্যকলাপে সাহায্য করে। কোনও কোনও সময় অস্ত্র বা অন্য হাতিয়ারও জোগান দেয়। এই যেমন গতকাল পাঁচটা মাকারভ পিস্তল ডেরায় এসেছে। তার একটা নিয়ে না কি ইমনকে অ্যাকশনে যেতে হবে। একদম লেটেস্ট মডেল। বালগেরিয়া থেকে সদ্য আনা।

ইমন কোনোদিন মাকারভ পিস্তল হাতে পায়নি। কিন্তু দলে আচমকা ওর গুরুত্ব বেড়ে গেছে। চিরাগের বদলে কম্যান্ডাররা ওকে দায়িত্ব দিয়েছেন কালকেতু নন্দী বলে একজনকে খুন করার। এর পিছনে একটাই কারণ। লোকটাকে হত্যা করার জন্য একটা অ্যাপার্টমন্টের লক ভাঙতে হবে। সবাই জানে, ইমন এই কাজটায় খুবই ওস্তাদ। মাকারভ পিস্তলটা হাতে তুলে দেওয়ার সময় কামাল উৎসাহ দেওয়ার মতো গলায় ওকে বলেছিল, 'তোর স্যাঙাৎ তো পারল না। একটা সুযোগ পেয়েছিস, তুই এটা কাজে লাগা। আল্লাহর অনেক কাছে চলে যেতে পারবি।'

চিরাগের কাজটা যত কঠিন ছিল, তার তুলনায় ইমনেরটা অনেক সহজ। লিলি গডউইনের চারপাশে নিরাপত্তার বলয় থাকত। সেটা কালকেতু নন্দীর ধারে কাছে নেই। কামালের মুখে যখন ব্রিফিং শোনে, তখন ইমন অবাক হয়ে গেছিল, আরে এই নন্দী লোকটা তো কলকাতার। ওর মতোই বাঙালি। লোকটা কী এমন অপরাধ করেছে, যার জন্য ওর নাম হিট লিস্টে? হ্যাঁ, নায়গারায় নন্দী ওদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর জন্য চিরাগকে যথেষ্ট অপদস্থও হতে হয়েছে। তবুও, লোকটাকে খুন করার জন্য ইমন এখনও যথেষ্ট জিঘাংসাবোধ করছে না।

কামাল সম্পর্কে খুশখবরটা দিয়ে চিরাগ গোসল করতে ঢুকে গেল। মজা দেখার জন্য নয়, এমনিতেই ইমনের যাওয়ার কথা কামালদের ঘরে। চেলসিতে যে অ্যাপার্টমেন্টে কালকেতু নন্দী আছে, সেখানে একবার রেকি করে আসার দরকার কি না, সেটা ও জানতে যাবে। তা ছাড়া, কামাল দুটো ভূতের মুখোশ কিনে এনেছে ওয়ালমার্ট থেকে। ঠিক আছে, হ্যালোইনের রাতে অ্যাকশনটা করতে হবে। ভূতের কস্টিউম পরে গেলে ওর আসল চেহারাটা সিসিটিভির ক্যামেরায় ধরা পড়বে না। সেদিক থেকে ইমন নিশ্চিন্ত। কিন্তু ওর সঙ্গে অ্যাকশনে কে যাবে, সেটা ও শুনতে চায় কামালের কাছ থেকে। চিরাগকে নিশ্চয়ই পাঠানো হবে না। মিস লিলিকে খুন করতে না পারার জন্য ছেলেটার খুব বদনাম হয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ইমন গিয়ে ঢুকল কামালের ঘরে। ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে। ওর চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে। গলাতেও তেমন জোর নেই। ওর পাশেই বসে আছে ইমাদ খামিস। সমবয়সি, একেবারে রাজপুত্তুরের মতো দেখতে ছেলেটা। গত পাঁচ বছর ধরে আরবদের দেশে থাকার জন্য আরবি ভাষা কিছুটা আয়ত্ত্ব করেছে ইমন। নিজে পড়তে বা লিখতেও পারে। মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পরও ও বুঝতে পারল না কামাল কোন ভাষায় কথা বলছে। ইমন নিশ্চিত, আরবি নয়। কুর্দ হতে

পারে। হঠাৎ ও খামিসের চোখে পড়ল। মুখে আঙুল দিয়ে খামিস ওকে ইশারা করল, চুপ করে থাকতে। কিন্তু এত ভদ্রভাবে কার সঙ্গে কথা বলছে কামাল? একটু পরেই ইমনের কৌতূহল মিটে গেল। খামিস যখন জিজ্ঞেস করল, 'তোর শ্বশুর এখন কী বলছে কামাল?'

ফোনের সুইচ অফ করেই, দপ করে জ্বলে উঠল কামাল। বলল, 'আমাকে দামাস্কাসে যেতে বলছে। ইঁদুরের বাচ্চাটা জানে, এই সময় দামাস্কাসে গেলেই আমি অ্যারেস্ট হয়ে যাব। কুর্দরা ওখানে খুব স্ট্রং হয়ে গেছে। খুঁজে খুঁজে আমাদের মতো জিহাদিদের গলা কাটছে। সেটা জেনে শুনেও লোকটা বলছে, দামাস্কাসে গিয়ে বউকে জেল থেকে আর ছেলেকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নিতে। আমি টাকা-পয়সা খরচা করতে পারব না। বউয়ের বাবা না হলে লোকটার বুক আমি ঝাঁঝরা করে দিতাম।'

শ্বশুরের উপর ঝাল মেটানোর ফাঁকে ইমনকে দেখতে পেল কামাল। মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'এই বি টেন, এখানে দাঁড়িয়ে তুই কী শুনছিস ?'

জিহাদিদের আসল নামে ডাকাডাকির কোনও প্রশ্নই নেই। ওর কোড নাম্বার বি টেন। অর্থাৎ কী না বাংলাদেশ থেকে দশ নম্বর জিহাদি। যেমন চিরাগের কোড নাম্বার আই সিক্সটি ফাইভ। ইমন বলল, 'আমার সঙ্গে আজ অ্যাকশনে কে যাবে, জানতে এসেছি।'

'কে গেলে তুই খুশি হবি, বল। দয়া করে আই সিক্সটি ফাইভের নামটা করিস না। বাফেলোর হাসপাতালে ওর জন্যই আমি ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। দু'দুবার ফেল। এমন আকাট, অপদার্থ সে। তুই এক কাজ কর। আজ খামিসকে সঙ্গে নিয়ে যা। তোর অনেক কাজে লাগবে। তোদের সঙ্গে আর যাবে তৌফিকও। সে গাড়ি নিয়ে কাছাকাছি কোথাও ওয়েট করবে। মিনিট দশেকের মধ্যে কাজটা খতম করে তোকে বেরিয়ে আসতে হবে।'

ঘাড় নেড়ে ইমন বেরিয়ে আসছিল, সেইসময় ফের ওকে ডেকে কামাল বলল, 'শোন, আজ দুপুরেই নিউ ইয়র্ক থেকে আমি চলে যাচ্ছি। খামিসও

দু'একদিনের মধ্যে হয়তো একটা ইমপরট্যান্ট কাজে কসোভোয় চলে যাবে। দেখিস, ওকে যেন বিপদের মধ্যে ফেলিস না।'

আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। কথা বাড়াতে গেলে কপালে খিস্তি জুটবে। নিজেদের ঘরে ফিরে এসে ইমন দেখল, চিরাগ ল্যাপটপ খুলে বসে আছে। ওর সামনে অর্ধেক শেষ করা খাবারের প্লেট। আধ খাওয়া চিকেন স্যান্ডউইচ, কলা, আধা ডেমসেদ্ধ পড়ে রয়েছে। ওর খাবারটাও প্লেট দিয়ে ঢাকা। ঘুম থেকে উঠে শুধু বেড টি খেয়েছে। তা সত্ত্বেও, খিদে পাচ্ছে না ইমনের। সন্ধেবেলার অ্যাকশনের কথা যখনই ভাবছে, তখনই ওর অল্প টেনশন হচ্ছে। জীবনে এই প্রথম ও কাউকে খুন করতে যাচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই ও ডানপিটে টাইপের। কিন্তু পাঁচ-ছয় বছর আগে পর্যন্ত কাউকে খুন করার কথাটা ও চিন্তাই করতে পারত না। ওদের বাড়ি ঢাকার কাছে আমোদপুর বলে একটা গ্রামে। ওর দাদামশয় বিপুল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। রাজনীতি করতেন বলে বিশাল প্রতিপত্তি ছিল তাঁর। বাংলাদেশের জন্ম হওয়ার পর অবশ্য সেই রমরমা কমে যায়।

ইমনের মনে আছে, একবার ঈদের তিন-চারদিন আগে ওর দাদামশয় একটা উট কিনে এনেছিলেন। উটের মাংস খাওয়ার সৌভাগ্য তো চট করে হয় না। প্রতিবেশীরা সবাই জুটে গেছিলেন সেই আনন্দ যজ্ঞে। বাড়িতে কয়েকদিন দেখে ইমনের খুব মায়া পড়ে গেছিল উটের উপর। আগের রাতে যখন নিরীহ পশুটাকে জবাই করা হচ্ছিল, তখন তার আর্ত চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেছিল ইমনের। ওর এত কষ্ট হয়েছিল যে, আম্মুকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করেছিল। গ্রামে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল রোহিত দাশগুপ্ত। ওর বাবা পরে একদিন বলেছিলেন, প্রাণীহত্যা মহাপাপ। ঈশ্বরের কাছে সব প্রাণীই সমান। এই কারণেই হিন্দু দেবদেবীদের বাহন অন্য জীবজন্তুরা। যাতে কেউ তাদের মেরে ফেলার কথা না ভাবে। প্রাণীহত্যা করলে না কি মরণের পরে হিন্দুরা নরক আর মুসলমানরা দোজখে গিয়ে কষ্টভোগ করে।

কপালের ফেরে জিহাদিদের ক্যাম্পে এসে একেবারে উল্টো কথা শুনতে হচ্ছে ইমনকে। এখানে মায়া-মমতা-স্নেহ বলে কিছু নেই। সর্বদাই ওদের শুনতে হয়, ইহুদি আর ইসাই অর্থাৎ ক্রিশ্চানরা হল কাফের। ওদের খতম করো। ক্যালিফ বলতেন, শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষরাও শত্রু। ওদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে হবে। হয় মারো, না হয় মরো। শত্রুর হাতে মারা যাওয়া, মানে শহীদ হওয়া। আল্লাহ বেহস্তে ঠিক জায়গা করে দেবেন। সুন্নি সম্প্রদায়ের শত্রু কারা, তাও মওলানারা শুরুতেই মনে করিয়ে দিতেন। জিহাদিদের নিজস্ব ওয়েব সাইটে বলা আছে, শিয়া আর তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়াই কোরো।

'কামাল শূয়ারটা তোকে কী বলল রে ইমন?' ল্যাপটপ থেকে মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্নটা করল চিরাগ। 'বলেছে কি আজই নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে যাচ্ছে?'

ইমন বলল, 'হ কইসে। তুই জানলি কী কইর‍্যা?'

'আমাদের ওয়েবসাইট থেকে। নিউ ইয়র্ক থেকে ও এমন একজনকে সিরিয়ার রাক্কা শহর নিয়ে যাচ্ছে, যে আর্টিফিসিয়াল লিম্ব তৈরিতে এক্সপার্ট। ওখানে আমেরিকানদের অ্যাটাকে জিহাদিদের অনেকের হাত-পা অ্যামপিউট করতে হচ্ছে। জেলের বাইরে যদি থাকে, তা হলে বাকি জীবনে তারা চলাফেরা... কাজকর্ম করবে কী করে? এই আমেরিকান লোকটা যাচ্ছে ওদের জন্য। এর নাম ছিল ডেভিড ক্লিফোর্ড। রিসেন্টলি ইসলাম ধর্ম নিয়ে নাম বদলে হয়েছে গাজি মহম্মদ সালাম। একে নিয়ে কামাল প্রথমে যাচ্ছে দামাস্কাস। সেখান থেকে সুযোগ মতো ঢুকে পড়বে রাক্কায়। সালামকে এরা কত মাইনে দেবে, আন্দাজ কর তো?'

ইমন বলল, 'কইতে পারুম না।'

'পার মান্থ সাত লাখ সিরিয়ান পাউন্ড। মানে প্রায় এক লাখ টাকা। প্লাস ও যতগুলো আর্টিফিসিয়াল হাত-পা তৈরি করবে, তার খরচাও দিতে হবে। সালাম না কি এদের বলেই দিয়েছে, ওকে দিয়ে খুন-খারাপি করানো যাবে

না। আরবরা আমাদের কী রকম ঠকাচ্ছে ভাব। যত রিস্কি কাজ করব আমরা, মানুষ মারতে গিয়ে মরব। অথচ আমাদের মাইনে মাত্র কুড়ি হাজার টাকা। সিরিয়াসলি ভাবার সময় এসে গেছে, জিহাদিদের সঙ্গে থাকব কি না।'

'কামাল কিন্তু দামাস্কাস যাইতে চাইতাসে না।'

'বলল বুঝি? যাবে কোন মুখে? গেলে ওর শ্বশুরই গারদের ভিতর ঢুকিয়ে দেবে। ভদ্রলোক ওখানকার প্রেজেন্ট গর্ভমেন্টে একটা ভাল জায়গায় আছেন। তবুও সিরিয়ান পুলিশ কামালের বউয়ের এগেনস্টে চাইল্ড অ্যাবিউসের এমন চার্জ দিয়েছে যে, তিন বছরের আগে সে জেল থেকে বেরোতে পারবে না। শ্বশুর এত রেগে রয়েছে, হয়তো কামালকেই অ্যারেস্ট করিয়ে দেবে।'

'তুই এত খবর পাইলি কোত্থেইকা চিরাগ?'

'তুই জেনে কী করবি? সকালে আমার সঙ্গে ওর একচোট ঝামেলা হয়ে গেছে। তাই ওকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ওর সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিলাম।'

'কখন হল এসব?'

'আরে, সবে গোসল করে বেরিয়েছি, এমন সময় আমায় বলে কী না, আমাদের কমোডটা পরিষ্কার করে দিয়ে যা। কাজের লোকটা আজ আসবে না। কত বড় সাহস! কমোড পরিষ্কার করতে গিয়ে আমি ওখানেই পটি করে এলাম। ফ্ল্যাশ টেনেও আসিনি।'

শুনে ইমনের হাসি পেল। চিরাগ ফের জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, আজ চেলসিতে তোর সঙ্গে কে অ্যাকশনে যাচ্ছে, বলেছে কিছু?'

'কইল তো খামিস যাইব।'

চিরাগ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'তা হলেই হয়েছে। মোসুলে দেখেছি, আকাশে আমেরিকান ড্রোন দেখলেই ওর প্যান্ট হলদে হয়ে যেত। ফাইটার

প্লেন তো দূরের কথা। সে যাবে অ্যাকশনে! সাবধানে থাকিস। যাক গে, তোর ব্রেক ফাস্ট ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এ বার খেয়ে নে।’

(সাত)

ইচ্ছে ছিল না, তবুও সন্ধের দিকে মেক্সিকানদের একটা হ্যালোইন পার্টিতে এসেছেন লিলি গডউইন। একেবারে হাডসন নদীর ধারে একটা পার্কে। নায়গারায় হামলার পর সিকিউরিটি গার্ডরা তাঁকে চলাফেরায় সাবধান হতে বলেছেন। বিশেষ করে, এমন কোনও মিটিং বা পার্টিতে যাওয়ার ব্যাপারে, যেখানে অজ্ঞাত পরিচয় লোকজনের থাকার সম্ভাবনা। কিন্তু লিলি গডউইনের উপায় নেই। তিনি এমন একটা দায়িত্বে আছেন, যেখানে তাঁর কাজই জনসংযোগের। মেক্সিকানদের এই পার্টিটা আয়োজন করেছিল হুলা হুলা বলে একটা সংস্থা। আমেরিকায় বিপন্ন মেক্সিকানদের পাশে দাঁড়ানো যাদের মূল কাজ। বছর তিনেক ধরে এঁদের আমন্ত্রণ এড়িয়ে গেছেন লিলি। কিন্তু এ বার আর না করতে পারেননি। উদ্যোক্তাদের বলে দিয়েছেন, তিনি যাবেন, তবে এক ঘণ্টার বেশি পার্টিতে থাকতে পারবেন না।

পার্টিতে যাওয়ার অন্যতম কারণ আমন্ত্রিতদের তালিকা। কানাডার বিদেশমন্ত্রী ডোমেনিকো পেরেজ আছেন ওই তালিকায়। কানাঘুষোয় লিলি শুনতে পাচ্ছেন, কানাডার অভিবাসন দফতর তাদের নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল করবে। সারা বিশ্বের স্টেটলেস অর্থাৎ দেশহীন কিছু লোককে তারা কানাডায় বসবাস করার অনুমতি দেবে। তবে দেশছুটরা পেশাদার বা টেকনিক্যাল কোনও কাজে দক্ষ হলে ভাল হয়। বিশ্বে দেশহীন মানুষের সংখ্যা এই মুহূর্তে কম নয়। এক দেড়-কোটি তো হবেই। এই তালিকায় সাম্প্রতিক সংযোজন হল মায়নমারের রোহিঙ্গারা। লিলির যাবতীয় চিন্তা এখন এই রোহিঙ্গাদের নিয়েই। ইউনিসেফ তাঁরই উপর দায়িত্ব দিয়েছে রোহিঙ্গা শিশুদের কল্যাণের। কোথাও কোনও খড়কুঁটো দেখলে লিলি তা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছেন। হুলা হুলা-র হ্যালোইন পার্টিতে ডোমেনিকো

পেরেজের সঙ্গে লিলির আলাপ করতে চাওয়াটাও সেই সুপ্ত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। কিছু রোহিঙ্গাকে যাতে ওরা কানাডায় থাকতে দেন। বেসরকারিভাবে তিনি আন্দাজের চেষ্টা করবেন, রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে কানাডার মনোভাব কী?

ডোমিনিকো পেরেজকে যতটা বয়স্ক লিলি ভেবেছিলেন, ততটা নন। খুব বেশি হলেও তিরিশ। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, সুদর্শন। পড়াশুনো করেছেন অক্সফোর্ডে। এই বয়সে কানাডার ছেলেরা ফুটবল আর বেসবল নিয়ে মেতে থাকে। লিলির মনে পড়ল, কানাডায় মাস খানেক আগে নতুন সরকার এসেছে। মিডিয়া মারফৎ তিনি জেনেছেন, প্রধানমন্ত্রীর বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ। বিশ্বের সবথেকে কমবয়সি প্রধানমন্ত্রী। তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা আর কত ভারিক্কি হবেন! পার্টিতে আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার দেওয়ার সময় পেরেজ কানাডার নতুন সরকারের কিছু উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা বলেই বসে গেলেন। বুদ্ধিমান মানুষ, জানেন, পার্টির ফরফুরে মেজাজে বেশি রাজনীতির কচকচি লোকে পছন্দ করবে না। কিন্তু লিলি সুযোগটা ছাড়লেন না। বিশ্বে ক্রমাগত বাড়তে থাকা বিদ্বেষ আর দেশছুট মানুষদের সম্পর্কে হালকা কথা বললেন। এবং লক্ষ করলেন, পেরেজ তাঁর বক্তব্য মন দিয়ে শুনছেন। লিলি তাঁর কথা শেষ করলেন এই বলে, 'ডোমেনিকো পেরেজের মতো তরুণ রাষ্ট্রনায়কদের উপর নির্ভর করছে, আগামী দিনে বিশ্ব কতটা শান্তিতে থাকবে।'

মঞ্চ থেকে নামতেই লিলি ঘেরাও হয়ে গেলেন মিডিয়ার লোকদের মাঝে। কেউ একজন প্রশ্ন করলেন, 'ম্যাম, গতকালই একটা ক্যারাভান পৌঁছেছে সাউথ মেক্সিকোতে। আপনার কি মনে হয়, প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস তাদের উদ্দেশে যে মনোভাব নিয়েছেন, সেটা ঠিক?'

রাজনৈতিক কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবেন না লিলি ঠিকই করে রেখেছেন, ইউনিসেফের পরামর্শদাতা হওয়ার পর থেকে। বিশেষ করে, এমন কোনও

প্রশ্নের উত্তর, যাতে আমেরিকার সরকার জড়িয়ে আছে। একটা সময় ক্যারাভান কথাটা আরব যাযাবরদের সম্পর্কে বলা হত। এখন অন্য উদ্দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে। আজকাল এক দেশ থেকে একদল লোক অন্য দেশে অনুপ্রবেশ করার জন্য বেরিয়ে পড়েন। এঁদের বলা হচ্ছে মাইগ্রান্ট ক্যারাভান। হন্ডুরাসে বিশাল ভূমিকম্প হয়েছিল বছর খানেক আগে। দেশটার উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। হন্ডুরাসের নিঃসম্বল, অসহায় মানুষেরা দলে দলে মেক্সিকোতে ঢুকে পড়ছেন। তাঁদের লক্ষ শেষ পর্যন্ত আমেরিকা কি না, কেউ নিশ্চিতভাবে জানেন না। কিন্তু আগে থেকেই মিডিয়া ধুয়ো তুলে দিয়েছে, ওঁরা আমেরিকার বর্ডারে এসে অ্যামনেস্টি প্রার্থনা করবেন।

লিলি জানেন সবই। খুব দুর্ভাগ্যজনক, সেন্ট্রাল আমেরিকা থেকে একদল লোক স্টেটলেস-এর তকমা পেতে যাচ্ছে। তবুও, না জানার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'তাই না কি? আমার কানে তো কিছু আসেনি।'

রিপোর্টাররা ছাড়ার পাত্র নন। একজন বললেন, 'কেন, আপনি প্রেসিডেন্ট অ্যাডামসের টুইট দেখেননি?'

'কী লিখেছেন উনি তাতে?'

'লিখেছেন, চার হাজার মানুষের ক্যারাভান মেক্সিকো দিয়ে আমেরিকার সীমান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন। তাদের মধ্যে মধ্য প্রাচ্যের কুখ্যাত অপরাধী আর ধর্মোন্মাদরা মিশে রয়েছেন। সেনাবাহিনী দিয়ে এঁদের থামানো যাবে না। কেননা, অনুপ্রবেশকারীরা বাসে করে অথবা হেঁটে সীমান্তে হাজির হতে পারেন। সেখানে পৌঁছে যদি অ্যামনেস্টি চান, তা হলে আমাদের কিছু করার নেই। ম্যাম, আপনার কি মনে হয়, প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস সাধারণ লোককে অযথা ভয় দেখাচ্ছেন?'

প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস কী বলেছেন, লিলি জানেন। কেন বলেছেন, তাও তাঁর অজানা নেই। মাসখানেকের মধ্যেই অন্তবর্তী নির্বাচন। প্রেসিডেন্টের টুইট আর কিছু নয়। নির্বাচনের আগে রিপাবলিকানদের জন্য জনসমর্থন

আদায়ের কৌশল। লিলি মৃদু হেসে বললেন, 'আমাকে কেন এ সব কথা জিজ্ঞেস করছেন? রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে, তা হলে করুন।'

'রোহিঙ্গাদের আর হন্ডুরানদের সমস্যাটা তো একই ম্যাম। দেশছুট হওয়া।'

লিলি বললেন, 'আমার মনে হয়, তা নয়। রোহিঙ্গারা দেশছুট হতে চান না। নিজেদের জন্য তাঁরা আলাদা দেশ চান।'

'সে রকম সম্ভাবনা কি আছে, ম্যাম?'

'এখনই বলা সম্ভব নয়। মায়ানমার গর্ভমেন্টকে খানিকটা বোঝানো গেছে। দেশ থেকে বেরিয়ে যে সব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের অনেককেই মায়ানমার গর্ভমেন্ট ফিরিয়ে নিতে চাইছেন। রাখাইন প্রদেশে ফিরে গিয়ে তাঁদের যাতে কোনও হিংসার আবহে পড়তে না হয়, ওঁরা তারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। খুব সম্ভব নতুন বছরের আগেই রোহিঙ্গাদের বিরাটসংখ্যক একটা দল রাখাইনে চলে যাবে। খবরটা আপনারা লিখতে পারেন।'

যাতে ঘেরাও মুক্ত হতে পারেন, তার জন্য লিলি এক পা সামনের দিকে বাড়ালেন। তাঁর ইচ্ছেটা বুঝে সিকিউরিটি স্ট্যানলি গর্ডন পাশে এসে দাঁড়াল। মিডিয়ার দলটা এ-দিক সেদিক ছড়িয়ে গেল। স্ট্যানলি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এখানেই ডিনার করবেন ম্যাম?'

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন লিলি। দেখে স্ট্যানলি বলল, 'অর্গানাইজাররা অ্যানাউন্স করছিলেন। এখুনি মনে হয় কস্টিউম শো শুরু হবে। আপনাকে ওখানে যেতে হবে। ম্যাম, আমরা কাছাকাছিই আছি।'

স্ট্যানলি দূরে সরে যেতেই অল্পবয়সি একটা মেয়ে কাছে এসে বলল, 'ম্যাম, আমার নাম রেজওয়ানা চৌধুরী। আপনার সঙ্গে কি কয়েক মিনিট কথা

বলতে পারি? আমি যুগযুগান্ত কাগজের নিউ ইয়র্ক করেসপন্ডেন্ট। কাগজটা আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য প্রকাশিত হয়।'

বাংলাদেশ সম্পর্কে লিলি এমনিতেই একটু দুর্বল। তিনি মানুষ হয়েছেন বাংলাদেশি গর্ভনেসের কাছে। পরিষ্কার বাংলায় তিনি বললেন, 'আগে তো তোমাকে কখনও দেখিনি রেজওয়ানা?'

'আমি ভেরি রিসেন্টলি নিউ ইয়র্কে এসেছি।'

আড়চোখে ডোমেনিকো পেরেজের দিকে একবার তাকালেন লিলি। দেখলেন, উনি চার-পাঁচজনের জটলায় দাঁড়িয়ে কথা বলায় ব্যস্ত। হাতে মদের গ্লাস। উনি ফাঁকা না হলে কথা বলা যাবে না। ততক্ষণ বাংলাদেশি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলা যেতেই পারে। ভেবে লিলি বললেন, 'বলো, তোমার কী জানার আছে।'

'আপনি এত ভাল বাংলা বলছেন কী করে ম্যাম?'

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে লিলি বললেন, 'আমি আরও ছ'টা ভাষায় ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারি।'

'চার-পাঁচদিন আগে আমাদের কাগজের ঢাকা এডিশনে একটা খবর বেরিয়েছিল, আমি সেই ব্যাপারেই আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

ঢাকার কাগজের সাংবাদিক, নিশ্চয়ই রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করবে। তাই লিলি আগেই বলতে শুরু করলেন, 'রোহিঙ্গাদের সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার কাজে ইউনিসেফ এক পা এগিয়েছে...'

বাধা দিয়ে রেজওয়ানা বলল, 'আমার প্রশ্নটা রোহিঙ্গাদের নিয়ে নয়। ম্যাম, আপনি রোকেয়া সুলতানা বলে কাউকে চেনেন?'

শুনেই বুকের ভিতরটা একবার কেঁপে উঠল লিলির। তাঁর উপর হামলার খবরটা কি তা হলে লিক হয়ে গেছে? না-চেনার ভান করে তিনি বললেন, 'রোকেয়া সুলতানা! উনি কে বলো তো?'

‘ঢাকায় বন্ধু বলে একটা এনজিও আছে, সেটা উনি চালান। আমাদের দেশের নামকরা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। উনি কিন্তু বলেছেন, আপনার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় আছে।’

এ বার অস্বীকার করলে রোকেয়াকে ছোট করা হয়। লজ্জিত মুখে লিলি বললেন, ‘ছি ছি, এতক্ষণ আমার মনে পড়ছিল না কেন, কে জানে? ভাল করে চিনি। কেমন আছেন তিনি?’

‘রোকেয়া আপা ঢাকায় ফিরে গেছেন। কিন্তু ফের নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছেন। বুলেট ইনজুরির কারণে। এখানে ওকে কারা গুলি করেছিলেন, সে ব্যাপারে কি আপনার কিছু জানা আছে? আমাদের কাগজে উনি কিন্তু স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, নায়গারা পার্কের বাইরে শ্যুট আউটের আগে, একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের বাইরে দাঁড়িয়ে উনি আপনার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখনই গুলিটা ওর পেটে লাগে। আপনার সিকিউরিটির লোকজনই ওঁকে বাফেলোর এক হাসপাতালে নিয়ে যান।’

খবরটা যে রোকেয়ার মুখ দিয়ে ফাঁস হয়ে যাবে, লিলি তা স্বপ্নেও ভাবেননি। ওঁকে দোষও দেওয়া যায় না। মুখ বন্ধ রাখতে হবে, এ কথা ওকে বলে দেওয়া হয়নি। রেজওয়ানা যা বলেছে, সবই সত্যি। অপ্রত্যাশিত এই পরিস্থিতিটা তিনি কীভাবে সামাল দেবেন, লিলি তা বুঝতে পারলেন না। আমতা আমতা করে তিনি বললেন, ‘ঠিক। রোহিঙ্গা শিশুদের রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে কথা বলার জন্য সেদিন আমরা মিট করেছিলাম। কিন্তু আমি গাড়িতে উঠে যাওয়ার পর কী হয়েছিল, আমার জানা নেই। তুমি নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশের সঙ্গে কথা বলছ না কেন?’

‘নায়গারায় গিয়ে আমি শেরিফের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি বললেন, শ্যুট আউটের ঘটনার কথা ওঁর জানা নেই। আমার মনে হল, উনি সবই জানেন। কিন্তু কোনও কারণে মুখ খুলছেন না। বাফেলোর হসপিটালে গেছিলাম, ওরা বললেন, সেদিন রাতে গাড়ির ধাক্কায় একজন ইনজিওয়র্ড অবস্থায় ভর্তি

হয়েছিলেন। ট্রিটমেন্টের পর তাকে পরদিন বিকালেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সত্যিটা কী, আপনি কি জানেন, ম্যাম? বুলেট ইনজুরিকে কার অ্যাক্সিডেন্ট বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে কেন? এর পিছনে কি অন্য কোনও রহস্য আছে? বাংলাদেশের মানুষ জানতে চায়।'

'স্ট্রেঞ্জ! এতকিছু ঘটে গেছে, অথচ এখানকার মিডিয়ায় বিন্দুবিসর্গ লেখালেখি হয়নি! এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে, রোকেয়া আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল না কেন?'

'উনি নিজের ইচ্ছেয় চলে যাননি। খবর পেয়ে ওঁর ছেলে এসে ওঁকে নিয়ে গেছেন।'

'ঢাকার কাগজে আর কী লেখা হয়েছে, রেজওয়ানা?'

'অ্যান্টি আমেরিকান প্রোপাগান্ডা হচ্ছে। আমাদের প্রাইম মিনিস্টার না কি রোকেয়া আপার ব্যাপারে কথা বলেছেন আমেরিকান অ্যামব্যাসাডরের সঙ্গে।'

ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে লিলি ভাবতেও পারেননি। স্টেজে কস্টিউম কনটেস্ট বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। প্রাইজ দেওয়ার জন্য হুলা হুলা-দের একজন ওকে ডাকতে এসেছেন। লিলি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। রেজওয়ানাকে উনি বললেন, 'রোকেয়ার সঙ্গে আমি আজই একবার কথা বলব। যতদূর জানি, ওর সঙ্গে কারও শত্রুতা নেই। ওকে কেন লোকে গুলি করবে? তোমার কী মনে হয় রেজওয়ানা? কারা ওকে অ্যাটাক করতে পারে?'

'আমাদের কাগজের সাংবাদিকরা মনে করছেন, এটা জামাইত ইসলামি জঙ্গিদের কাজ। নানা কারণে ওরা রোকেয়া আপার উপর বিরক্ত।'

'আমার তা মনে হয় না রেজওয়ানা। তাই যদি হতো, বাংলাদেশি জঙ্গিরা আমেরিকায় এসে হামলা করার ঝুঁকি নেবে কেন? ওটা তো দেশেই করতে পারত।'

‘আপনার কী মনে হয় ম্যাম, জঙ্গিরা মিসফায়ার করেছে। মানে রোকেয়া আপা নন, অন্য কেউ ওদের টার্গেট ছিলেন?’

মাই গুডনেস! এ তো তির সোজা টার্গেটে মারছে! কী বলতে কী বলে ফেলবেন ভেবে, মেয়েটাকে এড়ানোর জন্য লিলি হাঁটতে হাঁটতে বললেন, ‘এক্সকিউজ মি রেজওয়ানা, প্রাইজ দেওয়ার জন্য আমাকে পোডিয়ামে যেতে হবে। ওই দ্যাখো, কানাডার ফরেন মিনিস্টার আমার জন্য ওয়েট করছেন। পরে দরকার হলে আমাকে ফোন কোরো কেমন? তখন ডিটেলে কথা বলা যাবে।’

পোডিয়ামে ওঠার সময় স্ট্যানলি পাশ থেকে বলল, ‘ম্যাম, একটা খারাপ খবর আছে।’

খবরটা শোনার জন্য লিলি দাঁড়িয়ে গেলেন। স্ট্যানলি বলল, ‘এফবিআইয়ের অনুমানই ঠিক। বাংলাদেশি টেররিস্টরা স্টিল অ্যাকটিভ। এখানে বেশিক্ষণ থাকা আপনার ঠিক হবে না ম্যাম।’

‘কেন কী হয়েছে?’

‘জন মিকেল একটু আগে আপনার খোঁজ করছিলেন। জানতে চাইছিলেন, আপনি ঠিক আছেন কি না? তার পর উনি এমন একটা খবর দিলেন, যেটা ডিসটার্বিং। নায়গারায় যে ইন্ডিয়ান জেন্টেলম্যান আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, একটু আগে তার উপর অ্যাটাক হয়েছিল।’

শুনে চমকে উঠলেন লিলি। তার মানে... কালকেতু নন্দী! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘ছেলেটি এখন কোথায়? হামলাটাই বা হল কীভাবে?’

‘ম্যাম, নায়গারায় সেদিন ছেলেটির সঙ্গে একজন বাংলাদেশি বিজনেসম্যান মি. পলাশ চৌধুরী ছিলেন। আপনি দেখলে হয়তো তাঁকে চিনতে পারবেন। এখানে তাঁর একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে চেলসিতে। মি. নান্ডি সেখানেই ছিলেন। আজ সন্ধেবেলায় হ্যালোইন কস্টিউমে টেররিস্টরা সেই অ্যাপার্টমেন্টে ব্রেক ইন করে। তখন ইন্ডিয়ান জেন্টেলম্যান ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

নিউ ইয়র্কের মতো হাই সিকিউরিটি জোনে আগে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। বিশেষ করে, হ্যালোইনের সন্ধেতে।'

শুনে টেনশন বোধ করতে লাগলেন লিলি। হুলা হুলার এই পার্টিতে হ্যালোইন কস্টিউমে প্রচুর মানুষ তাঁর চোখের সামনে ঘোরাঘুরি করছেন। তাঁদের আসল চেহারা বোঝা মুশকিল। কে টেররিস্ট, কে নন, কে জানে? নাহ, আর বেশিক্ষণ পার্টিতে থাকা উচিত হবে না। প্রাইজ দিয়েই তিনি নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাবেন। স্ট্যানলিকে কাছাকাছি থাকতে বলে লিলি পোডিয়ামে উঠে গেলেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি লক্ষ করছেন, যখনই স্ট্রেস ফিল করেন, বা টেনশনে পড়েন, তখন ঘাড়ের নিচে পিঠের দিকটায় চুলকোয়। আর ভুল করে চুলকে ফেললে, চামড়ায় লাল চাকা চাকা দাগ হয়ে যায়। তখনই ডার্মাটোলজিস্ট বা প্লাস্টিক সার্জেনের কাছে ছোটেন লিলি। কালকেতু ন্যান্ডির উপর হামলার খবরটা শোনার পর থেকে তাঁর পিঠে সুড়সুড়ানি টের পেলেন লিলি।

মনটা খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে ফের টেররিস্ট অ্যাটাকের কথা শুনে। চাপ কমানোর জন্য লিলি পার্টিতে সেজে আসা বাচ্চাদের দিকে মন দিলেন। ছোটবেলায় তিনি এমন অসুস্থ থাকতেন, ড্যাডি কখনও হ্যালোইনের রাতে তাঁকে বাইরে বেরতে দিতেন না। বাড়িতে তাঁর সমবয়সিরা ক্যান্ডি উপহার নিতে এলেও, ড্যাডি তাদের বাইরে থেকে ফিরিয়ে দিতেন। হুলা হুলা পার্টিতে বাচ্চাদের হাসিখুশি মুখগুলো দেখে খুব ভাল লাগতে শুরু করল লিলির। সেরা কস্টিউমের প্রাইজ নিতে উঠে এল একটা বাচ্চা ছেলে। তার কস্টিউম দেখে কৌতুকবোধ করলেন তিনি। স্কন্ধকাটা ভূত। কস্টিউম মেকাররা পারেনও বটে! সত্যিই মনে হচ্ছে, বাচ্চাটা তার মুন্ডু হাতে ধরে আছে। ধড়ের ঠিক পিছনে কাটা গলার ভিতর একটা ছোট থলে বসানো। তাতে উপহার পাওয়া ক্যান্ডিগুলো বাচ্চাটা জমিয়ে রেখেছে। পুরস্কারের হাজার ডলারের চেক বাচ্চাটার হাতে তুলে দিলেন লিলি। পরক্ষণেই চমক,

মাইক হাতে নিয়ে সে বলল, পুরস্কারের অর্থ চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনে দান করতে চায়। কথাটা বলেই সে চেক ফিরিয়ে দিল সংগঠকদের কাছে। পার্টিতে তাঁকে নিয়ে আসার কারণটা এ বার বুঝলেন লিলি। চেকটা তাঁর ফাউন্ডেশনেই যাবে।

ডোমিনিকো পেরেজ প্রাইজ তুলে দিচ্ছেন সেরা কস্টিউমে অ্যাডাল্ট জুটিকে। ভূত আর ডাইনি। রসিকতা করে তাঁদের বলছেন, আসল চেহারা দেখাতে। সঞ্চালক তাদের নাম দুটো জানিয়ে দিলেন। মহিলার নাম রোজিনা দেল বস্কে। আর তাঁর পুরুষ সঙ্গীর নাম পলাশ চৌধুরী। ভদ্রলোক ভূতের মুখোশটা খুলে ফেলার পর হাততালিতে হলঘর ফেটে পড়ল। পার্টিতে এই দ্বিতীয়বার লিলি চমকে উঠলেন। আরে, এই নামটা তো একটু আগেই স্ট্যানলির মুখে শোনা। এই সেই লোক, যাঁর ভাড়া করা গাড়ি চুরি করে টেররিস্টরা নায়গারায় শ্যুট আউট করেছিল! ভদ্রলোক হাঁটু গেড়ে বসে হাসিমুখে অভিনন্দন নিচ্ছেন দর্শকদের। অদ্ভুত তো! একটু আগে ওঁর চেলসির অ্যাপার্টমেন্টে অতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ উনি দিব্যি হাসছেন?

(আট)

ব্রুকলিন ব্রিজের ধারে একটা পাবলিক স্টোরেজ-এর পিছন দিকে গাড়ি থামিয়ে তৌফিক জিজ্ঞেস করল, ‘এখনও ব্লিডিং হচ্ছে?’

অস্ফুট স্বরে ইমন উত্তর দিল, ‘হ্যাঁ।’

ডান হাতের তালুতে মারাত্মক যন্ত্রণা। বাঁ হাত দিয়ে জায়গাটা ও চেপে ধরে আছে। চেলসির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পালিয়ে আসার মাঝে প্রায় পনেরো মিনিট সময় কেটে গেছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে এই সময়টায়। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করেছে ইমন। তবুও, মুখ ফুটে একটা আওয়াজও করেনি। জিহাদিরা ব্যথা বেদনার ঊর্ধে। ট্রেনিং ক্যাম্পে এই কথাটাই ওদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তৌফিক ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে এসে ডান দিকের সামনের দরজাটা খুলে দিল। খামিসও পিছনের দরজা খুলে নেমে এল। ইমনকে বাইরে বেরিয়ে আসায় সাহায্য করতে করতে তৌফিক বলল, 'ইস, সিটটা রক্তে ভেসে গেছে। চলো, তোমাকে বেসমেন্টে পৌঁছে দিয়ে আমাকে ফিরে আসতে হবে। রক্তের কোনও চিহ্ন যেন গাড়িতে না থাকে। আমেরিকান কুত্তাগুলোর হাতে যেন তোমার ব্লাড স্যাম্পল না পৌঁছয়।'

ব্রুকলিন ব্রিজ দিয়ে নদীর এ পারে আসার সময়ও নিউ ইয়র্কের স্কাইলাইন জ্বলজ্বল করছিল ইমনের চোখের সামনে। কত উঁচু উঁচু বাড়ি, তাতে কত আলোর বাহার! ওই বাড়িগুলোতে যারা থাকেন, সেই ইহুদি আর ইসাইরা চূড়ান্ত ভোগ বিলাসের মাঝে দিন কাটান। এমনটাই ওদের ধারণা দিয়েছেন, ট্রেনিং ক্যাম্পের মাতব্বররা। এই কাফেরদের জন্য আজ ইসলাম ধর্ম বিপন্ন। যেখানে সুযোগ পাবে, এঁদের সেখানে নিধন করাই তোমাদের একমাত্র কাজ হবে। সেই কাজটাই আজ করতে গেছিল ইমন আর খামিস। কিন্তু সফল হতে পারল কই? হাতে ক্ষত নিয়ে ফেরার যন্ত্রণা তো আছেই। পরের চ্যাপ্টারটা আরও ভয়ংকর হতে যাচ্ছে। ইমন জানে, ওর অবস্থা চিরাগের মতো হবে। ক্যাম্পে ফিরে গেলে কম্যান্ডাররা এর পর ওর সঙ্গেও নির্দয় ব্যবহার করবেন।

তৌফিকের সাহায্য নিয়ে চোরাকুঠুরিতে পৌঁছে ইমন সোফায় এলিয়ে পড়ল। ঘরের এক কোণে মেডিক্যাল বক্স আছে। ওকে নিজেকেই শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসার সময় চট করে ও ক্ষতস্থানে রুমাল জড়িয়ে নিয়েছিল। রুমালটা ভিজে চপচপ করছে রক্তে। রুমাল সরাতেই ওর চোখে পড়ল, ডান হাতের তালুর উল্টো দিকে বেশ বড় একটা ক্ষত। রক্ত দেখেই ওর মনে হঠাৎ হিংস্রভাব জেগে উঠল।

তৌফিক ক্ষত দেখে 'ইয়াআল্লাহ' বলে আঁতকে উঠেছে। ওর সামনে ইমন এমন কিছু করবে না, যাতে ছেলেটার মনে হয়, জিহাদি হওয়ার যোগ্যতা

ওর নেই। কথাটা ভাবা মাত্রই ইমনের হাতের ব্যথা কর্পূরের মতো উড়ে গেল। সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে, গরম জল দিয়ে ক্ষতের জায়গাটা ভাল করে ধুয়ে ফেলল ও। সিদ্ধান্ত নিতে সামান্য ভুল। আর তার জন্য এই চোট। প্ল্যান ছিল, চেলসির ওই অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে খামিস লিফটের দিকটায় গার্ড দেবে। আর ও নক করে দরজা খোলাবে। দরজায় নক করতে হবে এই কারণে যে, নন্দী বলে লোকটার যেন মনে হয়, বিল্ডিংয়েরই কেউ ভূত সেজে মজা করতে এসেছে। আর দরজা খোলা পেলেই ইমন ঘরের ভিতরে ঢুকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ইন্ডিয়ান কাফেরটাকে গুলি করে বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু ওইসময় কী যে হল? বারচারেক নক করার পরও কেউ দরজা খুলল না। তখন ওর উচিত ছিল, আরও দু'একটা মিনিট অপেক্ষা করা। কিন্তু খামিসের তাগাদায় অতি উৎসাহী হয়ে, নিজে দরজা খুলতে গিয়ে বিপদটা ও ডেকে আনল। ডান হাতের মাঝের আঙুলটা বেঁকে রয়েছে। সোজা করতে গেলেই চিড়িং চিড়িং করছে। ইমন বুঝতে পারল, চোটটা এমন জায়গায় হয়েছে, পিস্তল কেন, আগামী কয়েকটা দিন ও লোহার পিনও ধরতে পরবে না। মলম লাগানোর জন্য মেডিক্যাল বক্সের দিকে তাকাতেই ও শুনল, 'ইমন, তোর হাতে ইনজুরি হল কী করে? দেখি, দেখি।'

বেসিনের আয়নায় ইমন দেখল, ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে চিরাগ। ও যে এতক্ষণ কুঠুরিতে ছিল, ইমন টেরই পায়নি। জিহাদি ক্যাম্পে একমাত্র ওরা দু'জন নিজেদের নাম ধরে কথা বলে। ইমনের ডান হাত টেনে চোটের গভীরতা দেখে চিরাগও আঁতকে উঠল। ঘরের অন্য কোণে গিয়ে ও মেডিক্যাল বাক্সটা নিয়ে এল। তার পর মলম খোঁজার ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তোর সঙ্গে খামিস যাচ্ছে শুনে সকালেই তোকে বলেছিলাম, সাবধান। কী করে চোট লাগল, বললি না তো? এত ডিপ কাট হল কী করে?'

বলতে বলতে চিরাগ মেডিক্যাল বাক্স থেকে হেকিমি মলম বের করে আনল। কাফেরদের তৈরি করা কোনও ওষুধ জিহাদিরা ব্যবহার করে না। সিরিয়ান হেকিমরা যে দাওয়াই দেন, সেটাই জিহাদিদের ব্যবহার করতে হয়। ক্যাম্পে ইমন দেখেছে, ভেষজ ওষুধগুলো খুব কার্যকরী। ক্ষতস্থানে চিরাগ মলম লাগিয়ে দেওয়ার সময় ওর জ্বালা জ্বালা করতে লাগল। তবুও মুখ বুঁজে সহ্য করে ও উত্তর দিল, 'অ্যাকশনে পাঠানোর আগে হালারা ভাল কইর‍্যা খোঁজ খবর নেয় না। এমন অবস্থায় পড়সিলাম, ফিইর‍্যা আইসতে পারতাম না।'

'কেন? কামাল শূয়ারটা ভুল ব্রিফিং দিয়েছিল না কি?'

'ভুল-ভালা প্ল্যানিং। হালায়... আমরা গিয়া দেখি, হাইরাইজ বিল্ডিং। গ্রাউন্ড ফ্লোরের হলঘরে হ্যালোইন পার্টি শুরু হইসে। সব ফ্ল্যাটের লোক ভূত-প্রেতের কস্টিউম পইর‍্যা নিচে নাইম্যা আইসে। লিফটে কইর‍্যা অনবরত লোক নামতাসে আর উঠতাসে। আমাগোও অরা হলঘরে টানতাসিল। তখনই বুঝসিলাম, সাইলেন্টলি কাম সারন যাইব না। তাই পিস্তলে সাইলেন্সার লাগাইয়া রাখসিলাম। কিন্তু...'

'কিন্তু ফ্ল্যাটে ঢোকার সুযোগই পাসনি বোধহয়?'

'আরে না, দরজার লক খুইল্যা, ডাইন হাতে মাকারভ পিস্তলটা বাগাইয়া সবে ফ্ল্যাটে ঢুকত্যাসি, পুরা বডি ভিতরে দিবার আগেই হাতে আইস্যা লাগল কাঁচের বিরাট ফুলদানি। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা ছিটকা কুথায় য্যান চইল্যা গেল। ফিনকি দিয়া রক্ত। বিপদ বুইঝ্যা খামিস হাইত ধইর‍্যা দিল টান। কইল, লিফটের দিকে ছুট দে। ভাগ্যিস, কেউ আমাগো চেজ করে নাই। হালায় দরজায় যে আই হোল আসে, কামাল চুতমারানি তা কয় নাই। আই হোল দিয়া আমারে দেইখ্যা, ভিক্টিম আগেই অ্যালার্ট হইয়া গেসিল।'

ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে চিরাগ বলল, 'তোর কপালে দুঃখ আছে ভাই। তোর এই চোট সারতে অনেক সময় নেবে। তার চেয়েও বড় কথা,

তৌফিককে সকালবেলায় বলতে শুনলাম, কম্যান্ডার রববানি কাল নিউ ইয়র্কে আসছে। আমার মতো তোকেও কিন্তু রগড়াবে।'

সেটা যে বলার অপেক্ষা রাখে না, ইমন তা জানে। নিশ্চয়ই উনি এতক্ষণে জেনে গিয়েছেন মিশন সাকসেসফুল হয়নি। কোনও কথা না বলে ইমন ওর বিছানায় গিয়ে বসল। রববানিদের ধারণা, বাংলাদেশি আর ইন্ডিয়ানরা দুর্বলচিত্ত। ওঁদের চোখে কামাল আর খামিসরা অনেক বেশি সাহসী। তাই ওরা দু'জন যে সম্মানটা পায়, তা ইমন বা চিরাগদের কপালে জোটে না। কামাল নায়গারা থেকে ফিরে এসে পুরো দোষ চিরাগের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। অথচ কামাল ঠিকভাবে গাড়ি চালাতে পারলে চিরাগ ব্যর্থ হত না। কম্যান্ডার রববানির কাছে সরাসরি এই অভিযোগটা করলে উনি বিশ্বাসই করবেন না। উল্টে, ইরাকি-সিরিয়ানদের মতো লড়াকু জাতির বদনাম করার জন্য চিরাগের দুর্ভোগ আরও বাড়বে।

নিউ ইয়র্কে গত দু'দিন ধরে ভাল বৃষ্টি হয়েছে। এমনিতেই একটু ঠাণ্ডা। কিন্তু বেসমেন্টে চব্বিশ ঘণ্টা এ সি চালু থাকে বলে, ইমনের আরও শীত শীত করছে। উঠে গিয়ে হিটার চালু করে দেবে কি না যখন ও ভাবছে, তখনই হলঘরে ঢুকে এল তৌফিক। এর মধ্যেই ওর পোশাক বদলানো হয়ে গেছে। ওর হাতে পলিথিনের ব্যাগে খাবারের প্যাকেট। তাতে লেখা মিরচি। ব্রুকলিনে ব্রিজের ধারে মিরচি বলে একটা রেস্তোরাঁ আছে। তাতে পাকিস্তানি খাবার পাওয়া যায়। বিরিয়ানির গন্ধে ইমনের খিদে দু'গুণ বেড়ে গেল। খাবারের প্যাকেট ডাইনিং টেবলের উপর রেখে তৌফিক জিজ্ঞেস করল, 'তোমার হাতের ব্যথা কেমন বি টেন? ডাক্তার ডাকার দরকার আছে না কি?'

ইমন বলল, 'না প্রয়োজন নাই। চিরাগ মলম লাগাইয়া দিসে।'

'ভেরি গুড।' কথাটা বলে মৃদু হেসে তৌফিক ব্যাগ থেকে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের চারটে প্যাকেট বের করে আনল। তার পর জিজ্ঞেস করল, 'খামিস

কোথায়? এখনও আসেনি?'

চিরাগ বলল, 'না। ওকে গেটের দিকে যেতে দেখলাম।'

'ছেলেটা খুব মিস্টিরিয়াস টাইপের। কামাল আর ও দুটোই শয়তান। ওদের তোমরা বিশ্বাস কোরো না।'

কথাটা শুনে ইমন একবার চিরাগের মুখের দিকে তাকাল। চোখের ইশারায় চিরাগ বলল, মুখ খুলিস না।

অ্যালুমনিয়াম ফয়েলের দুটো প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে তৌফিক বলল, 'বিরিয়ানি এনেছি। চট করে খেয়ে নাও দোস্ত। এরপর কতদিন তোমাদের কপালে ঠিকমতো খাওয়া জুটবে না, কে জানে?'

তৌফিক নিজেও ডাইনিং চেয়ারে বসে পড়েছে। ওদের ঘরে আগে টেবল বা চেয়ার কিছুই ছিল না। স্টোরেজে কেউ হয়তো গচ্ছিত রেখে গেছে কিছু দিনের জন্য। সেই মালিকের অজান্তে তৌফিক তা নামিয়ে এনেছে। জিহাদিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে ওর খুব নজর। তিনটে ফয়েলের প্যাকেট টেবলে সাজিয়ে তৌফিক ডাকল, 'মিরচির বিরিয়ানি খুব নামকরা। তোমাদের মনে হবে, মায়ের হাতের রান্না খাচ্ছ।'

ইমন ডান হাত দিয়ে খেতে পারবে না। কিচেন থেকে একটা বড় চামচ নিয়ে এসে চিরাগ বলল, 'কী রে, বাঁ হাতে খেতে পারবি, না কি তোকে খাইয়ে দেব?'

ইমন গম্ভীর হয়ে বলল, 'দরকার নেই।'

প্রথম চামচ মুখে দিয়েই ইমনের মনে হল, এমন সুস্বাদু বিরিয়ানি মায়ের হাতেও কোনওদিন খায়নি। ওদের আমোদপুরে সবথেকে ভাল বিরিয়ানি রাঁধত সিরাজচাচা। কারও বাড়িতে নিকাহ বা অন্য কোনও অনুষ্ঠান হলে আগে সিরাজচাচার ডাক পড়ত। বিরিয়ানি খেতে খেতে ইমন হাতের ব্যথা, অ্যাকশনে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার আক্ষেপ, কম্যান্ডার রববানির রক্তচক্ষু, শাস্তির আশঙ্কা... সব ভুলে গেল। চিরাগ আর তৌফিক নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

ইমন চুপচাপ শুনতে লাগল। কামালের খুব নিন্দে করছে তৌফিক। দু'তিনদিন আগে মিরচির এই বিরিয়ানি না কি কামাল ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল, এই খাবার কুত্তারাও খাবে না। রাত বারোটার সময় কুড়ি মাইল ড্রাইভ করে গিয়ে ওকে কামালের পছন্দমতো খাবার নিয়ে আসতে হয়েছিল। তৌফিক বলল, 'দোস্ত, লোকটার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, ক্যাম্পে রোজ ফাইভ স্টার হোটেল থেকে ওর জন্য খাবার আসে। আপদটা বিদেয় হয়েছে, এর থেকে ভাল আর কিছু হয় না।'

জিহাদিদের সম্পর্কে প্রচুর কৌতূহল তৌফিকের। রাতের দিকে ও বেসমেন্টে এলে জিহাদিদের জীবন নিয়ে গল্প শুনতে চায়। আমেরিকানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা আগ্রহভরে শোনে। কথায় কথায় তৌফিক একবার বলেছিল, গত কুড়ি বছর ও আমেরিকায় আছে বটে, কিন্তু দেশটাকে ও একেবারেই পছন্দ করে না। সাদ্দাম হুসেনের খুন, টিভিতে দেখার পর থেকেই না কি আমেরিকানদের উপর ওর রাগ আরও বেড়েছে। আমেরিকানদের কোনও ক্ষতি হলে ও খুব আনন্দ পায়। আবেদন করা সত্ত্বেও, এখনও ওকে গ্রিন কার্ড দেওয়া হয়নি। তার একমাত্র কারণ, ও মুসলমান। জিহাদিদের দেখাশুনো করতে করতে একবার না কি তৌফিকের মনেও হয়েছিল, ধর্মরক্ষার যুদ্ধে নেমে পড়বে। কিন্তু কামালের মতো কয়েকজন জিহাদিকে দেখে ওর ধারণা হয়েছে, এরা মানুষ নয়, পিশাচ। তাই সভয়ে পিছিয়ে যায়।

মন খুলে কথা বলছে তৌফিক। ওকে দেখে এতদিন ইমনের মনে হত, আরব দেশের কেউ। কিন্তু এই প্রথম ও বলল, ওরা পাকিস্তানি। ওদের আসল বাড়ি লাহোরে। ওর বাবা নিউ ইয়র্কে ট্যাক্সি চালাতেন। ওর যখন চার বছর বয়স, তখন লাহোর থেকে উনি পুরো পরিবারকে এখানে নিয়ে আসেন। তৌফিক অস্টিন ইউনিভার্সিটি থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি নিয়েছে। আগে ও একটা ফার্নিচার কোম্পানিতে কাজ করত। কিন্তু এই

স্টোরেজে চাকরি পাওয়ার পর সেই কাজ ছেড়ে দেয়। এখন মালিকের খুব বিশ্বস্ত। ওর কথা শুনতে শুনতে ইমন এইবার বুঝতে পারল, ছেলেটা শুরু থেকেই ওদের প্রতি এত সিমপ্যাথেটিক কেন। আফটার অল, একই সাবকন্টিনেন্টের মানুষ তো।

পাকিস্তান দেশটাকেও তৌফিক ঘেন্না করে। বলল, জীবনেও ওই দেশে আর ফিরে যাবে না। পাকিস্তানের দু'মুখো নীতি ও সহ্য করতে পারে না। জিহাদিদের লুকিয়ে সাহায্য করব, আবার আমেরিকানদের কাছে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দাঁড়াব, এ কেমন কথা! ইমন বাংলাদেশি শুনে তৌফিক বলেই ফেলল, 'তোমরা ঠিকই করেছিলে, পাকিস্তানিদের লাথি মেরে তাড়িয়ে।' শুনে ইমন মনে মনে হাসল। আজ পর্যন্ত এমন একজন পাকিস্তানিকে ও পায়নি, যে বলেছে,বাংলাদেশের জন্ম দিয়ে তোমরা ভাল করেছ! মাত্তর কয়েকদিনের আলাপ। তবুও তৌফিক যে ওদের জন্য খাবার এনেছে, সেজন্য ইমন নীরবে কৃতজ্ঞতা জানাল।

তৌফিক একটু আগে একটা খাঁটি কথা বলে ফেলেছে। খামিস আর কামালকে তোরা বিশ্বাস করিস না। ওদের সম্পর্কে চিরাগই প্রথম সন্দেহটা করে, নায়গারা থেকে ফিরে আসার পর। কিন্তু খামিস আজ ওর সঙ্গে যা করল, তাতে সন্দেহটা বিশ্বাসে গিয়ে দাঁড়াল। বিরিয়ানি খেতে খেতে ইমনের মনে পড়ল, নক করার পরও যখন অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলছিল না, তখন খামিসই ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। ও তাগাদা দিচ্ছিল, 'লকটা ভেঙে ফেলছিস না কেন জানোয়ার? লিফটে করে কেউ এই ফ্লোরে উঠে এলে তোকে তো বেঘোরে জান দিতে হবেই, আমিও বেঁচে ফিরব না। যা করার তাড়াতাড়ি কর।' খামিসের কথায় বেশি অ্যাগ্রেসিভ হতে যাওয়াটাই ইমনের কাল হল। এখন মনে হচ্ছে, খামিস ইচ্ছে করেই তখন প্যানিক তৈরি করেছিল। যাতে কাজটা ও করে আসতে না পারে।

...বিরিয়ানি খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তৌফিক ওর বালিশের তলায় কী যেন গুঁজে দিয়ে গেল। মুখ ধুয়ে এসে বালিশ উল্টে ইমন দেখে, মোবাইল ফোন। জিহাদিদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক আছে। ইন্টারপোলেরও সাধ্য নেই, আঁড়ি পেতে কাউকে ধরা। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে ওরা যাতে কথা বলতে পারে, তার জন্য কোনও কোনওদিন তৌফিক ফোন ধার দিয়ে যায়। সাবধান করে দিয়ে যায়, ফোন দিয়ে যাওয়ার কথা যেন কম্যান্ডাররা জানতে না পারেন। ওদের হাতে মোবাইল ফোন দেখলে কম্যান্ডাররা মারাত্মক চটে যাবেন। কম্যান্ডাররা বলেন, জিহাদিদের নিজেদের পরিবার বলে কিছু থাকতে নেই। ক্যাম্পে ঢোকার পরই ওদের বলে দেওয়া হয়েছে, বাড়ি-ঘর, মা-বাবা, ভাই-বোনের কথা ভুলে যাও। তোমাদের পরিবারকে দেখাশুনো করার দায়িত্ব আমাদের। জিহাদিরাই তোমাদের পরিবার।

মায়ের সঙ্গে বহুদিন কথা বলা হয়নি। হাতে চোট পাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে, ফোনে মায়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য বেসমেন্ট থেকে বেরিয়ে ইমন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। জানলা দিয়ে কিসের আলো যেন বিপবিপ করছে। বাইরে তাকিয়েই ও চমকে উঠল। দেখতে পেল, নিউ ইয়র্ক পুলিশের লাল-নীল আলোওয়ালা গাড়ি নিঃশধে স্টোরেজ ঘিরে ফেলছে। পুলিশ রে-ই-ড করেছে!! চিরাগকে খবরটা দেওয়ার জন্য ইমন দুড়দাড় করে নিচে নেমে এল। দু'জনে যাতে একসঙ্গে পালাতে পারে। নীচে নেমেই ও দেখল, চিরাগের দু'হাতে দুটো কিট ব্যাগ। করিডরে দাঁড়িয়ে ও ফিসফিস করে বলল, 'আমি সব গুছিয়ে রেখেছিলাম। সময় নষ্ট করিস না। চল, পালাই।'

আধঘণ্টা পর মিরচি রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে চিরাগ বলল, 'তুই এত অবাক হচ্ছিস কেন ভাই। নাইন ইলেভেনে ফোন করে পুলিশকে আমিই খবরটা দিয়েছিলাম। কামাল আর খামিসকে ধরিয়ে দেব বলে।'

ইমন বলল, 'যদি জানাজানি হইয়া যায়?'

চিরাগ বলল, 'এত কথা ভাবার সময় নেই। শোন, তৌফিক গাড়ি আনতে গেছে। আজ রাতেই ও আমাদের নিউ জার্সিতে পৌঁছে দেবে। নায়গারা থেকে আসার সময় যে বাংলাদেশি গাঁড়লটা তোকে নেমকার্ড দিয়েছিল, কী নাম যেন তাঁর... পলাশ চৌধুরী... সেই কার্ডটা তুই বের করে রাখ। নিউ জার্সিতে আমরা তাঁর কাছেই যাব।'

(নয়)

নিউ জার্সিতে ইসেলিন বলে একটা জায়গায় পলাশভাইয়ের বাংলো বাড়ি আছে। চেলসির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মাত্র ঘণ্টাখানেকের ড্রাইভ। একতলা বাড়িটা একেবারে ছবির মতো। পিছনের দিকটায় ঘন জঙ্গল। কিন্তু সামনের দিকে মখমলের মতো মসৃণ ঘাসের লন। বাড়ির সামনেই একটা সুইমিং পুল আছে। তাতে নীল জল টলটল করে। বাংলোর চারপাশটা পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। অনুমতি ছাড়া বাইরের লোকদের ঢোকা মুশকিল। লোহার কারুকাজ করা বিশাল সদর দরজা। খোলে রিমোট কন্ট্রোলে। বাইরে থেকে কেউ ডোর বেল টিপলে তার মুখটা ঘরে বসেই সিকিউরিটি সিস্টেমের পর্দায় দেখতে পাওয়া যায়। মালিকের মরজি, সে প্রবেশাধিকার পাবে কি না। গেটে গার্ড অবশ্য আছে। দিনে-রাতে দু'বেলা দু'জন পাহারা দেয়। দু'দিন আগে নিরাপত্তার বলয়ে ঘেরা এই রকম বাংলোয় পলাশভাই নিয়ে এসেছেন কালকেতুকে।

হ্যালোইনের রাতে পার্টি থেকে চেলসির অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেই হামলার নজির দেখে পলাশভাই বলেছিলেন, 'আর আমি রিস্ক নিমু না কাইলকেতুভাই। কাইলই আফনেরে আমার নিউ জার্সির বাংলোতে নিয়া যামু। এহানে আফনে সেফ না।' তার পর প্রায় সারারাত্তির সিটি পুলিশ আর এফবিআইকে গালাগাল করে ছিলেন। 'এহানে আফনের কিছু হইয়া গেলে

আমি ফুল্লরাভাবীর কাছে মুখ দেখাইমু কী কইর‍্যা? হালায় অপদার্থ পুলিশ। অহনও টেররিস্টগুলান ফ্রিলি ঘুইর‍্যা বেরাইতাসে।'

সেদিন রাতে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দরজার সামনে রক্ত দেখে রোজিনা ম্যাডামের মুখও ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল। সঙ্গে সঙ্গে উনি নাইন ওয়ান ওয়ানে ফোন করেছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশ, অ্যাম্বুল্যান্স আর ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি একসঙ্গে এসে হাজির। যা ঘটেছিল, কালকেতু খুঁটিয়ে তা বলেছিল পুলিশকে। সদর দরজা আস্তে আস্তে ফাঁক হতে দেখে প্রথমে ও ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়। আসলে একটু সময় চেয়েছিল। যাতে ঘরের ভিতর ঢুকে ধাতস্থ হতে জঙ্গিটা একটু সময় নেয়। দ্রুত আশপাশে তাকিয়ে কালকেতু তখন হাতের সামনে কাচের একটা ফুলদানি পেয়েছিল। সেটা শক্ত করে ধরে জঙ্গি ছেলেটাকে আর সময় দেয়নি। পিস্তল ধরা হাত লক্ষ করে সজোরে ছুঁড়ে মেরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে 'আম্মি' বলে একটা আর্তনাদ। কাঠের মেঝেতে ধাতব কিছু পড়ে যাওয়ার ঠক আওয়াজ। তার পরই লিফটের দিকে কেউ ছুটে গেছিল। তখনই ও হাত দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। কয়েক সেকেন্ড পর কালকেতু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যাক, এ বারের মতো প্রাণটা বেঁচে গেল।

'আপনি বলেই কমব্যাট করতে পেরেছেন কালকেতুভাই।' অনেকক্ষণ পর রোজিনা বলেছিলেন, 'পলাশ ঠিকই বলছেন। চলেন, কাল ব্রেক ফাস্টের পর আমরা নিউ জার্সিতে চলে যাই।'

পুলিশ ঘণ্টাখানেক তদন্ত করে পিস্তলটা খুঁজে পেয়েছিল। যাওয়ার সময় বলে গেছিল, 'যে গাড়ি করে টেররিস্টরা পালিয়েছে, সেটা আইডেন্টিফাই করা গেছে। ব্রুকলিন ব্রিজ দিয়ে গাড়িটাকে যেতে দেখা গেছে। মনে হয়, আজ রাতেই আমরা ওদের ধরে ফেলতে পারব।'

শুনে বিশ্বাস করেননি পলাশভাই। বলেছিলেন, 'আগেরবারও নায়গারায় হ্যারা এক কথা কইসিল। গাড়ি ধরসিল, মানুষ ধইরতে পারে নাই। হ্যারা

ঘোড়ার ডিম প্রসব কইরব।'

গত দু'দিন ধরে পলাশভাইয়ের মাথা এমন গরম, সেভও করেননি। মুখে হালকা দাঁড়ি গজিয়েছে। সবসময় চিন্তার ছাপ। তৃতীয়দিন নিউ ইয়র্ক থেকে পুলিশ ফোন করে জানাল, কামাল গামা বলে একজন ইরাকি টেররিস্টকে ওরা আটক করেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, গোপন ডেরায় তার সঙ্গে আরও তিন জঙ্গি ছিল। একজনের হাতে চোটের চিহ্ন আছে। পুলিশ তার সন্ধান করছে। রোজিনার মুখে এই খবরটা শোনার পর থেকে পলাশভাই ফের ফুরফুরে মেজাজে। কখন যেন একবার বললেনও, 'নিউ ইয়র্ক পুলিশরে যতটা অকম্মা ভাবসিলাম, ততডা না, বোঝলেন কাইলকেতুভাই। দ্যাখবেন, ঠিক অরা বাকি তিনজনরে ধইর‍্যা ফেইলব।'

যে কাজের জন্য কালকেতুর নিউ ইয়র্কে আসা অর্থাৎ পলাশভাইয়ের শিউলিদিদিকে খুঁজে বের করা... তার কিছুই এগোয়নি। নায়গারা ট্রিপের পর থেকে সে ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্যও করছেন না পলাশভাই। মানুষটাই এমন হুজুগে। ওর পিছনে লাখ চারেক টাকা ইতিমধ্যেই খরচা করে ফেলেছেন। অথচ একবারও জিজ্ঞাসা করেননি, আসল কাজ কতদূর এগোল। মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছে কালকেতু। কলকাতায় থাকার সময় ও কিছুটা রিসার্চ করে এসেছিল। রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পেও গিয়েছিল। কেননা, শরণার্থীদের বড় একটা দলের ঠাঁই তখন হয়েছিল ওই ক্যাম্পে। তার পর সুদীশের সঙ্গে কথা বলে ও ঠিক করেছিল, খোঁজ শুরু করবে নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর পুরনো ফাইল দেখে। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ওই কাগজে বেশ কয়েকদিন লেখালিখি হয়েছিল শিউলিদিদিকে নিয়ে। কালকেতুর এমনই দুর্ভাগ্য, নিউ ইয়র্কে দিন তিনেক কাটানো সত্ত্বেও একবারও খবরের কাগজের অফিসে যাওয়ার সময় বা সুযোগ ও পায়নি।

নাহ, আর আলসেমি করে লাভ নেই। আজ একবার নিউ ইয়র্কে যাওয়ার কথা তুলবে বলে কালকেতু ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল, পলাশভাই লিভিং

রুমের সোফায় বসে, ঘনঘন সেলফি তুলছেন রোজিনা ম্যাডামের সঙ্গে। কাঁধে হাত দিয়ে, কোমর জড়িয়ে ধরে। হঠাৎ সেলফি তোলার এত উৎসাহ কেন, তাও আবার ঘনিষ্ঠ পোজে, কালকেতুর বোধগম্য হয়নি। মোবাইল সেটটা আইফোন এক্স... একেবারে লেটেস্ট মডেলের। নায়গারাতে যাওয়ার আগের দিন পলাশভাই অ্যাপল স্টোরে গিয়ে কিনে এনেছেন, দুর্দান্ত ছবি ওঠে বলে। হাজার ডলার দাম শুনে মাথা ঘুরে গেছিল কালকেতুর। পলাশভাই তখন ওর জন্যও একটা সেট কিনতে চাইছিলেন। কিন্তু কালকেতুই বাধা দিয়ে বলে, 'আগে আপনার শিউলিদিদিকে খুঁজে বের করি। তার পর যা উপহার দিতে চান, নেব।'

ওকে লিভিং রুমে ঢুকতে দেখে পলাশভাই সোফায় একটু সরে বসে, আন্তরিকভাবে ডাকলেন, 'আসেন, আসেন কাইলকেতুভাই। আফনের সাথেও সেলফি তুইল্যা রাখি।'

হালকাভাবেই কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ এত সেলফি তোলার ইচ্ছে হল কেন?'

ওঁর হয়ে উত্তর দিলেন রোজিনা, 'উনি নো শেভ নভেম্বর পালন করবেন বলে।'

বুঝতে না পেরে কালকেতু বলল, 'তার মানে?'

'পুরো নভেম্বর মাসটায় উনি শেভ করবেন না। দেখছেন না, হ্যালোইনের পরদিন... মানে পয়লা নভেম্বর থেকে আপনার পলাশভাই গোঁফ-দাঁড়ি রাখতে শুরু করেছেন। একমাস কাটবেন না। সেই কারণে এখন সেলফি তুলে রাখছেন। পয়লা ডিসেম্বর শেভ করার আগে ফের উনি সেলফি তুলে মিলিয়ে দেখবেন, ওঁর লুক কতটা চেঞ্জ হয়েছিল।'

'হঠাৎ এই অদ্ভুত শখের কারণ?'

পলাশভাই বললেন, 'শখ না কাইলকেতুভাই। হ্যার পিছনে একডা মহৎ উদ্দেশ্য আসে। আমেরিকায় নো শেভ নভেম্বর পালন কইর‍্যা, লোগে যে

ট্যাহাডা বাঁচায়, তা দান করে ক্যানসার ফাউন্ডেশনে। ক্যানসার সম্পর্কে পাবলিকের অ্যাওয়ারনেস বাড়ানোর লইগ্যা এই টার্গেট। এই ট্যাহা অরা খরচা করে ক্যানসার নিয়া রিসার্চ করব বইল্যা। হেইডা একডা ওয়েব সাইট বেইসড অর্গানাইজেশন। নো শেভ করার আগে সেহানে রেজেস্ট্রি কইরতে হয়। আসলে কী জানেন কাইলকেতুভাই, ক্যানসার হইলে পেসেন্টের চুল দাঁড়ি উইঠ্যা যায়। ভাল হইয়্যা গেলে ফের হ্যাগো চুল গজায়। সেই লক্ষ্যেই আফনে ট্যাহা ডোনেশন দিতাসেন। নিউজপেপারে কত লেখালেখি হইসে, আফনের চোখে পড়ে নাই?'

শুনে কালকেতু একটু অবাকই হল। আমেরিকানরা পারেনও ভাবতে। ক্যানসার রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এমন একটা অভিনব আইডিয়া বের করেছেন যাতে, সাধারণ লোককেও এই মহান ব্রতে জড়িয়ে নেওয়া যায়। যার যা সামর্থ, তা নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ডোনেট করার জন্য পলাশভাইয়ের দাড়ি রাখার দরকার কী? উনি ধনকুবের মানুষ। এমনিতেই প্রচুর টাকা ডোনেশন দিতে পারেন। তার জন্য এমন কৃচ্ছসাধন ওঁর না করলেও চলে।

আরও একটা কথা কালকেতুর মাথায় এল। সেটা হল, নো শেভ নভেম্বর থেকে আর কত টাকা উঠতে পারে? প্রশ্নটা করতেই পলাশভাই বললেন, 'ক'ন কী? লোগে যদি মুইচ আর দাঁড়ি শেভ না করে, তাইলে পার মান্থ কম কইর‍্যা একশো ডলার বাঁচাইতে পারে। ভাবেন তো, পাঁচ লাইখ লোক সামিল হইলেও পঞ্চাইশ কোটি ডলার। মানে হাফ আ বিলিয়ন! আফনেগো ট্যাহায় সাড়ে তিনশো কোটি! কম না হি?'

কৌতূহল হওয়ায় কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'এই একটা মাস কি এখানে সেলুন-টেলুন বন্ধ থাকে?'

রোজিনা হেসে বললেন, 'না, না। ওদেরও প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকে। নভেম্বর মাসে কেউ চুল-দাঁড়ি কাটতে গেলে সেলুনে ফিফটি পার্সেন্ট ছাড় দেয়।

অনেকে আবার দাড়ি-গোঁফ ট্রিম করতে যায়। সেটা অ্যালাউড। পলাশ যে হিসেবটা দিলেন, আমার মনে হয়, সেটা ঠিক না। মেয়েদের পার্টিসিপেশনের কথা উনি বলেননি। আমেরিকান মেয়েরা হাতে-পায়ে লোম পছন্দ করে না। লোম শেভ করার খরচাও কিন্তু কম নয়। মাস গেলে পার হেড টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ ডলার। সেটাও হিসেবের মধ্যে রাখুন।'

পলাশভাই বললেন, 'এই মাসডায় পুরা... আফনে ক্যাম্পেনডা লক্ষ কইরবেন কাইলকেতুভাই। লোকে নো শেভ নভেম্বরের টি শার্ট আর হুডি পইর‍্যা ঘুইর‍্যা বেড়াইতাসে। মাইয়াগো হাতেও নো শেভ নভেম্বর লেখা ব্রেসলেট। কোট বা ব্লেজারের পকেটে ল্যাপেল পিন। রাস্তায় বাইর হইলেই আফনে বুঝতে পাইরবেন, কারা ব্রত পালন করতাসে। আমেরিকানরা যা করে, অন্য লেভেলে উইঠ্যা করে। সত্যিই, এই জাতটারে হ্যাটস অফ করতে অইবই।'

পলাশভাইয়ের মুখে আমেরিকানদের প্রশংসা শুনে রোজিনা মিটিমিটি হাসছেন। এ বার বললেন, 'কালকেতুভাই, আপনার কাছ থেকে একটা প্রশ্ন আশা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি জানতে চাইবেন, এরা নভেম্বর মাসটাকেই বেছে নিল কেন?'

কালকেতু বলল, 'অ্যাপারেন্টলি আমার যা মনে হচ্ছে, সেটা বলি?'

পলাশভাইও সকৌতূকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন। দেখে কালকেতু বলল, 'নভেম্বর মাসে সবে ঠান্ডা পড়তে শুরু করে। দাড়িটা স্কিন প্রোটেকশনের কাজ করে। মনে হয়, আরও একটা কারণ থাকলেও থাকতে পারে। দাড়ি-গোঁফ পুরুষদের ব্যক্তিত্ব অনেক বাড়িয়ে দেয়। ক্রিসমাসের ঠিক আগে দেখতেও ভাল লাগে।'

'ঠিকই কইসেন।' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন পলাশভাই। তার পর রোজিনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যার আইকিউ লেভেল আমার-আফনের থেইক্যা অনেক বেশি। কালকেতুভাইরে জইধ কইরতে পারবেন না। হ,

হত্যাই, আসল কারণডা কিন্তু থ্যাঙ্কস গিভিং ডে, ক্রিসমাস আর নিউ ইয়ারস সেলিব্রেশন। নভেম্বরে দাঁড়ি-গোঁফ রাইখলে পরপর এই তিনডা অকেশনে পুরুষগো পুরুষ-পুরুষ দেখায়।'

সুযোগ পেয়ে কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, এক মাস শেভ না করলে একজন মানুষের দাড়ি-গোঁফ কতটা আর বাড়তে পারে?'

'হাফ ইঞ্চি, তার বেশি না। কিন্তু লোকে আফনের দিগে আলাদা চোখে তাকাইব। বুঝব, সমাজের প্রতি আফনে কর্তব্য পালন করতাসেন।'

রোজিনার বোধহয় কোথাও যাওয়ার তাড়া আছে। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উনি বললেন, 'আপনারা আলোচনা চালিয়ে যান। এখানকার ইন্ডিয়ান পাড়ায় আমার একটা বিজনেস মিটিং আছে। আমি যাই। লাঞ্চে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।'

দু'পা এগিয়ে কী মনে পড়ায়, ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে উনি পলাশভাইকে বললেন, 'হোনেন, মেন গেটের দুইজন সিকিউরিটি গার্ড ছুটি চাইসে। ক্রিসমাসের সময় দ্যাশে যাইতে চায়। আমি দুই হপ্তায়ের ছুটি দিসি। আর এজেন্সিরে ফোন কইর‍্যা দিসি, দুইজন নতুন গার্ড পাঠাইতে। আফনে হ্যাগো সাথে কথা কইয়া নিবেন। অরা য্যান, বুইঝ্যা শুইন্যা লোগ পাঠায়।'

কথাগুলো পলাশভাইয়ের কানে গেল বলে কালকেতুর মনে হল না। নো শেভ নভেম্বরের আলোচনার রেশ ধরে উনি বললেন, 'আমাগো বাংলাদ্যাশেও একডা ক্যানসার ফাউন্ডেশন আসে। পার ইয়ার আমার কাছ থেইক্যা ভাল ট্যাহা নেয়। কিন্তু, দুঃখের কথা কী কমু, ট্যাহা কোথায় খরচ করে জাইনতে চাইলে, জানায় না। অনেস্টি বইল্যা আর কিছু অবশিষ্ট নাই, বোঝলেন কাইলকেতুভাই।'

পলাশভাইয়ের সঙ্গে কী কথা আলোচনা করার জন্য এসেছে, এতক্ষণে কালকেতুর তা মনে পড়ল। কিন্তু উনি সুযোগই দিচ্ছেন না। অস্ট্রেলিয়ায়

ক্যানসার ফাউন্ডেশনের জন্য কীভাবে টাকা তোলা হয়, সে গল্প শোনাচ্ছেন। হঠাৎ সিকিউরিটি সিস্টেমের পর্দায় গার্ডের মুখ ভেসে উঠল। বাইরে দু'জন ভিজিটর দাঁড়িয়ে আছেন। পলাশভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চান। ভিজিটরদের মুখ পর্দায় দেখা যেতেই পলাশভাই বললেন, 'তুমি! নায়গারা থেইক্যা ফেরার সময় রেস্ট এরিয়ায় তোমার সঙ্গেই তো দেখা হইসিল। তাই না? তোমার নাম তো ইমন। তা কী মনে কইর‍্যা?'

পর্দার দিকে ভাল করে তাকিয়ে কালকেতু দেখল, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের দুটি ছেলে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে। একজনের পরনে জিনসের প্যান্ট ও কালো জ্যাকেট, কাঁধে ব্যাগ। অন্যজনের গায়ে সাদা রঙের টি শার্ট, তাতে লেখা নো শেভ নভেম্বর। টি শার্ট পরা ছেলেটা করুণ মুখে বলল, 'ছ্যার, আফনে কাইজ-কাম দিবেন কইসিলেন। খুব অসুবিধার মধ্যে পড়সি। দ্যাশে ফিরার ট্যাহাও নাই। আফনে না দ্যাখলে আমাগো না খাইয়া মরতে অইব। প্লিজ, ছ্যার আমাগো ফিরাইয়া দিবেন না।'

পলাশভাই খুব বিচলিত হয়ে উঠলেন বলে কালকেতুর মনে হল। উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সাথে যে পোলাডা আইসে, সে কে?'

ইমন বলে ছেলেটি বলল, 'হ্যায় চিরাগ, ইন্ডিয়ান। করিমগঞ্জের পোলা। আমার সাথে পাবলিক স্টোরেজেই কাম কইরত। হ্যারেও মালিক বাইর কইর‍্যা দিসে।'

'ঢাকায় তুমি ক'দ্দূর ল্যাখাপড়া করসিলা?'

'আমি কলেজ অবধি পড়সি। কিন্তু পাশ করি নাই।'

'পাবলিক স্টোরেজে কী কাম কইরতা?'

'সিকিউরিটি গার্ডের ছ্যার। আমাগো দুইজনেরই সিকিউরিটি ট্রেনিং নেওয়া আসে। আমাগো এড্ডু হেলফ করেন ছ্যার। পরে আফনের অনেক কাজে লাগুম।'

পলাশভাই একটু চিন্তা করে বললেন, ‘তোমরা যদি আধঘণ্টা আগে আইসতা, তাইলে পাকা কথা দিতে পাইরতাম। কিন্তু এহানে আমার বিজনেস যে ম্যাডাম চালান, হ্যায় অহন নাই। তোমরা এ হানে আছ কোথায়? পরে একবার দেখা কইরতে পারবা?’

‘রাস্তায় আছি ছ্যার। অনেক কষ্টে ট্রেনে কইর‍্যা নিউ জার্সিতে আইসি। আমাগো থাকনের জায়গা নাই। দুই রাত্তির চোখে ঘুম নাই, খাওয়া দাওয়া, স্নান নাই। এজেন্টের পাল্লায় পইড়্যা এ দ্যাশে আইসিলাম। খুব ভুল করসি ছ্যার। জমি বিককিরি কইর‍্যা আববু এজেন্টেরে ট্যাহা দিসিল। অহন দ্যাশে ফিরতে পারুম না।’

‘থাউক থাউক। আর কিছু কইতে অহব না। তোমরা আহাম্মক, তাই বইল্যা আমি তো আহাম্মক হইতে পারি না। আমার বাসায় সিকিউরিটি গার্ডের কাম কইরতে পারবা?’

‘পারুম ছ্যার। এগবার বিশ্বাস কইর‍্যা দ্যাখেন।’

‘তুমি আমার দ্যাশের পোলা। তোমারে বিশ্বাস না কইর‍্যা পারি? আইসো, তাইলে ভিতরে চইল্যা আইসো। আইজ রাইতটা আউটহাউসে থাকো। কাইল রোজিনা ম্যাডামরে তোমাগো কাগজপত্তর সব দ্যাখাইও।’

(দশ)

অ্যাড্রিয়াটিকা রেসিডেন্সির ব্যালকনিতে বসে যোগ ব্যায়াম করছেন লিলি গডউইন। বছর পাঁচেক আগে ইউনিসেফেরই কোনও কাজে তিনি লস অ্যাঞ্জিলেসে গেছিলেন। বাম কিম তাঁকে চৌধুরী যোগা সেন্টারে নিয়ে যান। সেইসময় সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করার সময় হাঁটুতে সামান্য ব্যথা অনুভব করছিলেন। আর্থারাইটিস বলে ভয় হচ্ছিল লিলির। সপ্তাহখানেক যোগা সেন্টারে গিয়ে তিনি বেশ উপকার পান। যোগ ব্যায়ামের উপর তাঁর বিশ্বাস এসে যায়। তার পর থেকে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তেই থাকুন না কেন,

প্রতিদিন সকালে এক ঘণ্টা যোগ ব্যায়াম আর ধ্যান করার জন্য সময় বের করে নেন। তাঁর শরীরে আপাতত কোনও সমস্যা নেই। শুধুমাত্র পিঠের কোঁচকানো চামড়াটা ছাড়া। মাঝে মাঝেই তাঁকে ডার্মাটোলজিস্টের কাছে ছুটতে হয়।

অন্যদিন যোগ ব্যায়াম করার পর লিলি ধ্যানে বসেন। তখন মনটা খুব শান্ত থাকে। কিন্তু আজ অস্থির। বারবার রোকেয়ার মুখটা ভেসে উঠছে তাঁর চোখের সামনে। গত দু'দিন অনেক চেষ্টা করেও ঢাকায় বেচারিকে ফোনে ধরতে পারেননি। তিনি বুঝতেই পারছেন না, মেয়েটাকে ফের হাসপাতালে ভর্তি হতে হল কেন? কোনও রকমে কপালভাতি শেষ করে আধ ঘণ্টার মধ্যেই লিলি উঠে পড়লেন। ব্যালকনির রেলিংয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই যে দৃশ্যটা তিনি দেখলেন, তাতে মন ভরে গেল। কুইন্সে আড্রিয়াটিকা রেসিডেন্সি ক্যাসেলের ধাঁচে গড়া একটা হাউজিং কমপ্লেক্স। ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট ইউ আকারের সরোবর আছে। তার চারপাশ জুড়ে প্রচুর গাছ। সেই গাছের পাতার রং বদলাতে শুরু করেছে।

হ্যালোইনের দু'চারদিন আগে থেকেই এখানকার গাছে পাতার রং বদলাতে শুরু করে। সবুজ থেকে হলুদ, তার পর গেরুয়া। ক্রমশ গেরুয়া থেকে লাল, তার পর বাদামি হতে সময় নেয় দিন দশেক। তার পর শীতের ঠিক আগে সব পাতা ঝরে যায়। গাছের নিচে পড়ে থাকা বিচিত্র বর্ণের পাতা দেখলে মনে হয়, কোনও শিল্পী যত্ন করে তা এঁকে রেখেছেন। আমেরিকায় অগুণতি ন্যাশনাল পার্ক। 'ফল কালার' অর্থাৎ পাতায় রঙের খেলা শুরু হলেই লোকে বনাঞ্চলে ছুটে যায় প্রকৃতির বিচিত্র লীলা দেখার জন্য। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট ধরে লিলি দেখলেন, সূর্যের আলো গাছের পাতার উপর এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে, সূর্য তার এক একটা রং ঢেলে দিয়েছেন একেকটা গাছে। লিলি জানেন, এই অপরূপ শোভা খুব

বেশিদিন দেখা যাবে না। থ্যাঙ্কস গিভিং ডে আর ক্রিসমাসের মাঝের সময়টুকুর মধ্যে গাছগুলো নেড়া হয়ে যাবে।

ছোটবেলায় ড্যাডি এই সময়টায় পুরো পরিবার নিয়ে প্রতিবার ছুটি কাটাতে যেতেন ইস্ট আর সাউথ ইস্ট কোস্টের দিকে। নিউ জার্সি, জর্জিয়া, ভার্জিনিয়া, টেনিসি, নিউ ক্যারোলাইনা। একবার অ্যাটলান্টাতেও নিয়ে গেছিলেন। সেখান থেকে দু'শো মাইল দূরে স্মোকিং মাউনটেন্স বলে একটা জায়গায়। তখন লিলি হাই স্কুলের ছাত্রী। সেই কারণেও আরও বেশি করে মনে আছে অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা। দিগন্তব্যাপী পাহাড়ের ঢেউ। এক একটা পাহাড়ের পুরো ঢাল জুড়ে গাছের একেক রকম রং। সবুজ, হলুদ, গেরুয়া, লাল, বেগুনি। কোথাও কোথাও ঝরণা নেমে এসে টেনেসি নদীতে মিশে যাচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে জঙ্গলের মধ্যে কোথাও লম্বা শিংওয়ালা এলক হরিণ, কোথাও আবার কালো ভালুক দেখেছিলেন লিলি। মনে আছে, গাটলিনবার্গ বলে একটা জায়গায় সালামান্ডার বলে এক ধরনের কালো টিকটিকি দেখে তিনি মারাত্মক ভয় পান। সেই ভয় ভাঙানোর জন্য ড্যাডি তাঁকে বলেছিলেন, সালামান্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাকের নাকি খুব চাহিদা। ধনী মানুষরা সেই পোশাক আভিজাত্যের অঙ্গ বলে মনে করে।

ইউনিসেফের পরামর্শদাত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে লিলি এমন ব্যস্ত, 'ফল কালার' দেখতে যাওয়ার সুযোগই পান না। স্মোকিং মাউনটেন্স এখন হেরিটেজ সাইট। ইউনিসেফের কর্তা হিসেবে, তিনি যখন ইচ্ছে সেখানে যেতেই পারেন। তিনি জানেন, স্মোকিং মাউনটেন্সে প্রতি বছর এত ট্যুরিস্ট যান, আমেরিকার আর কোথাও তেমন যান না। প্রায় এক কোটি দশ লাখের মতো। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বা নায়গারার থেকেও অনেক বেশি ট্যুরিস্ট। প্রতি বছরই শীত আসার আগে লিলি একবার মনে করেন, ভাই ড্যানিয়েলকে নিয়ে ফের গাটলিনবার্গে যাবেন। মেয়েবেলার স্মৃতিটা ফের ঝালিয়ে

আসবেন। কিন্তু ড্যানিয়েল চাকরি করে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের লন্ডন অফিসে। ক্রিসমাসের সময় ছাড়া আর ছুটি পায় না।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ই গুগল যন্ত্রের মিষ্টি আওয়াজ শুনতে পেলেন লিলি। অ্যালার্ম বাজছে, 'হাই লিলি, নাউ ইট ইজ এইট ও'ক্লক। দিস ইজ দ্য টাইম টু টেক বাথ।'

শুনে ভিতরে ঢুকে এলেন লিলি। এখন নানা ধরনের অ্যাপস পাওয়া যায়। স্মার্ট হোমের কনসেপ্ট দিনকে দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। ঘর-দোরের অনেক কাজ রোবো করে দেয়। দরজা খুলতে বা বন্ধ করতে হয় না। বাড়ির আলো জ্বালাতে অথবা নেভাতে হয় না। গুগল হোমই সব করে দেয়। লিলি জানেন, অ্যালার্ম বাজার সঙ্গেসঙ্গে আপনা থেকেই কফি মেকার কাজ শুরু করে দিয়েছে। ঘরে ঢুকে একটু পরেই ধূমায়িত কফির কাপ হাতের সামনে তিনি পেয়ে যাবেন। বাথরুমে স্নান করতে ঢুকলে শাওয়ারটাও আপনা থেকে কাজ শুরু করে। গুগল হোম এখন বয়স্ক মানুষদের বিরাট সাহারা। মানুষ ক্রমশ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। শুধু পরিবার কেন, বহু মানুষের দেশ পর্যন্ত হারিয়ে যাচ্ছে।

স্নান আর ব্রেক ফাস্ট সেরে লিভিং রুমে এসে লিলি দেখলেন, বাম কিম সু তাঁর জন্য বসে আছেন। ভদ্রলোক দক্ষিণ কোরিয়ান। বয়স চল্লিশের নিচে। কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। থাকেন অ্যাড্রিয়াটিকা রেসিডেন্সির অন্য একটা অ্যাপার্টমেন্টে। কোনও আলোচনা থাকলে শনি বা রবিবার সকালের দিকে উনি চলে আসেন। দু'জনে মিলে চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশন নিয়ে আলোচনায় বসেন। বছরে একটা বড় চ্যারিটি শো করে ওঁরা টাকা তোলেন। সে ব্যাপারেই কোনও কথা বলতে এসেছেন। তাঁকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাম কিম বললেন, 'গুড মর্নিং ম্যাম। কাল রাতে ঢাকায় কি কথা বলতে পেরেছিলেন?'

সোফায় বসে লিলি বললেন, 'না। অনেক রাত পর্যন্ত চেষ্টা করেছি। উল্টোদিকে রিং হয়েই যাচ্ছে। কেউ ফোন তুলছেন না। বুঝতে পারছি না, রোকেয়া ফোন ধরার মতো অবস্থায় আছে কি না? দেখি, এখন একবার চেষ্টা করে।' বলেই ঘড়ির দিকে একবার তাকালেন লিলি। নিউ ইয়র্কে সকাল ন'টা বাজে। তার মানে ঢাকায় এখন রাত্তির আটটা। ঢাকা ঠিক এগারো ঘণ্টা এগিয়ে। রোকেয়া যদি হসপিটালে থাকে, তা হলে এখনও ঘুমোয়নি। বার দুয়েক ডায়াল করার পর লিলি লাইন পেয়ে গেলেন। তাঁর গলা শুনেই ও প্রান্তে কান্নায় ভেঙে পড়ল রোকেয়া, 'ম্যাডাম, আমি খুব বিপদের মইধ্যে পড়সি। আমারে বাঁচান।'

লিলি জানতে চাইলেন, 'কেন, কী হয়েছে রোকেয়া?'

'এহানে আমার খুব অ্যান্টি পাবলিসিটি হইয়া গ্যাসে। কাগজ লিখছে, বুলেট ইনজুরির ইন্সিডেন্টডা নিয়া আমি এহানকার মিডিয়ার কাছে যা কইসিলাম, তা না হি সব ঠিক না। ম্যাম, রিসেন্টলি আফনের সাথে কি ঢাকার কোনও সাংবাদিক যোগাযোগ করসিল?'

'হ্যাঁ। তার নাম রেজওয়ানা চৌধুরী। চেনো না কি তাকে? কী লিখেছে সে?'

'না, চিনি না। হ্যায় লিখছে, আফনে না হি প্রথমে আমারে চিনতে পারেন নাই। আমার গায়ে যহন গুলি লাগে, তহন নাহি আফনে ধারে-কাছে ছিলেন না। বাফেলোর পুলিশ কইসে, শ্যুট আউট হয় নাই। হসপিটাল কইসে, বুলেট ইনজুরির কথা হ্যারা জানে না। এহানে জামায়েত সাপোর্টাররা কাইল আমার এগেনস্টে রাস্তায় মিছিল বাইর করসিল। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনরে কইসে, আমি সিমপ্যাথি আদায়ের জন্য না হি মিথ্যা কথা কইসি। আমার এনজিও এক সপ্তাহের মইধ্যে বন্ধ কইর‍্যা না দিলে, বন্ধুর আপিস ভাঙচুর কইরব।'

শুনে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন লিলি। হামলার ঘটনা গোপন রাখতে গিয়ে রেজওয়ানার কাছে তাঁকে একটা অসত্য কথা বলতে হয়েছে।

তার মাশুল যে রোকেয়াকে এ ভাবে দিতে হবে, তিনি ভাবতেও পারেননি। কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'আসলে, আমি চাইনি আমার উপর হামলার খবরটা মিডিয়া জানুক। তা হলে রোহিঙ্গাদের উপর থেকে আমেরিকান মিডিয়ার সিমপ্যাথি সরে যেত। আমি ওদের কল্যাণের জন্য এত চেষ্টা করছি, অথচ ওরা আমাকেই খুন করতে চাইছে? এখানকার মিডিয়া এটা ভালভাবে নিত না। তুমি এক কাজ করো, ঢাকার কোনও কাগজের রিপোর্টারকে আমায় ফোন করতে বোলো। যা ঘটেছে, ইন ডিটেল, তাঁকে আমি বলে দেব।'

'তাইলে আমি বাঁচুম ম্যাডাম। মুশকিলটা কী জানেন, বাংলাদ্যাশ গর্ভমেন্ট-এরও লস অফ ফেস হইসে। ইউএসএ অ্যামবেসিরে হ্যারা চিঠি লিখসিল, রোকেয়া সুলতানার সাথে কী হইসিল আমাগো জানান। অহন কাগজে উল্টাপাল্টা রিপোর্ট বাইর হওয়ার জন্য হ্যারাও আমার উপর চইট্টা গ্যাসে।'

'শুনে খারাপ লাগছে রোকেয়া। কিন্তু, কী আর করা যাবে। কারোর কাছে মুখ না খোলার কথাটা তোমাকে আমার বলে দেওয়া উচিত ছিল। এ নিয়ে তুমি আর দুশ্চিন্তা কোরো না। যা করার, এ বার আমি করব। এখন বলো, তোমাকে ফের হসপিটালে ভর্তি হতে হল কেন?'

'ঢাকায় ফেরার পর থেইক্যা প্যাটে প্রচণ্ড পেইন হইতাসিল ম্যাডাম। আল্ট্রা সোনোগ্রাফির করার পর ডিসকভার হইল, প্যাটে স্প্রিলন্টারের একডা টুকরো রইয়্যা গ্যাসে। তাই সেকেন্ড টাইম অপারেশন কইরতে হইল। অহন ঠিক আসি।'

ডাক্তারের তরফে মারাত্মক অপরাধ। কমপ্লেন হলে, চূড়ান্ত অবহেলার জন্য বাফেলোর সার্জেনকে প্রচুর অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের মানুষরা এ সব অধিকার আদায় করতে জানে না। আর কথা না বাড়িয়ে লিলি বললেন, 'আমি এখান থেকে স্টেটমেন্ট দিচ্ছি রোকেয়া। যাতে

তোমার সম্পর্কে লোকের ভুল ভাঙে। কিন্তু এই প্রসঙ্গ নিয়ে তুমি মিডিয়ার কাছে আর মুখ খুলবে না, ক্যামন?'

ও প্রান্তে রোকেয়া বোধহয় আন্দাজ করেছে, লাইনটা তিনি কেটে দেবেন। তাই ও বলল, 'ম্যাম, লাইনটা ছাইড়েন না। হোনেন, আফনেরে কিছু ছবি পাঠাইতাসি। দ্যাখলে বুঝতে পাইরবেন, মায়ানমার গর্ভমেন্ট মুখে আফনেগো যা কইতাসে, কাজে তার কুনও লক্ষণ নাই।'

লিলি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার তা মনে হচ্ছে কেন?'

'মায়নমার গর্ভমেন্ট মুখে কইত্যাসে রোহিঙ্গাগো দ্যাশে ফিরাইয়া নিব। কিন্তু অহনও রাখাইন থেইক্যা দলে দলে লোক পাঠাইতাসে বাংলাদ্যাশে। রোজ নৌকা কইর‍্যা ক্যারাভাঁন আইতাসে ছ্যাফ নদীর উপর দিয়া। বুড়া-বুড়ি আর মাইয়্যাগো কিছু কইত্যাসে না। কিন্তু পোলাপান দ্যাখলেই ছুইড়া ফ্যালাইয়া দিতাসে ছ্যাফ নদীতে। দুধের শিশুরেও ছাড়ে নাই ম্যাম। সেই ছবি তুলসে আমার এনজিওর ফোটোগ্রাফার। দ্যাখলে আফনের চোখ ফাইট্টা পানি বাইর হইয়্যা আইসব। পাঠামু?'

ইউনিসেফে শিশু কল্যাণের দায়িত্বে রয়েছেন লিলি। দৃশ্যটা চিন্তা করে তিনি আঁতকে উঠলেন। বাচ্চাদের উপর মায়ানমার আর্মির ক্রোধের কারণটা কী, বুঝতে পারলেন না? জিজ্ঞাসা করায় রোকেয়া বলল, 'রোহিঙ্গা পপুলেশন যাতে না বাড়ে, তাইর জইন্য বাচ্চাগুলানরে অরা মাইর‍্যা ফ্যালতাসে। প্রেগনেন্ট বউ-ঝি দ্যাখলেও হ্যাগো একই ট্রিটমেন্ট। এই ভায়োলেন্স বন্ধ করা দরকার ম্যাম।'

ফোনেই লিলি বুঝতে পারছেন রোকেয়া খুব উত্তেজিত। ঘনঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ওকে শান্ত করার জন্য তিনি বললেন, 'ছবিগুলো তুমি তাড়াতাড়ি পাঠাও। ইউনিসেফের একজিকিউটিভ বোর্ডের মিটিং আছে, দু'দিনের মধ্যে। রোহিঙ্গাদের প্রবলেম নিয়েই। আমি ছবিগুলো মেম্বারদের দেখাতে চাই। এখন ছাড়ি, কেমন?' বলে লাইন কেটে দিলেন লিলি।

বাম কিম কৌতূহলী চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে লিলি অল্প কথায় জানালেন, মায়নমারের আর্মি কী ধরনের অত্যাচার চালাচ্ছে বাচ্চাদের উপর। স্টেটলেস মানুষের সংখ্যা কীভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বিশ্বের এক প্রান্তে... দূর প্রাচ্যে একদল রোহিঙ্গা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে নৌকো করে। তাচ্ছিল্য করে তাদের বলা হচ্ছে, বোট পিপল। বিশ্বের আরেক প্রান্তেও, বাসে করে অথবা হেঁটে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে একদল হন্ডুরান। তাদের দলটাকে বলা হচ্ছে, ক্যারাভাঁন। বোট পিপল আর ক্যারাভাঁনের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ইউনিসেফ কর্তাদের সবার মুখে চিন্তার ভাঁজ। একটা চতুর্থ বিশ্ব গড়ে উঠতে যাচ্ছে এই দেশহীন, নাগরিকত্বহীন মানুষদের জন্য। ওদের কে বোঝাবে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় পাওয়া কতটা কঠিন।

বাম কিম বললেন, 'একটা খবর শুনলে আপনার ভাল লাগবে না ম্যাডাম। কালই ইন্টারপোলের এক অফিসারের কাছে খবরটা পেলাম। হন্ডুরাস থেকে যে লোকগুলো দেশ ছেড়েছিল, তারা এল সালভাদোর পেরিয়ে মেক্সিকোয় ঢুকে পড়েছে। তাদের উপর মেক্সিকো পুলিশ খুব নিষ্ঠুর আচরণ করছে। একটু আগে টিভিতে আমি দেখে এলাম।'

এ রকমটা যে হবে, লিলি আগেই আন্দাজ করেছিলেন। হন্ডুরাস সরকারের চরম ব্যর্থতা এই মানুষগুলো দেশত্যাগী হতে বাধ্য করেছে। কিন্তু মেক্সিকোতে ঢুকেও ওঁরা কী করবেন? মেক্সিকো সরকারের অর্থনেতিক অবস্থা খারাপ। দেশ ছেড়ে মেক্সিকানরাই আমেরিকায় লুকিয়ে চুরিয়ে ঢুকছে। ওরা হন্ডুরানদের দায়িত্ব নিতে রাজি হবে কেন? মার্কিন মিডিয়া অবশ্য আগেভাগেই বলে দিয়েছে, হন্ডুরানদের আসল টার্গেট হল আমেরিকায় পৌঁছনো। যদি তাই হয়, তা হলে কী ভয়ানক পরিস্থিতি! একটা দেশের মানুষ একটু ভালোভাবে দিন গুজরানের জন্য, দুটো দেশ টপকে তৃতীয় দেশে ঢোকার চেষ্টা করছে। সেনা, পুলিশ, গুলি, গোলা-বারুদ... কোনও কিছুরই পরোয়া করছে না। কতটা দিশাহীন হলে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে

এমনটা করতে পারে? বাম কিমের মুখে খবরটা শুনে লিলি টিভি চালিয়ে দিলেন। এনবিসি বা সিএনএন কী বলছে শোনার জন্য।

প্রথমেই পর্দায় যে ছবিটা ভেসে উঠল, তা দেখে আঁতকে উঠলেন লিলি। হেলিকপ্টার থেকে নেওয়া শট। মেক্সিকোর বর্ডারে কোনও একটা শহরের রাস্তায় বিশাল জমায়েত। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করছে হন্ডুরানরা। জনতার একেবারে সামনের সারিতে কিছু টিনএজ ছেলে মেয়ে। তাদের পিছনেই শিশু কোলে মহিলারা। তাদেরও অনেক পিছনে শক্তসমর্থ পুরুষরা। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ লাঠি চার্জ করার সাহস পাচ্ছে না। বাচ্চা ছেলে-মেয়ে আর মহিলারা আহত হবেন বলে। জমায়েতে লোক দেখে লিলি অবাক হয়ে বললেন, 'কত লোক হন্ডুরাস ছেড়ে চলে আসতে চাইছে মি. কিম?'

বাম কিম উত্তর দিলেন, 'আন্দোলনটা শুরু করেছিলেন মাত্র চারজন। রাজধানী তেগুসিগালপার বাস ডিপোতে গিয়ে তাঁরা ফেসবুকে একটা পোস্ট করেন। এই অপদার্থ দেশে আমরা আর থাকছি না। আমাদের সঙ্গে আর যাঁরা দেশত্যাগ করতে চান, তাঁরা বাস ডিপোতে চলে আসুন। প্রথম যে বাসটা ছাড়ে সালভাদোরের দিকে, তাতে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন ছিলেন। কিন্তু সেদিনই সোশ্যাল নেট ওয়ার্কিং সাইটে পোস্টটা ভাইরাল হয়ে যায়। ম্যাডাম, কমেন্টেটররা বলছিলেন, এল সালভাদোরে প্রায় চার হাজার হন্ডুরান ছিলেন। মেক্সিকো বর্ডারে মিছিল পৌঁছনোর পর না কি সেই সংখ্যাটা বেড়ে ছয় হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।'

টিভির পর্দায় জমায়েত দেখে লিলির মনে হল, সংখ্যাটা ওইরকমই হতে পারে। কিন্তু এ কী! মিছিলে হঠাৎ হুড়োহুড়ি শুরু হল কেন? লিলি দেখলেন, পিছনের দিক থেকে লাঠি, আর সামনের দিক থেকে জল কামান চার্জ করে পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। লাঠির আঘাতে প্রচুর মানুষ রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছেন। মহিলা ও শিশুরা রাস্তা থেকে নেমে ক্ষেতের

আলপথ দিয়ে দৌড়চ্ছেন। টিভির ক্যামেরা সেই দৃশ্য তোলার জন্য পিছু ধাওয়া করেছে। সামনেই ছোট একটা নদী। সেই নদীর ঢাল দিয়ে উঠে আসছে ছয় সাত বছরের একটা মেয়ে। তার ঠিক পিছনেই হঠাৎ কাঁদানে গ্যাসের খট করে একটা শধ। সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। ক্যামেরা থেমে গেছে। পর্দা জুড়ে শুধু মেয়েটার আতঙ্কভরা মুখ। তার পরনের পোশাক ছিন্নভিন্ন।

টিভি দেখতে দেখতে এক মুহূর্তের জন্য লিলির চোখের সামনে সব আবছা। পর্দায় দেখা ওই মেয়েটাকে আগে কোথাও তিনি দেখেছেন। কিন্তু কোথায়, সেটা তিনি মনে করতে পারলেন না। বোধহীন শূন্য চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন ফ্রকপরা মেয়েটির দিকে।

(এগারো)

ঘরে গাঢ় অন্ধকার। শুধু ডিজিটাল ঘড়ির লাল আলোটা জ্বলছে। প্রতি সেকেন্ডে সময় বদলাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে আড়চোখে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ইমন দেখল, রাত প্রায় দুটো বাজে। আউট হাউসের একটা রুমে ওদের ঠাঁই হয়েছে। পাবলিক স্টোরেজের বেসমেন্টে যে ঘরটায় ওরা থাকত, তার থেকে অনেক ভাল। বাথরুমে স্নান করতে ঢুকে, প্রথমে সেটা ওরা টের পায়। সুন্দর বাথটব, কমোড, তাকে রাখা নানা সুগন্ধি সাবান, শ্যাম্পু, বডিলোশন, এমন কী গিজারও আছে। প্রায় দু'দিন ওরা কুত্তার মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। বাথটবে সুগন্ধি জলে শুয়ে থাকার সময় পলাশছ্যারের উপর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেছিল ইমনের। জীবনে এই রকম একটা পর্যায় আসবে, ও ভাবতেও পারেনি। জিহাদিরা সবসময় কুরবানির কথা বলে। ধর্মযুদ্ধে যদি কোনওদিন জেতে, সারা বিশ্ব ইসলামিক রাষ্ট্রে ভরে গেলে, তার পর জীবনটা এমন আরামে কাটাতে পারবে কী না, সে কথা কখনও কেউ ওদের বলেনি।

ওদের আশ্রয় দেওয়ার আগে রোজিনা ম্যাডাম বলে দিয়েছিলেন, অনুমতি ছাড়া মেন বিল্ডিংয়ে ঢোকা চলবে না। বাড়ি পাহারা দেওয়া ছাড়া, কখনও কখনও ড্রাইভিং করার জন্য এ দিক সেদিক যেতে হতে পারে। ঘণ্টাখানেক আগেও, দু'জন বারান্দায় বসে চুপচাপ ভাবছিল, দ্বিতীয় শর্তটা পালন করবে কী করে? এফবিআই এতক্ষণে ওদের ছবি জোগাড় করে ফেলেছে। হয়তো ফিঙ্গারপ্রিন্টও পেয়ে গিয়েছে। কতদিন আর ওরা লুকিয়ে রাখতে পারবে নিজেদের? কী ভয়ানক অনিশ্চয়তার মধ্যেই না পড়েছে। এ সব ভাবতে ভাবতেই ওরা দেখতে পেল, মেন বিল্ডিংয়ের আলোগুলো একে একে নিভে গেল। তার পর এমন হু হু করে বাতাস বইতে লাগল, দু'জনে বাধ্য হয়ে ঘরে ঢুকে এসেছে। আলাদা বেডে কম্ফর্টারের ভিতর সেঁধিয়ে গিয়েছে। এই আরামটুকু কতক্ষণ স্থায়ী হতে পারে, ইমনের কোনও আন্দাজ নেই। রাত পোহালেই হয়তো এফবিআই অথবা জিহাদিদের কেউ এসে দরজার সামনে দাঁড়াতে পারে।

অন্ধকারে চোখ খুলে রেখেই ইমন জিজ্ঞেস করল, 'কী করা যায়, ক তো চিরাগ? রাক্কার হেড কোয়ার্টার্সে কি আমাগো একবার খবর দেওয়া উচিত?'

সিরিয়ার অন্য শহরগুলো থেকে তাড়া খেতে খেতে এখন একমাত্র রাক্কা শহরের শিবিরই বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে জিহাদিরা। আমেরিকানদের আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে পারছে না, আইএস। গতকাল আউটহাউসে বসে সারাদিন টিভির দিকে নজর রেখেছে ইমন। তখন পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে চিরাগ। টিভিতে ইমন দেখেছে, দু'তিনদিন আগে সিরিয়ায় আমেরিকান সেনারা প্রায় দেড় হাজার জিহাদিকে মেরে ফেলেছে, রিমোট কন্ট্রোলে উড়ন্ত ড্রোন থেকে বোমা ফেলে। ড্রোন মারফৎ আক্রমণ করার জন্য আমেরিকানদের আর লোকক্ষয় হচ্ছে না। অন্য দেশের জন্য অহেতুক লড়াই করতে গিয়ে আমেরিকানরা মারা যাচ্ছে বলে, এ দেশে আগে যে চেঁচামেচিটা হচ্ছিল, সেটা এখন বন্ধ। ট্রেনিং ক্যাম্পে কম্যান্ডাররা ওদের বলতেন,

আমেরিকান টিভি চ্যানেলের খবর সত্যি নয়। ওরা নিজেদের ঢাক পেটায়। অন্য জিহাদিদের মতো ইমনও সে কথা বিশ্বাস করত। কিন্তু আমেরিকায় পা দেওয়ার পর ওর ধারণা বদলাতে শুরু করেছে। ইসলামি বিপন্নতা নিয়ে এই দেশটার কোনও মাথাব্যথা নেই।

চিরাগকে যে প্রশ্নটা করেছিল, ও তার কোনও উত্তর দেয়নি। এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল না কি? তাই ফের ইমন জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুমাইয়া পড়ছস না হি।'

এ বার চিরাগ উত্তর দিল, 'না রে, তোর প্রশ্নটা নিয়ে আমি ভাবছি। তোর কি মনে হয়, রাক্কার হেড কোয়ার্টার্সে খবর দিলে, ওরা কেউ আমাদের উদ্ধার করার রিস্ক নেবে?'

ইমন বলল, 'আমার তা মনে হয় না। একজন সিরিয়ান বা ইরাকির জন্য হ্যারা যা করত, আমাগো জন্য তার কিছুই কইরব না। আমরা অহন না ঘর কা, না ঘাট কা। মোস্ট ইম্পরট্যান্ট থিং, এই দ্যাশ থেইক্যা হ্যারা আমগো বাইর কইরব কী কইর‍্যা? আমরা কানাডা দিয়া ঢুকসিলাম। ওই রুট ধইর‍্যাই আমাগো ফিরতে অইব। কিন্তু এফবিআই নিশ্চয়ই নজর রাখতাসে। বর্ডার ক্রস করার আগেই অরা আমাগো ধইর‍্যা ফেলব।'

'তৌফিকের সাথে একবার কন্টাক্ট করলে ক্যামন হয়, বল তো? ও একটু সিমপ্যাথেটিক। ওর কাছ থেকে একটা সাজেশান পাওয়া যেতে পারে। মেক্সিকান বর্ডার দিয়ে পালালে কেমন হয়?'

'কিন্তু তৌফিকরে আমরা পামু কোথায়? আমার মনে হয়, একটু রিস্কি হইয়া যাইব। টিভিতে অবশ্য কইল, পাবলিক স্টোরেজ থেইক্যা শুধু মাত্র একজনই অ্যারেস্ট হইসে। হ্যায় ইমাদ খামিস। তৌফিকের কথা কিন্তু কয় নাই।'

'সবই ঠিক আছে। কিন্তু টিভিতে এও বলেছে, দুই টেররিস্ট পলাতক। একজনের হাতে চোট আছে। এই পয়েন্টটাই ডেঞ্জারাস। তুই লক্ষ করছিলি

কী না, জানি না। রোজিনা ম্যাডাম যখন আমাদের সাথে কথা বলছিলেন, তখন তোকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমার ডান হাতে গ্লাভস কেন? এখন তো তেমন ঠান্ডা পড়েনি? তুই একটা উত্তর দিয়েছিলি বটে, কিন্তু উনি কনভিন্সড হননি। আমি তো তখন ভয় পেয়ে গেছিলাম, তোকে আবার গ্লাভস খুলতে না বলেন। তোকে আমি অ্যালার্ট করে দিচ্ছি ইমন, এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কিন্তু সাবধানে ডিল করতে হবে।'

চিরাগের অনুমানটা যে সঠিক, ইমন মনে মনে তা সমর্থন করল। রোজিনা ম্যাডামকে যে এড়িয়ে চলতে হবে, ও তা বুঝে গেছে। কিন্তু গোদের উপর বিষফোঁড়া, সকালের দিকে এ বাড়ির কোর্ট ইয়ার্ডে ওর এমন একজনকে চোখে পড়েছে, যাকে দেখে ও চমকে উঠেছিল। আরে, এই তো সেই ইন্ডিয়ানটা, কালকেতু নন্দী, যাকে খুন করতে ওকে পাঠানো হয়েছিল নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে। নায়গারার লা কুইতা হোটেল থেকে লোকটাকে ওরা ফলো করেছিল। পলাশ ছ্যার আর রোজিনা ম্যাডামের সঙ্গে যখন কালকেতু লোকটা হোটেলের লবিতে দাঁড়িয়েছিল, তখন প্রথম ওঁকে ভাল করে দেখে। ওঁদের কথাবার্তায় ইমন বুঝে যায়, পলাশ ছ্যার বাংলাদেশি এবং যথেষ্ঠ ধনী। দ্বিতীয়বার ওঁরা চোখে পড়েন মাঝরাস্তায় রেস্ট এরিয়ার কফিশপে। স্টার বাকস-এর লাইনে ইমন যেচে আলাপ করে পলাশছ্যারের সাথে। বাংলাদেশি পরিচয় দেওয়ায়, ভাবতেও পারেনি, ভদ্রলোক নিজের নেমকার্ড এগিয়ে দেবেন। ইমন এমন একটা ভাব করেছিল, খুব কষ্টের মধ্যে আছে। ভাগ্যিস, অভিনয়টা করেছিল। তাই আজ, চরম দুর্দিনে পলাশছ্যারের বাসায় কম্ফর্টারের তলায় শুয়ে রয়েছে।

অন্ধকার ঘরে খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ। মুজাহিদ্দিন জীবনে ওরা বাঙ্কারে শুতে অভ্যস্ত। গোলাগুলি আর বোম্ব ব্লাস্ট-এর শধ শুনেও ঘুমোতে ওদের অসুবিধে হত না। কিন্তু নিউ জার্সির এই বাড়িটা নিঃঝুম। বাইরে থেকে শুধুমাত্র সোঁ সোঁ শধ ভেসে আসছে বাতাসের। টিভিতে ওয়েদার ফোরকাস্ট

বলেছে, কাল সকালের দিকে বৃষ্টি হবে। তাপমাত্রা নেমে যাবে শূন্যের নিচে। এই রকম একটা প্রতিকূল মরশুমে যদি পলাশছ্যার আশ্রয় না দিতেন, তা হলে কি হত ভাবতেই শিউরে উঠছে ইমন। কিছুক্ষণ আগে রাক্কায় যোগাযোগ করবে কি না, এ নিয়ে ওর মনে দ্বন্দ্ব ছিল। তখন মনে হয়েছিল, ওদের একজন শিকার একই বাড়িতে আছে, এই খবরটা যদি রাক্কার হেড কোয়াটার্সে ও জানায়, তা হলে ওখান থেকে অর্ডার আসবে, কাফেরটাকে এখুনি শেষ করে দাও। মৃত্যুটা যেন এমন পৈশাচিক হয়, আর পাঁচটা কাফের ইয়াদ রাখে। কিন্তু তারপর?

এই প্রশ্নটার কোনও উত্তর রাক্কা দেবে না। বুঝে নিতে হবে। পালিয়ে আসতে পারলে ইসলামের কাজে লাগো। না হলে শহিদের মতো মৃত্যু বরণ করো। শুয়ে শুয়ে কথাটা ভাবার সময়, ইমন ততটা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল না, যতটা হত ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থাকার সময়। এরপর? এরপর? এই দুটো শধ বারবার ওর মাথায় হাতুড়ি মারতে শুরু করল। না, না, অতঃপর আগুপিছু না ভেবে এখন থেকে কোনও কাজ ইমন আর করবে না। প্রতি মুহূর্তে নিজের মনকে প্রথম প্রশ্নটা করবে, ‘কেন?’ তার পরের প্রশ্নটা নিয়ে ভাববে, ‘এরপর?’

এই দুটো প্রশ্নই ব্রাত্য জিহাদিদের ক্যাম্পে। কথাটা এতদিন ওর মনে হয়নি। কিন্তু গত দু’দিনে প্রশ্ন দুটো কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। কম্যান্ডাররা কালকেতু লোকটাকে খুন করতে বলেছিল। কেন বলেছিল, অনেক ভেবে, অনেক আলোচনা করেও চিরাগ আর ইমন কোনও উত্তর খুঁজে পায়নি। কালকেতুর সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য ওরা জানে না। শুধু শুনেছে, লোকটা না কি একটা বই লিখেছে, যাতে ইসলামকে অপমান করেছে। কিন্তু মানুষটাকে দেখে ওদের মনে হয়নি, এমন একটা জগতে বাস করে, যেখানে ইসলামকে অপদস্থ করার মতো কোনও কাজ করতে পারে।

শুয়ে থাকার সময় হঠাৎ ইমনের মনে হল, অহেতুক খুন খারাপির মধ্যে নিজেদের জড়ানোর কি আর প্রয়োজন আছে? দরকার নেই জিহাদিদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখার। একবার যখন বেরিয়ে এসেছে, তখন আর ওই নিষ্ঠুর জগতে গিয়ে ঢুকবে না। অনেকক্ষণ ধরে কথাটা ও মনে নাড়াচড়া করতে লাগল। কথাটা মন খুলে চিরাগকে বলবে কি না, ইমন ঠিক করতে পারল না। চিরাগ যদি ওকে গদ্দার বলে! যদি বলে, 'ছি: ইমন, তোর মনে যদি এই ছিল, তা হলে পাঁচটা বছর নষ্ট করলি কেন?'

চোখের পাতা জোড়া লাগছে না ইমনের। সকালের দিকে সিকিউরিটি গার্ডকে দিয়ে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন পলাশছ্যার। হাতে কয়েকটা একশো ডলারের নোট গুজে দিয়ে বলেছিলেন, 'ট্যাহাগুলা রাখো, তোমাগো কাজে লাগব।'

এত ব্যস্ত একটা মানুষ, তবুও খুঁটিনাটি কত দিকে তাঁর নজর। ভেবে মনটা খুব নরম হয়ে গেছিল ইমনের। পল্যাশছ্যার বিশ্বাস করে নিয়েছেন, ওদের কাছে টাকাপয়সা কিছু নেই। আসলে টাকা পয়সার প্রয়োজন আপাতত ওদের নেই। দরকার শুধু একটা নিরাপদ আশ্রয়। রোজিনা ম্যাডাম যদি তাতে বাধ সাধেন, তা হলে কিছু করার নেই। চিরাগ বলছিল, এক মিনিটে তাঁকে খতম করে দিতে হবে। আজ থেকে এক সপ্তাহ আগেও কথাটা ভাবতে ইমনের বুক কাঁপত না। কিন্তু নোটগুলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় ওর মনে হল, কোনও পরিস্থিতিতেই ও পলাশছ্যারের কোনও ক্ষতি হতে দেবে না। এমন কিছু করবে না, যাতে উনি কষ্টে বা বিপদে পড়তে পারেন।

ঠিক এই সময়টায় ফুঁপিয়ে কান্নার শধ শুনতে পেল ইমন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শধটা থেমেও গেল। চিরাগ ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। কিন্তু চিরাগের মতো পাষাণ মনের ছেলে ঘুমের ঘোরেও কাঁদবে বলে ওর মনে হল না। পাঁচ বছর আগে কাবুলের ট্রেনিং ক্যাম্পে ওর সঙ্গে আলাপ

হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনওদিন ওকে কাঁদতে দেখেনি ইমন। কম্যান্ডারদের হাতে রাইফেলের গুঁতো খেয়েও ও জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থেকেছে। চোখে জল আসার মতো অনেক ঘটনা দেখে ইমন যখন সরে গেছে, তখন চিরাগের মুখে বিজাতীয় উল্লাস লক্ষ করেছে। পাশ ফিরে উল্টোদিকের বিছানার দিকে তাকিয়ে ইমন অবাক হয়ে গেল। চিরাগ দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ও কম্ফর্টার ছেড়ে বেরিয়ে এল। হেঁটে গিয়ে পাশের বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করল, 'কী হইসে চিরাগ?'

চিরাগ বলল, 'এখনই একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখলাম ইমনভাই।'

'বাড়ির কাউরে নিয়া স্বপ্ন?'

'হ্যাঁ। দেখলাম, করিমগঞ্জে আমাদের বাড়ির কাছে কুশিয়ারা নদীর কিনারে গুলি গোলা চলছে। আম্মি এসে আমাকে বলল, হিন্দুরা তোর আববুরে মেরে ফেলেছে। ওদের তুই ছাড়িস না চিরাগ। বন্দুক আর বটিটানিয়ে দৌড়ে যা। অন্তত একটা মুন্ডু কেটে আমার কাছে নিয়ে আয়।'

কসোভোর ক্যাম্পে থাকার সময় শেষবার করিমগঞ্জের খবর নিয়েছিল চিরাগ। তখন বলেছিল, ওদের অসমে না কি খুব অশান্তি চলছে। হিন্দুরা না কি মুসলিমদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিচ্ছে। ওর পরিবারকেও না কি কারা হুমকি দিয়েছে। একবার ভীষণ ক্রোধে চিরাগ বলেও ফেলেছিল, 'হিন্দু মৌলবাদীরা কিন্তু ভাল করছে না ইমন।' দেশ নিয়ে নিজে কোনও ভাবনা-চিন্তা করত না বলে ইমন তখন বলত, 'ছাইড়্যা দে। দ্যাশ নিয়া ভাইব্যা আমরা কী করুম? ভুইল্যা যা।' কিন্তু ও যে ভুলে যায়নি, তার প্রমাণ, এ ধরনের স্বপ্ন দেখা। বোধহয় ওর অবচেতন মনে, এই রকম একটা আশঙ্কা ঘোরাফেরা করে।

চিরাগ বলল, 'ভুল করেছি। বিরাট ভুল করেছি ইমন। জানোয়ার জিহাদি এজেন্টদের বিশ্বাস করে মারাত্মক ভুল করেছি। গত দুইদিন ধরে খালি ভাবছি, এত পড়শুনো করে শেষ পর্যন্ত কী করলাম? ফিজিক্সে এমএসসি

করার পর গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করার জন্য ডাক পেয়েছিলাম। সেইসব ছেড়ে এসে এখন কুত্তার মতোন জীবন কাটাচ্ছি। কী ইডিয়েট আমি, বল দেখি।'

শুনে চমকে উঠল ইমন। ওর লেখাপড়ার কেরিয়ার এত ভাল, কই, আগে কখনও তো বলেনি। ও কি সত্যি কথা বলছে? চিরাগকে বিশ্বাস করা কঠিন। ইমন শুনেছিল, রাইফেল শ্যুটিংয়ে না কি একবার স্টেট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল চিরাগ। চেষ্টা করলে ইন্ডিয়ার হয়ে এশিয়ান কম্পিটিশনেও যেতে পারত। ওর তো শ্যুটার হওয়ার কথা। কেন জিহাদি হওয়ার কথা ভাবল? কে ওর মাথায় এসব ঢোকাল? চিরাগের দিকে তাকিয়ে ইমন অবশ্য একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল, জিহাদি জীবন থেকে বেরিয়ে আসা সম্পর্কে ও যা ভাবছে, চিরাগও সেই লাইনে চিন্তা করছে। ও বলল, 'করিমগঞ্জে একবার ফোন করবি না হি?'

মুখ তুলে তাকিয়ে চিরাগ বলল, 'কী করে?'

'আমার লগে তৌফিকের ফোনডা আসে।'

'আগে তো আমাকে বলিসনি! দে, ফোনটা দে।'

ফোন খোঁজার জন্য ঘরের লাইট জ্বালাতে গিয়েও কী ভেবে নিজেকে সংযত করল ইমন। বাইরে থেকে কারও যদি নজরে পড়ে! অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে, কিট ব্যাগ থেকে ও ফোনটা বের করে আনল। সুইচ টিপে বুঝল, চার্জ শেষ হয়ে গেছে। গত দু'দিন ধরে ফোন ব্যাগেই পড়ে আছে। চার্জ না থাকারই কথা। সে কথা চিরাগকে জানাতে ও বলল, 'আমার কপাল খারাপ। দেশের বাড়িতে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু হয়েছে ইমন। না হলে মনডা উতলা হত না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর ইমন জিজ্ঞেস করল, 'এড্ডু আগে তুই যা কইলি, হেইডা কি মন থেইক্যা কইছস। হঠাৎ তর ক্যান মনে হইল, যা করছস, ভুল করছস?'

চিরাগ বলল, 'কম্যান্ডারদের টর্চার আর সহ্য করতে পারছিলাম না ভাই। তুই তো দেখেছিস, কসোভো ক্যাম্পে মর্টার চালানো শিখতে গিয়ে একবার কী বেধড়ক মার খেয়েছিলাম? এখনও সোজা পা ফেলে হাঁটতে পারি না। আরব জিহাদিরা মুখে এক কথা বলে, কাজে আর এক করে। সিরিয়ায় তুই দেখিসনি, গলায় পা দিয়ে কীভাবে ওরা টাকা আদায় করত অর্ডিনারি লোকদের কাছ থেকে? দেখিসনি, কীভাবে মেয়েগুলোকে বাড়ি বাড়ি থেকে তুলে এনে ওরা রেপ করত। শরিয়েতে কি এইসব কথা লেখা আছে?'

'তুই জিহাদি হইলি ক্যান চিরাগ? তর এত ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার...।'

'হিন্দু মেয়ের সাথে প্রেম হয়েছিল।' জীবন কাহিনি শোনাতে লাগল চিরাগ, 'স্বপ্না আর আমি একই ক্লাসে পড়তাম। লুকিয়ে ওকে নিকাহ করেছিলাম। হিন্দু মৌলবাদীরা এসে আমাদের বাসা থেকে স্বপ্নাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। একদিন পরই ও সুইসাইড করে। হিন্দুরা এসে আমাদের বাসা তছনছ করে। আমাকে মেরেই ফেলত, যদি না কুশিয়ারা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আমি পালাতাম। গুয়াহাটিতে এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে উঠলাম। একদিন ঘরে বসে ল্যাপটপে কাজ করছি। হঠাৎ একটা ওয়েব লিঙ্ক পেলাম। দু'চারদিন পরে বুঝলাম, ওটা মুজাহিদ্দিনদের ওয়েব লিঙ্ক। তখন মুসলমানদের উপরও আমার রাগ। এই কারণে রাগ, ওরা কেন আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল না? এইভাবে এক মাসের মধ্যে আমি জিহাদি হয়ে গেলাম।'

চিরাগ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। মুখে আঙুল দিয়ে ওকে আর কিছু বলতে মানা করল ইমন। জানালার পাশে কিছু নড়াচড়া হতে দেখেছে। নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে নেমে এসে পা টিপে টিপে ও জানালার দিকে এগোল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে জানালার পাল্লাটা ও অল্প সরিয়ে দেখল, লম্বা লম্বা পা ফেলে কেউ জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার পরনে সাদা পোশাক। হঠাৎ সে অন্ধকারে ভ্যানিশ হয়ে গেল।

(বারো)

নিউ জার্সিতে মিঠাস বলে একটা গুজরাতি রেস্টুরেন্টে খেতে এসেছে কালকেতু আর সুদীশ। সন্ধে ছ'টা-সাড়ে ছ'টা বাজে। নিরামিষ এই রেস্টুরেন্টটা যে খুব চালু, ভিড় দেখলেই বোঝা যায়। খাদ্যরসিকরা বেশিরভাগই গুজরাতি অথবা দক্ষিণ ভারতীয়। খাবারের তালিকাতেও তাদেরই পছন্দের ছাপ। হয় ব্যাসন দিয়ে তৈরি নোনতা, নয়তো নারকেল তেল দিয়ে ভাজা বড়া-ধোসা। কালকেতুর কোনওটাই পছন্দের নয়। কাউন্টারের ঠিক উপরে খাবারের ছবি দেখতে দেখতে ও একবার ভাবল, পুরি-ভাজি খাবে। কিন্তু পুরির সাইজ দেখে ও পিছিয়ে গেল। রোজিনা ডিনারে মেক্সিকান কুইজিন খাওয়াবেন। ভর সন্ধেয় দুটো বড় বড় পুরি খেলে পেটে আর জায়গা থাকবে না। রাতে আর খেতে ইচ্ছে করবে না। তাই ও দহিবড়ার অর্ডার দিল। সুদীশ অবশ্য পাওভাজি খেতে চাইল। অর্ডার দিয়ে সুদীশ বলল, 'মুক্তিযুদ্ধের সময়কার যে ছবিটা তুই আমার কাছে পাঠিয়েছিলি, সেটা কিন্তু তোদের রমাদার তোলা না।'

শুনে চমকে উঠল কালকেতু। কী বলছে সুদীশ!!

সকালে সুদীশ ফোন করে বলেছিল, লিওঁ থেকে নিউ জার্সিতে এসেছে। মেট্রো পার্ক স্টেশনের কাছাকাছি এক হোটেলে উঠেছে। অবাক হয়ে কালকেতু জিজ্ঞেস করেছিল, 'হঠাৎ তুই এখানে?'

সুদীশ বলেছিল, ওর এক মাসতুতোভাই এই নিউ জার্সিতে থাকে। পনেরো বছর এখানে কাটানোর পর ভাই সদ্য গ্রিনকার্ড পেয়েছে। সেই আনন্দে পার্টি। শুনে একটু খটকা লেগেছিল কালকেতুর। সামান্য একটা পার্টির জন্য সুদীশ ফ্রান্সের লিওঁ থেকে নিউ জার্সিতে আসবে, বিশ্বাস করতে ওর মন চায়নি। কিন্তু সুদীশ যখন বলল, কাল সকালবেলাতেই ও ওয়াশিংটন

চলে যাবে, ওখানে আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরোর (এনসিবি) একটা ওয়ার্কশপে অংশ নেওয়ার জন্য, তখন কালকেতু আর কোনও প্রশ্ন করেনি।

ইন্টারপোল অফিসারদের না কি কিছু বাধা-নিষেধ আছে। ওঁরা যার-তার বাড়িতে যেতে পারেন না। প্রোটোকলে বাঁধে। পলাশভাইয়ের বাড়িতে তাই সুদীশ যেতে চায়নি। কাছাকাছি মিঠাস বলে এই রেস্টুরেন্টে ওকে ডেকে নিয়েছে কালকেতু। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলছে। কলকাতা থেকে বেরনোর আগেই শিউলিদিদিকে খুঁজে বের করার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সব কথা সুদীশকে ও জানিয়েছিল। টুলটুলের দেওয়া ছবি আর রমাদার লেখার ফোটো কপিও পাঠিয়ে দিয়েছিল। সুদীশ বোধহয় কিছুর সন্ধান পেয়েছে। আর সেটা বলার জন্যই ও এত উদগ্রিব।

ছবিটা তোদের রমাদার তোলা না। শুনে বিস্ময় কাটিয়ে কালকেতু বলল, 'তুই কী করে সিওর হলি?'

সুদীশ বলল, 'দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। যে ধরনের ক্যামেরায়, এই ছবি তোলা সম্ভব, সত্তরের দশকের গোড়ায় আমাদের কাগজের ফোটোগ্রাফারদের কাছে তা ছিলই না। আমাদের ইন্টারপোলের একটা ফোরেনসিক ডিভিশন আছে জার্মানির কোলন শহরে। সেখানে এক্সপার্টরা বলে দিতে পারেন, ছবিটা কোন ধরনের ক্যামেরা থেকে তোলা হয়েছে। কতদিনের পুরনো। কত হাইট থেকে তোলা... এইসব খুঁটিনাটি। তোর পাঠানো রমাদার ছবিটা আমি পাঠিয়েছিলাম কোলনে। নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যায় কি না, তা জানার জন্য। একটা রেসপন্স পেয়েছি। তাই তোকে জানাতে এলাম।'

'রমাদার ছবিটা কোন ক্যামেরা থেকে তোলা হয়েছিল?'

'এই ছবিটা তোলা হয়েছিল ক্যাননের এফ-ওয়ান সিরিজের ক্যামেরা থেকে। হাই স্পিড মোটর ড্রাইভ ক্যামেরা, সবে বেরিয়েছে। সেকেন্ডে

সাতটা করে ফ্রেম দিত। তখনও ওই মডেলের ক্যামেরা ভারতে আসেনি। তাই ধরে নিতে হবে, রমাদা মোটেও ওই ছবিটা তোলেননি।'

'তা হলে রমাদার কাছে ওই ছবিটা এল কী করে?'

কাউন্টারে পাওভাজি আর দহিবড়া রেডি। সেটা দেখে সুদীশ বলল, 'দাঁড়া, বলছি। এখানকার রেস্টুরেন্টে তো আপনা হাত, জগন্নাথ। কাউন্টার থেকে ট্রে নিজেদেরই নিয়ে যেতে হবে। চল, আগে সেটাই করি।'

দু'জনে খাবারের ট্রে নিয়ে এসে কোণের দিকে একটা টেবলে খেতে বসল। পাওভাজি মুখে দিয়ে সুদীশ বলল, 'তুই খুব অবাক হচ্ছিস, তাই না? তা হলে পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে বলি। লিওঁতে আমাদের ইন্টারপোলের হেড কোয়াটার্সে একটা বিশাল লাইব্রেরি আছে, যেখানে ওয়ার্ল্ডের সব নামী কাগজের পুরনো ফাইল পাওয়া যায়। আমেরিকান সেকশনের যিনি লাইব্রেরিয়ান, তাঁর নাম জন বেটো। কলকাতা থেকে তাঁকে মেল করে আমি লিখেছিলাম, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের অপারেশন সার্চলাইট শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাওয়া পর্যন্ত এক বছর সময়ের পেপার কাটিংস আমার দরকার। জানতে চেয়েছিলাম, ছয় বছরের একটা মেয়ে সেই যুদ্ধের সময় মারাত্মক আহত হয়েছিল। তার ছবি নিউ ইয়র্ক টাইমস ছেপে ছিল। মেয়েটির সম্পর্কে যদি কোনও কাগজে কিছু লেখা হয়ে থাকে, তা হলে সেটা আমার কাজে লাগবে। প্রায় একমাস বেটোর কাছ থেকে কোনও উত্তর নেই। দু'তিন দিন আগে আমার কাছে একটা পার্সেল এল। তাতে দেখি, বেটো এমন কিছু তথ্য পাঠিয়েছেন, যা আমার সন্দেহটা তো গাঢ় করেইছে, ভবিষ্যতে তোরও ভীষণ কাজে লাগবে।'

দহিবড়া মুখে দিয়ে কালকেতু বলল, 'কিন্তু ছবিটা রমাদার তোলা না, এটা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না ভাই। যতদূর জানি, ওই ছবিটার জন্য রমাদা বেস্ট ওয়ার পিকচারের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। রমাদা মিথ্যে কথা বলে প্রাইজ নেবেন? আমার মনে হয় না।'

সুদীশ বলল, 'তোকে কে বলেছে, ওই ছবিটার জন্য রমাদা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন?'

'রমাদার ছেলে টুলটুল।'

'ও ঠিক জানে না। গুগল সার্চ করে আমি দেখেছি। রমাদা বেস্ট ওয়ার পিকচার তোলার অ্যাওয়ার্ড পান ওয়ার্ল্ড ফোটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে। অন্য একটা ছবির জন্য। সেটাও আমি খুঁজে পেয়েছি। সাবজেক্টটা অসাধারণ। বুড়ি গঙ্গার চরে পাক সেনারা মেরে ফেলে রেখে গেছে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে। ডেডবডিগুলো পড়ে আছে। বিষণ্ণ বিকেল, নদীর ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ডেডবডির একটু দূরেই অপেক্ষা করছে একদল শকুন। দিনের আলো নিভে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। তার পর মৃতদেহ ঠুকরে ঠুকরে খাবে। ওয়ার্ল্ড ফোটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে গিয়ে ক্লিক করিস। তা হলে দেখতে পাবি, সেরা একশোটা যুদ্ধের ছবির মধ্যে রমাদার এই ছবিটা আছে।'

'ছবিটা কোন সালে তোলা?'

'ওই একাত্তরেই। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর। ছবি আর রেলিভ্যান্ট কিছু পেপার কাটিং একটা পেন ড্রাইভে ভর্তি করে নিয়ে এসেছি। পড়লেই সব বুঝতে পারবি ভাই। দেখবি, ওই মেয়েটার ছবি প্রথম ছাপা হয় নিউ ইয়র্ক টাইমসে ষোলোই ডিসেম্বর ১৯৭১। অর্থাৎ কলকাতায় তোদের কাগজে ছবিটা ছাপা হওয়ার এক সপ্তাহ আগে। ছবিটা অ্যাকচুয়ালি তোলেন নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিচার্ড গাটম্যান বলে একজন ফোটোগ্রাফার। আমার মনে হয়, ঢাকায় কোথাও রিচার্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছিল রমাদার। তখন ওঁর কাছ থেকে কিছু ছবি উনি চেয়ে নিয়ে তোদের কাগজে পাঠিয়ে ছিলেন।'

ফোটোগ্রাফাররা নিজেদের মধ্যে ছবি আদান প্রদান করেন, সেটা অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু রমাদার মতো একজন শ্রদ্ধেয় ফোটোগ্রাফার

অন্যের ছবি নিজের বলে চালিয়ে দেবেন, এটা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছিল কালকেতুর। ছবি আগে ছাপা হওয়া মানে গ্যারান্টি দেয় না, রিচার্ড গাটম্যানেরই তোলা। এমনও হতে পারে, ঢাকা থেকে ছবিটা কলকাতায় পাঠাতে দেরি করেছিলেন রমাদা। অথবা ওঁর ছবিটা পেয়েও নিউজ এডিটর দু'চারদিন ফেলে রেখে দিয়েছিলেন, ছাপাননি। তখন কাগজের নিউজ এডিটর কে ছিলেন, মনে করার চেষ্টা করল কালকেতু। অমিত চৌধুরী... ওই রকম একটা ছবি তিনি ফেলে রাখতেই পারেন না। বিশেষ করে, সদ্য যুদ্ধ লেগেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ভারত জেনারেল মানেকশ'র নেতৃত্বে তখন সবে সেনাবাহিনি পাঠিয়েছে ঢাকায়!

যুক্তিটা দিতেই সুদীশ বলল, 'টুলটুল ছবির সঙ্গে রমাদার যে চিঠিটা তোকে দিয়েছিল, সেটা কি তুই ভাল করে পড়েছিস কালকেতু? ইন বিটুইন লাইনস পড়লে বুঝতে পারতি, রমাদা কোথাও ক্লেইম করেননি, ছবিটা উনি তুলেছিলেন। দাঁড়া, চিঠিটা আমার মোবাইলেই আছে। খাওয়া শেষ হলে, পড়ে তোকে শোনাচ্ছি। তা হলে বুঝতে পারবি।'

খেতে খেতে কালকেতুও মনে করার চেষ্টা চালাল। রমাদার লেখা চিঠিটা ও এক-দু'বার পড়েছে। কিন্তু কখনও ওর মনে ছবিটা নিয়ে প্রশ্ন জাগেনি। রিটায়ার করার পর রিপোর্টার বরুণদা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা বই লিখেছিলেন। তাতে রমাদার দক্ষতা নিয়ে উনি প্রচুর প্রশংসা করেছেন। লিখেছেন, 'তখন রমার বয়স কম, ব্যাটাচ্ছেলে সবসময় আমেরিকান আর ব্রিটিশ রিপোর্টারদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। মাঝে মধ্যে ওঁদের আলোচনা শুনে এসে আমাদের টিপসও দিত। পাকিস্তান যে খুব তাড়াতাড়ি স্যারেন্ডার করবে, সেই খবরটা ও-ই প্রথম আমাকে এনে দিয়েছিল। তখন ওকে অবিশ্বাস করে খবরটা করিনি। করলে আমরা একটা অল ইন্ডিয়া এক্সক্লুসিভ করে ফেলতে পারতাম। পরে এ নিয়ে রমা খুব আক্ষেপ করত।'

খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে এসে সুদীশ পকেট থেকে মোবাইল বের করল। সুইচ টিপে চিঠিটা বের করে ও বলল, 'দাঁড়া, তোর অসুবিধে হবে। আমিই তোকে পড়ে শোনাচ্ছি। শোন, যা বলেছি, ঠিক কি না?'

সুদীশ লেখাটা পড়তে শুরু করল। 'রমাদা লিখেছেন, এই ছবিটা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার। পাক সেনারা তখন নির্বিচারে হত্যা করছিল, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী আর গ্রামের মোড়লদের। বাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বউ-ঝিদের ধর্ষণ করছিল। তখন তাদের সাহায্য করছিল রাজাকাররা। পাক সরকারের সুবিধাভোগী সেই সব বাঙালি-অবাঙালি, যারা সংখ্যায় খুব অল্প। রাজাকাররা চাইছিল না, মুক্তিযুদ্ধ সফল হোক। যুদ্ধের সময় এই রাজাকাররা সাংবাদিকদেরও ভয় দেখাচ্ছিল। এমন কোনও ছবি বা লেখা পাঠানো যাবে না, যাতে পাকিস্তানের বদনাম হয়। ব্রিটিশ বা আমেরিকান সাংবাদিকরা অবশ্য রাজাকারদের পাত্তা দিতেন না। সেটা বুঝে আমি ফরেন রিপোর্টারদের একটা দলের সঙ্গে ভিড়ে গেছিলাম। ওদের সাহায্য নিয়ে কলকাতার অফিসে ছবি পাঠাতাম।'

'পূর্ব পাকিস্তানে আমি ঢুকেছিলাম, যশোহর দিয়ে। একাত্তরের ডিসেম্বরে ইন্ডিয়ান আর্মি যুদ্ধ ঘোষণা করার পরই বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে আমিও রওনা হয়েছিলাম ঢাকার দিকে। সেদিনই ঢাকায় প্রথম বোমা পড়েছিল। রাজাকারদের এড়ানোর জন্য আমরা গাড়িতে করে নদীর ধার দিয়ে এগোচ্ছিলাম। তখন শুনলাম, কাছেই একটা গ্রামের কালীমন্দিরের আশপাশে চারটে বোমা পড়েছে। ক্ষয়ক্ষতির টাটকা ছবি তোলার জন্য আমরাও দৌড়লাম সেদিকে। গিয়ে আহতদের মুখে শুনলাম, পাক সেনারা বোমা ফেলবে এই আশঙ্কায় গ্রামের মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল কালীমন্দিরে। এই আশায় যে, জাগ্রত কালী মা ওদের বাঁচাবেন। তেমনটা

আদৌও হয়নি। মন্দির অক্ষত ছিল, কিন্তু আশ্রিতরা অনেকেই মারা গেছিলেন।'

'আমরা যখন ধ্বংসের ছবি তুলতে ব্যস্ত, সেইসময় নদীর ধারে মন্দিরের পিছনদিকে মেয়েটাকে প্রথম দেখতে পায় রিচার্ড গাটম্যান বলে একজন আমেরিকান ফোটোগ্রাফার। মেয়েটার পায়ের পাতা থেকে পিঠ, হাতের পিছনের দিকের অংশ এবং পোশাক আগুনে ঝলসে গেছিল। আতঙ্কে উলঙ্গ অবস্থায় ও রাস্তা দিয়ে দৌড়োচ্ছিল। 'জ্বইলা গেল, জ্বইল্যা গেল' বলতে বলতে মেয়েটা একটা সময় রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে। রিচার্ড ওর ওই অবস্থা দেখে, ক্যামেরা কাঁধ থেকে নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায়। তার পর ওকে কোলে তুলে নিয়ে ঝাঁপ দেয় নদীর জলে। ও জলে ঝাঁপ না দিলে মেয়েটা হয়তো সেদিনই মরে যেত। রিচার্ডকে দেখে সেদিনই শিখেছিলাম, পেশার থেকেও মানবিক কর্তব্যকে কতটা অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।'

'মেয়েটাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে রিচার্ড রওনা দিয়েছিল ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের দিকে। আমরা অনেকেই ছবি তোলার লোভে ওই গ্রামেই থেকে গেছিলাম। রাতে পূর্বানী হোটেলে যখন ওঁর সঙ্গে দেখা হল, তখন জানলাম, মেয়েটাকে ও রেড ক্রশের হাতে তুলে দিয়েছে। হয়তো বেঁচে যাবে। কিন্তু কবে সুস্থ হবে, ডাক্তাররা গ্যারান্টি দিতে পারেননি। হোটেলের ঘরেই ছবি ডেভেলপ করে রিচার্ড প্রিন্ট শুকোতে দিয়েছিল। সেগুলো দেখিয়ে আমাকে বলেছিল, তোমার যেটা পছন্দ, বেছে নিয়ে, সেটা তোমার অফিসে পাঠিয়ে দিতে পারো।'

'সারা দিনে আমি চারটে রোল ছবি তুলেছিলাম। কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে ঢাকায় স্টুডিয়োগুলো তখন সব বন্ধ। ডেভেলপ করার সুযোগ নেই। পরদিন ইস্টার্ন কম্যান্ডের এক কর্ণেলের হাত দিয়ে রোলগুলো আমি কলকাতায় পাঠাই। সেই ছবি আমাদের অফিসে পৌঁছেছিল আরও দিন তিনেক পর। রিচার্ডের সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয়নি। কেননা, পরে হোটেলে

গিয়ে ওঁর খোঁজ করতে শুনি, চেক আউট করে গেছে। অনেক পরে পাকিস্তানি এক ফোটোগ্রাফারের কাছে শুনেছিলাম, রিচার্ড না কি প্রতিজ্ঞা করেছিল, জীবনে আর কখনও যুদ্ধের ছবি তুলবে না।'

মোবাইল থেকে রমাদার চিঠিটা সুদীশ পড়ে শোনাচ্ছে। কালকেতুর মনে পড়ল, প্রথম যেদিন ও চিঠিটাতে চোখ বোলায়, সেদিন টুলটুল বলেছিল, 'এই ছবিটা ভাঙিয়ে বাবা জীবনে অনেক কিছু করতে পারতেন। কিন্তু উনি তা করেননি। স্টুডিয়োতে আগুন লাগার পর ছবিটা আমি যখন উদ্ধার করি, তখনও বাবা বেঁচে। স্মৃতিশক্তি খানিকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই ছবিটা দেখিয়ে কোনও প্রশ্ন করলে কেন জানি না বাবা এড়িয়ে যেতেন। কেমন যেন সংকোচ বোধ করতেন উত্তর দিতে।' টুলটুলের কথাগুলো কালকেতু তখন বুঝতে পারেনি। এখন ওর মনে হচ্ছে, হয়তো সুদীশই ঠিক। ছবিটা নিজের তোলা নয় বলে, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে হয়তো রমাদা কিছু বলতে গ্লানিবোধ করতেন। সত্যিই, চিঠিতে রমাদা কোথাও স্পষ্ট করে লিখে যাননি, ছবিটা উনিই তুলেছিলেন।

চিঠি পড়া শেষ করে সুদীশ বলল, 'কেন আমার সন্দেহ হয়েছিল জানিস। রিচার্ড গাটম্যান ওই ছবিটার জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিলেন। অরিজিনাল আর এক্সক্লুসিভ ছবি না হলে উনি অত বড় অ্যাওয়ার্ড পেতেন না। তুই আমায় ভুল বুঝিস না ভাই। রমাদাকে খাটো করছি না। উল্টে তোকে একটা দিশা দিতে চাইছি। বলতে চাইছি, যে মেয়েটাকে তুই খুঁজছিস, তার সম্পর্কে সবথেকে ভাল বলতে পারবেন রিচার্ড গাটম্যান। উনি আগে থাকতেন নিউ ইয়র্কে। রিটায়ার করার পর এখন আমেরিকার কোথায় আছেন, কেউ জানে না। এটা তোকেই খুঁজে বের করতে হবে।'

'তোদের মিসিং পারসন্স ডিভিশনও বলতে পারল না?'

'না। আসলে কী জানিস, নিরুদিষ্ট মানুষ সম্পর্কে কেউ যদি ব্যাক্তিগতভাবে কিছু জানতে চায়, ইন্টারপোল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

ওদের কাছে অনুরোধটা যেতে হবে কোনও দেশের পুলিশ ফোর্সের কাছ থেকে। নামেই গালভারী অর্গাইজেশন। ইন্টারপোল আসলে ইন্টারন্যাশনাল পুলিশের একটা লাইব্রেরি। সারা বিশ্বের ক্রাইম রেকর্ড ওখানে পাবি। এমন একটা জায়গা যা, শুধু তথ্য আদান-প্রদান করে। আমি জানি, তোর ব্যাপারটা নিয়ে যদি ফের বেটোর কাছে কোনও রিকোয়েস্ট করি, তা হলে উনি রেসপন্ড করবেন না।'

'তোর ভাল লাগছে ইন্টারপোলে কাজ করতে?'

'একদম না। নামেই বিরাট, কিন্তু শুনে তুই অবাক হবি, কাউকে অ্যারেস্ট করার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের নেই। আমরা একটা পিস্তল পর্যন্ত ক্যারি করতে পারি না। আমাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অপরাধী আর উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করা এবং সেটা লিওঁর হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেওয়া।'

আরও কী বলতে যাচ্ছিল সুদীশ। এমন সময় ওর মোবাইলটা বেজে উঠল। চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় ও বলল, 'হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফোন! দাঁড়া, কী রিকোয়েস্ট করবে কে জানে?'

রেস্টুরেন্টের ভিতর প্রচুর লোক খেতে খেতে কথা বলছে। ফোনে কিছু শুনতে পাবে না, ভেবে সুদীশ মিঠাস থেকে বেরল। সিগারেট ধরানোর জন্য কালকেতুও বাইরে বেরিয়ে এল। সামনে বিরাট পার্কিং স্পেস। তাতে অসংখ্য গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমেরিকায় গাড়ি ছাড়া জীবনযাপন অসম্ভব। আশপাশে আরও কয়েকটা ফুড জয়েন্ট। ডোমিনো'স, আইহোপ, পাণ্ডা এক্সপ্রেস, পাপা জোন্স, স্পোর্টস পাব, স্টার বাকস। রোজিনা আর পলাশভাইয়ের কল্যাণে, এই ক'দিনে ওই সব নামী রেস্টুরেন্ট আর কফি শপে কালকেতুর পা দেওয়া হয়ে গেছে। মিঠাসের ঠিক পাশেই একটা মোগলাই খানার দোকান। কাচের দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে ধূমপান করতে করতে হঠাৎ কালকেতুর চোখে পড়ল, পলাশভাইয়ের আশ্রিত দু'জন... ইমন

আর চিরাগ দোকানটা থেকে বেরিয়ে আসছে। ইচ্ছে করেই ও মুখ ঘুরিয়ে নিল, যাতে ওই দু'জনের চোখে না পড়ে।

বাইরে ঠান্ডা বাতাস বইছে। জ্যাকেট না পরে বেরনোটা ওর ঠিক হয়নি। কালকেতু ফের মিঠাসের ভিতরে ঢুকে যাবে কী না ভাবছে, এমন সময় সুদীশ এসে বলল, 'দিন দুই তিনেক বোধহয় আমাকে নিউ জার্সিতে থেকে যেতে হবে রে।'

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

সুদীশ বলল, 'এইমাত্তর হেড কোয়াটার্স থেকে খবর পেলাম, নিউ জার্সিতে দু'জন জিহাদি কোনও বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছে। তাদের খুঁজে বের করতে হবে। দু'জনই খতরনাক টাইপের। একজনের নাম রফিকুল আলম অন্যজন ফিরহাদ আলি। আমাকে একবার লোকাল এফবিআই অফিসে যেতে হবে। ওরা কিছু ইনপুট দেবে।'

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'তুই কেন? এখানে ইন্টারপোলের আর কোনও অফিসার নেই?'

সুদীশ বলল, 'আছেন। কিন্তু আমাকে রেখে দেওয়ার কারণ, যে দুই টেররিস্ট এখানে লুকিয়ে আছে, এফবিআই খবর পেয়েছে, তারা দু'জনই বাংলা ভাষায় কথা বলে।' কথাগুলো বলতে বলতেই সুদীশ পকেট থেকে পেনড্রাইভটা বের করে কালকেতুর হাতে ধরিয়ে দিল। তার পর বলল, 'এই পেন ড্রাইভে অনেক তথ্য আছে। সেগুলো ভাল করে দেখে নিয়ে, তুই কাল একবার নিউ ইয়র্ক টাইমস অফিসে যা। গিয়ে দ্যাখ, রিচার্ড গাটম্যান সম্পর্কে কোনও খবর পাস কি না। তোর সঙ্গে আমার দু'একদিনের মধ্যে ফের কথা হবে।'

(তেরো)

ইন্দো-পাক স্টোর থেকে দরকারি কয়েকটা জিনিস কিনতে গেছে ইমন। মাথায় হুডি-র ঘোমটা দিয়ে। যাতে চট করে কেউ ওকে চিনতে না পারে। ওখানেই হঠাৎ ওর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল রোহিত দাশগুপ্তের। ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে। তাতে কলা, আঙুর, আপেল, স্ট্রবেরির প্যাকেট, আর কিছু সবজি। এখানে উইক এন্ড ছাড়া বাজার করার সময় কেউ পায় না। আজ শনিবার, তাই হয়তো রোহিত শপিং করতে বেরিয়েছে। আম্মির কাছে বহুদিন আগে ইমন শুনেছিল, চাকরিসূত্রে রোহিত এখন নিউ জার্সিতে। বাঁকের মুখে দেখা হতেই ট্রলি দাঁড় করিয়ে রোহিত বলে উঠল, 'এই ইমন, তুই এহানে?'

ছোটবেলার বন্ধু, ঢাকায় আমোদপুরে ওরা একই পাড়ায় থাকত। বছর পাঁচ-ছয় পর দেখা। রোহিত ওর সম্পর্কে কতটুকু জানে, ওর জিহাদি জীবন সম্পর্কে আদৌও কিছু জানে কি না, ইমনের কোনও আন্দাজ নেই। ও পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুই এহানে কোথায় থাকস, আগে ক।'

রোহিত বলল, 'ইসেলিন বইল্যা একডা জায়গায়। বছর দুয়েক আসি। আরে, তর সম্পর্কে মাসিরে জিজ্ঞাস কইরলে ঠিক কইতে পারে না। তুই আমেরিকার কোথায় থাকস, কোন কোম্পানিতে চাকরি করস। মেসো... মানে তর বাবা একবার লস অ্যাঞ্জিলেসের কথা কইসিল। তর সাথে এইভাবে দেখা অইব, ভাইবতেও পারি নাই। তুই বদলি হইয়া এহানে কবে আইলি?'

প্রশ্নটা শুনে ইমন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। মাসি... মানে রোহিত ওর আম্মির কথা বলছে। আম্মি ওর সম্পর্কে জানেটাই বা কী? শুধু জানে, ও বিদেশে বিরাট চাকরি করে। মাসে মাসে টাকা পাঠায়। ঢাকায় ওর বাড়ির লোকেদের কাছে যা শুনেছে, রোহিত সম্ভবত ততটাই জানে। অস্বস্তি কাটিয়ে, হুডি-র ঘোমটা খুলে হেসে ইমন বলল, 'এই তো মাস ছয়েক হইল, এহানে আইসি। আগে সাড়ে চাইর বসর লস অ্যাঞ্জিলেসে সিলাম।

খুব ভাল সিলাম রে। এহানকার মতোন ঠান্ডা ওহানে পইড়ত না। হুনলাম, এহানে না কি এন্ড অফ দ্য ইয়ার বরফ পড়ে?'

'ঠিক শুনছস।' তার পরই রোহিত কাকে যেন ডাকল, 'রিয়াঙ্কা, এদিকে এসো। দরকার আছে।'

ট্রলির পাশে এসে দাঁড়াল একটা বিবাহিতা মেয়ে। তার হাতে রুটির প্যাকেট। রোহিত পরিচয় করিয়ে দিল, 'হ্যায় আমার ওয়াইফ রিয়াঙ্কা। আর রিয়াঙ্কা... এ হইল ইমন। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। স্কুল আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আমরা একই ক্লাসে পড়তাম।'

দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে রিয়াঙ্কা বলল, 'রোহিতের মুখে আপনার সম্পর্কে এত কথা শুনেছি যে, খুব কিউরিসিটি হত, কবে আলাপ হবে। প্রতিদিনই একবার-দু'বার আপনার কথা ও তুলবেই।'

ইমন জিজ্ঞেস করল, 'কী এত কয় আমার সম্পর্কে?'

'এই যেমন... আপনি কলেজের টপার ছিলেন। আপনার ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার। আপনার মতো মন কারও হয় না। আপনার লাভ স্টোরিও আমার সব জানা হয়ে গেছে। যাক, দেখা যখন হয়েই গেল, তখন আপনাকে ছাড়ছি না। চলুন, আমাদের বাসায় চলুন। লাঞ্চ করে তবে যাবেন।'

শুনে মনে মনে হাসল ইমন। রোহিত যা বলছে, সব ঠিক। কিন্তু কলেজের টপার এখন তালা ভাঙার জাদুকর। একজন হ্যাকার। কুখ্যাত জিহাদি, যাকে এফবিআইয়ের কোনও অফিসার শুট অ্যাট সাইট করে দেবে। একটা মতাদর্শের পিছনে না ছুটলে রিয়াঙ্কার চেয়েও বেশি সুন্দরী একটা মেয়েকে নিয়ে ওর একইভাবে শপিং করে বেড়ানোর কথা। তার নাম কুসুম। একটা সময় যাকে বেহেস্তের নূর বলে মনে হত ওর। কষ্টটা বুকে চেপে রেখে ইমন বলল, 'আমার সম্পর্কে রোহিত বাড়াইয়া বাড়াইয়া যা ক'য়, বিশ্বাস কইরেন না ভাবী।'

রিয়াঙ্কা বলল, 'আপনি কিন্তু আমার কথার উত্তর দিলেন না ইমনভাই।'

রোহিতও সায় দিয়ে বলল, 'চল না। বাসায় গেলে আরও দুইডা চেনা মুখ দেখতে পাবি। এ বার দুগগা পুজার সময় ঢাকায় গিয়া বাবা আর মাকে নিয়া আইসি। তরে দেখলে হ্যারাও খুউব খুশি অইব। তর সাথে দেখা হইয়া ভালাই হইল, বুঝলি। থ্যাঙ্কস গিভিংয়ের সময় অফিস থেইক্যা কয়েকডা দিন ছুটি পাওয়া যাইব। তহন মা-বাবারে লস অ্যাঞ্জিলেস নিয়া যাওয়ার প্ল্যান করতাসি। কোন কোন জায়গা মাস্ট ভিজিট... তর কাছ থেইক্যা জাইন্যা নিম।'

সর্বনাশ! লস অ্যাঞ্জিলেসে কখনও যায়নি ইমন। হলিউড আর বেভারলি হিলস-এর নাম শুধু শুনেছে। রোহিত যদি ডিটেলে জানতে চায়, তা হলে ও খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। বাবা-মাকে নিজের কাছে নিয়ে এসে রোহিত ছেলের কর্তব্য করছে। ভিসার নিয়ম অনুযায়ী অন্তত মাস ছয়েক ওঁদের একটানা আমেরিকায় রাখতে পারবে। কিন্তু আম্মি-আববার প্রতি ও কী কর্তব্য করল, ভাবতেই ইমন অস্বস্তিতে পড়ল। কেটে পড়ার জন্য ও বলল, 'আইজ না ভাই। অন্য কোনওদিন তর বাসায় যামু। মেসে আমার রুম পার্টনার আমার জইন্য বইস্যা আসে। আমি ফিইর‍্যা না গেলে ও বাইর হইতে পারব না।'

কথাটা রোহিত পাত্তা দিল বলে ইমনের মনে হল না। ট্রলিটা বউয়ের হাতে দিয়ে ও বলল, 'তুমি যা কেনার কিইন্যা নাও রিয়া। আমরা দুই বন্ধু রেস্টুরেন্টে গিয়া একডু বসি।'

কথাটা রোহিত মন্দ বলেনি। রিসেন্টলি ও ঢাকা থেকে ঘুরে এসেছে। রোহিতের কাছ থেকে দাদামশায় এবং দেশের কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। ভেবে ইমন রাজি হয়ে গেল। ও বলল, 'চল, তাইলে।'

ক্যাফেটোরিয়ার দিকে হাঁটার সময় রোহিত জিজ্ঞেস করল, 'তুই অহনও টয়োটা কোম্পানিতেই আছস, না কি অন্য কোথাও জয়েন করছস।'

রোহিতের ভুল ভাঙানোর দরকার নেই। ইমন বলল, 'না, অন্য কোথাও জয়েন করি নাই। আমার এইচ ওয়ান বি ভিসা এক্সপায়ার হইতে আর ছয়মাস বাকি। তার পর কী করুম, জানি না।'

'যা-ই করস, ঢাকায় ফিইর‍্যা যাওনের কথা ভাবিস না ভাই? আমোদপুরের পাট তুইল্যা দিয়া রিসেন্টলি ঢাকার ধানমন্ডিতে একটা দোতলা বাড়ি কিনসি। মা-বাবারে আনার লইগ্যা দ্যাশে গিয়া দেহি, কী অশান্তি। জেনারেল ইলেকশন আইতাসে। ঢাকায় রোজ রোজ মিটিং-মিছিল। একদিন আওয়ামী লিগের সাপোর্টাররা বাইরায়, তো নেক্সড ডে গণ ফোরাম বা জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের পোলারা। রাস্তায় রিকশার ভিড়, যহন তহন বোম ব্লাস্ট। দশ-বারো দিনের মধ্যে আমি অতিষ্ঠ হইয়া গেসিলাম। কালীপুজোর আগে পলাইয়া আইসি। আমি ভাই ঠিক করসি, দ্যাশে আর ফিরুম না। যে কইর‍্যাই হোক, এহানে গ্রিন কার্ড ম্যানেজ করুম।'

দেশ নিয়ে তেমন কোনও মাথাব্যথা নেই ইমনেরও। দেশ বলে যে কিছু ওর আছে, সেটা দেশ ছেড়ে চলে আসার সময়ই ও ভুলে গেছে। জিহাদি মওলানারা এমনভাবে তখন ওর ব্রেন ওয়াশ করেছিলেন। ওঁরা বলতেন, ইসলাম বিপন্ন। ওঁদের কথা তখন ইমনরা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু পাঁচ-পাঁচটা বছর জিহাদিদের সঙ্গে বাস করার পর এক ঝটকায় ওর নেশা কেটে গেছে। এখন ওর মনে হচ্ছে, ঝুট, সব ঝুট। আসলে বিপন্ন আরব জগৎ। একটা জিগির তুলে ওরাই মুসলিম বিশ্বের একাংশকে দলে টানছে। রোহিতের কোনও সমস্যা নেই। টিকে থাকতে পারলে, ও একদিন গ্রিন কার্ড পেয়ে যাবে। কেননা, ওর নাম রোহিত দাশগুপ্ত। কিন্তু ইমন মুসলমান। ওকে লুকিয়ে চুরিয়ে থাকতে হবে। মুসলমানরা এতটাই ধিক্কৃত এ দেশে।

ক্যাফেটোরিয়ায় নানা ধরনের স্ন্যাকস পাওয়া যায়। খাবারের ছবিগুলো দেখে ইমনের পেটে খিদে মোচড় দিয়ে উঠল। আসলে বেকারির তৈরি কিছু খাবার কেনার জন্যই ও ইন্দো-পাক স্টোরে এসেছিল। ও জানত, এখানে

বাংলাদেশিদের যাতায়াত বেশি। চেনা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। ইসেলিনে পলাশ ছ্যারের বাড়ির কাছেই একটা ওয়ালমার্ট আছে। ইমন অ্যাদ্দিন সেখানেই টুকটাক জিনিস কিনতে যেত। কিন্তু কপালে লেখা আছে, রোহিতের সঙ্গে দেখা হবে। সেটা খণ্ডাবে কে? ভাগ্যিস, আজ ইন্দো-পাক স্টোরে এসেছিল। রোহিতের কাছ থেকে ঢাকার খবর জানা যাচ্ছে। সুযোগ পেলেই ও প্রশ্ন করবে, জামায়েতিদের সঙ্গে আইএস জঙ্গিদের বন্ডিং কতটা। ঢাকায় কয়েকজন ব্লগারকে জিহাদিরা নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে। সে খবর ওদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক অথবা আল জাজিরা নিউজ চ্যানেল মারফৎ নিয়মিত পায়ইমন।

কাউন্টার থেকে দু'হাতে দুটো ট্রে নিয়ে এসে রোহিত চেয়ারে বসে বলল, 'টার্কিস স্যান্ডউইচ নিয়া আইলাম। খাইয়া দ্যাখ। মনে হয়, তর ভালা লাইগব।'

ট্রে-র দিকে তাকিয়ে পুরনো একটা কথা মনে পড়ল ইমনের। রোহিতের বাবা সুধাংশু দাশগুপ্ত ছিলেন একটা প্রাইমারি স্কুলের টিচার। নুন আনতে ওদের পান্তা ফুরোত। স্কুল লাইফে তো বটেই, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সময়ও ইমনের মনে পড়ে না, রোহিত কোনওদিন টিফিন আনত। আম্মি ওর জন্য যা টিফিন দিত, রোহিতের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ইমন খেয়ে নিত। দিনগুলো যে কী সুন্দর ছিল! টিফিন বক্স খুলে তখন ইমন বলত, 'আম্মি আইজ তর লইগ্যা পরোটা আর গোস্ত পাঠাইসে। খাইয়্যা দ্যাখ, তর ভালা লাইগব।'

স্যান্ডউইচে কামড় দেওয়ার আগে ইমন বলল, 'ভাবী নাই। হ্যারে বাদ দিয়া খাওয়া কী ঠিক হইতাসে?'

রোহিত বলল, 'তাতে কী হইসে? রিয়াঙ্কা বিরাট একডা ফর্দ নিয়া আইসে। জিনিস কিনতে হ্যার খানিকডা সময় লাইগব। ভীষণ আন্ডারস্ট্যান্ডিং মাইয়্যা। ও কিসু মনে কইরব না।'

‘তুই বিয়া করলি কবে?’

‘বছর দেড়েক আগে। বাবার বন্ধুর মাইয়্যা। মা আগেই রিয়ারেপছন্দ কইর‍্যা রাখসিল। ইনফোসিসে আমি চাকরি পাওয়ার পরই মা কইল, বিদেশে তরে একা যাইতে দিমু না। বিয়া কইর‍্যা, বউ নিয়া তবে যাবি। বড়দের কথা ফেইলতে পারলাম না।’

‘রিয়া কি বাংলাদ্যাশের?’

‘না, ইন্ডিয়ার করিমগঞ্জের। মুক্তিযুদ্ধের সময় হ্যার বাবা ঢাকা ছাইড়্যা ইন্ডিয়ায় চইল্যা গেসিলেন। ওহানেই সেটল হইয়া যান। রিয়া লেখাপড়া করসে কলকাতায়। মাস কমিউনিকেশন-এ এমএ। ছাড় হ্যার কথা। তরে দেইখ্যা আমার এত ভাল লাগতাসে, কী কমু। একডা কথা কইলে তুই বিশ্বাস কইরবি না ইমন। আমি যেদিন এইচ ওয়ান বি ভিসা হাতে পাইলাম, হেইদিন প্রথমেই তর কথা মনে পড়সিল। তুই পাশে না থাইকলে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাওয়া সম্ভব অইত না। মনে আসে, লাস্ট দুইড্যা সেমিস্টারের ট্যাহা তুই জোগাড় কইর‍্যা না দিলে, আমারে কলেজ ছাইড়তে অইত।’

হপ্তা দুয়েক আগেও কেউ যদি এ সব কথা বলে ওর মন ভেজানোর চেষ্টা করত, তা হলে তার উপর মারাত্মক ঘেন্না হত ইমনের। চিরাগ নির্ঘাত বলত, হালায় সিস্টেমের দাস। বাড়ি-গাড়ি, বউ-বাচ্চা, মোটা মাইনার চাকরি নিয়া সুখে সংসার করতাসে। এইসব ক্লীব মানুষগুলার বাঁইচা থাকার অধিকার নাই। হ্যাগো খুন করো। হ্যার বউরে তুইল্যা নিয়া গিয়া অত্যাচার করো। জিহাদিদের শেখানো হয়েছে, খুন বা বলাৎকার করার সময় কষ্ট দাও। কিন্তু এখন ইমন অনেক বদলে গেছে। ও বলল, ‘পুরানা কথা ছাড়। ক, এ বার আমাগো বাড়িতে গেসিলি না হি?’

‘হ্যাঁ, তগো চৌধুরী মঞ্জিলে গেসিলাম।’ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে রোহিত বলল, ‘মাসির মুখেই হুনলাম, বহুদিন তুই যোগাযোগ করস না।

তবে প্রতি মাসে নিয়ম কইর‍্যা না হি ট্যাহা পাঠাস।'

'দাদামশায়ের খবর কিছু জানস?'

'খুব ভালা না রে ইমন। মাসি তরে কইতে মানা করসিল। তবে তুই যহন হুনতেই চাইতাছস, তহন কই। ট্রায়াল শ্যাষ হইয়া গ্যাসে। কালীপুজার পরদিনই কোর্টের ভারডিক্ট বাইর হওনের কথা। মেসোর মুখে হুনলাম, দাদামশায়ের ফাঁসির সাজা হইতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট হ্যায় কেসে তিনজনের ফাঁসি দিসে। মেসোর শরীলও ভাইঙা গ্যাসে। মাসি কইতাসিল, মেসোর প্রোস্টেটে ক্যানসার ধরা পড়সে। হ্যায় খুব দিশাহারা হইয়্যা গ্যাসে। ছোটবেলায় তর সাথে যহন চৌধুরী মঞ্জিলে যাইতাম, তহন বাড়িডা থেইক্যা বাইরাতে ইচ্ছা কইরত না। এত সুন্দর সিল। কিন্তু অহন পোড়োবাড়ি হইয়্যা গ্যাসে... গিয়া বেশিক্ষণ বইসতেই পারলাম না। ছুডিপাইলে এগবার ঢাকায় ঘুইর‍্যা আসিস ইমন। মাসির পাশে গিয়া তর দাঁড়ানো দরকার।'

দাদামশয় মণিরুল চৌধুরীর বয়স এখন আশি বছর! ক'দিনই বা উনি বাঁচবেন? তবুও, ওঁর ফাঁসির সাজা হতে পারে! দেশবাসীরা ওঁর গায়ে রাজাকারের তকমা এঁটে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনাদের না কি উনি সমর্থন করেছিলেন। রাজনীতিতে একেক জনের বিশ্বাস একক রকম থাকতেই পারে। কিন্তু সেই অপরাধে পাঁচ দশক পর ওই অশীতিপরমানুষটা এভাবে মরতে হবে? ভাবতেই মাথায় দপ করে আগুন জ্বলে ওঠার তাপ টের পেল ইমন। মনে পড়ল, ওর জিহাদি হওয়ার পিছনে এটাই সবথেকে বড় কারণ ছিল। মসজিদের উপর রাগ। সমাজ, রাষ্ট্রের উপর রাগ।

জিহাদিদের বুকলেট, ভিডিয়ো ওই সময়টাতেই ঢাকার ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়ছিল। পশ্চিমের দেশের ইসলামি নেতাদের জ্বালাময়ী ভাষণ টানতে শুরু করেছিল ইমনদের মতো কিছু ছাত্রকে। ওঁরা বলতেন, সবকিছু ভেঙে দাও। গুঁড়িয়ে দাও। জিহাদ ঘোষণা করো। মসজিদের অশিক্ষিত মৌলভীরা অ্যাদ্দিন যা বলতেন, তোমার আগের প্রজন্ম... বাপ-ঠাকুর্দারা মাথা নিচু করে তা

মেনে নিতেন। তোমরা নবীন প্রজন্ম, তোমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। প্রশ্ন করতে শেখো। শরিয়তের সম্মান রক্ষা করো। শহিদ হলে আল্লাহ আরও বেশি করে তোমাদের কাছে টেনে নেবেন।

ইমন অ্যাদ্দিন এই স্বপ্নের পিছনে ছুটছিল। বুকের ভিতর তুষের আগুন। দাদামশয়কে যারা জেলে ঢুকিয়েছিল, তাদের কোনওদিন ও ক্ষমা করতে পারবে না। ও ঠিকই করেছিল, আওয়ামি লিগের দুই আঞ্চলিক নেতা, সুপ্রিম কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর আর বিচারপতিকে নিজের হাতে শাস্তি দেবে। ধানমন্ডিতে বোমা বিস্ফোরণের ছকও কষেছিল। কিন্তু সিরিয়ার রাক্কায় ওদের হেড কোয়ার্টারস থেকে গ্রিন সিগন্যাল না আসায় সেই পরিকল্পনা ধামাচাপা পড়ে যায়। কম্যান্ডারকে তখন ইমন এমনও বলেছিল, প্রয়োজনে ফিদাইন অর্থাৎ কি না সুইসাইড বম্বার হয়েও ও ঢাকায় যেতে চায়। কেননা, কসোভোর ক্যাম্পে তখন ওদের কাছে খবর পৌঁছেছিল, ঢাকায় ওদের সংগঠন ক্রমশ মজবুত হচ্ছে। চিনাদের কাছ থেকে এক ডজন হাই কোয়ালিটি সুইসাইড জ্যাকেট পাওয়া গেছে। সেইসঙ্গে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও।

এখন অবশ্য পরিস্থিতি পুরো পাল্টেছে। জিহাদিদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর প্রায় একসপ্তাহ কেটে গেছে। ও বা চিরাগ এখনও দলের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। ওরা জানে, জিহাদিরাও ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। গদ্দারির শাস্তি কী, তাও ওরা জানে। পাবলিক স্টোরেজ থেকে পালিয়ে আসার দিন দু'জন খুব বুদ্ধিমানের মতো একটা কাজ করেছিল। নিজেদের আসল পাসপোর্ট, আর ডলারের নোটগুলো নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। রোহিত ওকে আম্মির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে বলছে। ওর পক্ষে দেশে ফেরার সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও, সঙ্গে পাসপোর্ট আছে। একবার চেষ্টা করে দেখতে পারে। রোহিতের মুখের দিকে ইমন তাকিয়ে রইল। তার পর প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ও বলল, 'কুসুমের কোনও খবর জানস না হি রোহিত?'

‘জানুম না ক্যান?’ রোহিতের গলার স্বর হঠাৎ বদলে গেল। ‘হ্যারা অহন আর আমোদপুরে নাই। ধানমন্ডিতে চইল্যা গ্যাসে। মাসির কাছ থেইক্যা ঠিকানা লইয়্যা একদিন হ্যাগো বাসায় গেসিলাম।’

‘কুসুম অহন কী করে?’

‘কুসুম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াইত। কিন্তু মাস দুয়েক আগে চাকরি নিয়া বিদেশে চইল্যা গ্যাসে। হ্যার এক ফুফাতো ভাই না কি এখন বিলকিস সরকারের মন্ত্রী। সে-ই চাকরির ব্যবস্থা কইর‍্যা দিসে। কুসুম অহনও নিকাহ করে নাই। হ্যার আববু এ নিয়া খুব আফসোস করতাসিল আমার কাসে।’

‘হ্যার আববু আমার কথা জিজ্ঞাস করল না?’

‘তেমন কিছু না। তবে, তর সম্পর্কে হ্যার আববুর অনেক কমপ্লেন। তুই বিদেশে চইল্যা আইলি অথচ কুসুমরে কিসু জানাইলি না, ক্যান ইমন? ও তরে এত ভালাবাসত, অথচ তুই ক্যান সম্পর্কডা ছিন্ন করলি ভাই? হেইডা আমার কাছেও রহস্য।’

কুসুমের চেহারাটা ওর চোখের সামনে ভাসছে। দশ বছরের প্রেম। সম্পর্কের সুতোটা ইমন নিজেই একটানে ছিড়ে ফেলেছিল, যেদিন গভীর রাতে বাংলাদেশের পুলিশ দাদামশায়কে টানাহিঁচড়ে করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছিল। দু’দিন পর সেই লাঞ্ছনার ছবি খবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। রাতারাতি চৌধুরী মঞ্জিল হয়ে গেছিল ঘৃণ্য রাজাকারদের বাড়ি। তার অল্পদিনের মধ্যে ইসলামিক স্টেটস-এর এজেন্ট তৈমুর সাহেব ওর দুবাই যাওয়ার টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ির লোকেরা জানত, ও দুবাইয়ে চাকরি পেয়েছে।

স্যান্ডউইচ খাওয়ার ফাঁকেই হঠাৎ রোহিত বলে উঠল, ‘দ্যাখ ইমন, টিভিতে কী কইতাসে, দ্যাখ। বাংলাদেশি দুই টেররিস্ট না হি নিউ জার্সির কোনও বাসায়লুকাইয়া আসে। কী মুশকিল ক তো, হ্যাগোর লইগ্যা আমাগো দ্যাশের বদনাম হইয়া যায়।’

মুখ তুলে ইমন টিভির দিকে তাকাল। নিউজ রিডার বলছে, ‘এফবিআই সোর্স জানাচ্ছে, দুই জিহাদি খুব রিসেন্টলি নিউ জার্সিতে এসে লুকিয়ে রয়েছে। একজনের ডান হাতে চোট-আঘাত আছে। এখানে এসে ওরা বড় ধরনের নাশকতার ছক কষছে। কয়েকদিন আগে ব্রুকলিন ব্রিজের কাছে একটা পাবলিক স্টোরেজে জঙ্গিদের গোপন ডেরায় হানা দিয়ে এফবিআই একজনকে আটক করে। তার কাছ থেকে জানা যায়, ডেরায় আরও দু’জন থাকত। একজন বাংলাদেশি ও অন্যজন ইন্ডিয়ান। দু’জনই আইএস-এর মদতপুষ্ট। কানাডার বর্ডার পেরিয়ে আমেরিকায় ঢুকেছিল। এফবিআই তল্লাশি চালাচ্ছে।’

শুনতে শুনতে বুকের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। রোহিতের কাছে যাতে ধরা পড়ে না যায়, সেই কারণে টিভির দিক থেকে চোখ সরিয়ে ইমন বলল, ‘নিজেরে মুসলমান কইতে এখন লইজ্জা করে রে রোহিত। কে জানে, পুলিশ আমাগো মেসে আইস্যাও উৎপাত কইরব কি না। আমার পাসপোর্টও তো বাংলাদ্যাশের। তুই হিন্দু আর তর সাথে বউ আসে, তর কিছু হইব না। জানি না, আমাগো কপালে কী আসে। চট কইর‍্যা তুই তর কন্টাক্ট নাম্বারটা দে। পরে তর সাথে যোগাযোগ করুম।’

কোনওরকমে রোহিতের নাম্বারটা লিখে নিয়ে ইন্দো-পাক স্টোর থেকে বেরিয়ে এল ইমন।

(চৌদ্দো)

লিভিং রুমে রোজিনার সঙ্গে আড্ডা মারছেন পলাশভাই। হাতে ড্রিঙ্কসের গ্লাস। সেন্টার টেবলে ক্যাপ্টেন মর্গানের বোতল। রামের এই ব্র্যান্ড খুব প্রিয় পলাশভাইয়ের। ওর মতো পয়সাওয়ালা মানুষরা সাধারণত স্কচ পছন্দ করেন। কিন্তু উনি মানুষটাই অদ্ভুত। কালকেতুকে ঘরে ঢুকতে দেখে পলাশভাই খানিকটা কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে বললেন, ‘আইজ ড্রিঙ্ক করতে

ইচ্ছা হইল, বোঝলেন কাইলকেতুভাই। যা ঠান্ডা পড়সে, লোভ সামলাইতে পাইরলাম না।'

সক্কালবেলায় কালকেতু মোবাইলে দেখেছে পারদ শূন্য ডিগ্রির আশপাশে। রাতের দিকে অবশ্যই মাইনাসে পৌঁছে যাবে। আবহাওয়াবিদরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কাল হালকা বরফ পড়তে পারে। ঠিকঠাক পোশাক চাপালে ঠান্ডাকে অবশ্য ভয় করার কিছু নেই। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য মদ্যপানেরও দরকার নেই। পলাশভাই বোধহয় রোজিনার সঙ্গে কোথাও বেরিয়ে ছিলেন। দু'জনের পোশাকই তা বলে দিচ্ছে। রোজিনা দেখতে এত সুন্দরী, যা পরেন তাই মানিয়ে যায়। এই মুহূর্তে ওঁর পরনে ফারের সাদা লং কোট, সাদা ব্যারেটস ক্যাপ। বলাই বাহুল্য, খুব দামি। আর পলাশভাই থ্রি পিস স্যুটে।

কালকেতু সোফায় বসতেই পলাশভাই বললেন, 'আপনেও দুই প্যাগ মর্গানপ্যাটে দ্যান। ঠান্ডা কোথায় পলাইব, ট্যার পাইবেন না। ম্যাডাম, আপনে সার্ভ করেন তো। এক যাত্রায় পৃথক ফল অইব ক্যান?'

শোনামাত্রই দেরি করলেন না রোজিনা। ড্রিঙ্কস ঢেলে গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনিও বেরিয়ে ছিলেন না কি কালকেতুভাই? ফিরে এসে পলাশ আপনার খোঁজ করেছিলেন। আপনি ছিলেন না।'

গত কয়েকদিন ধরেই কালকেতু লক্ষ করছে, রোজিনা যখন ওর সঙ্গে কথা বলেন, তখন কলকাতার ভাষায়। কিন্তু পলাশভাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালান বাঙাল ভাষায়। এই মহিলাটিকে ও যত দেখছে, ততই ওর শ্রদ্ধা বাড়ছে। রোজিনা পলাশভাইকে পলাশ বলে ডাকেন। কিন্তু পলাশভাই রোজিনাকে বলেন ম্যাডাম। পলাশভাইয়ের সঙ্গে রোজিনার সম্পর্কটা ঠিক কী, এখনও ও বুঝে উঠতে পারেনি। একেক সময় কালকেতুর মনে হয়, মালিক আর কর্মচারীর সম্পর্ক। আবার অন্যসময় ঘনিষ্ঠতা দেখে মনে হয়, ওরা বন্ধুর মতো। বা তার থেকেও বেশি। স্বামী-স্ত্রীর মতো লিভ টুগেদার

করছেন। ওঁদের বোঝাপড়ার রসায়নটা যে খুব মজবুত, সেটা অবশ্য কালকেতু বোঝে।

রোজিনার হাতেও এখন রঙিন গ্লাস। চিয়ার্স জানিয়ে কালকেতু বলল, 'হ্যাঁ, সন্ধেবেলায় আমিও বেরিয়ে ছিলাম। আমার এক বন্ধু এসেছে ফ্রান্স থেকে। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য মিঠাস রেস্টুরেন্টে গেছিলাম।'

শুনে পলাশভাই অসন্তুষ্ট হওয়ার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তে শুরু করলেন, 'না, না কাইলকেতুভাই, হেইড্যা আফনে ঠিক করেন নাই। আমার এত্তবড় বাসা থাকতে আফনে বন্ধুর সাথে বাইরে দ্যাখা কইরবেন ক্যান? বাসায় ডাইক্যা লইতে পাইরতেন। হেইড্যা করা আফনের উচিত হয় নাই।'

কালকেতু বলল, 'আমার এই বন্ধু সুদীশ নাগ ইন্টারপোল অফিসার। ওরা অফিসকে না জানিয়ে কারও বাড়িতে যেতে পারেন না। ওর নিজের মাসতুতো ভাই থাকে নিউ জার্সিতে। সেখানেও ওঠেনি।'

পলাশভাই অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, 'ক'ন কী? ইন্টারপোল! হেইড্যা তো বিশাল অর্গানাইজেশন। হোল ওয়ার্ল্ডের পুলিশ এককাট্টা হয় সেহানে। ভেরি হাই প্রোফাইল জব। আমার সাথে আলাপ করাইয়া দ্যান না ভাই। পরে কোনও কামে লাইগতে পারে।'

কালকেতু হেসে বলল, 'কোনও অসুবিধে নেই। সুদীশ এখন কয়েকদিন নিউ জার্সিতে থাকবে। কোনও একটা হোটেলে ওকে ডেকে নিলেই হরবে। অ্যাকচুয়ালি ও এসেছে, আপনার শিউলিদিদির ব্যাপারে আমাকে হেল্প করতে।'

'হ্যার কুনও সন্ধান পাইলেন?'

অ্যাদ্দিন পর এই প্রথম পলাশভাই প্রশ্নটা করলেন। কালকেতু উত্তর দিতে যাচ্ছিল। মাঝখান থেকে রোজিনা বলে উঠলেন, 'আমরাও কম চেষ্টা করিনি কালকেতুভাই। শিউলিদিদি কোথায় আছেন আমরা জানতে পারিনি ঠিকই। কিন্তু উনি যে বেঁচে আছেন সে সম্পর্কে আমরা সিওর।'

শুনে কালকেতুর কৌতূহল হল। ও জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে সিওর হলেন?'

'এখানে পাঁচ-ছ'জন ফর্চুন টেলার... মানে জ্যোতিষী একই কথা বলেছেন। বুকলিনে খুব নামকরা একজন ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ান আছেন। তিনি মেক্সিকান, নাম মারসেডো সালিনাস। যাকে যা বলেন, মিলে যায়। তাঁর কাছে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত ছুটে আসেন। পলাশকে তাঁর কাছে নিয়ে গেছিলাম। উনি জোর দিয়ে বলেছেন, শিউলিদিদি বেঁচে আছেন। কোথায় আছেন, সেটাও বলে দিতে পারেন। তবে, যা ফি চাইলেন, তার অঙ্কটা শুনে আপনার পলাশভাই পিছিয়ে গেলেন।'

কালকেতু জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, পিছিয়ে গেলেন কেন?'

পলাশভাই বললেন, 'হ্যাগো কথার কোনও গ্যারান্টি নাই। এহানে মেক্সিকান পাড়ায় গেলেই ট্যার পাইবেন, দুই হাইত অন্তর ফর্চুন টেলারের চেম্বার। হক্কলের গায়ে কারুকার্য করা পোশাক। টেবলে রঙিন আলো দিয়া সাজানো-গোজানো একডা খাঁচা। তাইর মধ্যে একডা পাখি বইস্যা থাকে। খাঁচার সামনে প্রচুর ট্যারোঁ কার্ড। তাতে অনেক কিছু আঁকা আর ল্যাখা। ঠোঁটে কইর‍্যা পাখি যে কার্ড আগাইয়া দিব, তাতে যে সিম্বল বা ল্যাখা থাইকব, হেহডাই আফনের ভবিষ্যদ্বাণী।'

কালকেতু হেসে বলল, 'এ রকম জ্যোতিষী তো কলকাতার রাস্তায় আকচার দেখা যায়। খাঁচায় টিয়াপাখি নিয়ে বসে থাকে।'

'ঢাকায়ও কম নাই।' পলাশভাই বললেন, 'তফাৎ হইল গিয়া, মেক্সিকানরা অনেক স্মার্ট। আপনের ট্যাহা পয়সা আসে জানলে, ব্ল্যাক ম্যাজিক দিয়া আফনেরে প্রথমে মেসমোরাইজড কইর‍্যা দিব। একেকজনের এক এক রকম স্টাইল অফ ফাংশনিং। যত্তসব ভণ্ড....চিট।'

বাধা দিয়ে রোজিনা বললেন, 'হেইড্যা কইয়েন না পলাশ। হ্যারা আফনেরে কিন্তু একবার উদ্ধার করসিল।'

উত্তর না দিয়ে পলাশভাই মিটিমিটি হাসছেন। কৌতূহল চেপে না রাখতে পেরে কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল পলাশভাই? কোনও বিপদে পড়েছিলেন?'

'আমার একডা ইম্পরট্যান্ট বিজনেস ফাইল হারাইয়্যা গেছিল। পাওয়া না গেলে এক মিলিয়ন লস হইয়া যাইত। নানা প্যাকনা কইর‍্যা সালিনাস কইয়া দিসিলেন, ফাইলডা আফনের বাড়ির উত্তর দিকে কোথাও আসে। হ, একডা ড্রয়ারে ফাইলডা পাইসিলাম। কী কইর‍্যা কইসিল, জানি না। তবে এইটুকু কইতে পারি, হ্যাগো দ্যাখলে, আফনেগো মতো ইন্টেলিজেন্ট মানুষরা বুজরুকি ধইর‍্যা ফ্যালবেন।'

শুনে রোজিনা গম্ভীর হয়ে গেছেন। মুখটা দেখে মায়া হল কালকেতুর। ম্যাডামকে খুশি করার জন্য ও বলল, 'সবাই কিন্তু বুজরুক নয়। অনেকের আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে।'

'আমার কিন্তু চোখে পড়ে নাই। মেক্সিকান ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ানরা সবকিছুর সাথে কার্স মানে... শাপ জুইড়্যা দেয়। য্যামন, শিউলিদিদি সম্পর্কে কইসিল, ফ্যামিলির কারও শাপ ছিল। হেই কারণে উনি নিখোঁজ। আগে শাপ কাটাইতে অইব। তার লইগ্যা বিশাল খরচ। বিশ্বাস করা যায়, কয়েন? আপা নিরুদ্দেশ হইল যুদ্ধের সময়। ফ্যামিলির কারও শাপে তা হইতে পারে না হি? চিডিংয়ের একডা সীমা আসে।'

কথাগুলো বলে পলাশভাই হাসতে লাগলেন। ওকে হাসতে দেখে রোজিনা আরও চটে গেলেন। এক চুমুকে গ্লাস খালি করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উনি বললেন, 'আমি কিচেনে আছি। ডিনার রেডি কইর‍্যা আফনেগো ডাকুম।'

রোজিনা ম্যাডাম নিজের হাতে মেক্সিকান ফুড তৈরি করে আজ খাওয়াবেন, বলেছিলেন। পর্দা সরিয়ে উনি অদৃশ্য হয়ে যেতেই পলাশভাই

বললেন, 'আমার উপর চেইত্যা গেসে। আসলে ম্যাডাম মেক্সিকানগো নিন্দা সহ্য কইরতে পারেন না। রক্তের সম্পর্ক তো...।'

কালকেতুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তার মানে?'

'আফনেরে কই নাই? হ্যার বাবা মেক্সিকান। মা বাংলাদেশি। হ্যার সাথে আমার পরিচয়... ইট'স আ লং লং স্টোরি। শুইন্যা তাজ্জুব হইয়া যাবেন। যাউক সে কথা। আফনে ক'ন, শিউলিদিদির ব্যাপারে কতডা আগাইলেন?'

ক্যাপ্টেন মর্গানে চুমুক দিতে দিতে কালকেতু মোটামুটি গুছিয়ে বলল, সুদীশের কাছ থেকে কী জানতে পেরেছে। শেষে বলল, 'সবার আগে আমাকে একবার নিউ ইয়র্ক টাইমসের অফিসে যেতে হবে। ওখান থেকে ওয়ার্ল্ড ফোটোগ্রাফারস অ্যাসোসিয়েশনের অফিস। দুটো অফিসই ম্যানহাটনে। আমার মনে হয়, ওই দুটো জায়গায় গেলে কিছু না কিছু ক্লু পাওয়া গেলেও যেতে পারে।'

সোফায় হেলান দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন পলাশভাই। নিউ ইয়র্কের কথা শুনে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'আফনে যদি চান, তাইলে আমিও আফনেরে কম্পানি দিতে পারি। কাইল আমারে বিশেষ একডা কাজে নিউ ইয়র্ক যাইতে অইব। নতুন একডা বিজনেস ভেঞ্চারে নামতাসি, বোঝলেন। আপনেরে কইতে অসুবিধে নাই। অনেকদিন ধইর‍্যা রোজিনা ম্যাডাম চাপাচাপি করতাসিল। তাই রাজি হইয়া গেলাম।'

শুনে কালকেতু উৎসুক চোখে তাকাল। কিছুদিন আগে পলাশভাই নায়গারার চেয়েও বড় একটা ওয়াটার ফলস চট্টগ্রামে বানানোর প্ল্যান করছিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদের জল টেনে নিয়ে গিয়ে। এমন একটা ট্যুরিস্ট স্পট বানাবেন, যা কি না দেখার জন্য সারা বিশ্বের লোক ছুটে যাবে। মাথা থেকে সেটা বোধহয় আপাতত সরে গেছে। নতুন প্ল্যানটা কী, জানার জন্য কালকেতু জিজ্ঞাসা করল, 'বিজনেস ভেঞ্চারটা কি এখানকার জন্য, না বাংলাদেশের?'

‘এহানে। আপনে লক্ষ করসেন কি না, জানি না। নিকি অ্যাডামস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেইক্যা বারবার কইতাসেন, ইল্লিগ্যাল যে সব ইমিগ্রান্টের পোলাপান আমেরিকায় জন্মাইসে, হ্যারা বাবা-মায়ের সঙ্গে থাইকতে পাইরব না। এইডা একডা মেজর পলিটিক্যাল ডিসিশন। আমি তারই ফায়দা তুলুম।’

এখানকার বড় বড় টিভি চ্যানেলগুলোতে এই প্রসঙ্গটা নিয়ে প্রায়ই ডিবেট হচ্ছে, লক্ষ করেছে কালকেতু। অ্যাডামস নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জিতলে অনুপ্রবেশকারী মেক্সিকানদের খুঁজে খুঁজে বের করবেন। আমেরিকার মাটিতে বাচ্চার জন্ম দিয়ে, বাবা-মায়েদের আমেরিকার নাগরিকত্ব পাওয়ার কৌশলটা তিনি রুখবেন। সেইসঙ্গে ভবিষ্যতেও মেক্সিকানদের বেআইনি ভাবে আমেরিকায় ঢুকতে দেবেন না। তেমন হলে মেক্সিকান বর্ডারে ইস্পাতের দেওয়াল তুলে দেবেন। আমেরিকায় দুই একটা স্টেট-এ অ্যাডামস প্রশাসন বাচ্চাদের বাড়ি থেকে তুলেও নিয়ে গেছে। তাতে ডেমোক্র্যাটরা মারাত্মক ক্ষুব্ধ। রোজই টিভিতে তাঁরা তুলোধনা করছেন অ্যাডামসের। ওরা বলছেন, বাবা-মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে বাচ্চাদের আলাদা ক্যাম্পে রাখা শুধু নিষ্ঠুরতাই নয়, বর্বরতা। এই বিতর্কের আবহাওয়ায় পলাশভাই কী ফায়দা তুলবেন, সেটা কালকেতুর মাথায় ঢুকল না।

এমনিতেই আমেরিকায় মেক্সিকান অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কম নয়। এরা জনজীবনে মিশে গেছেন। রাস্তা ঘাটে, শপিং মল, রেস্টুরেন্টগুলোতে এরাই কায়িক পরিশ্রমের কাজগুলো করেন। এঁদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভব। নানা জায়গায় ডেমোক্র্যাটদের মদতে বিক্ষোভ, মিটিং মিছিল হচ্ছেই। রোজ রোজ গ্রেফতারও হচ্ছেন প্রচুর মেক্সিকান। এই অশান্তির পরিবেশেও পলাশভাই ব্যবসায়িক মুনাফার কথা ভাবছেন? কীভাবে? প্রশ্নটা করতেই, পলাশভাই বললেন, ‘প্ল্যানডা আমার না। রোজিনা

ম্যাডামের মাথা থেইক্যা বাইর হইসে। নিউ ইয়র্ক টাইমসে মাস পাঁচেক আগে একডা আর্টিকেল পাবলিশড হইসিল, প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস যে বাচ্চাগুলানরে তুইল্যা আনতাসেন, হ্যাগো রাইখবেন কোথায়? সরকারি জেল বা ডিটেনশন সেন্টারগুলা তো সব ভর্তি হইয়া গ্যাসে? তহনই রোজিনা ম্যাডাম আমারে কইল, চাইল্ড ডিটেকশন সেন্টার কিংবা প্রাইভেট জেল খোলার বিজনেস কইরলে ক্যামন হয়?'

কালকেতু চমকে উঠে বলল, 'প্রাইভেট জেল মানে?'

'হ, এত অবাক হওনের কী আসে?' পলাশভাই গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'এহানে কিছু কোম্পানি হইসে, যারা প্রাইভেট জেল চালায়। সেই কোম্পানিগুলা প্রফিট মেকিংও। এই দ্যাশে জেল মানে তো আমাগো দ্যাশের মতো নরক না। এরা কয় কারেকশনাল সেন্টার। আফনে যে নর্মাল পরিবেশে বাসায় থাকতেন, হেই সুবিধাগুলান জেলেও পাইবেন। ডিটেনশন সেন্টারগুলানও একই রকম। গত তিন-চাইর বসরে ধড়পাকড় এমন বাইড়্যা গেসে, যে সরকারি জেলে আর জায়গা নাই। তাই প্রশাসন অহন প্রাইভেট জেলগুলানরে প্রোমোট করত্যাসে।'

'কিন্তু এই বিজনেস ভেঞ্চারটা খুব রিস্কি না? দাগী অপরাধীদের বন্দি করে রাখা চাট্টিখানি কথা নাকি? প্রাইভেট জেল থেকে কেউ পালিয়ে গেলে, সেই দায়িত্ব কার?'

'অবভিয়াসলি কোম্পানির মালিকের। ঠিক এই কারণেই আমি অ্যাদ্দিন হেজিটেট করতাসিলাম। কিন্তু ইমিগ্রান্ট চাইল্ড ডিটেনশন সেন্টার চালানো অনেক সহজ। আফটার অল, হ্যারা তো ক্রিমিনাল না। হ্যাগো হ্যান্ডেল করা অনেক কম ঝুঁকির। অনেকটা ক্রেশ চালানোর মতো। বা মিডল স্কুলের হোস্টেল। বাচ্চারা খাইব-দাইব, ল্যাখাপড়া কইরব, খেলব... এই তো। তবে হ্যাগো হেলথ কেয়ার-এর ব্যবস্থাটা ভালমতো কইরতে অইব। কেউ য্যান কইতে না পারে, আমার সেন্টারে বাচ্চারা খারাপ আসে।'

‘সেন্টার কোথায় করবেন ভাবছেন?’

‘আমার তো খুব ইচ্ছা, শহর থেইক্যা অনেক দূরে, কোনও রুরাল এরিয়ায়। আপাতত, দুইশোডা বেড নিয়া শুরু করুম। রোজিনা ম্যাডাম একডা প্রোজেক্ট বানাইয়া দিসেন। হেইডা নিয়া কথা কওয়ার জন্য আমরা আইজ জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে গেসিলাম। মোটামুটি গ্রিন সিগন্যাল পাইসি। এই ভেঞ্চারের মালিকানার মেজরিটি শেয়ার থাইকব রোজিনা ম্যাডামের। হ্যায় নিজে মেক্সিকান বইল্যা, একস্ট্রা কেয়ার নিব। মেসেজটা আমরা জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে দিতে পারসি।’

শুনতে শুনতে কালকেতু বলেই ফেলল, ‘রোজিনা ম্যাডামের বিজনেস ব্রেন বাঁধিয়ে রাখার মতো।’

‘আমি তো কই, জিনিয়াস।’ পলাশভাই বললেন, ‘জানেন, প্লেনোতে ম্যাডাম অলরেডি একডা বাড়ি খুইজ্যা বাইর করসেন, যেহানে সব ইনফ্রাস্ট্রাকচার আসে। আসলে ছিল পার্কোম্যাট। চালাইতে পারতাসিল না। বিককিরি কইর‍্যা দিতে চায়। সেল তৈরি কইর‍্যা, তিন মাসের মইধ্যে সেন্টার চালু করা সম্ভব। স্বীকার কইরতে দ্বিধা নাই কাইলকেতুভাই, ম্যাডাম যদি আমার সাথে না থাকেন, আমি এক্কেরে কানা।’

অকস্মাৎ পর্দা সরিয়ে রোজিনা লিভিং রুমে ঢুকে বললেন, ‘বসে বসে আমার অত নিন্দে শুনতে হবে না কালকেতুভাই। চলেন, মেক্সিকান ফুড রেডি।’

কালকেতু বলল, ‘এর মধ্যেই রেডি হয়ে গেল?’

‘খুব বেশি আইটেম করিনি। বুরিতো, নাচোস, টাকো, গুইমেলো...। যদি আপনার ভাল লাগে, তা হলে পরে আরও ভ্যারাইটি করে খাওয়াব।’

পলাশভাই সোফা ছেড়ে ওঠার মুডে নেই। দেখে তাঁর হাত ধরে টানলেন রোজিনা, ‘আফনের কিন্তু পাঁচ-ছয় প্যাগ হইয়া গেসে পলাশ। ওঠেন, ওঠেন।

আমি আর অ্যালাউ করুম না। কাইল হকালে নিউ ইয়র্কে যাইতে অইব, মনে আসে আফনের?'

উঠে দাঁড়ানোর বদলে রোজিনাকেই নিজের কাছে টেনে বসালেন পলাশভাই। জড়ানো গলায় বললেন, 'এতক্ষণ তো হেই গল্পই করতাসিলাম।'

'মিস গডউইনের কথা কি কাইলকেতুভাইরে কইসেন?'

'মাই গুডনেস! আমি কী বলদ দ্যাখেন। আসল কথাডাই কই নাই। কাইলকেতুভাই, নায়গারায় আফনে যে ভদ্রমহিলারে প্রাণে বাঁচাইয়া ছিলেন, আমাগো সাথে একবার আফনেরে হ্যার কাছে যাইতে অইব। চাইল্ড ডিটেকশন সেন্টারের ব্যাপারে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের অফিসারগো সাথে ডিল করতে গেসিলাম। অফিসার আমাগো জিজ্ঞাস করসিল, কুনও ইম্পরট্যান্ট লোকরে আফনেরা চেনেন কি না? তহন বুদ্ধি কইর‍্যা রোজিনা ম্যাডাম লিলি গডউইনের নামটা করেন। শুইন্যা অফিসার কইলেন, তাইলে তো আফনেগো চিন্তার কোনও কারণ নাই। হ্যায় চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশন চালায়। হ্যার কাইছ থেইক্যা একটা রেকমেন্ডেশন লইয়্যা আসেন। আফনেরা পার্মিশন পাইয়্যা যাবেন। অহন আফনে যদি মিসেস গডউইনরে রিকোয়েস্ট করেন, তা ইলে হয়তো আমাগো বিজনেস ডিলটা হইয়া যাইব। যাইবেন তো, প্লিজ?'

কালকেতু যাবে বলে ঘাড় নাড়ল। খবরটা পলাশভাই এতক্ষণ দেননি। আশ্চর্য মানুষ তো!

(পনেরো)

বেলা সাড়ে দশটার সময় টাইম নেওয়া আছে লিলির। তার আগেই পার্লারে পৌঁছতে হবে। ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, ব্রডওয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তার মানে আর দুটো ব্লক। গাড়িতে মিনিট পাঁচেক সময়ও লাগার কথা নয়। রাস্তায় ট্র্যাফিক জ্যাম না থাকলে ঠিক সময়েই পৌঁছে যাবেন। একবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করলে, পার্লারে

অন্যদের অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়। সেটা অবশ্য লিলির ক্ষেত্রে ঘটে না। লায়লা বলে যে মেয়েটা তাঁর চুল কাটে, সে নিয়ম ভেঙে আগে ডেকে নেয়। গত পাঁচ বছর ধরে ওই ইরানি মেয়েটাকে দিয়েই তিনি চুল কাটাচ্ছেন। টিভি চ্যানেলে মাঝে মধ্যে তাঁকে টকশোতে বসতে দেখে। জানে, তিনি কে? মেয়েটা তাই বাড়তি খাতির করে।

পার্লারের নাম দ্য গ্রেট ক্লিপস। এমনই নামী-দামি, সেলেব্রিটিদের খুব ভিড় হয়। বছরের গোড়ার দিকে একসঙ্গে গোটা সাত-আটেক কুপন কেটে রাখেন লিলি। তা হলে চুল কাটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া সহজ হয়। আগে কুপন কাটার জন্য সামান্য কনসেশনও পাওয়া যায়। সাধারণত, মাস দুয়েক পরপরই লিলি পার্লারে আসেন। এ বার একটু আগেই যেতে হচ্ছে। পিঠে ফের চুলকানি শুরু হয়েছে। প্লাস্টিক সার্জেনের কাছে গেলেই উনি ঘাড় অবধি চুল না-রাখার পরামর্শ দেন। ডাক্তারের কথা শুনে অ্যাদ্দিন সোনালি পরচুলা ব্যবহার করেছেন লিলি। কিন্তু তাতেও পিঠের চামড়ার সমস্যা মেটেনি। বিকেলের দিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া আছে ডাক্তারের। গাড়িতে যেতে যেতে লিলি একবার ঝালিয়ে নিলেন সারাদিনে কী কী কাজ আছে। লাঞ্চের পরে আসার কথা সেই ইন্ডিয়ান ছেলেটার, যে নায়গারায় প্রাণ বাঁচিয়েছিল। তার সঙ্গে কথা বলেই লিলি চলে যাবেন প্লাস্টিক সার্জেনের কাছে।

সাড়ে দশটার আগে পার্লারের কাছে পৌঁছে লিলি দেখলেন, দু'তিনজন চেনা ফোটোগ্রাফার পার্কিং স্পেসে ঘোরাঘুরি করছেন। তার মানে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও সেলেব্রিটি চুল কাটতে এসেছেন। হয়তো খবর পেয়ে ফোটোগ্রাফাররা এসে হাজির হয়েছেন। পার্কিং স্পেসের উল্টো দিকেই ইহুদিদের একটা সিনেগগ। সেখান থেকে ঘণ্টাধ্বনির শব্দ ভেসে আসছে। ইহুদিদের কোনও অনুষ্ঠান আছে বোধহয়। অন্য দিন পার্লার থেকে অনেকটা দূরে গাড়ি পার্ক করেন লিলি। যাতে খানিকটা হাঁটার ব্যায়াম করা যায়। কিন্তু আজ পার্লারের খুব কাছে গিয়ে গাড়িটা দাঁড় করালেন তিনি।

ফোটোগ্রাফারদের চোখে পড়লে রক্ষা নেই। খবরের জন্য তাঁরা পিছু ধাওয়া করতে পারেন। গাড়ি থেকে নেমে, টুপির আড়ালে মুখ ঢাকা দিয়ে লিলি পার্লারের ভিতর ঢুকে পড়লেন।

ঢুকেই চোখে পড়ল, লায়লা ওর কিউবিকলে নেই। এমনটা কখনও হয় না। তবে কি ও এখনও পৌঁছতে পারেনি? পার্লারের বাকি সবাই তাঁকে চেনেন। ম্যানেজার মেয়েটা কাছে এসে বলল, 'ম্যাডাম, লায়লা কি জানে, আপনি আসবেন? ও কিন্তু এখনও আসেনি।'

লিলি বললেন, 'আমি কিন্তু ওর সঙ্গেই কথা বলে রেখেছিলাম।'

'আপনার যদি তাড়াতাড়ি থাকে, তা হলে অন্য কোনও হেয়ার কাটারকে বলি?'

লিলি বললেন, 'না। আমি বরং একটু অপেক্ষা করি।'

পার্লারের ভিতরে কাঁচের দেওয়াল ঘেঁষে সার সার দামি চেয়ার পাতা। তার একটাতে বসে লিলি দু'একটা ফোন সেরে নিলেন। আলাদা আলাদা কিউবিকলে আট-দশজন মেয়ে হেয়ার কাটার-এর কাজ করছে। ক্লায়েন্টদের প্রত্যেকের গায়ে কালো অ্যাপ্রোন। মাথা নিচু করে রাখা। কে কোন জগতের সেলেব্রিটি, উজ্জ্বল সাদা ফ্লুরোসেন্ট আলোতেও তা বোঝা যাচ্ছে না। ঘরের ভিতর মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। মেশিনে এমনভাবে সুগন্ধি ভরে দেওয়া আছে, যা পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে। হালকা মিউজিকের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

দেওয়ালে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি আর ব্র্যাড পিটের ছবি। বোধহয় কোনও হেয়ার প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার। আরও অনেক ছবির মাঝে লিলি একটা পোস্টার দেখে একটু অবাক হলেন, 'স্টপ হিউম্যান ট্র্যাফিকিং।' মানুষ পাচার করলে তার কী কী শাস্তি, তাও পোস্টারে লেখা। দেশটার হলটা কী? স্কুলের বাইরে লিখে দিতে হচ্ছে, 'ড্রাগ ফ্রি, গান ফ্রি' স্কুল। মানে, এই স্কুলে

মাদক সেবন হয় না। ছাত্ররা কেউ অস্ত্র নিয়ে ঢোকে না। পার্লারেও লিখে দিতে হচ্ছে, মানুষ পাচার বেআইনি। আশ্চর্য!

বসে থাকতে থাকতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করবেন কি না ভাবছেন লিলি, এমন সময় কাচের সুইং ডোর ঠেলে ঝড়ের গতিতে ঢুকল লায়লা। কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'অ্যায়াম সরি মিস গডউইন। আমার জন্য আপনাকে কয়েক মিনিট ওয়েট করতে হল।'

লিলি হেসে বললেন, 'ডাজন্ট ম্যাটার ডিয়ার।'

অন্যদিন লায়লা খুব সেজেগুজে থাকে। চুল কাটতে বসার পর আয়নায় লিলি দেখলেন, লায়লার মুখটা শুকনো, চোখের নিচে কালি। রাতে বোধহয় ভাল ঘুমহয়নি। ওর স্বামী ডেমির্টাস থাকে তুরস্কের ইস্তানবুলে। দুটো বাচ্চাকে নিয়ে মেয়েটা একা নিউ ইয়র্কে রয়েছে। ডেমির্টাস একবার নিউ ইয়র্কে এলে ওর সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিল লায়লা। তখন শুনেছিল, ও আধা কুর্দ, আধা পারসি। ছেলেটা ভীষণভাবে জড়িয়ে গেছে কুর্দিস্তান তৈরির আন্দোলনে। ইস্তানবুল ছেড়ে পাকাপাকি চলেও আসতে পারছে না নিউ ইয়র্কে। চুল কাটার সময় প্রায়ই নিজের পরিবারের গল্প করে লায়লা। লিলি তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'খবর সব ভাল, লায়লা?'

হেয়ার কাটিং মেশিন চালিয়ে দিয়ে লায়লা বলল, 'না ম্যাডাম। একটা বাজে খবর আছে।' বলতে বলতে ওর চোখের কোণ ভিজে উঠল। 'তুরস্কের পুলিশ কাল ডেমির্টাসকে অ্যারেস্ট করেছে। ইস্তানবুলের রাস্তায় কুর্দদের একটা মিছিল বেরিয়েছিল। তাতে পুলিশ লাঠি চার্জ করে। শুনলাম, ডেমির্টাসের মাথায় চোটও লেগেছে।'

লিলি জানতে চাইলেন, 'খবরটা তুমি কার কাছ থেকে পেলে?'

'প্রথমে আল জাজিরা নিউজ চ্যানেলে ম্যাডাম। ডেমির্টাসকে দেখাও গেছে, রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ ভ্যানে উঠছে। পরে ওর ভাই আমাকে ফোন করেছিল। কী করব, বুঝতে পারছি না।'

‘ইস্তানবুল যাওয়ার কথা ভাবছ না কি?’

‘কী করে যাব? বাচ্চা দুটো এখানকার স্কুলে পড়ছে। ওদের কার কাছে রেখে যাব ম্যাডাম? ডেমির্টাসকে কতবার বলেছি, দেশ ছেড়ে চলে এসো। আমেরিকায় সেটল করতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু ও বলে, কুর্দদের আন্দোলন এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। সিরিয়া, ইরাক, তুরস্ক, ইরান... যেখানে যত কুর্দ বসবাস করে, সবাই একটা জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। আমাদের কুর্দিস্তান আর সময়ের অপেক্ষা। দেশের পাট গুটিয়ে ও চলেও আসতে পারছে না।’

কুর্দরা পশ্চিম এশিয়ার একটা এথনিক গোষ্ঠী। লায়লা যে চারটে দেশের নাম করল, তার খানিকটা করে অংশ নিয়ে কুর্দরা কুর্দিস্তানের স্বপ্ন দেখছে। আলাদা রাষ্ট্র বলে ঘোষণাও করেছে নিজেদের। সেনাবাহিনীও তৈরি করে ফেলেছে। কিন্তু এখনও রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়নি। দু’একটার বেশি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয়নি বলে। ইউনাইটেড নেশন’সও মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। তবে আন্দোলন যেভাবে গতি নিচ্ছে, তাতে ওদের দমিয়ে রাখা যাবে না। আপত্তিটা বেশি তুরস্কের তরফে। কেননা, ওদের দেশের প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ড কুর্দিস্তানে চলে যাবে। পুরো ঘটনাবলি লিলির জানা। তবুও তিনি চুপ করে রইলেন।

লায়লা ফের জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার কী মনে হয় ম্যাডাম, ডেমির্টাস যা বলছে, ঠিক? কুর্দিস্তান হবে? আপনারা তো অনেক বেশি খবর রাখেন।’

‘ডেমির্টাস ঠিকই বলছে।’ লিলি অল্প কথায় সেরে দিলেন।

লায়লা জিজ্ঞেস করল, ‘পুলিশ কাস্টোডি হয়েছে। ওর উপর খুব টর্চার হবে, তাই না ম্যাডাম?’

তা তো হবেই। কিন্তু সেটা বললে লায়লা আরও মুষড়ে পড়বে। পশ্চিম এশিয়া থেকে যে সব খবর আসছে, তা শিউড়ে ওঠার মতো। একদিকে জেনোসাইড চলছে। মৃত্যুর মিছিল। অন্যদিকে, মানবাধিকার লঙ্ঘন। পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে শুরু করে আরও পশ্চিমে লেবানন-

প্যালেস্তাইন পর্যন্ত। শিয়া-সুন্নিদের লড়াই।কেউ শান্তিতে নেই। ইস, লায়লা মেয়েটার কপালে দুঃখ আছে। কুর্দ বিরোধীরা যেসব নৃশংস কাণ্ড ঘটাচ্ছে, তাতে ডেমির্টাসের ফিরে আসার সম্ভাবনা কম। তবুও, সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে লিলি বললেন, 'এখানে বসে তুমি চিন্তা করে কী করবে? আল্লাহর উপর ভরসা রাখো। যা করার উনিই করবেন।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ হাতের মেশিনটা চালিয়ে গেল লায়লা। ঘাড়ের কাছে যখন চালাচ্ছে, তখন একবার সুচ ফোটানোর মতো ব্যথা টের পেলেন লিলি। ইদানীং মাঝে মধ্যেই এই যন্ত্রণাটা ফের ভোগাচ্ছে। প্রতি বছর মরশুম বদলানোর সময় পিঠের চামড়া তাকে ভোগায়। ড্যাডির মুখে তিনি শুনেছেন, প্রথমবার চিকিৎসার সময় স্কিন গ্রাফটিংয়ে ডাক্তাররা কিছু ভুলভ্রান্তি করেছিলেন। তার খেসারত সারা জীবন তাঁকে দিয়ে যেতে হবে। পিঠের চামড়া আর মসৃণ নেই। বাঁ হাতের বগলের পিছন দিকের চামড়া টেনে ধরে থাকে সর্বদা। বাঁ হাতটা তিনি পুরোপুরি তুলতে বা নামাতে পারেন না। এখনও তাঁকে উপুড় হয়ে শুতে হয় রাতে।

লায়লা চুল কাটতে খুব বেশি সময় নেয় না। তাঁর পিঠ জুড়ে যে পুড়ে যাওয়া চামড়ার দাগ আছে, সেটা পার্লারে একমাত্র ও-ই জানে। অস্বস্তিটা ও বোধহয় বুঝতে পেরেছে। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি লাগছে ম্যাডাম?'

লিলি ঘাড় নাড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, কেউ যেন পিন ফোটাচ্ছে।'

'ম্যাডাম, আপনার ঘাড়ের বেশ কয়েকটা জায়গায় লাল দাগ দেখতে পাচ্ছি। একবার ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করুন।'

লিলি বললেন, 'হ্যাঁ, আজই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি।'

'ম্যাডাম, আপনার স্কিন এখনও নর্মাল হল না? কী করে হয়েছিল?'

একই প্রশ্ন লায়লা আগেও করেছে। একই উত্তর লিলি ওকে আগেও দিয়েছেন। কোথায় হয়েছিল, কী করে হয়েছিল... সেসব লিলি নিজেরও জানা নেই। ড্যাডির মুখে শুনেছিলেন, খুব ছোটবেলায় হ্যালোইনের রাতে

ফায়ার ড্যান্সের সময় আগুন লেগে, তাঁর শরীরের পিছন দিকটা ঝলসে গেছিল। বছর খানেক না কি তাঁকে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়েছিল। সেইসব দিনগুলোর কথা বহুবার মনে করার চেষ্টা করেছেন লিলি। কিন্তু একবিন্দুও মনে পড়েনি। লায়লার কৌতূহল মেটানোর জন্য তিনি শুধু বললেন, 'জানি না কেন সারছে না। মনে হয়, এ বার লেজার ট্রিটমেন্ট করাতে হবে।'

দ্রুত হেয়ার কাট শেষ করে লায়লা পার্কিং স্পেস পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। লিলি গাড়িতে উঠতে যাবেন, এমন সময় লায়লা বলল, 'ম্যাডাম, আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট ছিল।'

স্টার্ট দেওয়ার জন্য গাড়ির সুইচে আঙুল দিতে গিয়েও লিলি সরিয়ে নিলেন। মেয়েটা মারাত্মক টেনশনে আছে। না হলে নিজের কিউবিকল থেকে বেরিয়ে আসত না। লিলি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত সংকোচ করছ কেন লায়লা। বলো।'

'ম্যাডাম, আপনার চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনে কি আমার বাচ্চা দুটোর ঠাঁই হতে পারে?'

মাই গুডনেস! লায়লা এতদূর অবধি ভেবে নিয়েছে? লিলির চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের একটা স্কুল আছে ডালাসে। সেখানে প্রায় হাজার দুয়েক বাচ্চা হস্টেলে পড়াশুনো করে। বিশ্বের যুদ্ধপীড়িত দেশের অনাথ বাচ্চা তারা। যুদ্ধ অথবা জেনোসাইডের কারণে যে সব বাচ্চা বাবা-মা হারিয়েছে, তাদের জন্য এই স্কুল। আমেরিকায় জন্ম যাদের, তাদের জন্য নয়। তাই লিলি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাচ্চা দুটো কি তুরস্কে জন্মেছে, না কি আমেরিকায়?'

লায়লা বলল, 'বড়জনের জন্ম তুরস্কে। ছোটটার এখানে।'

লিলি বললেন, 'তা হলে বড়জনকে আমাদের স্কুলে নেওয়া যেতে পারে। ছোটটাকে নয়। কিন্তু, জিজ্ঞেস করছি বলে কিছু মনে কোরো না। বাচ্চাদের

নিয়ে তুমি এত চিন্তিত কেন লায়লা?'

ফের মেয়েটার চোখের কোণে জল। বলল, 'কেন জানি না ম্যাডাম, আমার মনে হচ্ছে ডেমির্টাস বোধহয় আর ফিরে আসবে না। আমাকে একবার ইস্তানবুল যেতেই হবে। ডেমির্টাসের জন্য ল'ইয়ার ঠিক করতে হবে। এই সময়টায় ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ানো দরকার। কিন্তু আমি চলে গেলে বাচ্চা দুটোর কী হবে, ভেবে রাতে আমি ঘুমোতে পারছি না।' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল লায়লা।

মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিয়ে ফের গাড়িতে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় লিলি কোথাও গুলি চলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। পিছন দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, একদল লোক রাস্তার ও পারে সিনেগগের দিক থেকে দৌড়ে আসছে। চিৎকার করে বলছে, 'টেররিস্ট, টেররিস্ট। পালাও। পালাও।'

শুনে থমকে দাঁড়ালেন লিলি। কী শুরু হয়েছে দেশে? ভর দুপুরে টেররিস্ট অ্যাটাক! তাও সিনেগগে! এই একটু আগেই তো ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছিল ওখান থেকে। 'ম্যাডাম, শিগগির পার্লারের ভিতর চলুন। এখন গাড়ি নিয়ে বেরোতে হবে না।' বলে লায়লা হাত ধরে টানল। তখনই পিছন দিকে তাকিয়ে লিলি একটা ভয়ানক দৃশ্য দেখতে পেলেন। আলোর ঝলকানি, কানে তালা দেওয়ার মতো একটা আওয়াজ। সিনেগগের একাংশ ভেঙে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে একটা ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। দৃশ্যটা দেখার পরই মাথার ভিতর কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠল লিলির। হঠাৎই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল। তার পরই চোখের সামনে অন্ধকার। শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে তিনি টলে পড়লেন লায়লার বাহুডোরে।

পুরো শরীরটা হালকা হয়ে গেছে। ধুয়োর কুণ্ডলীর সঙ্গে খানিকটা উপরের দিকে উঠে, শূন্যে ভাসতে শুরু করেছেন লিলি। কয়েক সেকেন্ড পর নিচের দিকে তাকিয়ে রং বদলাতে যাওয়া গাছগুলো তিনি দেখতে পেলেন না। সিনেগগটাও নেই। তার বদলে রয়েছে হিন্দুদের একটা মন্দির। তার খুব

কাছে নদীর ঘাট। মন্দিরের লাগোয়া প্রচুর চেনা চেনা গাছ। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, বাতাবি লেবু। আমগাছের ডালে একটা দোলনা ঝুলছে। ভাসতে ভাসতে লিলি গিয়ে দোলনায় বসে পড়লেন। একটা সময় দোলনা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। সময় পেলেই কোঁচড়ে আম-জাম-পেয়ারা বা আচার নিয়ে দোলনায় উঠে পড়তেন। সেই অভ্যাসবশত আজও তিনি দোল খেতে শুরু করলেন।

একবার করে আকাশের দিকে উঠছেন আর নেমে আসছেন। উপরের দিকে ওঠার সময় ডালপালার ফাঁক দিয়ে কয়েকটা টিনের চালের বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন লিলি। সেইদিক থেকে কারও গলা ভেসে আসছে। কিন্তু কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না।' নিচের দিকে তাকিয়ে লিলি দেখলেন, বয়স্কা এক মহিলা কোমরে আঁচল বেঁধে তাকে শাসাচ্ছেন। তার হাতে ঘাস থেকে কুড়িয়ে নেওয়া একটা ডাঁশ।

দোলনা থেকে ঝুপ করে লাফিয়ে নামতে গিয়ে লিলি আছাড় খেলেন।

(ষোলো)

লিভিং রুমে ঢুকে ইমন দেখল, ডাইনিং টেবলে বসে দাবা খেলছেন পলাশছ্যার আর কালকেতু নন্দী বলে সেই ইন্ডিয়ান। দেখেই ওর দাদামশায়ের কথা মনে পড়ল। ছোটবেলায় দাদামশায়ের কাছে ও দাবা খেলা শিখেছিল। এত ভাল শিখেছিল যে, পরপর তিন-চারটে চাল আগাম ভেবে নিতে পারত। ঢাকায় তখন নিয়াজ মুর্শেদের খুব নাম। প্রথম বাঙালি গ্র্যান্ডমাস্টার দাবাড়ু। দাদামশায় বলতেন, 'তুই চেষ্টা কইরলে নিয়াজ মুর্শেদ হইতে পারবি।' ওদের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একবার অতিথি হিসাবে এসেছিলেন মুর্শেদ। ওকে দেখে ইমনের তখন খুব ইচ্ছে হয়েছিল, সিরিয়াসলি দাবা খেলাটাকে নেবে। কিন্তু সব ওলট পালট হয়ে গেল।

বোর্ডে বোড়ের অবস্থাগুলো একনজর দেখেই ইমন বুঝতে পারল, ঘোড়ার একটা চাল ঠিকমতো দিতে পারলে পলাশছ্যার কিস্তিমাত করতে পারবেন। কিন্তু অন্য একটা চাল দিতে গিয়ে মুখ তুলে, ওদের দু'জনকে দেখে ফেললেন উনি। তারপর বললেন, 'আইস ইমন। একডা ইম্পরট্যান্ট কথা আসে তোমাগো সাথে।'

শুনে বুক গুড়গুড় করে উঠল ইমনের। ওদের সম্পর্কে পলাশভাই সব জেনে ফেলেছেন না কি? গতকাল রাতেই চিরাগ একবার বলেছিল, 'রোজিনা ম্যাডাম যদি আমাদের পিছনে বেশি স্পাইং করেন, তা হলে ফল ভাল হবে না বলছি। আমার হাতের টিপ তো তুই জানিস। এই ঘরে বসেই ওর কপাল ফুঁটো করে দেব। কাকপক্ষীও টের পাবে না।' কথাটা শুনে ইমন একটু অবাকই হয়েছিল। রোজিনা ম্যাডাম কীভাবে স্পাইং করছেন, কখন করছেন, সেকথা ভেবে। দু'দিন ধরে ও দেখছে, চিরাগ খুব অস্থির। যা বলছে, তা করেও ফেলতে পারে। ওর প্রাণে দয়া-মায়া বলে কিছু নেই। ও মনে মনে আল্লাহকে ডাকল, কথায় কথায় পলাশছ্যার যেন এখন এমন কিছু বলে না বসেন, যাতে চিরাগ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বিনম্র মুখে ও বলল, 'জ্বী ছ্যার, কন, কী কইবেন।'

'হোনো, কাইল হগালে তোমাগো একজনরে একবার নিউ ইয়র্ক যাইতে অইব। কীভাবে যাইব্যা, কও?'

প্রশ্নটা শুনে ইমন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু একটু অবাকও হল। কীভাবে যাবে মানে? জিপিএস দেখেই তো চলে যাওয়া যায়। নিউ ইয়র্ক থেকে পালিয়ে আসার দিন ওরা আই টু সেভেন্টি এইট ফ্রিওয়ে ধরে এসেছিল। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার মতো লেগেছিল। উত্তরে ইমন সেই কথাটাই বলল।

'এই ছ্যার কাইল হগালে নিউ ইয়র্ক যাইব।' কালকেতুকে দেখিয়ে পলাশভাই বললেন, 'ইন্ডিয়ার খুব মানী লোগ। খবরের কাগজের রিপোর্ডার। যত্ন কইর‍্যা লইয়্যা যাইবা, ক্যামন?'

চিরাগ মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে। ইমন কিন্তু হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে কালকেতুকে জিজ্ঞেস করল, 'কখন যাইবেন ছ্যার? টাইমটা জানাইলে ভালা হয়।'

দাবার বোর্ড থেকে মুখ তুলে কালকেতু বললেন, 'এই ধরো, লাঞ্চের পর। বেলা একটায় বেরিয়ে যাব। আমাকে একবার ম্যানহাটনে যেতে হবে। নিউ ইয়র্ক টাইমস অপিসে।'

শুনে মনে মনে হাসল ইমন। এই কয়েকদিন আগে যে লোকটাকে খুন করার জন্য নায়গারা থেকে ফলো করে ও নিউ ইয়র্কে গেছিল, তাকেই পাশে বসিয়ে ফের ওই শহরে নিয়ে যেতে হবে। ইচ্ছে করলে গাড়িটা নিয়ে ও উধাও হয়ে যেতে পারে। তার পর নির্জন কোনও হাইওয়েতে নিজের জিঘাংসাটাকে ও চরিতার্থ করতে পারে। কিন্তু সে রকম কোনও অনুভূতি ওর হল না। আল্লাহ কী চান, ইমন জানে না। ঘাড় নেড়ে ও বলল, 'জ্বী জ্বী ছ্যার। ঠিক আসে।'

লিভিং রুম থেকে চিরাগকে নিয়ে ইমন বেরিয়ে আসছিল, এমন সময় মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে পলাশছ্যার বললেন, 'আরে চিরাগ, তুমি যাও কুথায়? তুমি মুইচ দাঁড়িতে মুখ ভর্তি কইর‍্যা রাখসো ক্যান? তুমিও আমার মতো নো শেভ নভেম্বর করত্যাস না হি?'

চিরাগ বলল, 'না স্যার, কয়েকদিন আগে স্বপ্ন দেখেছি, আববু মারা গেছে। তাই সেভ করিনি।'

কথাটা বলে চিরাগ ফের পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু পলাশছ্যার বলে উঠলেন, 'খাঁড়াও, খাঁড়াও। অত হড়বড় করতাসো ক্যান? কত বয়স হইসে তোমার আববুর?'

'স্যার, পঞ্চাশও হয়নি।'

'অত চিন্তা করো ক্যান? হেইডা মরণের বয়স না হি। হোনো, নিজের স্বপ্ন দ্যাখলে, পরের হয়। তোমার আববু সহি সেলামতই আছেন। যাউক গা, যে

লইগ্যা তোমারে ডাকছিস, হোনো। তোমারে একডা জিনিস দেখাইমু। দেইখ্যা যাও।' কথাটা বলেই রিমোট কন্ট্রোল হাতে নিয়ে পলাশছ্যার টিভি চালিয়ে দিলেন।

সত্তর ইঞ্চির টিভির পর্দায় ইমন দেখল, মেন বিল্ডিংয়ের লিভিং রুমে চিরাগ এসে দাঁড়িয়েছে। এ দিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে কী যেন খুঁজছে। নিজের চোখকে ইমন বিশ্বাস করতে পারল না। বিস্ফারিত চোখে ও দেখল, বেপরোয়াভাবে চিরাগ একবার কোনও একটা ঘরে ঢুকে গেল। দু'তিন মিনিট পর বাইরে বেরিয়ে এসে একটা ফুলদানি সরিয়ে পিছনে কী যেন দেখল। তার পর পর্দা সরিয়ে ফের অন্য একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। ইতিমধ্যে কোথাও টেলিফোন বাজতে শুরু করেছে। সেই শব্দ শুনে চিরাগ দ্রুত লিভিং রুম ছেড়ে বেরিয়ে এল। পর্দায় ইমন দেখল, তখন বিকেল চারটে পনেরো। ওর মনে পড়ল, এই সময়টায় ও আউট হাউসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আশ্চর্য, নির্জন বাড়িতে চিরাগ কেন ঢুকেছিল? ওর কোনও বদ মতলব ছিল না তো?

'রোজিনা ম্যাডাম প্রথম দিনই তোমারে কইয়্যা দিসিল, বিনা পার্মিশনে মেন বিল্ডিংয়ে ঢুকবা না। ক্যান ঢুকসিলা, কইব্যা?' কড়া গলায় পলাশছ্যার জিজ্ঞেস করলেন।

ইমন চমকে উঠে চিরাগের দিকে তাকাল। ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ও কী উত্তর দেবে, ইমন বুঝতে পারল না। পলাশছ্যার ওর উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে ওদের বিদেয় করে দিতে পারেন। ইমনের বুকের ভিতরটা লাফাতে লাগল। কিন্তু চিরাগ কঠিন মনের ছেলে। কোনও পরিস্থিতিতেই... ভাঙবে তো মচকাবে না। ও বলল, 'আপনার এই বাড়িতে জিন আছে স্যার।'

মুহূর্তে চিরাগের উপর থেকে সন্দেহের ছায়াটা সরে গেল। ইমনেরও মনে হয়েছে, এই বাসায় জিন আছে। বিশেষ করে সেদিন রাতে নিজের চোখে এক ছায়ামূর্তিকে জঙ্গলের দিকে ভ্যানিশ হতে দেখার পর থেকে, ওর

বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়েছে। এ নিয়ে চিরাগের সঙ্গে ওর একপ্রস্থ আলোচনাও হয়েছে। বন্ধুর সমর্থনে সে কথাই ও বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পলাশছ্যার একবার কালকেতুর দিকে তাকিয়ে তার পর হেসে উঠে বললেন, 'কী কইর‍্যা বোঝলা? জিন-টিনে তুমি বিশ্বাস করো না হি?'

চিরাগ ভয় পাওয়ার গলায় বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস করুন স্যার। আজ যখন আপনারা কেউ বাড়িতে ছিলেন না, তখন আউট হাউস থেকে খুটখাট আওয়াজ পাচ্ছিলাম। জানলায় একবার একটা শ্যাডোও দেখতে পেলাম। মনে হল, কোনও মহিলা ঘরে ঘুরে বেরাচ্ছে। তাকে হাতেনাতে ধরার জন্য আমি লিভিং রুমে ঢুকেছিলাম। কিন্তু কাউকে খুঁজে পাইনি।'

পলাশছ্যার বললেন, 'অহন বুঝসি। জিন না, হ্যায় লারেইনা। একডা মেক্সিকান মাইয়া আমার বাসায় ক্লিনিংয়ের কাম করতে আসে। হ্যারে আগে দেখো নাই?'

'না স্যার। কিন্তু মেয়েটা বাসায় ঢুকল কী করে?'

'হ্যার কাসে বাসার চাবি আসে। নিজের সময়মতো আইস্যা এহানে কাম কইর‍্যা যায়। যাউক গা, তোমারে তহন ফোন করলাম, তুললা না ক্যান? রিং হইত্যাসিল, হোনো নাই?'

চিরাগ বলল, 'শুনেছিলাম। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হল, জিন ফোন করেছে। তাই ভয়ে ধরিনি।'

কথাগুলো শুনে যেন খুব মজা পেলেন পলাশভাই। বললেন, 'ডর লাগসে? হা হা হা, আরে, ডর লাগনের কিছু নাই। হ, কে য্যান আমারে কইছিল, এই বাংলোতে অনেকদিন আগে একজন সুইসাইড করসিল। তার জিন ঘুইর‍্যা বেরায়। তবে সে আমাগো কুনও ক্ষতি করে নাই। হোনো, ফাঁকা বাসায় ঢুইক্যা জিন দ্যাখসো... হেই গল্প আবার রোজিনা ম্যাডামের কাছে কইরো না য্যান। হুনলে হ্যায় কিন্তু চেইত্যা যাইব। যাও, অহন তোমরা যাও।'

এত সহজে ছাড়া পেয়ে যাবে, ইমন ভাবতেও পারেনি। লিভিং রুম ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় ও সাহস করে বলল, 'ছ্যার, যদি কিছু মনে না করেন, তাইলে একডা কথা কমু?'

হাতে একটা বোড়ে ধরা, পলাশছ্যার বললেন, 'তুমি আবার কী কইব্যা? তুমিও জিন দ্যাখস না হি?'

'না, ছ্যার।' পা চালিয়ে টেবলের কাছে গিয়ে ইমন বলল, 'আপনে ঘোড়ার চালডা দ্যান। তাইলে কিস্তিমাত কইরতে পারবেন।'

বোর্ডের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে পলাশছ্যার বললেন, 'রাইট। তুমি ঠিকই কইস ইমন। এই ন্যান কাইলকেতুভাই। কিস্তিমাত করত্যাসি।' চালটা দিয়ে পলাশছ্যার শূন্যে দু'হাত ছুড়ে দিলেন। তা দেখে কাইলকেতুস্যার হাসতে লাগলেন।

ইমন লিভিং রুম ছেড়ে বেরিয়ে আসছিল। পিছন থেকে পলাশছ্যার ডাকলেন, 'ইমন হোনো হোনো। অ্যাদ্দিন খেলতাসি। কাইলকেতুভাইরে হারাইতে পারি নাই। তোমার জইন্য আইজ প্রথম জিতলাম। নাও, এই ইনাম লইয়্যা যাও। কাইল নিউ ইয়র্কে গিয়া খরচা কইরো।' বলে কয়েকটা একশো ডলারের নোট এগিয়ে দিলেন উনি।

আউট হাউসের দিকে হাঁটার সময় ইমন মনে মনে চটেই গেল চিরাগের উপর। ওকে না জানিয়ে মেন বিল্ডিংয়ে ঢুকে চিরাগ খুব অন্যায় করেছে। বিনা কারণে ও ভিতরে যায়নি। নিশ্চয়ই ওর কোনও অভিসন্ধি ছিল। রোজিনা ম্যাডাম থাকলে, এত সহজে ওকে ছেড়ে দিতেন না। প্যাঁচানো প্রশ্ন করে ঠিক চিরাগের পেট থেকে কথা বের করে নিতেন। আউট হাউসে পৌঁছে গম্ভীর মুখে চিরাগ সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল। গোসল করে এসে একটা কথাও না বলে ও সোফায় বসে টিভি খুলে দিল। সেদিন রাতে আম্মি-আববুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার পর থেকে চিরাগ আজকাল খুব উল্টোপাল্টা কথা বলছে। ইমন ওর হাবভাব একেবারেই পছন্দ করছে না। তবুও মুখ ফুটে

কিছু বলতে পারছে না। কারণ ওর কৃতজ্ঞতাবোধ। কাবুলের ট্রেনিং ক্যাম্পে যেদিন ও প্রথম চিরাগকে দেখে, সেদিনই যে ওকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়েছিল।

আউট হাউসের সোফায় বসে থাকতে থাকতে সেদিনকার কথাটা ইমনের মনে পড়ল। পাহাড়ের কোলে রুক্ষ একটা প্রান্তর। তার মধ্যে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ওদের ক্যাম্প। নতুন জিহাদিদের সেখানে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল। দুবাই থেকে সদ্য ওখানে গিয়ে খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিল ইমন। শ'দেড়েক জিহাদিদের ট্রেনিং ক্যাম্প সেটা। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন দেশের ছেলে সব। লেবানন, ইয়েমেন থেকে শুরু করে চেনিয়া, উজবেকিস্তানেরও। ক্যালিফ যিনি, তিনি ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মুসলিম। মহম্মদ আলজাওয়াকি। কাবুলে যাওয়ার আগেই ইমন শুনে ফেলেছিল, কাফেরদের মুণ্ডচ্ছেদনে ওদের ক্যালিফ বিশ্বরেকর্ড করে ফেলেছেন। হাজার দেড়েকেরও বেশি মুণ্ডুকেটেছেন। নিষ্ঠুরতায় তাঁর না কি জুড়ি নেই পৃথিবীতে।

ক্যালিফ আলজাওয়াকিকে প্রথম দেখার অভিজ্ঞতাও ভোলেনি ইমন। সেদিন চিরাগের সঙ্গেও ওর প্রথম আলাপের দিন। কাবুলেভোরবেলায় একটা ফাঁকা জায়গায় ওরা... নতুন রিক্রুটরা সারিবদ্ধ দাঁড়িয়েছিল। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে একটা হেলিকপ্টার উড়ে আসতে দেখেছিল ইমন। হেলিপ্যাডে সেই কপ্টার নামতেই কয়েকজন কম্যান্ডারের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন ক্যালিফ। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, পাঠানদের সাদা ঝুল পোশাকে আরও বেশি লম্বা দেখাচ্ছিল ক্যালিফকে। মাথায় বিন লাদেনের মতো সাদা পাগড়ি। লম্বা কাঁচা-পাকা দাড়ি। লম্বা ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি সেদিন। ইসলামের জন্য নিজেকে কেন কুরবানি দেওয়া দরকার, মিঠে বুলিতে বুঝিয়ে ছিলেন। ক্যালিফের শান্ত সমাহিত চেহারাটা দেখে ইমন ভাবতেও পারেনি এই মানুষটা নরবলি দিতে ওস্তাদ!

ক্যালিফ যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ পিন পড়ার আওয়াজও পাওয়া যায়নি। তার পর কম্যান্ডারদের হাঁকডাক শুরু হল। ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের নামে টর্চার। দশজন কম্যান্ডারের দায়িত্বে ছোট ছোট দল। রোল কল-এ কে কোন দেশের পরিচয় নেওয়ার সময় ইমন বাংলাদেশ বলার পর হাসির রোল উঠেছিল দলে। তখন ওর চোখে পড়েছিল, লাইনে একটা ছেলে মুখ কঠিন করে দাঁড়িয়ে। সে হল চিরাগ। জীবনে কখনও খেলাধুলো বা শরীরচর্চা করেনি ইমন। পড়াশুনোয় ভাল, বইতেই মুখ গুঁজে পড়ে থাকত। পাহাড়ি রাস্তায় দৌড় শুরু হওয়ার পরই ও টের পেয়েছিল, অন্যদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। মাইল দেড়েক দৌড়নোর পরই হাঁফাতে হাঁফাতে ও বসে পড়েছিল একটা পাথর খণ্ডের উপর। তখনই কম্যান্ডার পিছিয়ে এসে ওর পাছায় লাথি মেরে ছিলেন। মুখ খিঁচিয়ে বলেছিলেন, 'রান, বাস্টার্ড রান।' ওর দুরবস্থা দেখে অন্যরা হাসছিল।

দলে ভাল স্বাস্থ্যের ছেলে সবাই। দৌড়তে দৌড়তে খাঁড়াই রাস্তায় অনেকটা উঁচুতে পৌঁছে গিয়েছে। প্রাণপণ তাদের পিছনে ছুটতে গিয়ে ইমনের মাথা চক্কর দিতে শুরু করেছিল। তখনই চিরাগ পিছিয়ে এসে ওকে বলে, 'তুই আমার সঙ্গে জগিংশুরু কর। একবার যদি বুঝতে পারে তুই ফিজিক্যালি উইক, তা হলে এঁরা তোকে নিয়ে র‍্যাগিং করবে।' সেই মুহূর্ত থেকেই চিরাগ ওর বন্ধু হয়ে গেছিল। গত পাঁচ বছরে বেশ কয়েকবার ওদের ক্যাম্প বদলেছে। কিন্তু ওদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়নি। কসোভোর ক্যাম্পে গিয়ে সেটা আরও গাঢ় হয়েছিল। তাই কখনও কখনও রেগে গেলেও চিরাগকে ও কড়া কথা বলতে পারে না।

আউট হাউসে ফিরে এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি চিরাগ। টিভি বন্ধ করে এ বার বলল, 'ফ্রিজে কী আছে, বের কর ভাই। খিদে পেয়েছে।'

সুযোগ পেয়ে ইমন বলল, 'কামডা তুই কিন্তু ভাল করস নাই চিরাগ। আইজ আর এট্টু হইলে ধরা পইড়্যা যাইতি। নেহাত পলাশছ্যার ভালা

মানুষ, তাই...'

চিরাগ বাধা দিয়ে বলল, 'পলাশছ্যার বাড়ি ছিলেন না। তবুও, আমাকে দেখে ফোন করলেন কী করে, কিছু বুঝতে পারলি? '

প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেল ইমন। সত্যিই তো পলাশছ্যার তখন বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও ছিলেন। তা হলে উনি কী করে, জানতে পারলেন, চিরাগ ফাঁকা বাড়িতে ঘুরে বেরাচ্ছে? একটু চিন্তা করে ও বলল, 'ছ্যারের বাড়িতে মনে হয় কোনও গুগল অ্যাপস লাগানো আছে।'

'ঠিক ধরেছিস।' চিরাগ বলল, 'ওনার মোবাইলে এমন একটা অ্যাপস লাগানো আছে, যা বাড়ি পাহারা দেয়। বাড়িতে না থাকলেও বাড়ির সব খবর উনি পেয়ে যান। মোবাইল ফোন সঙ্গে সঙ্গে ওকে অ্যালার্ট করে দেয়। এইসব অ্যাপস সাধারণ লোকে অ্যাফোর্ড করতে পারে না। কিন্তু পলাশস্যারের পক্ষে সম্ভব।'

'তুই কী কইর‍্যা অ্যাপ্রিহেন্ড করলি?'

'জিহাদি ক্যাম্পে তুই বোধয় মন দিয়ে কিছু শিখিসনি ইমন। টেকনিক্যাল ক্লাসগুলো যখন হত, তখন কি ঘুমাতি? ক্যাপ্টেন জেসি একবার আমাদের এই ধরনের অ্যাপস-এর কথা বলেছিলেন। অ্যাপস বুঝানোর আগে তোকে একটা প্রশ্ন করি। পলাশছ্যার কে, কেমন মানুষ, তুই কতটা জানিস?'

ইমন বলল, 'বিজনেসম্যান, সাদাসিধা ভালা মানুষ। ক্যান, তর কী মনে হয়?'

'বিজনেসম্যানের ভালমানুষ হওয়া কঠিন। দ্যাখ ভাই, তোর হয়তো কথাটা ভাল লাগবে না। কিন্তু প্রথম দিনেই আমার মনে খটকা লেগেছিল। এই সময়ে যখন নিজের ভাইকেও মানুষ আশ্রয় দেয় না, তখন তোর পলাশছ্যার আমাদের ভালামতোন না চিনেই বাসায় থাকতে দিলেন কেন? ব্যাপারটা আমি হজম করতে পারিনি। মানুষটা আসলে কে, তা জানার জন্য

জিহাদি নেট ওয়ার্ক ঘাঁটাঘাটি করছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম, বাংলাদেশি জিহাদিদের সাথে ওনার লিঙ্ক আছে।'

ইমন অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'হইতেই পারে না। তুই জিহাদি নেট ওয়ার্কের লিঙ্ক পাইলি কী কইর‍্যা?'

'এ গুলো ইন্টারেস্ট থাকলেই জানা যায়। তোর নিশ্চয় মনে আছে, ক্যালিফেটে থাকার সময় আমি দিনের অনেকটা টাইম সফটওয়ার রুমে কাটাতাম। তুই তখন প্লে স্টেশন রুমে টাইম পাস করতি। কাউন্টার স্ট্রাইক বলে একটা পপুলার গেম ছিল। বসে বসে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতি।'

শুনে ইমন মনে মনে হাসল। ফিজিক্সের একজন এমএসসির মুখে ওকে সফটওয়ার সংক্রান্ত জ্ঞান শুনতে হচ্ছে! আরে সুমুন্ধির পোলা, তুই আমার সম্পর্কে কতটা জানস? স্কুল লাইফেই আমি কম্পিউটার গুইল্যা খাইসিলাম। হ্যাকিং শব্দটা তহন থেইক্যা জানি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সময় আমি হইয়া উঠসিলাম এথিক্যাল হ্যাকার। বাংলাদ্যাশের সিক্রেট এজেন্সি দুই একবার আমার হেল্প নিসিল। তার পর এমন একটা ঘটনা ঘটল, দ্যাশের উপর আমার ঘেন্না ধইর‍্যা গেল। তুই জানস না, জিহাদি এজেন্টরা আমারে ক্যান নিসিল। রাশিয়া আর রোমানিয়ান হ্যাকারগো সাথে কন্টাক্ট রাখার জইন্য।

চিরাগ যা বলল, তা অবশ্য ঠিক। ক্যালিফেটের প্লে স্টেশনে স্ফূর্তির অভাব ছিল না। ওখানে বসে ওয়ার গেমস খেলতে ওর ভাল লাগত। তখন সদ্য মর্টার চালানো শিখছে। কাঁধে এম সিক্সটিন রাইফেল উঠেছে। ধীরে ধীরে শরীরটাও শক্তপোক্ত হচ্ছে। নিজেকে সিলভেস্টার স্ট্যালোন বলে মনে হত ইমনের। তবে, কাঁধে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও ও কখনও মানুষ খুন করেনি। অত সাহসই হয়নি ওর। এক পলকে কাবুল থেকে মনটাকে নিউ জার্সিতে ফিরিয়ে আনল ইমন। এ কী বলছে চিরাগ! পলাশছ্যারের সঙ্গে বাংলাদেশি জিহাদিদের যোগাযোগ আছে! ও কী করে নিশ্চিত হল?

‘তোর এই কথাগুলান যে হত্যি, তার প্রমাণ কী?’

‘এই আউট হাউসের তলায় একটা চোরা কুঠুরি আবিষ্কার করেছি। ডিনারের পর তোকে সেখানে নিয়ে যাব। গেলেই বুঝবি। অনেক কিছু জানতে পারবি।’

চোরা কুঠুরির কথা শুনে ইমন চমকে উঠে তাকাল চিরাগের দিকে। ও সন্ধান পেল কী করে?

(সতেরো)

নিউ ইয়র্কে রওনা হওয়ার মুখেই বাধা। ফোর্ড গাড়ির লক খোলা যাচ্ছে না। কাল রাতে রিমোটটা রোজিনা ম্যাডামের কাছে ছিল। উনি আর পলাশভাই সক্কালবেলায় কোথাও বেরিয়েছেন অন্য গাড়ি নিয়ে। পার্কিং স্পেসে নেমে কালকেতু দেখল, ইমন আর চিরাগ দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি ড্রাইভ করে ওকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাওয়ার কথা ইমনের। ছেলেটা বলল, ‘প্রবলেম হইয়া গ্যাসে ছ্যার। লেটেস্ট মডেলের পুশ বাটন স্টার্ট গাড়ি। রিমোট না থাকলে খোলা যাইব না। আফনে একবার রোজিনা ম্যাডামরে ফোন করেন।’

কাল রাতে ডিনার করার সময়ই রোজিনা বলেছিলেন, পলাশভাই নিউইয়র্কে যেতে পারবেন না। বেলা এগারোটায় ওদের কোথাও বিজনেস মিটিং আছে। আজ নাস্তার সময় তো বটেই, লাঞ্চের সময়ও দেখা না হতে পারে। মিটিং কতক্ষণ চলবে, ওরা জানেন না। বেলা দুটো আড়াইটা অবধিও গড়াতে পারে। তাই সকালে কালকেতু নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। রোজিনা ম্যাডামকে এইসময় ফোন করা উচিত হবে কি না, ও বুঝতে পারল না। ইমনকে ও বলল, ‘লক খোলার অন্য কোনও উপায় নেই? দেখো না, কোনও মেকানিক পাওয়া যায় কী না?’

ইমন বলল, ‘মোবাইলে আফনে একবার চেক কইর‍্যা দ্যাখেন। কাছাকাছি কোনও অটো সেন্টার আছে কি না, ফোনেই ইনফর্মেশনটা পাওয়া যাইব।’

ইমন ঠিকই বলেছে। পকেটে মোবাইল ফোন থাকলে আমেরিকায় সব কিছুই হাতের মুঠোয়। সব সমস্যার সমাধান করা যায়। ফোন ঘাঁটবে, না কি রোজিনা ম্যাডামকে ফোনে ধরবে... কালকেতু ঠিক করতে পারল না। মুশকিল হচ্ছে, সুদীশেরও আজ নিউ ইয়র্কের ইন্টারপোল অফিসে যাওয়ার কথা। সুদীশ বলেছিল, বেলা দেড়টার সময় হোটেল থেকে ওকে তুলে নিতে। একটু আগেই ওর সঙ্গে ফোনে কথা হয়ে গেছে। সে বেচারি এতক্ষণে হোটেলের লবিতে এসে বসে আছে। ওকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করানো ঠিক হবে না। বাধ্য হয়েই কালকেতু ইমনকে বলল, 'উবের সেন্টার থেকে গাড়ি ডেকে নেওয়া যায় না?'

ইমন বলল, 'যায়। কিন্তু আফনে নিউ ইয়র্ক থেইক্যা ফিরবেন... অনেক ট্যাহা ভাড়া নিয়া নিব।'

এই সময় কালকেতু দেখল, চিরাগ ছেলেটার সঙ্গে ইমনের চোখে চোখে কী যেন কথা হয়ে গেল। তারপরই ইমন বলল, 'ছ্যার, আফনে লিভিং রুমে গিয়া বসেন। দেহি, আমি কী কইরতে পারি।'

লিভিং রুম থেকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার মানে লারেইনা ঘর পরিষ্কারের কাজ করছে। এখন ওখানে গিয়ে বসা সম্ভব না। লারেইনা সকালের দিকে ঘণ্টা তিনেক কাজ করে এ বাড়িতে। সন্ধেবেলায় যায় একটা স্পোর্টস পাব-এর রেস্তোরাঁয়। রোজিনা ম্যাডামের মুখে কালকেতু শুনেছে, দিনের বেলায় মেয়েটা পড়াশুনো করে ইউনিভার্সিটিতে। সবসময় হাসিখুশি, দেখা হলেই গুড মর্নিং জানায়। লিভিং রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে কালকেতু সিগারেট ধরাল সময় কাটানোর জন্য। কিন্তু মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ও ইঞ্জিন চালু হওয়ার মসৃণ শব্দ শুনতে পেল। তখনই চিরাগ ছেলেটা এসে বলল, 'ছ্যার, গাড়ির লক খোলা গেছে। এ বার কোনও অসুবিধে নেই।'

অবাক হয়ে কালকেতু বলল, 'বাঃ। কী করে খুললে?'

চিরাগ বলল, ‘আমরা যে স্টোরেজে কাজ করতাম, সেখানে প্রায়ই এ ধরনের সমস্যা হত। ইমন টুকটাক পারে, এ সব কাজ করতে।’

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কালকেতু দেখল, সোয়া একটা বাজে। যাক, খুব বেশি দেরি হয়নি। বেলা আড়াইটের মধ্যে নিউ ইয়র্ক টাইমস অফিসে পৌঁছলেও ওর চলবে। ইমন কী করে লকটা খুলল, সে কথা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কালকেতু মনে মনে ছকে নিল সারাদিনে কী কাজ করবে। গত দু’দিনে সুদীশের দেওয়া পেন ড্রাইভ থেকে ও কয়েকটা তথ্য পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন কাগজে ওয়ার ভিক্টিম মেয়েটাকে নিয়ে খবর। ছয় বছরের মেয়েটাকে ঢাকার মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলেন রিচার্ড গাটম্যান বলে একজন আমেরিকান ফোটোগ্রাফার। নিউ ইয়র্ক টাইমসে ডিন জোন্স বলে একজন ডাক্তারের সাক্ষাৎকারও আছে। বোমা পড়ার তিন দিন কেটে যাওয়ার পরও মেয়েটার জ্ঞান ফেরেনি। ওকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন ডাক্তার-নার্সেরা।

দিন সাতেক পর ঢাকার ‘ইত্তেফাক’ কাগজে বেরিয়েছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনির একজন কর্নেল হাসপাতালে মেয়েটাকে দেখতে গিয়েছেন। তাঁর নাম কর্নেল নপরাজিত মজুমদার। যুদ্ধে এত মানুষ আহত হওয়া সত্ত্বেও, কর্নেল মজুমদার কেন ওই বাচ্চা মেয়েটাকে দেখতে গিয়েছিলেন, কালকেতুর মাথায় ঢোকেনি।

মাস তিনেক পর ‘দৈনিক বাংলা’ কাগজে একটা চমকপ্রদ খবর, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন, মেয়েটিকে সুস্থ করার সব খরচ নতুন সরকার দেবে। প্রয়োজন হলে তাকে বিদেশে পাঠানো হবে। ব্যাস, তার পর বাংলাদেশের কোনও কাগজে মেয়েটাকে নিয়ে আর কোনও খবর নেই। প্রায় মাস আটেক পর নিউ ইয়র্ক টাইমসের খবর, রেড ক্রশের ডাক্তার পেড্রো কিউবায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মেয়েটিকে। কেননা, হাভানায় উন্নতমানের স্কিন গ্রাফটিং এবং প্লাস্টিক সার্জারির চিকিৎসা হয়।

কয়েকদিন পর কানাডার 'টোরেন্টো স্টার' কাগজ লিখেছে, বাংলাদেশ সরকার যদি চায়, তা হলে মেয়েটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে তারা রাজি। প্রায় ওই সময়েই গোটনবার্গের একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জানিয়েছে, মেয়েটির ভার তারা নিতে চায়। মেয়েটির কথা তারা জানতে পেরেছে, রেড ক্রশের এক সুইডিশ নার্স মিসেস এলসা গিনেসবেরির কাছ থেকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ঢাকায় ছিলেন।

মেয়েটাকে নিয়ে তা হলে সেইসময় সারা বিশ্বে আলোচনা হয়েছিল! আসলে মেয়েটার ঝলসে যাওয়া শরীরের ওই ছবিটা এত অ্যাপিলিং ছিল যে, আর্ন্তজাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তান ভিলেন হয়ে গিয়েছিল। পেপার কাটিংসগুলো পড়তে পড়তে কিন্তু একটাই প্রশ্ন কালকেতুর মনে উঠে আসছিল, যাকে নিয়ে এত হই চই, সেই মেয়েটার পরিবারের কোনও খোঁজ করেননি কেন কেউ? এমনও হতে পারে, সেইসময় ওর পরিবার রিফিউজি হয়ে ভারতের কোথাও আশ্রয় নিয়েছিল।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের লেখায় টুকরো তথ্য থেকে বোঝাই যাচ্ছে, গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে ছিল। বোমা পড়ার সময় ওর পরিবারের কয়েকজন মারাও যায়। কালী মন্দিরের আশপাশে ওর ভাই-বোনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। যুদ্ধের ডামাডোলে হয়তো ওর ফ্যামিলির বাকি লোকেরা ধরেই নিয়েছিল, মেয়েটিও বেঁচে নেই। বোমায় ছিন্নভন্ন হয়ে গিয়েছে। সেইজন্য কেউ খোঁজ করেনি। পলাশভাই একবার বলেছিলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার প্রায় এক বছর পর রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প থেকে ওঁর বাবা আমোদপুরে ফিরে যান।

'ছ্যার, হোটেল ফরচুন আইস্যা গেছে।'

ইমনের কথায় জানলা দিয়ে তাকিয়ে কালকেতু দেখল, গাড়ি হোটেলের গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দূর থেকে ও সুদীশকে দেখতে পেল। স্যুট-টাই পরে দাঁড়িয়ে। ওকে খুব হ্যান্ডসাম লাগছে। লালবাজার থেকে ও

সিঙ্গাপুরে চলে যাওয়ার পর ওর চেহারার মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে। গোয়েন্দা অফিসারের থেকেও এখন ওকে বেশি কর্পোরেট অফিসের ভাইস প্রেসিডেন্ট বলে মনে হয়। ড্রাইভ ওয়ে দিয়ে গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়ানোর পর কালকেতু ডাকল, 'উঠে আয়।'

গাড়িতে উঠেই সুদীশ বলল, 'যাক, তোর সময়জ্ঞানটা তা হলে হয়েছে। ঠিক টাইমে এসেছিস।'

কালকেতু বলল, 'থ্যাঙ্কস টু ইমন। ও ব্রেক ইন না করলে আসতে পারতাম না ভাই।'

সুদীশ জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

গাড়ির লক খোলা নিয়ে সমস্যার ব্যাপারটা দু'এক কথায় বলেই কালকেতু অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'তোর ব্যস্ততা এখন কেমন রে?'

'কেন বল তো?'

'আরে, পলাশভাই তোর সঙ্গে আলাপ করতে চান। তুই আমার বন্ধু, ইন্টারপোলে আছিস শুনে, উনি মাথা খারাপ করে দিচ্ছেন, কবে আমার বাড়িতে নিয়ে আসবেন। আজ ফেরার পথে একবার যাবি?'

'বলতে পারছি না। ইন্টারপোল অফিসে আজকের মিটিংটা কখন শেষ হবে, বুঝতে পারছি না। তোর পলাশভাইয়ের বাড়িতে আমাকে এমনিতেই একবার যেতে হবে।'

'তোর সেই বাংলাদেশি আর ইন্ডিয়ান টেররিস্ট এখনও ধরা পড়েনি?'

'না। ওদের গোপন ডেরায় এফবিআই রেইড করেছিল, সেটা তো আগের দিনই তোকে বলেছি। ওদের যে দুটো পাসপোর্ট পাওয়া গেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে সে দুটো ফেক। ওদের নাম রফিকুল আলম আর ফিরহাদ আলি নয়। তবে, ওদের জিহাদি কোড নাম্বারটা আমরা পেয়েছি। বি টেন আর আই সিক্সটি ফাইভ। এই চ্যানেলটা ধরেই আমাদের এগোতে হবে। ইন্টারপোলের রেকর্ড ঘেঁটে আমরা দেখলাম, আই সিক্সটি ফাইভ অসমের করিমগঞ্জের

ছেলে। ছেলেটা ডেয়ার ডেভিল টাইপের ছিল। যাই হোক, অসমে আমাদের লোকজন খোঁজ নিচ্ছে।'

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'আর বাংলাদেশি ছেলেটা?'

'তোকে বলব না ভেবেছিলাম। তবুও বলছি, এই সেই টেররিস্ট যে, নিউ ইয়র্কে তোকে খুন করতে গেছিল। এফবিআই ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত। অ্যাপার্টমেন্টের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা থেকে ওর একটা ইমেজ পাওয়া গেছে। মুখে ভূতের মুখোশ ছিল, তা সত্ত্বেও। কম্পিউটার গ্রাফিক্স মারফৎ মুখটা ক্লিন করে বি টেনের একটা ভাসাভাসা ছবি আমাদের হাতে এসেছে। দু'তিনদিন আগে ইন্দো-পাক স্টোরে একজন বাংলাদেশিকে রেস্টুরেন্টে বসে খেতে দেখা গেছে, যার সাথে বি টেনের খানিকটা মেলে। মোটামুটি এটা ঠিক, ছেলে দুটো নিউ জার্সি থেকে এখনও চলে যায়নি বা যেতে চায়নি। আমাদের জালে ধরা পড়বেই।'

'আমাদের সাব কন্টিনেন্ট থেকে কেন ছেলেরা জিহাদি হচ্ছে? তোদের কী ধারণা?'

'আউট অব ফ্রাস্ট্রেশন। ব্যক্তিগত জীবনে কোনও না কোনও আঘাত পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে অ্যাডভেঞ্চার করতে যাচ্ছে। আমাদের সময় ছেলেরা যেমন নকশাল হয়ে যেত। একবার পা বাড়িয়ে ফেললে তো আর ফেরার কোনও পথ ওদের সামনে খোলা থাকে না। এই যে বাংলাদেশি ছেলেটার কথা তোকে বলছিলাম, তার অবস্থা প্যাথেটিক। এফবিআইয়ের কাছে খবর আছে, মামুন আল-ফারখ বলে এক সিরিয়ান জিহাদি একে খুঁজে বেরাচ্ছে নিউ জার্সিতে। পেলেই খুন করে দেবে। এফবিআই যে মামুনের উপর লক্ষ রাখছে, সেটা আবার সে জানে না।'

'আমি বুঝতে পারছি না, টেররিস্টরা আমাকে মারার চেষ্টা করল কেন? আমেরিকায় আমি যে কাজে এসেছি, তার সঙ্গে ওদের তো কোনও শত্রুতা নেই।'

‘কেন তোকে খুন করতে বলা হয়েছিল, সেটা বোধহয় ওরা নিজেরাও জানত না। এই জিহাদিদের তো কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। ইসলামের নামে এরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। কত নিরীহ লোক যে ওয়েস্ট এশিয়ায় মারা যাচ্ছে, তার হিসেব নেই। মাঝে মাঝে খারাপ লাগে কিছু কেস হিস্ট্রি দেখে। আমাদের সাবকন্টিনেন্ট থেকে কিছু ছেলে এই সো কলড হোলি ওয়ারে ঢুকেছে। কারও বয়স কুড়ি-বাইশ। কারও পঁচিশ-তিরিশ। ফর নাথিং, লাইফ বরবাদ করে ফেলল। ধর্মযুদ্ধের কাজে এদের ডেকে নেওয়া হয় বটে, কিন্তু জিহাদিদের কাছেও এরা ভাল ট্রিটমেন্ট পায় না। আসলে এদের দিয়ে কায়িক পরিশ্রমের কাজগুলো করানো হয়। এরা কেউ মিলিট্যান্টদের গাড়ি চালায়, রান্নাবান্না করে, বাসন ধোয়, জামাকাপড় কাচে। বলতে গেলে খিদমত খাটে।’

‘কী বলছিস তুই!!’

‘ঠিকই বলছি। কখনও কখনও চূড়ান্ত রিস্কি কাজেও ঠেলে দেওয়া হয় এদের। আর এরা বোকার মতো ঝাঁপিয়েও পড়ে তাতে। এই যেমন, নায়গারায় ওই বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে খুন করতে পাঠানো হয়েছিল। নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে তোকে। ক্যালিফেট থেকে বেরিয়ে অ্যাকশন করতে যাওয়ার পর এদের অনেকে আবার পালিয়েও যায়। অথবা দুঃসাহসিক কম্ম করতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ হারায়। শখের জিহাদিদের সংখ্যা ইদানীং এমন কমে যাচ্ছে, ওদের ওয়েবসাইটে সেদিন দেখলাম, ক্যালিফরা আবেদন করেছেন, যত শিগগির সম্ভব প্রচুর নতুন ছেলে-মেয়ে জোগাড় করো।’

‘ধরা পড়লে এদের কী শাস্তি হয় রে?’

‘ফাঁসি, মিনিমাম লাইফলং ইম্প্রিজনমেন্ট। তবে, যারা রাজসাক্ষী হয়, তাদের কথা আলাদা। বুদ্ধিমানের মতো এরা কেউ যদি আর্মি বা পুলিশের কাছে সারেন্ডার করে, তা হলে প্রাণে তো বাঁচবেই, সুস্থ জীবনে ফিরেও যেতে পারে। দ্যাখ, আমি তো ঠিক করেছি, বাংলাদেশি আর ইন্ডিয়ান

জিহাদি দুটোকে যদি আমি ধরতে পারি, তা হলে ওদের অপশন দেব। হয় তুমি রাজসাক্ষী হও, না হয় সারা জীবন জেলে পচে মরো। এই দ্যাখ না, অসমের যে ছেলেটা... আই সিক্সটি ফাইভ... এখানে লুকিয়ে আছে, অথচ তার বাড়ির অবস্থা কী ভয়ানক, সম্ভবত ও জানে না। হিন্দু র‍্যাডিক্যাল গ্রুপের লোকেরা ওর বাবাকে গুলি করে মেরেছে। ওর একভাই নিখোঁজ। ওর মা-বোন করিমগঞ্জের বাস স্ট্যান্ডের কাছে একটা ঝুপড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। মা আর বোন জানেই না, ছেলেটা জিহাদি হয়ে গেছে।'

'ওর বাবাকে হিন্দুরা মেরে ফেলল কেন?'

'অনুপ্রবেশকারীর তকমা দিয়ে। তুই তো জানিস, সেন্ট্রাল গর্ভমেন্ট নতুন একটু পলিসি নিয়েছে, ১৯৭২ সালের পর যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছে, তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে। হয়তো ছেলেটার বাবা মানতে চায়নি। আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই কারণে হিন্দু র‍্যাডিক্যাল গ্রুপের রাগ। তুই ভাব, আই সিক্সটি ফাইভের কানে যখন এই খবরটা পৌঁছবে, তখন ওর মনে কী রিঅ্যাকশন হতে পারে? একদিকে যেমন বাড়িতে ফিরতে পারবে না, তেমনই জিহাদিদের ক্যালিফেটে। এদের কী করা উচিত জানিস, সারেন্ডার করা।'

'কী গ্যারান্টি আছে, তোরা এদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দিতে পারবি?'

'একজাম্পল আছে। ব্রিটেনে সম্ভব হয়েছে, আমেরিকায় হয়েছে। যারা অনুতপ্ত, তাদের ক্ষমার চোখে দেখা হচ্ছে। দু'তিন বছর জেল খাটার পর এরা কেউ সিকিউরিটি ফোর্সে চাকরি করছে। কেউ বই লিখছে। এমন কী, কেউ কেউ ইউনিভার্সিটিতে জিহাদি বিরোধী লেকচার দিয়ে ভাল রোজগারও করছে। যাদের পেটে বিদ্যে আছে, তাদের চাকরি পেতেও অসুবিধে হচ্ছে না।

'এই মেসেজটাই তোরা জিহাদিদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিস না কেন?'

‘সে চেষ্টা শুরু হয়েছে। আমি তো সেদিন একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে বলেছি, জিহাদের পথে যারা চলে গেছে, তাদের ভয় দেখিও না। সমাজের মূল স্রোতে যারা ফিরে আসতে চায়, তাদের ফিরে আসতে দাও। বন্দি জিহাদিদের প্রকৃত জ্ঞানী মৌলবীদের সামনে দাঁড় করিয়ে দাও। ইসলাম নিয়ে তারা সত্যি কথাটা শুনুক। শরিয়তে কী লেখা আছে, কী নেই। তা হলেই ওরা বুঝতে পারবে, আসল-নকল কী?’

‘তুই হয়তো ঠিকই বলেছিস সুদীশ।’

কথায় কথায় গাড়ি মিডটাউন ম্যানহাটনে পৌঁছে গিয়েছে। ফর্টি ফোর্থ স্ট্রিটে ইন্টারপোল অফিসের সামনে সুদীশ নেমে যাওয়ার পর কালকেতু পিছনের সিট বদলে সামনে চলে এল। তখনই ইমন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ‘ছ্যার, কিছু মনে কইরেন না, একডা কথা জিগামু?’

কালকেতু বলল, ‘এত ইতস্তত করছ কেন ইমন, বলো।’

‘আফনের এই বন্ধুডা হুনলাম ইন্টারপোলে কাম করে?’

‘হ্যাঁ। বড় অফিসার। থাকে কলকাতায়। কেন বলো তো?’

‘না, কথাবার্তা শুইন্যা খুব ভালা লাগল। কাইন্ড হার্টেড ম্যান।’

শুনে মনে মনে হাসল কালকেতু। সুদীশ দয়া-মায়া করার মানুষ, শুনলে কলকাতার কোনও অপরাধী বিশ্বাস করবে না। সত্যি কথা বলতে কী, ওর কথাবার্তা শুনে আজ কালকেতু নিজেও খুব অবাক। কখনও কখনও ওর মনে হচ্ছিল, সুদীশ যা বলছে, মন থেকে বলছে না। কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বলছে। একটু পরেই ওর কৌতূহল মিটে গেল, ফোনে একটা মেসেজ পেয়ে। ‘এতক্ষণ যে বাংলাদেশি জিহাদির কথা তোকে বলছিলাম, সে তোর গাড়ি চালাচ্ছে। এই ছেলেটাই নিউ ইয়র্কে তোকে খুন করতে গেছিল। ওর ডান হাতে গ্লাভস দেখতে পাচ্ছিস? তোরই কীর্তি। কাচের ফুলদানি লাগার ক্ষত। এখনও সারেনি। শোন, কাউকে কিছু বলিস না। ওকে আর ওর

সাঙাৎকে চোখে চোখে রাখিস। ওদের সময়মতো তুলে নেব পলাশভাইয়ের বাড়ি থেকে।'

মাই গুডনেস! বাঁ দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কালকেতু দেখল, সত্যিই ইমন ছেলেটার ডান হাতে গ্লাভস! সুদীশ কি মজা করার জন্য মেসেজটা পাঠিয়েছে? না, ও তো সে রকম মানুষ না। ইমন ছেলেটাকে দেখে অবশ্য মনে হয় না, জিহাদি। নম্র ভদ্র ছেলে। জিহাদিদের সম্পর্কে কালকেতু যতটা পড়াশুনো করেছে, সে রকম মোটেই না। ওর সঙ্গী ছেলেটা রাফ টাইপের। সে জিহাদি হলেও হতে পারে। পরক্ষণেই পলাশভাইয়ের জন্য কালকেতুর দুঃশ্চিন্তা শুরু হল। উনি কি জানেন, ছেলে দুটোর আসল পরিচয়? ওঁর বাড়ি থেকে ছেলে দুটো ধরা পড়লে এফবিআই যে পলাশভাইকেও ছাড়বে না। নাহ, ছেলে দুটোকে এবার থেকে চোখে চোখে রাখতে হবে।

(আঠারো)

পার্লারে চুল কাটতে গিয়ে কুইন্সে অ্যাড্রিয়াটিকো রেসিডেন্সিতে ফিরতে পারেননি লিলি গডউইন। গত চারদিন ধরে তিনি হাসপাতালেই রয়েছেন। সিনেগগে গুলি, বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গেসঙ্গে তাঁর অসুস্থতার খবরও মিডিয়া জড়িয়ে দিয়েছে। সারাদিনই নিউজ চ্যানেলের ভ্যান হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। মিডিয়ার কারও সঙ্গে কথা বলেননি লিলি। তাঁর হয়ে বুলেটিন দিয়ে যাচ্ছেন বাম কিম। সিনেগগে গুলি চলার জন্য সেদিন তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল। এক ইহুদি পরিবারের সন্তানের নামকরণ অনুষ্ঠান চলছিল সেই সময়।সেদিনই হত্যাকারী নিউজ চ্যানেলে ফোন করে তাঁর পরিচয় জানিয়ে দেয়। ইহুদি পরিবারের উপর তার ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণেই না কি সে প্রথমে গুলি এবং পরে গ্রেনেড চার্জ করেছিল। পরে নিউ ইয়র্ক পুলিশ পঞ্চাশ বছর বয়সি সেই হত্যাকারীকে গ্রেফতার করে।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দিনই সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন লিলি। কিন্তু বিকেলের দিকে তাঁকে দেখতে এসে ইউনিসেফের কর্তারা পরামর্শ দিয়ে

যান, আরও দু'তিনটে দিন বিশ্রাম নিন। বাম কিমও তখন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, 'ম্যাডাম, এর আগেও একবার আপনি বাড়িতে টিভি দেখার সময় বম্ব ব্লাস্টের দৃশ্য দেখে সেন্সলেস হয়ে পড়েছিলেন। এ বার পার্লারের কাছে তাই হল। বোমার শধ শুনে কেন আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, তার ডাক্তারি ব্যাখ্যা জানা দরকার। এই হাসপাতালে আপনার পরিচিত একজন সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন। ডাক্তার ইউপা সনা মিটার। ওঁর সঙ্গে একবার কনসাল্ট করে নিলে ভাল হয়।'

ডাক্তারের নামটা বাম কিম ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করেছিলেন বলে প্রথমে চিনতে পারেননি লিলি। পরে বুঝতে পারলেন উপাসনা মিত্র। ভদ্রমহিলা কলকাতার, পড়াশুনো ইংল্যান্ডে। কিন্তু চাকরি করতেন লস অ্যাঞ্জিলেসের এক হাসপাতালে। চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের ওয়ার্কশপে তিনি একবার এসেছিলেন চাইল্ড সাইকোলজি নিয়ে বলার জন্য। বিশেষ করে, যুদ্ধের কারণে অনাথ হওয়া বাচ্চাদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে। ডাক্তার উপাসনা এখন নিউ ইয়র্কে? ডাক্তারের নামটা শুনে লিলি থেকে যান হাসপাতালে। কিন্তু এখন শুভানুধ্যায়ীদের ভিড়ে মাঝে মাঝে তিনি বিরক্তবোধ করছেন। সকাল-বিকাল ফুলের তোড়ায় কেবিন ভরে যাচ্ছে। ফাউন্ডেশনের জন্য তিনি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞ, আবার ইউনিসেফের জন্য অনেকেই তাঁর কৃপাপ্রার্থী। কাকে তিনি আসতে মানা করবেন? মিডিয়ায় খবরটা বেরিয়ে যাওয়ায় যত গণ্ডগোল!

ডাক্তার উপাসনা সকালে লিলিকে নিয়ে এসেছেন নিজের চেম্বারে। শারীরিক অসুবিধের কথা একবারও তিনি জিজ্ঞেস করছেন না। উনি শুধু নিজের কৌতূহল মিটিয়ে নিচ্ছেন। রোগ সম্পর্কে যত না প্রশ্ন, তার চেয়ে বেশি জানার আগ্রহ চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশন সম্পর্কে। 'ম্যাডাম, চ্যারিটি নেভিগেটর রিপোর্টে দেখলাম, আপনাদের ফাউন্ডেশন এখন আমেরিকার

এক নম্বরে রয়েছে। খুব জানতে ইচ্ছে হয়, কী করে পারলেন, এত বড় একটা এনপিও গড়ে তুলতে?'

প্রথম প্রশ্নটা শুনেই ডাক্তার উপাসনা সম্পর্কে ধারণা বদলে গেছিল লিলির। ডাক্তারির কাজটা শুধু মাত্র মেডিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করা নয়। সঙ্গে সঙ্গে পেসেন্ট সম্পর্কেও ভালমতো খোঁজখবর নিয়ে, তার পর রোগ নিরাময়ে নামা। কথাটা তখন মনে হয়েছিল এই কারণে, চ্যারিটি নেভিগেটরের রিপোর্ট দেখার কথা ডাক্তার উপাসনার নয়। আমেরিকায় প্রায় নয় হাজারের মতো এনপিও বা নন প্রফিট চ্যারিটিবল অর্গানাইজেশন আছে। তারা কোত্থেকে কীভাবে টাকা তোলে, কতটা স্বচ্ছতার সঙ্গে খরচ করে, সেটার উপর নজরদারি করার জন্য সরকার অনুমোদিত একটা সংস্থার নাম চ্যারিটি নেভিগেটর। প্রতি বছর পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে একটা র‍্যাঙ্কিং লিস্ট তৈরি করে এরা। এনপিওগুলোতে যারা নিয়মিত ডোনেশন দেন, তাদের কাছেও সেই তালিকাটা যায়। যাতে ডোনাররা অবহিত হতে পারেন, কোন এনপিও কতটা স্বচ্ছ। ভবিষ্যতে কোন সংস্থাকে তাঁর ডোনেশন দেওয়া উচিত। চ্যারিটি নেভিগেটরের সেই তালিকায় গত তিন বছর ধরে লিলি গডউইনের চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশন এক নম্বরে।

প্রশ্নটা এত ভাল লেগেছিল যে লিলি বলে ফেলেছিলেন, 'এত বড় একটা ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারে সবথেকে প্রথমে আমার আগ্রহ জাগান, আমার মাতৃসমা এক সুইডিশ মহিলা এলসা গিনেসবেরি। উনি আমার মেন্টরও বলতে পারেন। উনি তখন রেড ক্রসের সিনিয়র নার্সের পদ থেকে সদ্য অবসর নিয়েছেন।'

'আপনি কীভাবে ওঁর সংস্পর্শে আসেন মিস গডউইন?'

'খুব ছোটবেলায় পিঠের ক্ষতের জন্য আমাকে বহুদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল। এলসা আন্টি তখন সেবা যত্ন করে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। আমার উপর ওঁর খুব মায়া পড়ে গেছিল। ওঁর মুখেই শুনেছি,

আমি যখন খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠি, তখন আমার পরিবারের লোকজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এলসা আন্টি তখন নিজেই রাজি হন, আমার দায়িত্ব নিতে।

'আপনি আমেরিকায় এলেন কীভাবে?'

'আমার ড্যাডি আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। ডাক্তার অ্যালেন গডউইন। উনি খুব নামকরা ডার্মাটোলজিস্ট। গোটেনবার্গে আমার চিকিৎসা করতেন। ওঁর নিজের তখন সন্তান ছিল না। এলসা আন্টির থেকে আমাকে উনি দত্তক নিয়েছিলেন। পরে আমি যখন স্কুলে, তখন ড্যাডি চাকরি নিয়ে নর্থ ক্যারোলাইনাতে চলে আসেন। তার পর আমার এক ভাই ও বোন হয়। মাম্মি বছর তিনেক আগে মারা গেছেন। কিন্তু ড্যাডি এখন থাকেন নিউ ইয়র্কের গ্রিনউইচ ভিলেজে। বছর দুয়েক আগে পাকাপাকিভাবে উনি এখানে চলে এসেছেন।'

'মিসেস এলসা গিনেসবেরির সঙ্গে এখনও কি আপনার যোগাযোগ আছে?'

'হ্যাঁ আছে। এই তো মিডিয়া মারফৎ খবরটা জেনে উনি হাসপাতালে আমাকে ফোন করেছিলেন। উনি আমার চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা মেম্বার। ওঁর বয়স এখন আশির কাছাকাছি। কিন্তু এখনও কতটা কর্মঠ, না দেখলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। চাইল্ড সাইকোলজি নিয়ে পিএইচডি করার পর আমি তখন ইউনিসেফে চাকরি পেয়েছি। নাইন্টিজ-এর শেষের দিক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। অথবা সিভিল ওয়ার চলছে। খবরের কাগজে প্রায়ই আর্ত বাচ্চাদের ছবি দেখতাম। তাদের সাহায্য করার জন্য আমাকে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হত। তখন এলসা আন্টি আমাকে বললেন, যুদ্ধের কারণে ওই অনাথ শিশুদের জন্য কিছু একটা করলে হয় না? ছোট একটা এনপিও ওঁর ছিলই। সেটাকে আরও বড় করে, চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের আইডিয়া ওঁর মাথায়

আসে। সেটা ইউনিসেফকে জানাতেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উৎসাহ দেন। প্রথম বিরাট অঙ্কের একটা ডোনেশন দিয়েছিল মার্কিন সরকার। আপনি একটা কাজ করুন ডক্টর। আমাদের ওয়েব সাইটে গেলে ডিটেল ইনফর্মেশন পেয়ে যাবেন।'

উপাসনা জিজ্ঞেস করলেন, 'ম্যাডাম, আপনার আর্লি লাইফ নিয়ে তা হলে ভাল বলতে পারবেন একমাত্র এলসা গিনেসবেরি, তাই না?'

লিলি বললেন, 'অবশ্যই। তবে কতটা আপনাকে বলবেন, সে নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। এর আগে মিডিয়ার লোকজন ওর কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উনি বলতে চাননি। আমি নিজেও কৌতূহলী হয়ে একবার জানতে চেয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন, জানতে চেও না। তোমার ক্ষতি হয়ে যাবে। আপনি বরং আমার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

'আপনার সমস্যাটা কী মিস গডউইন? বাম কিম বলছিলেন, বম্ব ব্লাস্টের দৃশ্য দেখলে না কি আপনি সেন্সলেস হয়ে যাচ্ছেন? অ্যাম আই রাইট?'

'উনি ঠিকই বলেছেন।'

'সত্যিই কখনও কোথাও চোখের সামনে বম্ব ব্লাস্ট হতে দেখেছেন ম্যাডাম? একটু ভেবে বলুন তো?'

'মনে পড়ে না। আমার চাইল্ডহুড নিয়ে যখনই ভাবতে যাই, তখনই মাথায় খুব যন্ত্রণা অনুভব করি। এলসা আন্টি বারণ করে দেওয়ার পর আমি আর চেষ্টাই করি না। এমনিতেই সারা জীবন পেন কিলার খেয়ে আমার পেটে চড়া পড়ে গেছে। কখনও কখনও ভাবি, আর বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।'

'চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনাকে কতটা স্ট্রেস নিতে হয় ম্যাডাম? রিসেন্টলি এমন কি কোনও ঘটনা ঘটেছিল, যা আপনাকে খুব বিচলিত করেছে? আমার কাছে লুকোবেন না।'

চট করে নায়গারার ঘটনাটার কথা মনে পড়ে গেল লিলি গডউইনের। ডাক্তারের কাছে মুখ বন্ধ রাখা উচিত না। তাই তিনি বললেন, 'স্ট্রেস তো নিতেই হয়। সারা বিশ্বের এখন কত ধরনের এথনিক সমস্যা। তার ফলে বিশ্বের একটা বিরাট একটা অঞ্চল জুড়ে যুদ্ধের আগুন জ্বলছে। সেখান থেকে এমন অনাথ বাচ্চাদের এনে আমরা আশ্রয় দিচ্ছি, যাদের বাবা-কাকারা পরস্পরের বিরুদ্ধে একে ফর্টিসিক্স নিয়ে লড়ছে। বুঝতেই পারছেন, একই ছাদের তলায় তাদের মানুষ করার কতটা স্ট্রেস। তবে আমার কপাল ভাল, সহকর্মীরা সেই স্ট্রেস আমাকে বুঝতেই দেন না। আপনার কাছে গোপন করব না। কিছুদিন আগে নায়গারায় কেউ বা কারা আমাকে লক্ষ করে গুলি করেছিল। প্রাণে বেঁচে গেছি।'

'আই সি।' উপাসনা বললেন, 'ইদানীং আর কোনও ইন্সিডেন্ট যা আপনাকে প্রচণ্ড ভাবাচ্ছে?'

লিলি বললেন, 'ইয়েমেনের বাচ্চারা। যখনই ওদের কথা ভাবছি, তখনই মনটা দুঃখে ভরে যাচ্ছে। হাজার হাজার বাচ্চা না খেতে পেয়ে ওখানে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। তাদের বয়স পাঁচ থেকে পনেরোর মধ্যে। দাঁড়ান, একটা বাচ্চার ছবি আপনাকে দেখাই। তা হলে বুঝতে পারবেন, কী অবস্থা।' কথা বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে মোবাইল ফোনটা টেনে নিলেন লিলি। বাটন টিপে হাড় জিরজিরে একটা মেয়ের ছবি বের করে উনি বললেন, 'এই মেয়েটার বয়স বারো বছর। দেখতেই পারছেন, দিনের পর দিন অভুক্ত থাকার জন্য কী হাল হয়েছে। শরীরের খাঁচা দুমড়ে গেছে। হাড়ের উপর চামড়াটা শুধু লেগে রয়েছে।'

'মাই গুডনেস! এদের জন্য আপনারা এইড পাঠাচ্ছেন না কেন?'

'পাঠানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ইয়েমেনে সিভিল ওয়ার চলছে। শিয়া-সুন্নির লড়াই। দেশটা ইরানের দিকে ঝুঁকে পড়ায় সৌদি আরব চটে গেছে। ইয়েমেনে ওরা নিয়মিত এয়ার স্ট্রাইক করে যাচ্ছে। আমার ফাউন্ডেশনের

লোকজন জাহাজে করে খাবার-দাবার আর ওষুধ নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সৌদি আরব সেনারা সেসব বন্দরে আটকে দিয়েছে। ডিসট্রিবিউট করতে দেয়নি।'

খানিকক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন উপাসনা। আর পর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ঘনিষ্ঠ এমন কোনও বন্ধু কি আছে, যাকে আপনি মনের কথা খুলে বলেন? তার সঙ্গে আমায় কথা বলতে হবে।'

লিলি বললেন, 'যে বয়সে বন্ধুত্ব হয়, সেই বয়সে আমি বিছানায় শয্যাশায়ী থাকতাম। জানলার কাচ দিয়ে দেখতাম, প্রতিবেশী সমবয়সি ছেলে-মেয়েরা কোর্ট ইয়ার্ড বা লনে বাস্কেটবল খেলছে। ইচ্ছে থাকলেও আমার শরীর তখন পারমিট করত না। ড্যাডি চিকিৎসা করে যখন একটু সুস্থ করে তুললেন, তখন মাম্মি কারও সঙ্গে মিশতে দিতেন না, ইনফেকশনের ভয়ে। তখন ওঁরা দু'জনই আমার বন্ধু ছিলেন। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় নিজে চলাফেরা করতে পারতাম। তখন অবশ্য মাম্মির অত কড়াকড়ি ছিল না।'

'ম্যাডাম, কখনও আর পাঁচটা মেয়ের মতো আপনার বিয়ে করার ইচ্ছে হয়নি?'

প্রশ্নটা শুনে লিলি থমকে গেলেন। মুহূর্তে তাঁর চোখের সামনে আন্দ্রিয়াস অ্যান্ডারসন... অ্যান্ডির হ্যান্ডসাম চেহারাটা ভেসে উঠল। এলসা আন্টির বোনপো। ইউনিভার্সিটিতে তাঁর সহপাঠী। দু'জনে মিলে সেন্ট্রাল পার্কে বসে আইসক্রিম খাওয়া, ম্যানহাটনের রাস্তা দিয়ে টাইমস স্কোয়্যারে হেঁটে যাওয়া, ব্রডওয়েতে গিয়ে সিনেমা দেখা, লাইব্রেরিতে বসে একসঙ্গে পড়াশুনা করা... কত স্মৃতি। অ্যান্ডি এখন লাস ভেগাসের একটা হোটেলের মালিক। ও বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু লিলি সেই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে এলসা আন্টি একটা কঠিন সত্য জানিয়ে ছিলেন। 'জীবনে মা হতে পারবে না।' শুনে লিলি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেননি। অ্যান্ডিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এখনও অ্যান্ডি প্রতি বছর থ্যাঙ্কস গিভিংয়ের সময় গিফট আর ক্রিসমাসের সময়

নিয়মিত কার্ড পাঠায়। বছরে এই দু'দিন মাত্র ফোন করে। দু'জনের সম্পর্ক ঠিক এই জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে। ডক্টর উপাসনা উত্তর শোনার আগ্রহে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে লিলি বললেন, 'বিয়ে করার ইচ্ছে একবার হয়েছিল। কিন্তু শরীরের অপূর্ণতা আমাকে বেশিদূর এগোতে দেয়নি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ মিস গডউইন। আজ এটুকুই। পরে একদিন আবার বসা যাবে।' বলে উপাসনা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

করিডর দিয়ে নিজের কেবিনের দিকে ফেরার সময় হঠাৎ লিলির মনে পড়ল, এ বার থ্যাঙ্কস গিভিং ডে-টা কি পেরিয়ে গেছে? দু'একদিনের মধ্যে হওয়ার কথা। হাসপাতালে শুয়ে থাকার জন্য তাঁর মনে নেই। অ্যান্ডি কি এ বারও গিফট পাঠিয়েছে? কে জানে, হয়তো কুরিয়্যর মারফৎ সেই গিফট আড্রিয়াটিকা রেসিডেন্সির বাড়িতে পৌঁছে পড়ে রয়েছে। তিনি জানেনও না। লিফটে করে দশতলায় উঠতেই লিলি দেখলেন, বাম কিম অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন কেবিনের সামনে। কাছে এসে উনি বললেন, 'ম্যাডাম, আপনার এত দেরি হচ্ছে দেখে আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। ইউপা সনা কী বললেন?'

লিলি বললেন, 'কাউন্সিলিংয়ের জন্য আরও একদিন ডাকবেন।'

'ম্যাডাম, আমাদের এক বড় ডোনার আপনার জন্য অনেকক্ষণ রিসেপশনে অপেক্ষা করছেন। ওঁকে কি উঠে আসতে বলব?'

'ভদ্রলোক কোত্থেকে এসেছেন মি. কিম?'

'লাস ভেগাস থেকে। ওখানকার সবথেকে বড় হোটেল... ভেনিসিয়ানের অন্যতম মালিক আন্দ্রেয়াস অ্যান্ডারসন।' বলতে বলতে বাম কিম খুব উত্তেজিত, 'নামটা শুনতেই চিনতে পারলাম, গত বছর উনি হাফ এ মিলিয়ন ডলার ডোনেশন দিয়েছিলেন। ম্যাডাম আপনি তো কখনও বলেননি, ওকে চেনেন? মিডিয়ায় আপনার অসুস্থতার খবর শুনে লাস ভেগাস থেকে উনি

উড়ে এসেছেন। জানি না, এতক্ষণ বসে আছেন কি না। আপনি যদি বলেন, তা হলে আমি নিজে গিয়ে ওকে ডেকে আনতে পারি।'

কী আশ্চর্য! একটু আগেই অ্যান্ডির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। সে এখন সশরীরে নিউ ইয়র্কে! এমন ঘটনাও ঘটে! ভেবে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল সারা শরীরে। কী ভেবে লিলি প্রশ্ন করলেন, 'মি. কিম, থ্যাঙ্কস গিভিং ডে-টা কি আজকে?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম, কেন বলুন তো?'

'নাহ, তেমন কোনও কারণ নেই। চলুন, আমিই আপনার সঙ্গে রিসেপশনে যাই। আফটার অল, উনি আমাদের বড় ডোনার। ওকে খাতির করা উচিত।'

বাম কিম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। দেখে, মনে মনে হেসে ফের লিফটের দিকে পা বাড়ালেন লিলি গডউইন।

(উনিশ)

চিরাগ সেদিন বলেছিল বটে, ডিনারের পর আউট হাউসের বেসমেন্টে চোরাকুঠুরিতে নিয়ে যাবে। কিন্তু ওকে নিয়ে যাওয়ার কোনও আগ্রহই দেখায়নি। ইদানীং ওর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না ইমন। কোত্থেকে সব বাজে বাজে খবর পাচ্ছে, কে জানে? পলাশছ্যারের সঙ্গে না কি জিহাদিদের যোগাযোগ আছে! কোন দুঃখে মানুষটা জিহাদিদের সংস্পর্শে আসতে যাবেন। উনি কি জানেন না, এর পরিণাম কী হতে পারে? কোটি কোটি টাকার ব্যাবসা জলে দেওয়ার ঝুঁকি কি কোনও সুস্থ মানুষ নিতে পারেন? রোজিনা ম্যাডামই বা সেটা অ্যালাউ করবেন কেন? পলাশছ্যারকে দেখে তো মনে হয়, উনি রোজিনা ম্যাডামের পরামর্শ ছাড়া এক পাও নড়েন না।

চিরাগের মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছে ইমন। ওর কথাবার্তাগুলো ইদানীং সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। রোজিনা ম্যাডাম সম্পর্কে ও কটু মন্তব্য

করে। প্রায়ই বলে, সুযোগ পেলে ম্যাডামকে একদিন বিছানায় চিত করে শোয়াবেই। ক্যালিফেটে থাকার সময় নারীদেহের প্রতি ওর টান দেখেছে ইমন। সিরিয়ান, ইরাকিরা যে সব কুর্দ মেয়েকে বাড়ি বাড়ি থেকে তুলে এনে ধর্ষণ করত, পরে তাদের ভোগ করার জন্য তক্কে তক্কে থাকত চিরাগ। রাক্কায় একবার একটা সিরিয়ান মেয়েকে তুলে এনে ও মারাত্মক বিপদের মধ্যে পড়েছিল। মেয়েটির নামও ইমনের মনে আছে... ওলা। একটা পরিত্যক্ত স্কুলবাড়িতে মেয়েটাকে আটকে রেখে কয়েকটা দিন ধর্ষণ করেছিল চিরাগ। সেই অঞ্চলটা আমেরিকানরা দখল করে নেওয়ার পর, মেয়েটাকে উদ্ধার করে সিরিয়ান সরকারের জওয়ানরা। তখন শ্যুট অ্যাট সাইট জারি হয়েছিল চিরাগের বিরুদ্ধে।

কালকেতুছ্যারকে নিউ ইয়র্ক টাইমস অফিসে নামিয়ে দিয়ে ইমন গাড়িটা নিয়ে চলে এসেছে কলম্বাস সার্কেলের কাছে সেন্ট্রাল পার্কে। নিউ ইয়র্কের অন্যতম ব্যস্ত জায়গা। মেট্রো ট্রেনে করে এসে কেজো লোকেরা অফিস পাড়ায় চলে যায়। আর ট্যুরিস্টরা ঢুকে পড়ে সেন্ট্রাল পার্কে। দেখে ইমন অবাক হল, একটা রিকশা স্ট্যান্ড রয়েছে পার্কে। তাতে গোটা দশ-বারো সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। ঢাকার মতো আমেরিকাতেও সাইকেল রিকশা ও আশা করেনি। তফাৎটা হল, ঢাকার রিকশায় দু'জন বসতে পারে, সেন্ট্রাল পার্কে চারজন। রিকশাওয়ালারা বেশিরভাগই কালো। বিরাট পার্কটা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য যা ভাড়া চাইছে, ঢাকার লোকেরা তা শুনলে আঁতকে উঠবে।

হাতে ঘণ্টা তিন সময় আছে। গাছের নিচে ছায়ায় একটা বেঞ্চ দেখে ইমন বসে পড়ল। কত দেশের মানুষ পার্কে ঘুরতে এসেছে। ঘনঘন সেলফি তুলছে। ইয়ং ছেলে-মেয়েরা অন্যের হাতে মোবাইল ফোন ধরিয়ে দিয়ে নিজেরা লিপলক করে চুমু খেতে খেতে ছবি তুলছে। কেউ সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কুসুমের কথা মনে পড়ল ইমনের।

আমোদপুরে একদিন ওর কাছে অঙ্ক শিখতে এসেছিল কুসুম। সেইসময় আম্মা-আববুরা কেউ বাড়িতে ছিল না। সেদিন মাথায় কী ভূত চেপেছিল কে জানে? কুসুমকে জড়িয়ে ধরে ও চুমু খেয়েছিল। তখনকার মতো কুসুম নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিল। কিন্তু বেশ কিছুদিন আর ওর ধারে কাছে আসেনি। অপরাধবোধে প্রায় পাগল পাগল অবস্থা হয়েছিল ইমনের। সেই কুসুম যদি আজ রাস্তা-ঘাটে খুল্লমখুল্লা চুমু খাওয়ার দৃশ্য দেখত, তা হলে ওর কী প্রতিক্রিয়া হত? কথাটা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইমন।

পার্কে ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে কত লোক কতভাবে রোজগার করছে। কেউ জিমন্যাস্টিক্স দেখাচ্ছে। তাকে ঘিরে বেশ ভাল ভিড়। রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট স্টল নিয়ে বসেছে কিছু লোক। নানা ধরনের মেমেন্টো বিক্রি করছে। শিল্পীরা ক্যানভাস আর ক্রেয়ন পেনসিল নিয়ে ছবি আঁকার জন্য বসে আছে। পথচলতি ট্যুরিস্ট বসে পড়ছে তাদের টুলে। সে দিকে তাকিয়ে ইমনের চেনা চেনা একটা মেয়েকে চোখে পড়ল। একটু ভাবতেই ওর মনে পড়ল, আরে, এই মেক্সিকান মেয়েটাই তো পলাশছ্যারের বাড়িতে রোজ রুম ক্লিনিংয়ের জন্য আসে! তখন ওর গায়ে সাদা অ্যাপ্রন থাকে। কিন্তু এখন মেয়েটা টপ আর জিনস পরে আছে। কাঁধে একটা ব্যাগ। মেয়েটার নাম ও জানে না। কিন্তু দেখা হলেই খুব মিষ্টি হাসি মুখে ধরে রাখে। মেয়েটার সঙ্গে একজন বান্ধবীও আছে। সে ছবি আঁকাতে চায়। কিন্তু মেক্সিকান মেয়েটা রাজি হচ্ছে না। কী মনে হল, ইমন বেঞ্চ থেকে উঠে মেয়েটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

চোখাচোখি হতে মেয়েটা মিষ্টি হেসে বলল, 'ইউ! হিয়ার?'

মেয়েটা তা হলে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে। বুঝতে পেরে ইমন ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তুমি চিনতে পেরেছ?'

'কেন চিনব না? তুমি তো রোজিনা ম্যাডামদের সিকিউরিটি স্টাফ।'

‘সরি, তোমার নামটা আমি কিন্তু জানি না।’

‘আমার নাম লারেইনা। আমাকে তুমি লানা বলেও ডাকতে পারো।’

‘লারেইনা কথাটার মানে কী?’

‘স্প্যানিশে লারেইনা কথাটার মানে হল, কুইন।’

‘তোমার বাবা-মা সঠিক নামটাই রেখেছেন। তোমাকে রানির মতোই দেখতে।’

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠে লারেইনা বলল, ‘গ্রাসিয়াস’। ধন্যবাদ। ওর বান্ধবী ইতিমধ্যে বসে পড়েছে ছবি আঁকাতে। নিশ্চয়ই পনেরো-কুড়ি মিনিট সময় নেবে। ইমন বলল, ‘চলো, ছায়ায় গিয়ে বসি। তোমার সঙ্গে গল্প করা যাক।’

লারেইনা কিন্তু না করল না। কয়েক পা হেঁটে ওরা দু’জন বেঞ্চে এসে বসল। ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে এক ঢোঁক খেয়ে লারেইনা সেটা এগিয়ে দিল ওর দিকে। তার পর বলল, ‘তুমি কি এখানে বেড়াতে এসেছ?’

ইমন বলল, ‘না। রোজিনা ম্যাডামের বাড়িতে মি. ন্যান্ডি বলে যে গেস্ট আছেন, তাঁকে আমি নিউ ইয়র্কে নিয়ে এসেছি। ঘন্টা দুয়েক পর তাঁকে নিয়ে ফের আমাকে নিউ জার্সিতে ফিরতে হবে। ইচ্ছে করলে তুমিও আমাদের সঙ্গে ফিরতে পারো।’

‘সম্ভব হবে না। নিউ মেক্সিকো থেকে আমার এক বান্ধবী এসেছে। ওই যে... সে এখন আর্টিস্টের কাছে বসে ছবি আঁকাচ্ছে। ওর জন্যই আমার সেন্ট্রাল পার্কে আসা। আমিও আগে কখনও এই পার্কে আসিনি। এ বার এসে খুব ভাল লাগল। পার্কের ভিতরটা কি তুমি ঘুরে দেখার সময় পেয়েছ? এখানে অনেকগুলো সুন্দর স্পট আছে।’

‘না, এখনও ভিতরে ঢুকিনি। আমি খুব অল্পদিন হল ইস্টকোস্টে এসেছি।’

‘তুমি কি বাংলাদেশি? তোমাকে আমি বাংলায় কথা বলতে শুনেছি।’

শুনে চমকে উঠল ইমন। জিজ্ঞেস করল, 'বাংলা ভাষা নিয়ে তোমার আইডিয়া হল কী করে?'

'রোজিনা ম্যাডামের মায়ের কাছ থেকে। হেমলতা আন্টি বাংলাদেশি, থাকেন নিউ মেক্সিকোতে।'

'তুমিও কি নিউ মেক্সিকোর মেয়ে?'

'হ্যাঁ। ওই স্টেটে আলবুকার্ক বলে একটা শহর আছে। আমি সেখানকার মেয়ে। সেখান থেকে রোজিনা ম্যাডাম আমাকে নিউ জার্সিতে নিয়ে এসেছেন। আমি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। রোজিনা ম্যাডাম আমার পড়ার সব খরচা দেন। হায়ার এডুকেশনের জন্য এখানে প্রচুর খরচ।'

'তুমি কী নিয়ে পড়ছ লারেইনা?'

'ক্রিমিনাল সাইকোলজি। আমার স্বপ্ন এফবিআই অফিসার হওয়া। আগামী বছরই পরীক্ষায় বসব।'

'পুলিশ অফিসার হওয়ার ইচ্ছে হল কেন তোমার?'

'নিউ মেক্সিকোতে ড্রাগ ডিলারদের গুলিতে আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। অপরাধীরা কোনও শাস্তি পায়নি। সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি পুলিশ অফিসার হব।'

'রোজিনা ম্যাডামকে তুমি কতদিন ধরে চেনো?'

'একেবারে বাচ্চা বয়স থেকে। ম্যাডামের ড্যাডির একটা বিশাল র‍্যাঞ্চ আছে আলবুকার্কে। আমার বাবা ওখানেই চাকরি করতেন সিকিউরিটি চিফ হিসেবে। রোজিনা ম্যাডাম অস্টিন ইউনিভার্সিটিতে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। র‍্যাঞ্চে যখন ছুটি কাটাতে যেতেন, তখন থেকেই উনি আমাকে চেনেন। বলতে পারেন, উনি আমার মেন্টর। আমি ম্যাডামের কাছে হর্স রাইডিং শিখেছি, আর্মস চালানোও। আপনি বোধহয় জানেন না, রোজিনা ম্যাডাম দেখতে নরম সরম হলেও, ভিতর ভিতর ভয়ানক টাফ।

দু'হাতে পিস্তল চালাতে পারেন। তা ছাড়া, উনি ক্যারাটের ব্ল্যাকবেল্ট। র‍্যাঞ্চে যেসব ড্রাগ ডিলার ঝামেলা করত, তাদের উনি শায়েস্তা করতেন।'

শুনে ইমন খানিকটা অবাকই হল। ম্যাডামকে দেখে বোঝা যায় না, ওঁর এতসব গুণ আছে। চিরাগকে সাবধান করে দিতে হবে। ও যদি ম্যাডামের উপর বলপ্রয়োগ করতে যায়, তা হলে মুশকিলে পড়বে। চট করে ইমনের আরেকটা কথাও মনে এল। এই নিষ্পাপ মেয়েটা আবার চিরাগের কুনজরে পড়েনি তো? অনেকদিন যৌনসংসর্গ করেনি, এখন চিরাগ খ্যাপা কুত্তার মতো হয়ে আছে। সপ্তাহে দু'দিন করে লারেইনা মেয়েটা ওদের আউট হাউসে যায়। রুম ক্লিনিং করার জন্য অনেকটা সময় ওদের ঘরে থাকে। সেইসময় মেয়েটাকে বিছানায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তো চিরাগ মুখ পোড়াবে। কথাটা মনে হওয়ার পর ইমন ঠিক করে নিল, এর পর থেকে লারেইনা যখন ওদের ঘরে যাবে, তখন চিরাগের উপর ও নজর রাখবে।

ইমন জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাডামের মতো তুমিও কি মার্শাল আর্টস শিখেছ লারেইনা?'

'হ্যাঁ। আমার সেলফ ডিফেন্সের সার্টিফিকেট নেওয়া আছে। থাই বক্সিং শিখেছি ট্রেনারের কাছে। ক্যারাটে ট্রেনিং নিচ্ছি। আমি যখন এফবিআইতে চাকরি করব, তখন এ সব আমার কাজে লাগবে।'

'এত সময় পাও কখন?'

'সময় করে নিতে হয়। আমার কথা ছাড়ো ইমন, এ বার তোমার কথা বলো।'

লারেইনা এমন আন্তরিকভাবে জানতে চাইল যে, ইমন ভুলে গেল ও নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে। ওর মনে হল, কুসম ওর পাশে বসে আছে। বাজিতপুরের বাদাবনে ওরা বেড়াতে গেছে। সফটওয়ার নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার দার্ঘদিন পর ও দেশের বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। কুসুম ওকে একই প্রশ্ন করছে, 'অহন তোমার কথা কও ইমন।'

কানাঘুষোয় ইমন তখন শুনতে পাচ্ছে, রাজাকার হওয়ার অপরাধে ওর দাদামশয়কে পুলিশ যে কোনওদিন তুলে নিয়ে যেতে পারে। ওর মন তখন ভীষণ খারাপ। সেই পরিস্থিতিতে কুসুমকে কী উত্তর দেবে, ও ভেবে পাচ্ছিল না। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে কুসুম বলেছিল, 'অহন চাকরি করবা, না এম টেক করার কথা ভাববা। আমার আববু অবশ্য কইতাসিল, এথিক্যাল হ্যাকিং লইয়া তোমার এত ইন্টারেস্ট। হেইসাবজেক্টডা লইয়াই তোমার আরও আগোইয়া যাওয়া উচিত। তাইলে না কি ফিউচারে তোমার চাকরির অভাব অইব না। কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে তোমার মারাত্মক ডিমান্ড অইব।'

কুসুমের কথাগুলো কেটে কেটে যাচ্ছে। বর্তমানে ফিরে এসে ইমন দেখল, উত্তরের আশায় লারেইনা সাগ্রহে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের সম্পর্কে সত্যি কথাটা বলার সাহস ওর নেই। ও একইসঙ্গে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার, হ্যাকিং এক্সপার্ট, তালা ভাঙার জাদুকর, সর্বশেষে জিহাদি। কোন পরিচয়টা ও দেবে? আনমনা অবস্থায় ও সত্যি কথাটাই বলে ফেলল, 'আমি ফার্স্ট ক্লাস সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। কপাল খারাপ, এখানে এসে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করছি।'

উত্তরটা হাতড়ানোর সময়ই হঠাৎ ইমনের মনে হল, কাছের একটা বেঞ্চ থেকে ওদেরই বয়সি একটা ছেলে ওকে লক্ষ করে যাচ্ছে। গায়ের রং সিরিয়ানদের মতো। মুখ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা। বেঞ্চে কিছু লিফটলেট রাখা আছে। পথচলতি মানুষকে ছেলেটা সেই লিফটলেট বিলি করছে। ভাল করে তাকাতেই ইমনের মনে হল, নাকের গোড়ায় তিল আছে। ছেলেটাকে ও কোথাও দেখেছে। কসোভোর ক্যাম্পে? না কি এখানে কোথাও? একটু ভাবতেই ওর মনে পড়ল, এই রকমই দেখতে একটা ছেলেটাকে ও পাবলিক স্টোরেজে দেখেছে। দু'তিনবার কামাল আর খামিসের কাছে এসেছিল। আজই গাড়িতে আসার সময়, কাইলকেতুছ্যারের বন্ধু

ইন্টারপোলের অফিসার বলছিলেন, জিহাদিরা ওর আর চিরাগের পিছনে একজনকে লাগিয়েছে। তার নাম মামুন আল ফারখ। এ সেই মামুন না কি?

ছেলেটা মামুন হোক বা না হোক, ইমন ঠিক করে নিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে পার্ক থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এত ভিড়ের মাঝে ছেলেটা নিশ্চয়ই ওকে আক্রমণ করার ঝুঁকি নেবে না। লারেইনাকে ঢাল করে পার্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় ও ভাবতে লাগল। ওকে বাঁচিয়ে দিল লারেইনার বন্ধু। ছবি আঁকা হয়ে গেছে। ছবি হাতে মেয়েটা কাছে এসে খুশিতে উচ্ছ্বল হয়ে লারেইনাকে বলল, 'কী সুন্দর এঁকেছে, দেখো।'

ছবিটা দেখে লারেইনা হাসিমুখে বলল, 'এটা তুই লিভিং রুমে বাঁধিয়ে রাখিস।' তার পরই ইমনকে বলল, 'এ আমার বান্ধবী আদেলিনা। মানেটা কী জানো, দয়ালু।'

আদেলিনা মেয়েটা চঞ্চল প্রকৃতির। বেঞ্চে বসে ওদের সঙ্গে আড্ডা মারার কোনও ইচ্ছেই দেখাল না। উল্টে একবার হাতঘড়ি দেখে নিয়ে তাগাদা দিল, 'এই চল, আমাকে এখুনি কলম্বাস সার্কেলে যেতে হবে। ওখানে জনি অপেক্ষা করবে। বেলা তিনটের মধ্যে আমাদের ফ্যাশন অ্যাভিনিউতে পৌঁছতে হবে।'

শুনে লারেইনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার কথা শুনে আমার খারাপই লাগছে ইমন। তুমি যদি ফ্রি থাকো, তা হলে বিকেল পাঁচটার সময় টাইমস স্কোয়্যারে আসতে পারো। আমার এই বন্ধুটা ফ্যাশন ডিজাইনার হতে চায়। সেই কারণেই ওর কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমাদের এখুনি যেতে হবে।'

ইমন বলল, 'আজ সময় হবে না। তবে এখন চলো, তোমাদের সঙ্গে আমিও কলম্বাস সার্কেল অবধি যাই।'

বেঞ্চ থেকে উঠে পা বাড়ানোর সময় ইমন আড়চোখে একবার দেখে নিল, লিফলেট বিলি করা ছেলেটাকে। না, ওদের পিছু নেওয়ার কোনও আগ্রহ

ছেলেটার মধ্যে নেই। অন্যদিকে তাকিয়ে ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। নিশ্চিন্ত হয়ে লারেইনা আর আদেলিনার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল ইমন। মিনিট পাঁচেক হেঁটে বড় রাস্তার কাছে পৌঁছে ওর মনে হল, যেন ঢাকার মীরপুরে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় লোকজনের ভিড়, যানজট। তফাৎ শুধু সাইকেল রিকশার ভেঁপুর শব্দদূষণ নেই। রাস্তার উল্টোদিকে এক পার্কোম্যাটে ও গাড়িটা রেখে এসেছে। মীরপুরের মতো গাড়ির ফাঁক দিয়ে গলে রাস্তার ও পারে যাওয়া যায় না। আমেরিকানরা তাড়াহুড়োও করে না। রাস্তা পেরোতেই ইমনের দশ মিনিট লেগে গেল। কলম্বাস সার্কেল থেকে লারেইনারা পাতাল রেল ধরার জন্য নিচে নেমে যাওয়ার পর ইমন ফের একবার পিছন ফিরে তাকাল। কিন্তু গোঁফ দাঁড়িওয়ালা ছেলেটাকে কোথাও দেখতে পেল না।

পার্কোম্যাট থেকে গাড়ি নিয়ে বেরনোর ঠিক পরই বড় রাস্তায় একজনকে দেখে ইমন তাজ্জব হয়ে গেল। ট্র্যাফিক সিগন্যালে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুসুমের মতো দেখতে একটা মেয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে। পরনে হলুদ রঙের টপ আর নীল জিনসের প্যান্ট। কুসুম না কি!! না, না, তা কী করে হবে? একটু আগে পার্কে বসে ও কুসুমের কথা শুনতে পাচ্ছিল। এখন চোখের সামনে ওকে দেখছে। এও কি সম্ভব? কুসুম কী করে নিউ ইয়র্কে আসবে? ইমন ভেবেই পেল না।

(কুড়ি)

নিউ ইয়র্ক টাইমস অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে কালকেতু একটু হকচকিয়ে গেল। মিডলটাউন ম্যানহাটনের এইটথ অ্যাভেনিউতে তিপ্পান্ন তলা বাড়ি। নিউ ইয়র্কের সবথেকে উঁচু দশটা বাড়ির অন্যতম। ফুটপাথ থেকে উপরের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। কোন তলায় গেলে রিচার্ড গাটম্যানের দেখা পাওয়া যাবে ভাবতে ভাবতে কালকেতু কাচের দরজা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল। আজকাল খবরের কাগজের অফিসে কারও সঙ্গে দেখা করতে গেলে চট

করে দেখা করা যায় না। নানা রকম চেকিংয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। মিডিয়ার অফিসেও টেররিস্টরা হানা দিচ্ছে। মি. গাটম্যান ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন কি না, সেটাও একটা প্রশ্ন। বিল্ডিংয়ের ভিতর ঢুকে কালকেতু দেখল, বিরাট রিসেপশনের পুরো ফ্লোরটা লাল কার্পেটে মোড়া। দুটো কাউন্টারে দু'জন বসে আছেন। একজন মহিলা ও অন্যজন পুরুষ। ও কিছু বলার আগেই ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, 'মে আই হেল্প ইউ জেন্টেলম্যান।'

কালকেতু বলল, 'আমি একজন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট। আপনাদের একজন ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। তাঁর নাম রিচার্ড গাটম্যান। তাঁর সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে?'

'একটু অপেক্ষা করুন। আমি দেখছি, উনি এখনও আছেন কি না?'

কথাটা বলেই ফোনে কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগলেন মহিলা। এদিক ওদিক তাকিয়ে তখনই কালকেতুর চোখে পড়ল দেওয়ালটা। পুরো দেওয়াল জুড়ে বড় নেমপ্লেটের সাইজে অসংখ্য কাচের পর্দা। তাতে নীল আলোর বিন্দু জ্বলছে-নিভছে। সেদিকে ভালভাবে তাকাতেই কালকেতু দেখল, প্রতিটি প্লেটে মুহুর্মুহু খবর বদলাচ্ছে। সারা বিশ্ব জুড়ে যেখানে যা ঘটছে, তার খবর। জাপান থেকে শুরু করে আমেরিকা। আইসল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত। অবাক হয়ে ও খবরগুলোতে চোখ বোলাতে লাগল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিকি অ্যাডামস হুমকি দিয়েছেন, মেক্সিকো সীমান্ত জুড়ে পাঁচিল তোলার জন্য তিনি যতদূর যাওয়ার যাবেন। ইয়েমেনে শিশুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত। ব্রিটেনে ফের ব্রেক্সিট নিয়ে গণভোট হতে পারে।

ভারতের খবরও চোখে পড়ল কালকেতুর। দিল্লিতে এনডিএ সরকারের এক মন্ত্রী এম জে আকবর পদত্যাগ করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে মহিলাঘটিত কেলেংকারির অভিযোগে। আকবর কলকাতার এক নামী ইংরেজি কাগজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি নিরানববুইজন লইয়ার নিয়োগ করেছেন, মানহানির

মামলা করার জন্য। একেকটা লাইন প্লেটে ফুটে ওঠার সঙ্গেসঙ্গে আলো জ্বলছে। মাত্র চার-পাঁচ লাইনে পুরো খবর জানা হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা প্লেটে কালকেতু দেখল, কেরলে ঘূর্ণিঝঞ্ঝায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন আমেরিকায় এসেছেন, প্রবাসী মালয়ালিদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য চাওয়ার জন্য। খেলার খবরও আছে। বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের পিভি সিন্ধু।

'এক্সকিউজ মি জেন্টেলম্যান।'

রিসেপশনিস্ট মহিলার গলা শুনে কালকেতু সে দিকে তাকাতেই উনি বললেন, 'সরি, আপনি যাঁকে খুঁজছেন, তিনি কয়েক বছর আগে রিটায়ার করে গেছেন। মি. গাটম্যান এখন ডালাসে থাকেন।'

শুনে একটু মুষড়ে পড়ল কালকেতু। মি. গাটম্যানের বয়স এখন পঁচাত্তর থেকে আশির মধ্যে। ওঁর তো রিটায়ার করারই কথা। এটা আগে মনে হলে অ্যাদ্দূর ছুটে আসার দরকারই পড়ত না। ও বলল, 'মি. গাটম্যানের কি কোনও কনটাক্ট নাম্বার পাওয়া যাবে?'

'সিওর।' বলে নোটপ্যাড থেকে কাগজ কেটে নিয়ে মহিলা খসখস করে লিখতে শুরু করলেন। তার পর সেই চিরকুট এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মি. গাটম্যানের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার লিখে দিলাম। আপনি কি অন্য আর কারও সঙ্গে দেখা করতে চান। তা হলে আপনাকে আঠারোতলায় যেতে হবে। ওখানে আমাদের এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্ট।'

দু'জনের নাম সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কালকেতুর। গ্যারি স্মিথ আর রব হিউজ। প্রথমজনের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছিল অলিম্পিকে। শেষজনের সঙ্গে বিশ্বকাপ ফুটবলে। ওঁদের লেখা নিয়মিত পড়ত বলে কালকেতু নিজে যেচে আলাপ করেছিল দুই সাংবাদিকের সঙ্গে। তবে ওঁরা মনে রেখেছেন কি না, সন্দেহ। ভদ্রমহিলা উত্তরের অপেক্ষায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন দেখে কালকেতু নাম দুটো বলেই ফেলল। উনি ফের ফোনে কারও সঙ্গে

যোগাযোগ করে বললেন, 'সরি জেন্টেলম্যান। ওঁরা টাইমসের স্টাফ নন। দু'জনেই ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট। টাইমস ওঁদের কলাম কেনে। আপনার নেমকার্ড থাকলে দিয়ে যান। মি. গাটম্যান কোনও কারণে এখানে এলে, তাঁকে কার্ডটা দিতে পারব।'

কাজের কাজ কিছুই হল না। মনে খানিকটা হতাশা নিয়েই কালকেতু ফের রাস্তায় নেমে এল। মাথা হেলিয়ে বাড়িটার শেষতলা দেখার চেষ্টা করেও সফল হল না। দু'একদিন আগে রোজিনা ম্যাডাম গল্প করতে করতে একবার বলছিলেন, 'টাইমস বিল্ডিংটা নিউ ইয়র্কের লোকেদের কাছে খুব গর্বের। সবাই একবার ছাদে যেতে চায়। টিকিট কাটলে ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের একশো দু'তলায় আপনি যেতে পারবেন। কিন্তু টাইমস বাড়ির ছাদ আপনার ধরাছোঁয়ার বাইরে। গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে আজ পর্যন্ত বাইরের মাত্র দু'জন ছাদে পৌঁছতে পেরেছিল। বাইরের দেওয়াল দিয়ে ক্লাইম্ব করে। কী ডেঞ্জারাস ব্যাপার ভাবুন। অ্যারেস্ট হওয়ার পর দু'জনই বলেছিল, ওরা মেসেজ দেওয়ার জন্য এই ঝুঁকিটা নেয়। একজন টেররিস্টদের বিরুদ্ধে, অন্যজন স্টেটলেস মানুষদের সমর্থনে।'

বিকেল তিনটে বাজে। ম্যানহাটনের রাস্তায় লোক গিজগিজ করছে। বিরাট অফিস বাড়িগুলোর গায়ে নিওনের বিশাল বিশাল ডিজিটাল বিজ্ঞাপন। আনমনা হয়ে কালকেতু টাইমস স্কোয়্যারের দিকে হাঁটতে লাগল। পলাশভাই কাল রাতে বলছিলেন, 'নিউ ইয়র্ক হইল গিয়া ওয়ার্ল্ডের গ্রেটেস্ট সিটি। আর নিউ ইয়র্কের বেস্ট জায়গা হইল টাইমস স্কোয়্যার। গিয়া দাঁড়াইলেই আফনের আর নড়তে ইচ্ছা করব না কাইলকেতুভাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আফনে রাস্তাতেই কাটাইয়া দিতে পারেন। হ্যার মতো সেফ জায়গা আর কোথাও নাই।' কালকেতুর মনে হল, পলাশভাই ঠিক। ও নিজেও বিশ্বের অনেক নামী শহরে গেছে... লস অ্যাঞ্জিলেস, শিকাগো, রোম, লন্ডন, প্যারিস, টোকিও, বেজিং। কিন্তু কোথাও এমন প্রাণের সজীবতা লক্ষ করেনি।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেই কালকেতুর চোখ গেল, কাটি রোল বলে একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের দিকে। সাইনবোর্ডে লেখা—মাটন রোল, এগ রোল থেকে শুরু করে লস্যি পর্যন্ত পাওয়া যায়। লস্যি খাওয়ার লোভে ও রেস্টুরেন্টের ভিতর ঢুকে পড়ল। তেমন হাই ফাই কিছু নয়। কলকাতার হেদুয়া বা আমহার্স্ট স্ট্রিটের রেস্টুরেন্টের মতো। তফাৎ হল পুরো রেস্টুরেন্টটাই পুরনো দিনের বাংলা আর হিন্দি সিনেমার পোস্টারে মোড়া। আওয়ারার রাজ কাপূর, নয়া দৌড়ের দিলীপকুমার-বৈজয়ন্তীমালা, গাইডের দেবানন্দ, জঞ্জিরের অমিতাভ বচ্চন, ডিসকো ডান্সারের মিঠুন চক্রবর্তী, হারানো সুরের উত্তমকুমার, আঁধির সুচিত্রা সেন। চিকেন রোলের দাম চার ডলার, লস্যির পাঁচ। পলাশভাই সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই বলতেন, 'কন কী কাইলকেতুভাই! রোলের প্রাইস তিইনশো ট্যাহার উফর? আফনের কইলজ্যা আসে। গলা দিয়া নামাইতে পারলেন কী কইর‍্যা? না, না চলেন, ম্যাকডি-তে যাই।' ম্যাকডি মানে ম্যাকডোনাল্ডস। সেখানকার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ অর্থাৎ আলুভাজার দাম অবশ্য আরও বেশি, সাত ডলার।

নামেই ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, আসলে চালান বাংলাদেশিরা। রোল আর লস্যির অর্ডার দিতে গিয়ে সেটা টের পেল কালকেতু। যারা খেতে ঢুকেছে, তারাও বাঙালভাষায় কথা বলছে। খাবারের ট্রে হাতে নিয়ে কালকেতু এক কোণে গিয়ে বসল। ইমনকে বলে দিয়েছে বিকেল চারটের সময় টাইমসের অফিসের সামনে থেকে ওকে তুলে নিতে। ম্যানহাটন এরিয়ায় গাড়ি পার্ক করার জায়গা নেই। ইমন নিশ্চয়ই দূরে কোথাও পার্ক করেছে। হাতে এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। নিশ্চিন্তে খাওয়া শেষ করে কালকেতু ফের গিয়ে টাইমস অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। ভেবে ও চিকেন রোলে কামড় দিল।

তখনই ওর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। বাঁ হাত দিয়ে কোনও রকমে পকেট থেকে সেটটা বের করে পর্দায় একটা অচেনা নাম্বার দেখতে পেল কালকেতু। লং ডিসট্যান্স কল। এই সময় বিদেশ থেকে কে ওকে ফোন

করতে পারে? সোয়াইপ করে ফোন অন করতেই ও প্রান্ত থেকে ও শুনতে পেল, 'আমি কি কালকেতু নন্দীর সঙ্গে কথা বলছি?'

ভরাট ও বেশ কর্তৃত্বব্যঞ্জক গলা। এই ধরনের গলা সাধারণত পুলিস বা আর্মির লোকদের হয়। কালকেতু বলল, 'হ্যাঁ, বলছেন। আপনি?'

'আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি রিটায়ার্ড কর্নেল নপরাজিত মজুমদার। আপনার নাম্বারটা আমি সংগ্রহ করেছি টুলটুল চাকলাদারের কাছ থেকে।'

টুলটুল মানে রমাদার ছেলে। যার আগ্রহে কালকেতুকে পলাশভাইয়ের কেসটা হাতে নিতে হয়েছে। কর্নেল মজুমদারের নামটা পুরনো কোনও কাগজের কাটিংয়ে ও দেখেছে। মনে পড়ায় কালকেতু সাগ্রহে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন। আপনার নামটা আমি জানি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তো আপনি ঢাকায় ছিলেন।'

'কালকেতুবাবু, আপনার সঙ্গে কি এখন কথা বলা যাবে?'

'কোনও অসুবিধে নেই। নিউ ইয়র্কে এখন বেলা সাড়ে তিনটে।'

'গুড। আপনি ওয়ার ভিক্টিম যে মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছেন, তার সম্পর্কে কিছু ইনফর্মেশন আমি দিতে পারি। সেই কারণেই আপনাকে ফোন।'

কালকেতু বলল, 'সো নাইস অফ ইউ কর্নেল। বলুন, কী বলতে চান?'

ফেসবুক মারফৎ টুলটুলের সঙ্গে কীভাবে তাঁর যোগাযোগ হয়, সে কথা জানিয়ে কর্নেল বললেন, 'মেয়েটির নাম কী ছিল, বলতে পারব না। ঢাকার হসপিটালে ওকে ভর্তি করা হয়েছিল, বেবি নামে। তখন বেশ কয়েকবার আমি ওকে দেখতে গেছিলাম। ওর সম্পর্কে আমাকে একটা রিপোর্ট দিতে হয়েছিল জেনারেল মানেকশ'র কাছে। হোল ইন্ডিয়ান আর্মি প্রে করেছিল, যাতে মেয়েটা বেঁচে যায়। কী ভয়ানক বার্ন হয়েছিল, আপনারা ধারণাও করতে পারবেন না। শরীরের পিছন দিকটা পুড়ে দগদগে ঘা হয়ে গেছিল।

বেবি অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করত। ও মারা গেলে আমাদের খুব বদনাম হয়ে যেত।'

বুঝতে না পেরে কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলছেন একথা?'

'বলছি এই কারণে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের আর্মি পাঠানো নিয়ে তখন আমেরিকা আর চিন খুব অসন্তুষ্ট ছিল। ওরা মনে করেছিল, ইন্ডিয়া অহেতুক পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছে। ইন্ডিয়ার পিছনে সোভিয়েত রাশিয়া আছে জেনে, পাকিস্তানকে মদত দেওয়ার জন্য ওরা মনে মনে প্রস্তুতও হচ্ছিল। ভাবুন, কী একটা ভোলাটাইল পলিটিক্যাল সিচুয়েশন তখন। বেবি মেয়েটি যে গ্রামে থাকত, সেই আমোদপুরে বম্বিং নিয়ে একটা মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল সেইসময়। আমরা প্রোপাগন্ডা করেছিলাম, বম্বিং পাকিস্তান আর্মি করেছে। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, সেদিন ওই গ্রামে পাকিস্তান আর্মি এয়ার স্ট্রাইক করেনি। করেছিল ইন্ডিয়ান আর্মি।'

কালকেতু চমকে উঠে বলল, 'কী বলছেন আপনি? ঢাকায় প্রথম এয়ার স্ট্রাইক সেটা। তা হলে মুক্তিযোদ্ধাসহ পঞ্চাশ-ষাটজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছিল ইন্ডিয়ান আর্মির বম্বিংয়ে?'

'ঠিকই বলছি। এও বলছি, এয়ার স্ট্রাইক করার ইচ্ছা আমাদের ছিল না। কিন্তু রাজাকার বাহিনি পুরো বোকা বানিয়ে দিয়েছিল আমাদের। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, রাজাকার বাহিনি হল তারা, যারা চায়নি বাংলাদেশ হোক। পাকিস্তান গর্ভমেন্টই আর্মস ট্রেনিং দিয়ে এদের তৈরি করেছিল। এই রাজাকারদের মাধ্যমেই পাকিস্তান আর্মি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে শিক্ষক ও ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছিল। অপারেশন সার্চলাইটের সময় নয় মাস ধরে শহরে, গ্রামে লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাঙালিকে ওরা মার্ডার করে।'

'কিন্তু রাজাকাররা আপনাদের বোকা বানালেন কী করে?'

‘ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে রাজাকার বাহিনির একজন আমাদের কাছে মিথ্যে খবর দিয়েছিল, পাকিস্তান ইনফ্যান্ট্রি আমোদপুর গ্রামে একটা কালীমন্দির দখল করতে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে গ্রামের মানুষদেরও ওরা মেরে ফেলবে। আমরা তখন দিন দুয়েক হল ইস্ট পাকিস্তানে ঢুকেছি। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনটে এয়ারক্র্যাফট ওই গ্রামের দিকে পাঠিয়ে দিই।’

‘খবরের সত্যতা যাচাই করার কথা আপনারা ভাবেননি?’

‘তেমন প্রশ্নই ওঠেনি। ঢাকায় আমাদের ইন্টেলিজেন্স তখন মুক্তিবাহিনি। কে রাজাকার, কে মুক্তিযোদ্ধা কয়েকটা দিন আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। আসলে কী হয়েছিল জানেন, আমাদের খবর দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গে রাজাকাররা আমোদপুর গ্রামেও একটা কথা রটিয়ে দিয়েছিল, পাকিস্তান আর্মি গ্রাম অ্যাটাক করার জন্য আসছে। ওরা কালীমন্দিরের ভিতর ঢুকবে না। যদি বাঁচতে চাও, তা হলে তাড়াতাড়ি কালীমন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নাও। ওদের কথা শুনে ভয়ে গ্রামবাসীরা কালীমন্দিরে গিয়ে জড়ো হয়েছিল। আকাশে ফাইটার প্লেন দেখে রাজাকাররা রটিয়ে দেয়, পালাও। আর পালাতে গিয়েই আমাদের বোমার আঘাতে কালীমন্দিরের কাছাকাছি প্রচুর লোক মারা যায়। বুঝতেই পারছেন, এর পিছনে কত বড় কন্সপিরেসি ছিল?’

‘আপনারা ভুলটা বুঝতে পারলেন কী করে?’

‘আমেরিকায় আমাদের হাইকমিশনের মাধ্যমে। তিন-চার দিন পর নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে এই বেবি মেয়েটার আগুনে পোড়া নেকেড ছবি বেরিয়েছিল। যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে সারা আমেরিকা চমকে উঠেছিল। ওদের ওয়ার এক্সপার্টরাই প্রথম আবিষ্কার করেন, ছবিতে যে ফাইটার প্লেনগুলো দেখা গেছে, সেগুলো ভারতের। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে কেনা। পাকিস্তানের হতেই পারে না। কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা হতে হতে অবশেষে খবরটা আমাদের কানে এসে পৌঁছয়। সেইসময়কার প্রাইম

মিনিস্টার মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ডিফেন্স মিনিস্টারকে খোঁজ নিতে বলেন। বেবি মেয়েটার ছবি সেইসময় কতটা ইম্পরট্যান্ট হয়ে উঠেছিল, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। মেয়েটা তখন মারা গেলে ইন্ডিয়ার ভাবমূর্তি বিরাট ধাক্কা খেত।'

'মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান আর্মি হঠাৎ সারেন্ডার করেছিল কেন কর্নেল মজুমদার?'

'দ্যাট আই কান্ট ডাইভালজ। দেয়ার ওয়ার লট অফ রিজনস টু সারেন্ডার। এ ছাড়া ওদের কোনও উপায় ছিল না। ওদের নাইনটি থ্রি থাউজেন্ড সোলজার আমাদের হাতে বন্দি ছিল।'

'পরে রাজাকার বা বন্দিদের বিরুদ্ধে আপনারা ব্যবস্থা নেননি?'

'হয়তো নেওয়া হত। কিন্তু ওদিকে থেকে ইয়াইয়া খান হুমকি দিলেন, রাজাকার বা বন্দিদের বিরুদ্ধে যদি আমরা কোনও অ্যাকশন নিই, তা হলে পাকিস্তানে বাস করেন, এমন তিরিশ লাখ হিন্দুকে ওরা মেরে ফেলবেন। তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার চুপ করে যান।'

'বেবি মেয়েটি সম্পর্কে আর কিছু জানেন?'

'আপনি এলসা গিনেসবেরির কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় উনি ঢাকার রেড ক্রস সেন্টারে চিফ মেট্রন ছিলেন। হাসপাতালে কয়েকদিন যাতায়াত করার জন্য মিসেস গিনেসবেরির সঙ্গে আমার ভাল সম্পর্ক হয়ে গেছিল। পরে শুনেছি, মিসেস গিনেসবেরি না কি বেবিকে গোটেনবার্গে নিয়ে যান বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য। আপনি সুইডেনের রেড ক্রস অফিসে ফোন করলে এলসা গিনেসবেরির হদিশ পাবেন। মিসেস গিনেসবেরির সঙ্গে ঢাকায় তখন আরও একজন অল্পবয়সি নার্সকে দেখতাম। তিনি বাঙালি। মাফ করবেন, তাঁর নামটা আমার মনে নেই। ঢাকায় কাফি বীর বলে একজন আছেন, তাঁর কাছেও আপনি মিসেস গিনেসবেরির কনটাক্ট নাম্বার পেতে পারেন।'

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'কে এই কাফি বীর?'

‘বাংলাদেশের একজন ফিল্ম ডিরেক্টর। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে উনি একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাচ্ছেন। গত সপ্তাহে কাফি বীর কলকাতায় আমার কাছে এসেছিলেন। বেবি সম্পর্কে নানা কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন। গোথেনবার্গে গিয়ে উনি মিসেস এলসা গিনেসবেরির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টাও করছেন। কিন্তু মিসেস গিনেসবেরি না কি সহযোগিতা করেননি। কাফি বীরের মেল অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

শুনে একটু দমে গেল কালকেতু। ওর মতো আরও একজনও তা হলে শিউলিদিদিকে খুঁজে বেরাচ্ছেন! অবশ্য এই বেবিই শিউলিদিদি কি না, তা নিশ্চিত নয়। না, আর ঢিলে দেওয়া যাবে না। শিউলিদিদির কাছে কাফি বীর পৌঁছনোর আগেই ওকে পৌঁছতে হবে। ও বলল, ‘থ্যাঙ্কস কর্নেল মজুমদার। কলকাতায় ফিরে অবশ্যই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। আর এর মধ্যে যদি মেয়েটি সম্পর্কে কোনও কিছু আপনার মনে পড়ে, তা হলে আমাকে জানাবেন।’

(একুশ)

নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরে গাড়ি গ্যারাজে ঢুকিয়ে ইমন বুঝতে পারল না, মেন বিল্ডিংয়ে ঢুকবে কি না? সারাদিন গাড়িটা আনলক করা ছিল। গাড়ির রিমোটই যে ওর কাছে ছিল না। আউট হাউসের দিকে পা বাড়ানোর আগে কালকেতুকে ও বলল, ‘ছ্যার। রোজিনা ম্যাডামরে কইয়া দিবেন, গাড়ির দরজা খুলা আসে। রিমোট দিয়া হ্যায় য্যান লক কইর‍্যা দ্যান।’

কালকেতুছ্যার বললেন, ‘রোজিনা ম্যাডাম জানেন। ফোনে ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। তাও তুমি একবার নিজে গিয়ে বলো।’

বাধ্য হয়ে ইমন মেন বিল্ডিংয়ে ঢুকল। রোজিনা ম্যাডামের মুখোমুখি হতে ওর ইচ্ছে করে না। ভদ্রমহিলার চোখের চাউনিটা এমন, যেন মনের ভিতরটাও পড়ে ফেলতে পারেন। কালকেতুছ্যার গেস্ট রুমে ঢুকে যাওয়ার

পর, লিভিং রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে ইমন দেখল, মুখোমুখি সোফায় রোজিনা ম্যাডাম কাগজপত্তর নিয়ে বসেছেন পলাশছ্যারের সঙ্গে। দু'জনে কথা বলায় ব্যস্ত। হঠাৎ মুখ তুলে ওকে দেখামাত্রই পলাশছ্যার বললেন, 'আইসো ইমন, আইসো। এত দেরি হইল ক্যান? তুমি না হি আইজ ম্যাজিক দ্যাখাইস?'

রোজিনা ম্যাডাম সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'গাড়ির লক তুমি খুললে কী করে ইমন?'

ইমন বলল, 'জ্বী ম্যাডাম, ম্যাজিক না। জানলার রাবার সরাইয়া, চাপ দিতেই কাচ নাইম্যা গেল। তহন হ্যান্ডেল দিয়া দরজা খুলতে অসুবিধা হয় নাই।'

'আইজ ব্রুকলিন ব্রিজ দিয়া কোথায় গেসিলা?'

শুনে ভিতরে ভিতরে চমকে উঠল ইমন। আজ সত্যিই কাইলকেতুছ্যারকে ড্রপ করার পর ও ব্রুকলিন ব্রিজ পেরিয়ে তৌফিকের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিল। ম্যাডাম জানলেন কী করে? জিপিএস মারফৎ জানা যায়, গাড়ি সারাদিনে কোথায় কোথায় ট্র্যাভেল করেছে। কিন্তু রোজিনা ম্যাডাম তো সেটাও চেক করার সুযোগ পাননি। ওঁর মোবাইল ফোন বা হাতঘড়িতেও কি কোনও অ্যাপস লাগানো আছে? যা দিয়ে উনি গাড়ির গতিবিধি জানতে পারেন? তৌফিকের সঙ্গে আজ দেখা হয়নি। তাই উত্তর দেওয়ার সময় ইমন চেষ্টা করল চিরাগের মতো স্মার্ট হতে, 'ম্যাডাম, ব্রুকলিন ব্রিজের ঠিক নিচেই মিরচি বইল্যা একডা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আসে। সেহানে বিরিয়ানি খাইতে গেসিলাম। পাবলিক স্টোরেজে কাম করনের সময় ওহানে রোওজ খাইতে যাইতাম। রেস্টুরেন্টের হক্কলে আমার চেনা।'

শুনে পলাশছ্যার সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'আরে বাঃ, ওহানে কি হায়দরাবাদি বিরিয়ানি পাওয়া যায়? অনেকদিন খাই নাই। চলেন ম্যাডাম, সবাই মিইল্যা কাইল হ্যায় রেস্টুরেন্টে খাইয়্যা আসি।'

রোজিনা ম্যাডাম ওর দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছেন। ইমন পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। রেস্টুরেন্টে কেউ ওকে চেনে না। মাত্র একবারই তৌফিকের কল্যাণে ও ওখানকার বিরিয়ানি খেয়েছে। সেটা হায়দরাবাদি না রাওয়ালপিণ্ডির, ও জানে না। পলাশছ্যাররা সবাই মিলে যদি ওই রেস্টুরেন্টে যান, তা হলে ও ধরা পড়ে যাবে। ইমন সামলে নেওয়ার জন্য বলল, 'ছ্যার, হ্যায় রেস্টুরেন্ট আফনেগো মতো হাই ফাই মাইনষের জইন্য না। ওহানে গেলে আফনেরা কম্ফর্টেবল হইতে পারবেন না।'

রোজিনা ম্যাডাম হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বন্ধু কোথায় ইমন? ঘরে নেই দেখলাম।'

ইমন একটু অবাক হওয়ার ভঙ্গি করল, 'জানি না ম্যাডাম। ঠিক দ্যাখসেন? ওয়াশরুমে যাইতে পারে। হ্যারে পাঠাইয়া দিম না হি?'

পলাশছ্যার বললেন, 'না, না। আসলে কী হইসে জানো। তোমাগো ঘরে যে টিভিটা আসে, তাতে ইয়াপ চ্যানেল লাগাইয়া দিলাম। যাতে তোমরা ইন্ডিয়া আর বাংলাদ্যাশের টিভি চ্যানেলগুলা এহানে বইস্যা দ্যাখতে পারো। দ্যাশে কী হইতাসে, তোমাগো জানা দরকার। জিটিভি, এবিপি আনন্দ, এটিএন, বিটিভি... সব দেইখতে পাইবা।'

'থ্যাঙ্কয়ু ছ্যার।' ইমন উচ্ছ্বসিত হওয়ার ভান করল। দেশের খবর জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ওর নেই। কিন্তু ও এমন কিছু করবে না, যাতে রোজিনা ম্যাডামের সন্দেহ হতে পারে। ভদ্রমহিলা খরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে। ওঁর চোখের দিকে তাকালেই মনে হয়, এই জিজ্ঞেস করে বসবেন, 'আমারে চকমা দিতে পারবা না। তোমাগো হিস্ট্রি আমার জানা আসে।' লিভিং রুমে থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসার জন্য ইমন বলল, 'ছ্যার, কাইল কহন আমাগো লাইগব কইয়্যা দ্যান। রেডি থাকুম।'

রোজিনা ম্যাডাম বললেন, 'হোনো, কাইল হক্কালে তোমরা দুইজন আউট হাউসে থাকবা না। লারেইনা গিয়া রুম সার্ভিস কইর‍্যা আইব। যা অবস্থা

করস, কওনের না।'

'জ্বী ম্যাডাম। থাকুম না। অহন আমি যাম? চিরাগ আমার জইন্য বইস্যা আসে। আমি গেলে হ্যায় ডিনারে বইসব।'

হাত নেড়ে ওকে চলে যেতে বলে পলাশছ্যার ফের কাগজপত্রে মন দিলেন। লিভিং রুমের বাইরে বেরিয়ে ইমন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। টাকাপয়সা থাকলে মানুষ কী না করতে পারে? পাঁচ বছর আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর, ইমন আর বাংলা চ্যানেল দেখার সুযোগ পায়নি। ক্যালিফেটে ইংলিশ আর আরবি চ্যানেলগুলো দেখতে ওর মোটেই ভাল লাগত না। প্রথম দু'তিনটে বছর তো ভাষাই বুঝতে পারত না। পরে আরবি আর ফারসি ভাষাটা মোটামুটি রপ্ত করতে পেরেছে। কসোভোয় থাকতে ও বিবিসি দেখত। কানাডা ও আমেরিকায় এসে ওরা সিএনএন বা এনবিসি দেখার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু এইসব চ্যানেল দেখলে বুকের ভিতরটা ভয়ে এখন শিরশির করে। মনে হয়, জিহাদিদের ধোঁকা দিতে পারলেও, এফবিআইয়ের নজর ওরা এড়াতে পারবে না।

আউট হাউসে ঢুকে ইমন দেখল, সোফায় বসে চিরাগ বাংলা চ্যানেল দেখছে। বাংলায় কোনও মহিলা ভাষণ দিচ্ছেন। গলার স্বরটা শুনে ওর চেনা চেনা লাগল। প্রাইম মিনিস্টার বিলকিস বেগম। উনি কী বলছেন, তাতে কান দেওয়ার আগে, ওকে দেখে চিরাগ টিভিটা বন্ধ করে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'তোর এত দেরি হল? আমি তো ভাবলাম, এফবিআই তোকে ধরে ফেলেছে।'

গা থেকে হুডিটা খুলতে খুলতে ইমন বলল, 'নিউ ইয়র্ক থেইক্যা রওয়ানা দিলাম সাড়ে চাইরটায়। বাসায় ফিরতেই পলাশছ্যার ডাইক্যা কথা কইলেন। তুই হারাডা দিন করলিডা কী, ক?'

'দুপুরে বসে বসে ইন্ডিয়ান চ্যানেলে কুরবান বলে হিন্দি সিনেমা দেখছিলাম। আমাদের মতো জিহাদিদের নিয়ে গল্প। লন্ডন মেট্রোতে আল

কায়দার লোকেরা কয়েকবছর আগে ব্লাস্ট করেছিল। সেই ঘটনাটাই ঝেড়ে দেওয়া। হিরো সেফ আলি খান।'

'তর কথা শুইন্যা মনে হইতাসে, ভালা লাগে নাই।'

'লাগবে কী করে? ফিল্ম বানালেই হল? আরে, ক্যালিফেটে একজন জিহাদি কেমনভাবে থাকে, তার অভিজ্ঞতা না থাকলে কী করে ফিল্ম দাঁড়াবে? নবাবের ব্যাটাকে দিয়ে কি জিহাদির রোল করানো যায়? শেষের দিকটা ভাল লাগছিল না। চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে দেখি, বাংলা চ্যানেল এসে গেছে।'

হাতে ধরা হুডিটা বিছানার উপর ছুড়ে ফেলল ইমন। তার পর ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করে বলল, 'হালায় হারাডা দিন একবারই পানি প্যাটে গ্যাসে। টাকরা শুকাইয়া আইসে।' বলে ঢকঢক করে পানি খেতে লাগল। প্রায় হাফ বোতল খালি করে দেওয়ার পর ঢেকুর তুলে বলল, 'আইজ কী কাণ্ড হইসে, জানস? তর ধারণাই হত্য হইয়া যাইত। ইন্টারপোলের যে অফিসার আমাগো দুইজনরে ধরার জইন্য নিউ জার্সিতে আইসে, হ্যারে ড্রাইভ কইর‍্যা আমি নিউ ইয়র্কে পৌঁছাইয়া দিলাম।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিরাগ বলল, 'সে কী, উনি তোর গাড়িতে উঠলেন কী করে?'

'হ্যায় কাইলকেতুছ্যারের ফ্রেন্ড। আমাগো মতো বাঙালি। হারাডা রাস্তা জিহাদিগো কথা কইতে কইতে গ্যালেন। হ্যার মুখেই হোনলাম..,' বলতে বলতে ইমন থেমে গেল।

চিরাগ ভ্রু কুঁচকে বলল, 'থেমে গেলি কেন, বল।'

'হুনলে তর ভালা লাইগব না, থাক।'

'না, না, তবুও তুই বল।'

'তুই হেইদিন যে স্বপ্নডা দেখসিলি, হেইডা সত্যি হইয়া গ্যাসে। হিন্দু মৌলবাদীরা তর আববুরে গুলি কইর‍্যা মারসে। তগো বাসা জ্বালাইয়া দিসে।

তর মা আর বুইন করিমগঞ্জের বাসস্ট্যান্ডের কাসে একটা ঝুপড়িতে গিয়া উঠসে।'

শুনে চিরাগ থম মেরে গেল। তার পর হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে কার্পেটের উপর বসে পড়ল। ওর চোখের পাতা বোজা। মুখের পেশিগুলো ক্রমশ শক্ত হচ্ছে। কয়েকদিন আগে চিরাগ যখন ওই স্বপ্নটা দেখার কথা বলেছিল, তখন ওকে আবেগপ্রবণ মনে হচ্ছিল। আজ খবরটা শুনে ওকে তেমন বিচলিত বলে মনে হল না। স্বপ্নের সত্যি-মিথ্যে, ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় ও আগ্রহই দেখাল না। অথচ ক্যালিফেটে থাকার সময় নিজের মতো করে ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারত। একবার তো ওর সঙ্গে এক সিরিয়ান জিহাদির হাতাহাতির অবস্থা হয়েছিল। এন্টারটেনমেন্ট রুমে হিন্দি সিনেমা 'শোলে' দেখার পর সেই সিরিয়ান ছেলেটা হেমা মালিনীকে জড়িয়ে একটা কুৎসিত স্বপ্নের কথা বলেছিল। শুনে চিরাগ সহ্য করতে পারেনি। এটা সেইসময়কার কথা যখন জিহাদিদের যৌনস্বপ্ন দেখা পাপ। তখনও হস্তমৈথুনের অনুমতি দেননি ক্যালিফরা।

জিহাদিদের আলোচনার প্রিয় বিষয় ছিল স্বপ্ন। নিজের দেখা স্বপ্ন নিয়ে কথা বলার থেকে জিহাদিরা অনেক বেশি পছন্দ করত অন্যের দেখা স্বপ্ন নিয়ে মতামত দিতে। ক্যালিফ বলতেন, স্বপ্নের গুরুত্ব অপরিসীম। উনি ওসামা বিন লাদেনের প্রসঙ্গ টেনে আনতেন। ইমন নিজের কানে শুনেছে, ক্যালিফ একদিন বলেছিলেন, আমেরিকায় টুইন টাওয়ার অ্যাটাকের এক বছর আগে লাদেন স্বপ্নে দেখেছিলেন, পাইলটের বেশে জিহাদিরা ফুটবল ম্যাচ খেলছে আমেরিকান টিমের সঙ্গে। স্বপ্নের অর্থটা না কি লাদেন ধরে ফেলেছিলেন। তখনই ঘনিষ্ঠ লোকদের ডেকে বলেন, আমেরিকানদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এমন কোনও প্ল্যান বানাও, যাতে পাইলটদের দরকার হয়। সেই প্ল্যানেরই চূড়ান্ত পরিণতি টুইন টাওয়ারে বিমান হানা। ইমনের মনে পড়ল, আববুর মৃত্যু দেখার স্বপ্নটাকে নিয়ে মাঝে একদিন চিরাগ ব্যাখ্যা

করেছিল এই বলে, 'আমার জীবনে খুব শিগগির আনএক্সপেক্টেড কিছু ঘটতে যাচ্ছে।'

খানিকক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে চিরাগ বলল, 'তোর কি মনে হয়, ইন্টারপোল অফিসারটা যা তোর সামনে আলোচনা করছিল, সেটা ঠিক?'

'তর অবিশ্বাস হওয়ার কারণ?'

'দ্যাখ, পুলিশ ভয় দেখানোর জন্য অনেক সময় বানিয়ে বানিয়ে আজগুবি কথা বলে। কিন্তু তোর কথা থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারছি, আমাদের সম্পর্কে কিছু না কিছু খবর ওই ভদ্রলোকের কাছে আছে। উনি আমার সম্পর্কে যা বলেছেন, সেটা যাতে আমার কানে তুই পৌঁছে দিস, সেই কারণেই বলেছেন। সাইকোলজিক্যাল প্রেসার দেওয়ার জন্য। ভদ্রলোককে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। আবার অস্বীকারও করছি না। উনি আর কী কী বলছিলেন, মনে করে বল তো।'

যতটুকু মনে ছিল, ইমন ধীরে ধীরে সব বলল। জিহাদিদের মাফ করে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হবে, এই কথাটা শোনার পর চিরাগ বলে উঠল, 'ব্যাস, ব্যাস, আর বলার দরকার নেই। আমি সব বুঝতে পারছি। উনি যা বলেছেন, তার দশ পার্সেন্টও যদি সত্যি হয়, তা হলেও ধরে নে, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ক্যালিফেটে ফিরে গেলে আমেরিকানদের বোমায় মরতে হবে। দেশে ফিরে গেলে হিন্দুদের মাঝে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে বাঁচতে হবে। আর যদি এফবিআইয়ের হাতে ধরা পড়ি, তাহলে সারা জীবন জেলে পচে মরতে হবে। কুইক, খুব কুইক, ঠান্ডা মাথায় আমাদের ডিসিশন নিতে হবে ইমন। আমরা কোন জীবনে ফিরে যাব।'

চিরাগের মুখে হতাশাজনক কথা শুনে ইমন দমে গেল। গোসল করার জন্য উঠে ও ওয়াশরুমের দিকে গেল। হাতে চোট লাগার পর থেকে অনেকদিন ও ডান হাত ব্যবহার করতে পারত না। ক্ষতের জায়গায় যাতে জল লেগে না যায়, তার জন্য বাঁ হাতে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিত। ডান

হাতের গ্লাভস আর ব্যান্ডেজ খুলে ও দেখল, ঘা অনেকটা শুকিয়ে এসেছে। সিরিয়ান হেকিমদের ভেষজ দাওয়াই অব্যর্থ। তৌফিক বলেছিল, ক্ষতের দাগ একেবারে মিলিয়ে যাবে। মলম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সেই মলমই আনার চেষ্টায় ও আজ তৌফিকের সঙ্গে দেখা করতে গেছিল। কিন্তু দেখা পায়নি।

বাঁ হাতে মুখে জলের ঝাপটা দেওয়ার পর আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে ইমন চমকে উঠল। এ কী চেহারা হয়েছে! আত্মীয়-স্বজনরা প্রায় সবাই বলত, 'তুই তর দাদামশয়ের চেহারা পাইছস। ইয়াং এজ-এ বন্দুক লইয়া তর দাদামশয় যখন বাঘ শিকার কইরতে যাইত, তখন হ্যারে নবাবজাদা বইল্যা মনে অইত।'

বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকেই না কি দাদামশায়ের চেহারা ভাঙতে শুরু করে। এই দাদামশায়কে নিয়ে ইমনের মনে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল। কিন্তু সেই গর্বে চিড় ধরতে শুরু করে, স্কুলে নিচু ক্লাসে পড়ার সময়। তখন বন্ধুদের অনেকেই তাচ্ছিল্য করে ওকে বলত, 'তুই তো রাজাকারের নাতি।' রাজাকার কথাটা মানে বোঝার বয়স তখনও ইমনের হয়নি। স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় মানেটা ও বুঝতে পারে, অর্থাৎ কি না দেশদ্রোহী। তখন মনের মধ্যে একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, দাদামশয়ের যদি কখনও মনে হয়েই থাকে, পাকিস্তান দেশটাকে দ্বিখণ্ডিত করা উচিত নয়, তা হলে তিনি কি ভুলটা করেছিলেন? প্রত্যেকটা মানুষের একটা নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত থাকতেই পারে। এই যে চাকমারা নিজেদের জন্য আলাদা ভূখণ্ড চাইছে, ওরাও কি তা হলে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে? মুক্তিযোদ্ধারাও তো তা হলে একটা সময় দেশদ্রোহী ছিল। এখন তাঁরা কেউ বীর, কেউ শহিদ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাটা কেমন পাল্টে যায়!

চোখ-মুখে পানির ঝাপটা দেওয়ার সময় চিরাগের প্রশ্নটা ইমনের মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল। কোন জীবনটা ওদের বেছে নিতে হবে? সত্যিই কি কাইলকেতুছ্যারের ফ্রেন্ড গাড়িতে বসে ইচ্ছে করে জিহাদিদের

সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক কথাগুলো বলছিলেন। তা হলে কি চিরাগের ধারণাই ঠিক, কোনওভাবে উনি আন্দাজ করেছেন, ওরা জিহাদি? যদি তা-ই বুঝতে পারতেন, তা হলে গ্রেফতার করছেন না কেন? এলোমেলো ভাবনাগুলো মন থেকে ইমন সরিয়ে দিল।

তার পর ওয়াশরুম থেকে ঘরে ফিরে এসে দেখল, চিরাগ ডিনার সাজাচ্ছে। নান, তন্দুরি চিকেন আর ডাল মাখনি। মাইক্রোওভেনে সদ্য গরম করেছে। তন্দুরি চিকেন থেকে ধোঁয়া উঠছে। কাছেই নিউ জার্সির ইন্ডিয়ান পাড়া। সেখানকার কোনও দোকান থেকে বোধহয় চিরাগ কিনে এনেছে। খেতে খেতে বাংলা কোনও চ্যানেল দেখবে। ভেবে টিভির রিমোট খুঁজতে লাগল ইমন। কিন্তু চিরাগ ওকে বলল, 'এখন টিভি খুলিস না প্লিজ। আগে খেয়ে নে। তার পর ইচ্ছে হলে দেখিস।'

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত চিরাগ কোনও কথা বলল না। কাচের প্লেট দুটো ধুয়ে ও র‍্যাকে সাজিয়ে রাখল। তার পর ওর দিককার আলো নিভিয়ে, সেঁধিয়ে গেল কম্ফর্টারের ভিতর। সোফায় বসে ইমন টিভি চালাতেই দেখল, পর্দায় কোথাও বিক্ষোভের ছবি দেখাচ্ছে। আরে, এ তো ঢাকার বায়তুল মোকারম মসজিদের রাস্তা। একদল লোক দোকানপাট ভাঙচুর করছে। পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তাদের তাড়া করেছে। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাচ্ছে। নিউজ রিডারের গলা শুনতে পেল ইমন, 'আজ মণিরুল চৌধুরির ফাঁসির খবর প্রচার হওয়ার পরই জামায়েতি সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বায়তুল মোকারম চত্বর থেকে সেই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে ঢাকার সর্বত্র। জামায়েতিদের ঠেকানোর জন্য কোথাও কোথাও পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে। রমনায় তিনজন জামায়েতি পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন। ধানমণ্ডীতে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের বাসার সামনেও বিডিআর-কে গুলি চালাতে হয়েছে।'

তা হলে সত্যিই দাদামশয়ের ফাঁসি হয়ে গেল! খবরটা শুনতে শুনতে কেঁপে উঠল ইমন। টিভির পর্দায় দাদামশয়ের ছবি। নিউজ রিডার বলছেন, ‘গতমাসেই সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রাজাকার মণিরুল চৌধুরির ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অসংখ্য খুনের মামলা চলছিল। সবথেকে মারাত্মক অভিযোগ, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমোদপুরের কালীমন্দিরের কাছে কিছু গ্রামবাসীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা। অভিযোগ প্রমাণিত, মিথ্যা খবর দিয়ে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। তাঁরই প্ররোচনায় ভারতীয় সেনা আমোদপুরে বোমাবর্ষণ করে। মণিরুল চৌধুরিকে কবে ফাঁসি দেওয়া হবে, তা গোপন রাখা হয়েছিল। সোমবার গভীর রাতে তাঁর পুত্রবধূ সাজেদা বেগমকে সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হয়। ভোর পাঁচটায় শাস্তির সাজা কার্যকর করা হয়। ফাঁসির আগে মণিরুল চৌধুরি তাঁর অন্তিম ইচ্ছার কথা পুত্রবধূকে জানিয়ে গিয়েছেন।’

সাজেদা বেগম মানে ওর আম্মি। দাদামশায় কোন অন্তিম ইচ্ছের কথা আম্মিকে জানিয়ে গেলেন? খবরটা শুনতে শুনতে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল ইমনের। এই কারণেই কি চিরাগ ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে টিভি বন্ধ করে দিয়েছিল? যাতে দাদামশয়ের ফাঁসির খবরটা ওকে শুনতে না হয়? হঠাৎ ইমনের ইচ্ছে হল, চিরাগের কাছে গিয়ে বলে, ‘এই ওঠ। চল, আমরা আবার ক্যালিফেটে ফিরে যাই।’

(বাইশ)

ফুলের তোড়াটা এগিয়ে দিয়ে, অনেকটা ঝুঁকে গালে গাল ঠেকাল অ্যান্ডি। সারা শরীরে ঠিক আগের মতো উত্তাপ টের পেলেন লিলি। প্রায় ছ’ফুটের মতো হাইট অ্যান্ডির। গড়পড়তা সুইডদের মতোই। পাশাপাশি হাঁটলে একটু বেমানানই লাগে। কিন্তু প্রেমের বন্ধনটা কার সঙ্গে কীভাবে হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। নিশ্চয়ই উচ্চতা বুঝে কখনো হয় না। হাগ করার পর

অ্যান্ডি জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন আছ, ডার্লিং। অনেকদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হল।'

কেমন আছেন, লিলি নিজে বুঝতে পারছেন। চেক আপের জন্য হাসপাতালে এসেছেন। খবরটা পেয়ে অ্যান্ডি লাস ভেগাস থেকে অ্যাদ্দূর হাজির। এর থেকে ভাল থাকা আর কী হতে পারে? 'আপাতত ঠিক আছি।' ছোট্ট উত্তর দিয়ে লিলি ভাল করে তাকালেন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকের দিকে। অ্যান্ডির চুলে সামান্য পাক ধরেছে। মুখ ভরাট, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তাতে বেশ রাশভারী লাগছে ওকে। পরনে আরমানির থ্রি পিস স্যুট। তখনকার মতোই হ্যান্ডসাম অ্যান্ডি। পারফিউম নিয়ে পছন্দ এখনও বদলায়নি। ওর শরীর থেকে এখনও বন্ড নাম্বার নাইন-এর সুগন্ধ ভেসে আসছে। লিলি পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখছ আমাকে?'

'অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ এভার।' অ্যান্ডির গলায় কৌতুকের ঝিলিক, 'ফুলগুলোকেও তোমার কাছে ম্লান দেখাচ্ছে। আমি তো চুজ-ই করতে পারছিলাম না, কোন ফুল তোমার জন্য নিয়ে আসব।'

লিলি বললেন, 'ফ্লার্ট করার স্বভাবটা তোমার গেল না অ্যান্ডি।'

'নিজেকে বদলাতে দিইনি ডার্লিং। চলো, বাইরে কোথাও নিরিবিলিতে বসে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলি।'

'সম্ভব না। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ডার্মাটোলজিস্ট ডা. কিংসফোর্ডের সঙ্গে। এখন বাইরে কোথাও যাওয়া যাবে না। নিরিবিলিতে যদি কথা বলতে চাও, তা হলে চলো, ফোয়ারার ধারে গিয়ে বসি।'

হাসপাতালে ঢোকার মুখেই বিরাট একটা লন আছে। তারই মাঝে সুন্দর একটা ফোয়ারা। রাতে কেবিন থেকে বসে লিলি দেখতে পান, মিউজিকের সঙ্গে রঙিন আলোয় ফোয়ারার জল খেলা করে। জায়গাটা চমৎকার সাজানো গোছানো। যারা সুস্থ হয়ে গেছেন, তারা ভিজিটরদের সঙ্গে ওখানে বসে কথা

বলতে পারেন। সেদিকে এগোনোর সময় অ্যান্ডি জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর কী বলছেন, ডার্লিং?'

লিলি বললেন, 'লেজার ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আমার কথা থাক। এলসা আন্টি কেমন আছেন অ্যান্ডি?'

অ্যান্ডি বললেন, 'উনি এখন লাস ভেগাসে। আলেক্সের ছুটি শুরু হয়ে গিয়েছে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখাবেন বলে মাদার এলসা ওকে আমার কাছে নিয়ে গেছেন।'

ইন্ডিয়ার মাদার টেরিজা নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর সুইডেনের কোনও কাগজে এলসা আন্টিকে নিয়ে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল। তাতে ওরা মাদার এলসা কথাটা ব্যবহার করেছিল। তার পর থেকে অ্যান্ডি ওঁর মাসিকে মাদার এলসা নামে ডাকতে শুরু করেছে। আর্ত মানুষের সেবা আর শিশু কল্যাণে এলসা গিনেসবেরির যা অবদান, তা অবশ্য মাদার টেরিজার থেকে কোনও অংশে কম নয়। দীর্ঘ তিরিশ বছর রেড ক্রসের হয়ে কাজ করেছেন। অন্তত ছাব্বিশটা যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশে হাজার হাজার মানুষকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। গত দশ বছর ধরে বিশ্বের বিপন্ন শিশুদের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। মা ডাকটা ওঁরই তো প্রাপ্য। গতবছর গ্রিটিংস কার্ডে একবার মাদার লিলি কথাটা লিখেছিল অ্যান্ডি। তাতে খুব চটে গেছিলেন লিলি। লিখে পাঠিয়ে ছিলেন, এমন ঠাট্টা করলে ভবিষ্যতে কোনও কার্ড গ্রহণ করবেন না।

আলেক্স হল এলসা আন্টির মেয়ের ছেলে। হাই স্কুলে পড়ে। এই নাতিটিকে খুব ভালবাসেন আন্টি। ফোনে যখনই কথা হয়, তখন ওর কথা খুব বলেন। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরের দিনই এলসা আন্টি ফোন করেছিলেন কুশল জানার জন্য। তখন কিন্তু আলেক্সকে নিয়ে লাস ভেগাসে যাওয়ার কথা কিছু বলেননি। হয়তো তাঁর সঙ্গে অ্যান্ডির সম্পর্কটা শীতল হয়ে রয়েছে বলে, উল্লেখ করতে চাননি। অথচ প্রথম যেদিন ওঁদের প্রেমের সম্পর্কটা আন্টি জানতে পারেন, সেদিন খুব খুশি হয়েছিলেন। এলসা আন্টির

সেই মুখটা চোখের সামনে একবার ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। লিলি জিজ্ঞেস করলেন, 'আন্টিরা কি তোমার হোটেলেই আছেন?'

অ্যান্ডি বলল, 'হ্যাঁ ডার্লিং, আমার সুইটেই। ওঁরা আজ গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতে গেছেন। সেই ফাঁকে প্লেন চালিয়ে আমি চলে এলাম নিউ ইয়র্কে।'

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে এই থ্যাঙ্কস গিভিংয়ের ছুটিতেই আন্দ্রিয়াসের সঙ্গে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ওয়েস্ট রিম-এ বেড়াতে গেছিলেন লিলি। সেদিনটাও আজকের মতো রোদ ঝলমলে ছিল। অ্যারিজোনা স্টেট-এ পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে প্রায় পৌনে তিনশো মাইল জুড়ে ক্যানিয়নের বিস্তৃতি। এক মাইল নিচ দিয়ে বয়ে গেছে কোলোরাডো নদী। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের তিনটে দিক। সাউথ রিম সারা বছরই খোলা থাকে। নর্থ রিম শীতকালে বন্ধ, ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত। তাই অনেকে এখন ওয়েস্ট রিম-এ যাওয়া পছন্দ করেন। কেননা, ওখানে বাড়তি আকর্ষণ... রেলিং ঘেরা স্কাইওয়াক আছে। ঘোড়ার খুরের আকৃতির, একশো গজ লম্বা, মেঝেটা কাচের। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে পায়ের তলায় নদীটা দেখা যায়। ফোয়ারার দিকে হাঁটতে হাঁটতে সেইদিনটা মনে করার চেষ্টা করলেন লিলি। স্কাইওয়াকে হাঁটার ভয়মিশ্রিত অনুভূতির কথাও।

ওয়েস্ট রিম-এ নিয়ে গিয়ে সেদিন অ্যান্ডি বলেছিল, 'বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখো ডার্লিং, পাহাড়টা এমন, যেন মনে হচ্ছে একটা ঈগল ডানা ছড়িয়ে বসে আছে। এটাকে বলে ঈগল'স পয়েন্ট।'

সেদিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন লিলি। এমনটাও হয়? সত্যিই মনে হচ্ছে, একটা ঈগল পাখি যেন পাহাড় জুড়ে বসে রয়েছে। পাখিটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে প্রচুর ছবি তুলেছিল অ্যান্ডি। নিচের দিকে উঁকি মারতে ভয় পাচ্ছিলেন লিলি। নিচ দিয়ে কোলোরাডো নদীর সবজে জল বয়ে যাচ্ছে ক্ষীণ ধারায়। নদীটাকে যাতে ভালভাবে দেখা যায়, তার জন্য হেলিকপ্টার সার্ভিসও আছে। পাহাড়ের খাঁজে কপ্টারের পাখা ঘুরছে। নিচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরতে শুরু করায় লিলি একটা পাথরের উপর বসে

পড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্ডি এসে জড়িয়ে ধরে। তাঁকে কোলে তুলে অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে বসেছিল হুয়ালাপাইদের রেস্টুরেন্টে। হুয়ালাপাইরা হল আমেরিকার প্রাচীন জনজাতি। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতে গিয়ে সেদিনই লিলি প্রথম জানতে পারেন, তাঁর ভার্টিগো আছে।

হাসপাতালে ফোয়ারার ধারে এসে বসলেন দু'জন। মোবাইল সেটে রিং টোন হচ্ছে দেখে অ্যান্ডি সুইচ অন করে খুশি খুশি গলায় বলে উঠল, 'হাই অ্যালেক্স। তোমরা এখন কোথায়?'

স্পিকার অন থাকায় একটা বাচ্চা ছেলের উত্তেজিত গলা শুনতে পেলেন লিলি। ছেলেটা বলল, 'আমরা এখনও ক্যানিয়নে। এইমাত্তর স্কাইওয়াক থেকে নেমে এলাম। ইউ আর রাইট আঙ্কল, কাচের ফাঁক দিয়ে নিচের দিকে তাকাতে খুব ভয় ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল, যদি ভেঙে নিচে পড়ে যাই, তা হলে আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঘোড়ার খুড়ের মতো অত বড় একটা স্ট্রাকচার শূন্যে বানাল কী করে আঙ্কল?'

এ দিক থেকে অ্যান্ডি হাসতে হাসতে বলল, 'এতে সারপ্রাইজড হওয়ার কী আছে ডিয়ার। মনে রেখো, আমরা আমেরিকান। আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি। রাইট? বলো, তোমার গ্র্যান্ডমা কোথায়?'

'দেখো না, উনি রেস্টুরেন্টে বসে নেটিভদের সঙ্গে কথা বলে যাছেন। গ্র্যান্ডমায়ের সঙ্গে কোথাও আসা মুশকিল। কোনও না কোনও একজন চেনা লোক এসে হাজির হয়। ওঁকে খাতির করতে শুরু করে।'

অভিযোগের সুর শুনে অ্যান্ডি প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বললেন, 'তোমার গ্র্যান্ডমা একজন সেলেব্রিটি ডিয়ার। চিরদিন মানুষের সেবা করে এসেছেন। লোকে ওকে সেই কারণেই চেনেন ও ভালবাসেন।'

ছেলেটার অনুযোগ শুনে লিলি মনে মনে বললেন, তোমার গ্র্যান্ডমা কত বড় মনের মানুষ, একটু বয়স হোক, তখন বুঝতে পারবে আলেক্স। এই তো বছর দশেক আগে ক্যানিয়নের একটা অংশের জঙ্গলে আগুন লেগেছিল। ওই

অঞ্চলে যাঁরা থাকেন, সেই হুয়ালাপাই জনজাতির বহু মানুষ তাতে আহত হয়েছিলেন। রেড ক্রশের হয়ে এলসা আন্টি দুর্গতদের সেবা করতে যান। শুধু তাই নয়, পীড়িত বাচ্চাদের সুস্থ করে তোলার জন্য চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশন থেকে একটা বড় অনুদানও তিনি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। ওঁরা কি সেদিনগুলোর কথা ভুলে যেতে পারেন? দেখা হলে ওঁরা তো মাথায় করে রাখবেনই। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ওয়েস্ট রিম অঞ্চলটা হুয়ালাপাই জনজাতির জন্য সংরক্ষিত। আলেক্স যাদের নেটিভ বলছে, আমেরিকান সরকারও তাঁদের ঘাঁটায় না।

আলেক্স ও প্রান্ত থেকে আরও কী বলতে চাইছিল, অ্যান্ডি ওকে থামিয়ে দিল। 'ঠিক আছে ডিয়ার। আমি এখন একজনের সঙ্গে কথা বলছি। রাতে তোমার সঙ্গে ফের দেখা হবে।'

ফোনের সুইচ অফ করে দিয়ে তার পর অ্যান্ডি বলল, 'স্কাইওয়াকে উঠে, আলেক্সের মতো তুমিও কিন্তু প্রথমবার মারাত্মক ভয় পেয়েছিলে লিলি। নিচের দিকে তাকাতেই চাইছিলে না।'

'আমি এখুনি সেই কথাই ভাবছিলাম। তোমারও মনে আছে সে কথা?'

'এভরি বিট অফ ইট। অতীতের কোনও কথাই আমি ভুলিনি। যাক গে, কয়েকটা দরকারেই তোমার কাছে ছুটে এলাম। হলিডডে একটা ছবি বানানোর কাজ চলছে। ওরা একটা বায়োপিক বানাতে চান। ডিরেক্টর ভদ্রলোক বছর দেড়েক আগে গোথেনবার্গ গেছিলেন স্ক্রিপ্ট রাইটারকে সঙ্গে নিয়ে। তখন ওদের প্ল্যান ছিল, মাদার এলসার জীবনী নিয়ে ছবি করার।'

শুনে লিলি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেললেন, 'ইজ ইট? এর থেকে ভাল খবর আর হয় না।'

'ওয়েট, ওয়েট।' অ্যান্ডি বললেন, 'খবরটা ভাল। কিন্তু মাদার এলসা তখন রাজি হননি। সোজাসাপ্টা না করে দিয়ে বলেছিলেন, উনি এমন কিছু করে

ফেলেননি, যার জন্য ওকে নিয়ে ছবি হতে পারে। পাল্টা উনি কি সাজেশন দিয়েছিলেন, জানো? ফিল্মটা তোমার জীবনী নিয়ে করতে।'

'আমাকে নিয়ে! এমন হাসির কথা তুমি দ্বিতীয়বার মুখে উচ্চারণ কোরো না অ্যান্ডি। তুমি যদি চাও, তা হলে আমি এলসা আন্টিকে রাজি করাতে পারি। ওর জীবনের গল্প আমার থেকে বেশি আর কেউ জানেন না।'

'অদ্ভুত! উনি তো একই কথা বলছেন, তোমার সম্পর্কে। স্ক্রিপ্ট রাইটারকে উনি বলছিলেন, লিলি ইজ আ রিয়াল উইনার। যেখান থেকে ফিরে এসে আজ, ও যে জায়গায় পৌঁছেছে, তা বিশ্বের মানুষের জানা উচিত। ওর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত মানুষের সিমপ্যাথি পাবে। অনেক মানুষকে ইন্সপায়ার করবে।'

'এলসা আন্টির কথা তোমরা মেনে নিও না অ্যান্ডি।'

'আরে শোনো, শোনো। তোমার জীবনের গল্প শুনে ডিরেক্টর ভদ্রলোক এত ইম্প্রেসড যে, উনি মাদার এলসার কথাই মেনে নিয়েছেন। ওঁরা তোমার সম্পর্কে আরও রিসার্চ করেছেন। সেইসূত্রে আমার কাছেও এসেছিলেন। স্ক্রিপ্ট রেডি, প্রিপ্রোডাকশনের কাজও শুরু হয়ে গেছে তিনমাস আগে। তোমার চেহারার সঙ্গে এশিয়ানদের মিল আছে। তাই প্রোতাগনিস্ট-এর রোলটা করছেন একজন ইন্ডিয়ান অ্যাক্টর প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। রিসেন্টলি উনি খুব নাম করেছেন হলিউডে।'

'বাঃ, আমার বায়োপিক হচ্ছে, অথচ আমাকে না জানিয়ে? কী করে হয়?'

'প্রোডিউসার-ডিরেক্টর তোমার কাছে আসতে চান। ওঁরা দু'জনই আমাকে বলেছেন, ফিল্ম থেকে যা রোজগার হবে, তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ওঁরা ডোনেশন দেবেন তোমার চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনে। আমি জানি, সেটা গিয়ে দাঁড়াবে, মিলিয়ন ডলারে। আর তা সত্ত্বেও, তুমি যদি রাজি না হও, তা হলে ছবিটা তোমার বায়োপিক হিসেবে ওরা প্রচার করবেন না। কিন্তু ছবিটা শেষ পর্যন্ত করবেন।'

ডোনেশনের কথা শুনে লিলি অবাক হয়ে তাকালেন। ওয়ান মিলিয়ন ডলার কম অর্থ নয়। চাইল্ড কেয়ারের দায় দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। লিলি বললেন, 'দাঁড়াও, আমি একটু ভেবে দেখি।'

অ্যান্ডি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের ফাউন্ডেশনের চ্যারিটি শো-টা কবে?'

'অস্কার অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার এক সপ্তাহ পরে। ওই সময়টায় হলিউডের স্টারদের ফাঁকা পাওয়া যায়।'

'শো কাদের ডেডিকেট করা হচ্ছে এ বার লিলি?'

'ইয়েমেনের শিশুদের জন্য। অপুষ্টি, রোগ, দারিদ্র... নানা কারণে প্রতি বারো মিনিটে একজন করে শিশু মারা যাচ্ছে ওখানে। সবথেকে বড় কারণ, সিভিল ওয়ার। ক্ষমতা দখলের জন্য দেশের ভিতরই দু'দলের লড়াই। রিসেন্টলি চাইল্ডকেয়ার ফাউন্ডেশন থেকে আমরা পাঁচজনের একটা দল ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে রিপাবলিকান সেনেটর মাইকেল ক্লেয়ারও ছিলেন। ফিরে এসে ওঁরা যা চিত্র দিলেন, তা ভয়াবহ। মাটির নিচে জলের স্তর বারোশো মিটারের মতো নেমে গেছে। সারা দেশে চাষ করার মতো জল নেই। একটা জাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হওয়ার পথে। সারা বিশ্বের মানুষের এখুনি উচিত ইয়েমেনের পাশে দাঁড়ানো। আমরা বাচ্চাদের জন্য অর্থ সাহায্য চাইব সাধারণ মানুষের কাছে। পঞ্চাশ থেকে হাজার ডলার। যে যেমন পারেন, সাহায্য করুন।'

'শো-টা কি এবার লাস ভেগাসে নিয়ে যাওয়া যায়? আমাদের ভেনিসিয়ান হোটেল তোমাদের জন্য খোলা থাকবে। আমি চাই, তোমাদের শো আরও জাঁকজমক করে হোক।'

প্রস্তাবটা শুনে লিলি চুপ করে গেলেন। অ্যান্ডি যখন অনুরোধটা করছে, তখন নিশ্চয়ই এলসা আন্টির সমর্থন আছে। কিন্তু ভেনু অন্য জায়গায় নিয়ে গেলে বেশি খরচ হবে কি না, তা নিয়ে মিটিংয়ে আলোচনা করতে হবে। ডোনেশন থেকে ফাউন্ডেশন যত অর্থ পায়, তার নববুই শতাংশ খরচ হয়

অনাথ, আর্ত আর অসহায় বাচ্চাদের জন্য। বাকি মাত্র দশ শতাংশ সংস্থা চালানোর জন্য লাগে। এই কারণেই চ্যারিটি নেভিগেটর ওঁদের ফাউন্ডেশনকে এক নম্বরে রেখেছে। লিলি বললেন, 'এই প্রস্তাবটাও আমরা ভেবে দেখব। এখন ওঠো। আমাকে কেবিনে ফিরে যেতে হবে।'

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে মেন গেটের দিকে ফিরছেন। অ্যান্ডি বললেন, 'তোমাকে আরও একটা কথা বলার ছিল। কিন্তু বলব কি না, ঠিক করতে পারছি না।'

গলার স্বরে হঠাৎ পরিবর্তন শুনে, দাঁড়িয়ে পড়ে লিলি বললেন, 'কী হয়েছে অ্যান্ডি? এত ইতস্তত করছ কেন?'

'কয়েকদিন আগে কয়েকজন ডিপ্লোম্যাট সেনেটর আমাদের হোটেলে একটা অনুষ্ঠানে গেছিলেন। ওঁদের মুখে শুনলাম, বাংলাদেশে তোমাকে নিয়ে না কি মারাত্মক হই চই হচ্ছে। আচ্ছা, নায়গারায় রিসেন্টলি তোমাকে লক্ষ্য করে টেররিস্টরা কি গুলি চালিয়েছিল? সেই গুলি না কি তোমার বাংলাদেশি রিপ্রেজেন্টিটিভ রোকেয়া সুলতানার গায়ে লাগে? কথাটা কি সত্যি?'

অ্যান্ডির কাছে গোপন করতে চাইলেন না লিলি। বললেন, 'হ্যাঁ।'

'তুমি কি জানতে তোমার উপর অ্যাটাক হবে? না হলে ঘটনাটা ঘটার আগে তুমি ও রোকেয়া কেন পোশাক বদলাবদলি করেছিলে? বাংলাদেশি সাংবাদিকরা এই প্রশ্নটা তুলেছেন।'

লিলি বললেন, 'আমরা পোশাক বদলে নিয়েছিলাম সিকিউরিটি গার্ড স্ট্যানলি গর্ডনের কথায়। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। কিন্তু আমি তো সে ব্যাপারে কথা বলে নিয়েছি রোকেয়ার সঙ্গে।'

অ্যান্ডি বললেন, 'দু'দিন আগে রোকেয়া মারা গেছেন। হাইকমিশন মারফৎ খবরটা পেয়ে ডিপ্লোম্যাট সেনেটররা তৈরি হচ্ছেন। তোমার উপর টেররিস্ট অ্যাটাকের খবর কেন চেপে দেওয়া হল, তোমার জন্য কেন একজন বাংলাদেশিকে প্রাণ দিতে হল, এর পিছনে চাইল্ড কেয়ার

ফাউন্ডেশনের কোনও আর্থিক কারচুপির কারণ আছে কি না... সেনেটে এইসব প্রশ্ন ওঁরা তুলবেন। ওঁরা জানেন, তুমি প্রেসিডেন্ট অ্যাডামসের খুব প্রিয়। আসল টার্গেট তাই উনি।'

রোকেয়া মারা গেছে! শোনার পর থেকে পা থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে লিলির। ইসস, রোকেয়াকে তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশি কোনও সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে চান। তাঁকেই পরিষ্কার করে সব বলে দেবেন, অ্যাটাকের খবর মিডিয়া জানুক, সেটা তিনি কেন চাননি? রোকেয়া বলেছিল, যোগাযোগ করিয়ে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঢাকা থেকে কোনও সাংবাদিক ফোন করেননি। করলে তিনি বলে দিতে পারতেন, রোকেয়া নন, টেররিস্টদের টার্গেট ছিলেন তিনিই। হামলার ঘটনাটা আমেরিকান মিডিয়া জানতে পারলে, চ্যানেলগুলোতে বিশ্রী আলোচনা শুরু হয়ে যেত। তাতে তাঁর ফাউন্ডেশনের খুব ক্ষতি হত। কথাগুলো ভাবতেই লিলি পিঠে সুচ ফোটার যন্ত্রণা অনুভব করলেন। কোনও রকমে তিনি বললেন, 'অ্যান্ডি, আমার শরীরটা কেমন যেন করছে। প্লিজ, আমাকে কেবিনে নিয়ে চলো।'

বলার সঙ্গেসঙ্গে লিলি টের পেলেন, অ্যান্ডি তাঁকে পাঁজকোলা করে তুলে নিয়েছেন। পঁচিশ বছর আগে ঠিক যেমন ক্যানিয়নের ধার থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে গেছিলেন হুয়ালাপাইদের রেস্টুরেন্টে।

(তেইশ)

প্রায় একমাস আমেরিকায় কাটিয়ে ফেলল কালকেতু। শিউলিদিদিকে খোঁজার কাজ যতটা এগোনো উচিত ছিল, ততটা এগোয়নি। মনে মনে অপরাধবোধে ভুগছিল কালকেতু। কিন্তু কর্নেল মজুমদারের সঙ্গে কথা হওয়ার পর ও একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। উনি এমন কয়েকটা তথ্য দিয়েছেন, যা কালকেতু পুরনো পেপার কাটিংগুলোতে পায়নি। খোঁজটা ও শুরু করেছিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে। ঢাকায় ওর এক বন্ধু থাকে। ইত্তেফাক কাগজের সিনিয়র রিপোর্টার চঞ্চল। প্রশাসনের উঁচুতলায়

ওর যাওয়া-আসা আছে। কালকেতু ওকেই প্রথম একটা মেল পাঠায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় মেডিক্যাল কলেজে যারা ভর্তি হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছয় বছরের কোনও বাচ্চা মেয়ে ছিল কি না, তা জানার জন্য? মেয়েটাকে নিয়ে তখন খুব লেখালেখি হয়েছিল। মেল পাওয়ার পরই চঞ্চল জানতে চায়, মেয়েটির ব্যাপারে আর কিছু জানানো কি সম্ভব? কালকেতু রেখে ঢেকে তথ্য পাঠিয়েছে। এখনও চঞ্চল কিছু জানায়নি।

দ্বিতীয় যে কাজটা কালকেতু করেছে, সেটা হল, গোথেনবার্গে মিসেস এলসা গিনেসবেরির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা। কর্নেল মজুমদার ভদ্রমহিলার অফিসের মেল অ্যাড্রেস আর কন্টাক্ট নাম্বার দুটোই পাঠিয়েছিলেন। এলসা ম্যাডামের সঙ্গে ও কথা বলতে চায়, এইরকম একটা মেল পাঠানোর প্রায় একঘণ্টার মধ্যে উত্তর এসে যায়। ভদ্রমহিলা মনে হয়, কোনও চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত। ওঁর অফিসের একজন স্টাফ জানান, মিসেস গিনেসবেরি এখন লাস ভেগাসে ছুটি কাটাতে গেছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসবেন। উনিই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবেন।

কালকেতুর তালিকায় তৃতীয় নামটা ছিল, রিচার্ড গাটম্যানের। নিউ ইয়র্ক টাইমস অফিসের দেওয়া ওর নাম্বারে বারবার ফোন করা সত্ত্বেও কেউ তোলেননি। দীর্ঘ-সময় ধরে রিং হয়ে গেছে। গুগল সার্চ করে কালকেতু জানতে পারে, ভদ্রলোক ডালাসের বাড়িতে উইক এন্ড-এ থাকেন। ডালাস শহর থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে প্লেনো বলে জায়গা আছে। সেখানে গাটম্যান একটা ফোটোগ্রাফি ইন্সটিটিউট চালান। ছাত্র-ছাত্রী আর তাদের অভিভাবকদের বাইরে অন্য লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে তিনি নাকি এখন উৎসুক নন। দু'চারজন সাংবাদিক ছাড়া কারও সঙ্গে খুব মেশেনও না।

কালকেতু কথা বলার চেষ্টা করেছিল রেড ক্রসের ডিন জোন্স বলে এক ডাক্তারের সঙ্গেও। ঢাকায় উনি বেবির ট্রিটমেন্ট করেন প্রথম দিকে। উনি

অস্ট্রেলিয়ান, থাকতেন সিডনি শহরে। রেড ক্রসের হেড কোয়াটার্স জেনিভায় অনেকবার ফোন করার পর মেল মারফৎ একটা খবর পেয়েছে কালকেতু। ডা. জোন্স বেঁচে নেই। সোমালিয়ার সিভিল ওয়ারের সময় রেড ক্রস শিবিরে বোমা পড়েছিল। সাত বছর আগে সেইসময় ডাঃ জোন্স মারা যান। মেল-এর সঙ্গে একটা অবিচুয়ারিও পিডিএফ করা ছিল। সেটা পড়ে কালকেতুর মন খারাপ হয়ে গেছিল।

গুগল সার্চ করার সময় একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি চোখে পড়েছে কালকেতুর। এক ভিয়েতনামি মেয়ের কাহিনি। নাম কিম ফুক ফান থি। সারা বিশ্বে পরিচিত 'দ্য ন্যাপাম গার্ল' হিসেবে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আমেরিকার ন্যাপাম বোমায় তিনি মারাত্মক আহত হন। ঢাকায় বেবির খোঁজ কেউ রাখেনি। কিন্তু কিম ফুক বরাবর মিডিয়ার নজরে ছিলেন। ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট সরকার তাঁকে কিউবাতে পাঠান চিকিৎসার জন্য। শুশ্রূষা চলার মাঝেই হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনো শেষ করেন। তার পর বিয়ে করেন এক সহপাঠীকে। ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট নেতাদের আচরণ পছন্দ হচ্ছিল না কিম ফুকের। হনিমুনে যাওয়ার নাম করে, রাশিয়ায় যাওয়া পথে মস্কো এয়ারপোর্ট থেকেই দু'জনে পালান। কানাডায় গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এখনও তিনি কানাডাবাসী, দুই সন্তানের মা। ইউনিসেফের হয়ে কিম ফুক সারা বিশ্বে শান্তির বার্তা দিয়ে বেড়ান।

উইকিপেডিয়ায় কিম ফুকের জীবনী পড়ে কালকেতু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, বেবি বলে মেয়েটিকে খুঁজে বের করতেই হবে। দু'জনের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ প্রায় একই রকম। কিম ফুকের চিকিৎসা হয়েছিল কিউবায়। এ দিকে, এলসা গিনেসবেরি বেবিকে নিয়ে গেছিলেন তাঁর দেশে। বেবির প্রচারের পিছনে ছিলেন এক আমেরিকান ফোটোগ্রাফার রিচার্ড গাটম্যান। অন্যদিকে, কিম ফুকের ছবি ছাপিয়ে তাঁকে বিশ্বখ্যাত করেন যিনি, তিনিও এক ফোটোগ্রাফার। ভিয়েতনামের নিক ওট। দু'টি ঘটনা কয়েকমাস

তফাতের। মুক্তিযুদ্ধ উনিশশো একাত্তর সালে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকা জড়িয়ে পড়ে বাহাত্তরে। বেবি আর কিম ফুকের জীবনীপুঞ্জে একটাই তফাৎ। কিম স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে সংসার করছেন, সবাই জানেন। কিন্তু বেবি বেঁচে আছেন কি না, বেঁচে থাকলে কোথায় আছেন বা সংসার পেতেছেন, তা মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া আর কেউ জানেন না।

পলাশভাইয়ের সঙ্গে দু'টো দিন দেখা হয়নি। রোজিনা ম্যাডামকে নিয়ে উনি ডালাস গেছেন। প্রাইভেট জেল তৈরির ব্যবস্থাপনা দেখতে। ফলে অফুরন্ত সময় এখন কালকেতুর হাতে। দু'দিন বাড়ির বাইরে পা দেয়নি ও। ক্রমাগত ভেবে যাচ্ছে, পলাশভাইয়ের শিউলিদিদিকে নিয়ে। ওর মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা, ফিল্ম ডিরেক্টর কাফি বীর যেন ওকে টেক্কা দিতে না পারেন। ভদ্রলোককে কালকেতু একবার ফোন করেছিল। ওর প্রোডাকশন অফিসের কেউ একজন জানালেন, কাফি এখন ঢাকায় নেই। কবে ফিরবেন, বলা সম্ভব নয়। নিজের পরিচয় দিয়ে কালকেতু তখন বলে, কাফি ফিরে এসে যেন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

হাত-পায়ে জং ধরে গেছে। কালকেতু বাইরের লনে কিছুক্ষণ হেঁটে আসার কথা ভাবছিল, তখন দেখে লারেইনা হাসিমুখে ওর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। মেক্সিকান মেয়েটা প্রায়ই রুম সার্ভিসের জন্য আসে। রোজিনা ম্যাডামের খুব প্রিয়পাত্রী। সবসময় হাসিমুখে থাকে। মাঝেমাঝে যেচে কথাও বলে। মেয়েটা একদিন বলেছিল, ওর খুব ইচ্ছে, এফবিআইতে চাকরি করবে। সেজন্য ও জোর কদমে তৈরি হচ্ছে। আজও রুম সার্ভিসের জন্য এসেছে ভেবে, কালকেতু ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু লারেইনা বলল, ও আগে আউট হাউসের ঘরগুলো গুছিয়ে দেবে। তারপর সময় পেলে মেন বিল্ডিংয়ে ঢুকবে। কথাগুলো বলে ও হেঁটে আউট হাউসের দিকে গেল।

ও চলে যাওয়ার পরই দরজায় নক করার শব্দ। তার পরই ইমন বলে ছেলেটার গলা, 'ছ্যার, আফনে ঘরে আসেন না হি? এগবার বাইরে আইবেন?'

কালকেতু বলল, 'তুমি ভেতরে এসো ইমন।'

ঘরে পা ইমন দিয়ে বলল, 'ছ্যার, অ্যামাজন থেইক্যা আফনের একডা পার্সেল আইসে। মনে হয়, বই।'

সঙ্গে সঙ্গে কালকেতুর মনে পড়ল, নিউ ইয়র্ক থেকে ফেরার দিনই ও অ্যামাজনে একটা অন লাইন অর্ডার দিয়েছিল। জিহাদিদের নিয়ে লেখা একটা বই। ড্যারেল স্মিথের 'মাই লাইফ উইথ জিহাদি'। বাইশ ডলার দাম। মূলত জিহাদিদের সম্পর্কে কৌতূহল মেটানোর জন্যই কিনতে চাওয়া। এই সব বই ভারতের বাজারে অনেক দিন পরে পৌঁছয়। হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে কালকেতু বলল, 'দাঁড়াও, দামটা দিয়ে দিচ্ছি।'

ইমন বলল, 'দাম আমি মিটাইয়া দিসি ছ্যার। পরে আমারে দিয়া দেবেন।'

প্যাকেট খুলে কালকেতু দেখল, প্রায় সাড়ে তিনশো পাতার বই। ও চট করে লেখক পরিচিতিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। ড্যারেল লিখেছেন, সিরিয়ায় দীর্ঘদিন তিনি জিহাদিদের ক্যালিফেটে কাটিয়েছেন। ধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্য, কবিতা ও গানের প্রতি ভালবাসা যেমন তিনি দেখেছেন, তেমনই তাদের প্রতিশোধস্পৃহা, নিষ্ঠুরতা দেখে কখনও কখনও তিনি বাকরহিত হয়ে গিয়েছেন। ভদ্রলোক দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা করেছেন। লন্ডনের এক কাগজের হয়ে সিরিয়ার সিভিলওয়ার কভার করতে গিয়ে কী ধরনের ঝুঁকি নিয়েছেন, ভাবতেই কালকেতুর মন শ্রদ্ধায় ভরে গেল। বইয়ের ব্যাককভার থেকে মুখ তুলে ও দেখল, ইমন তখনও দাঁড়িয়ে আছে। একটু অবাক হয়েই কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবে?'

'জ্বী ছ্যার, আফনের এই বইডা আমারে পইড়তে দিবেন?'

'জিহাদিদের নিয়ে তোমার ইন্টারেস্ট আছে না কি?'

‘জ্বী ছ্যার। জিহাদিগো আমি কাইছ থেইক্যা দ্যাখসি। তাই মিলাইয়া দ্যাখতাম। বইতে যা লিখসে, সব হত্য কথা কি না।’

কালকেতু জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি কদ্দূর পড়াশুনো করেছ ইমন?’

‘ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেইক্যা পাস করসিলাম। তাইর পর আর আগাইল না।’

‘আরে বাহ। পলাশভাই কি জানেন, তুমি ইঞ্জিনিয়ার?’

‘কই নাই। কইলে উনি আমারে কাম দিতেন না। জীবনে একডা বড় ভুল কইর‍্যা ফালাইসিলাম ছ্যার। বিদেশে চাগরি করনের ইচ্ছায়, দ্যাশ ছাইড়া আইসা। কপাল খারাপ, অহন আমারে সিকিউরিটি গার্ডের কাম করতে হইতাসে।’

ইমন কি সত্যি কথা বলছে? না কি সেদিন সুদীশের কথাবার্তা শুনে, ওকে বাজিয়ে দেখার জন্য পাল্টা চাল দিচ্ছে? কালকেতু বুঝতে পারল না। তবুও উৎসাহ দেখিয়ে ও বলল, ‘বোসো, বোসো। আমাকে বলো তো, তুমি কোথায় দেখেছ জিহাদিদের। সত্যিই কাছ থেকে দেখেছ?’

সোফায় মুখোমুখি বসে ইমন বলল, ‘জ্বী ছ্যার। নিউ ইয়র্কে আমরা যে পাবলিক স্টোরেজে কাম কইরতাম, সেহানে হ্যাগো দ্যাখসি। স্টোরেজের বেসমেন্টে চাইরজন জিহাদি লুকাইয়া ছিল। স্টোরেজের ম্যানেজার ছাড়া আর কেউ জাইনত না। আমাগো কাছে ধরা পড়ার পর হ্যারা আমাগো থেরেট করছিসল, পুলিশরে জানাইলে খতম কইর‍্যা দিমু।’

‘ওরা কি এখনও পাবলিক স্টোরেজেই আছে?’

‘কইতে পারুম না ছ্যার। আফনের বন্ধু সুদীশছ্যার হেইদিন গাড়িতে যার কথা কইতাসিল, তারে আমি চিইনতাম।‘

‘কার কথা তুমি বলছ? আই সিক্সটিফাইভ... মানে ইন্ডিয়ান ছেলেটাকে না কি?’

‘জ্বী ছ্যার। করিমগঞ্জের পোলাডারে। বাংলায় কথা কয় বইল্যা হ্যার সাথে আমার রেগুলার কথা হইত।’

‘এই কথাগুলো তুমি সুদীশছ্যারকে সেদিন বলোনি কেন?’

‘ডর লাগতাসিল। হ্যায় আমারেও যদি জিহাদি বইল্যা ধইর‍্যা নেন। হত্য কথা হইল, জিহাদিরা এহন কোথায়, আমি জানি না। পাবলিক স্টোরেজ থেইক্যা যেদিন আমরা চইলা আসি, তাইর পরের দিন পুলিশ রেইড করসিল। জানি না, অরা চাইরজন ধরা পড়সিল কি না। ’

‘ওদের সম্পর্কে তুমি আর কী জানো ইমন?’

‘দুইডা ঘটনার কথা জানি। হ্যাগো তিনজন নায়গারায় গেসিল লিলি গডউইন বইল্যা এগজনরে খুন করার জন্য। সাকসেসফুল হয় নাই। তহনই আমারে হ্যায় কইসিল, জিহাদি ক্যাম্পে আর ফিইর‍্যা যাইব না।’

রোকেয়া সুলতানা নন। লিলি গডউইনই তা হলে সেদিন টার্গেট ছিলেন। কালকেতু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘ওরা লিলি গডউইনকে মারতে চেয়েছিল কেন?’

‘হ্যায় না হি ইউনিসেফের কাছে খারাপ রিপোর্ট দিতাসিল রোহিঙ্গাগো সম্পর্কে। বাংলাদ্যাশের জামায়েতিরা চেইত্যা গেসিল। জামায়েতিরাই আইএসের কাছে রিকোয়েস্ট করসিল, নায়গারায় লিলি গডউইনরে খুন করার জন্য। ’

‘তোমার জানা দ্বিতীয় ঘটনাটা কী?’

কী যেন চিন্তা করে ইমন বলল, ‘ছ্যার, আফনেরে মারার জন্য জিহাদিরা যারে পাঠাইসিল, হ্যায় আর বাঁইচ্যা নাই।’

কথাটা শুনে কালকেতু চমকে উঠল। ইমন গল্প বানাচ্ছে না কি? এমন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছে, যেন ও মৃত। পুলিশ যেন ওকে খুঁজে বের করার জন্য আর সময় নষ্ট না করে। সুদীশ সেদিন যা বলেছিল, তা হলে সেটা ঠিক। জিহাদিরা কাউকে খুন করতে যাওয়ার আগে, পাবলিক

স্টোরেজের গার্ডদের কাছে গল্প করবে, এটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য? দ্রুত চিন্তা করে নিয়ে কালকেতু পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আমার উপর যে অ্যাটাক হয়েছিল, তুমি কী করে জানলে ইমন?'

'কাউরে খুন করতে যাওয়ার আগে জিহাদিরা প্রেয়ার কইর‍্যা যাইত। আল্লাহরে জানাইয়া যাইত, কাফের নিধন করতে যাইতাসে। হ্যালোইনের রাতে হেইদিন বেসমেন্টে খাওয়া- দাওয়ার ব্যবস্থাও হইসিল। হ্যারা আমাগো দুইজনরে দাওয়াত দিসিল। গিয়া দেখি, আফনের ছবি দেওয়ালে ঝুলতাসে।'

'তুমি কি জানো, কেন ওরা আমাকে মারতে চেয়েছিল?'

'জ্বী ছ্যার। তহন হ্যাগো মুখে যা হুনসি, কই। আফনে ছ্যার কি কুনও বই লিখসেন, যেহানে রোহিঙ্গা মুসলিমগো খুব নিন্দা করসেন?'

চট করে কালকেতুর মনে পড়ল, ওর লেখা একটা উপন্যাসের কথা। যার পটভূমি মায়ানমারে বৌদ্ধ আর মুসলিমদের লড়াই। ইমন ওকে বোকা বানাচ্ছে না কি? সত্যি বলতে কী, উপন্যাসটায় কালকেতু এমন কিছু কড়া কথা লেখেনি, যাতে মুসলিম সম্প্রদায় ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। কিন্তু উপন্যাসটা সম্পর্কে ইমন জানলই বা কী করে? আর যেই হোক, ও তো সুলেমান রুশদির মতো বিখ্যাত নয়। পরক্ষণেই ওর মনে হল, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এ এমন কি কঠিন কাজ? ফেসবুকে এই কিছুদিন আগেও বিস্তর আলোচনা হয়েছে বইটা নিয়ে। সেখানে কেউ কেউ বলেওছিলেন, কালকেতু নন্দী ইসলামকে অবমামনা করেছেন। ইমনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কালকেতু পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে যে ছেলেটা মার্ডার করতে এসেছিল, তার কী হল? তার উপর জিহাদি কমান্ডাররা অত্যাচার করেছিল না কি?'

'জ্বী জ্বী। ঠিকই ধরসেন। হুধু অইত্যাচার না, হ্যারে গুলি কইর‍্যা, মাইর‍্যাই ফ্যালসে ছ্যার। পাবলিক স্টোরেজের পিছনের জমিতে হ্যারে পুইত্যা দিসে। আমি নিজের চোখখে দাখসি।'

শুনে কালকেতুর হাসি পেল। এতক্ষণে ও মোটামুটি নিশ্চিত, জিহাদি চিনতে সুদীশ অন্তত ভুল করেনি। ইমন ছেলেটার কপালে অশেষ দুঃখ লেখা আছে। সুদীশ একবার যার উপর থাবা বসায়, তাকে সহজে ছাড়ে না। ও কাউকে কিছু বলতে মানা করেছে। কোনও দরকার নেই জিহাদিদের নিয়ে মাথা ঘামানোর। যে কাজ করার জন্য আমেরিকায় এসেছে, অতঃপর তাতেই ও মন দেবে। ইমনকে বাজিয়ে দেখার জন্য ও একবার বলল, 'তুমি কি এ সব কথাসুদীশস্যারকে বলতে পারবে? ওকে নিয়ে যেতে পারবে সেই জায়গাটায়, যেখানে জিহাদিরা ওই ছেলেটাকে কবর দিয়েছে?'

'জ্বী ছ্যার কইতে পারুম। কিন্তু আমারে কোথাও যাইতে কইবেন না। আর আফনেরে কথা দিতে অইব, জিহাদিরা য্যান আমার কথা জাইনতে না পারে। হ্যারা খুউব ডেঞ্জারাস টাইপের ছ্যার। যে সব গল্প হ্যাগো মুখে হুনসি, তাতে ডর লাগে। হ্যারা ঠিক আমাগো খুঁইজ্যা বাইর করব। তাইর পর গুলি কইর‍্যা মারব।'

'ভয় পেও না ইমন। সুদীশস্যারেরা তোমাদের প্রোটেকশন দেবে। তুমি কি জিহাদিদের স্কেচ আঁকায় সাহায্য করতে পারবে?'

'জ্বী ছ্যার, পারুম। আমি নিজেই স্কেচ আঁইক্যা দিতে পারি। তবে, পুলিশের চক্করে আমি জড়াইয়া পড়তে চাই না। অনেক কষ্টে পলাশছ্যারের এহানে আশ্রয় পাইসি। হেইডা নষ্ট কইরতে চাই না। ছ্যার, আফনেরে দেইখ্যা আমার মনে হইসে, আফনে পলাশছ্যারের মতো ভালা মানুষ। আফনেরে আগে থেইক্যা সব কইয়া রাখলাম। নাইলে হান্তি পাইতাসিলাম না।'

'আমাকে সব কথা বলে ভাল করেছ ইমন। এখন তুমি যাও। জিহাদিদের বইটা তুমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো। পড়া শেষ হলে ফেরত দিয়ে যেও।'

সোফা ছেড়ে উঠে বইটা হাতে নিয়ে ইমন ঘর থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে কালকেতুও বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

পলাশভাই সেদিন বলছিলেন, শীতের শুরুতে এই সময় গাছের পাতা শুকিয়ে বাদামি বা খয়েরি রঙের হয়ে যায়। পাতাগুলো ঝরে লনে জড়ো হতে থাকে। রোদ্দুর উঠলে আশপাশের গাছ থেকে কাঠবেড়ালিরা নেমে লনে খেলা করতে আসে। কাঠবেড়ালিগুলোর শরীরের তুলনায় লেজের দিকটা বেশ মোটা ও লোমে ভরা। লনের গর্ত থেকে কয়েকটা খরগোসও বেরিয়ে এসে কুটকুট করে ঘাস খায়। নিউ জার্সির বেড়ালগুলো তখন হঠাৎ হানা দেয়। এই ব্ব ক্যাটদের সঙ্গে কাঠবেড়ালির লুকোচুরি খেলা দেখতে কালকেতুর খুব মজা লাগে। আজ লনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, আউট হাউসের বারান্দায় চিরাগ হাতে গুলতি নিয়ে দাঁড়িয়ে। দেখে ওর ভ্রু কুঁচকে গেল।ছেলেটার মতলবটা কী? কাঠবেড়ালি মারবে না কি? গুলতিই বা ও পেল কোথায়?

শুকনো পাতার উপর দুটো কাঠবেড়ালি দৌড়ে বেরাচ্ছে। আউট হাউসের বারান্দা থেকে পনেরো ষোলো গজ দূরে। কালকেতু দেখল, চিরাগ গুলতি তাক করে আছে। তার দু'এক সেকেন্ড পরেই কাঠবেড়ালিটা একবার লাফিয়ে উঠল। তার পর দু'তিনবার গড়িয়ে গিয়ে নিথর হয়ে গেল। ওর গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। নিজের চোখকে কালকেতু বিশ্বাস করতে পারল না। এমন নিখুঁত টিপ কারও হয় না কি? চোখের সামনে একটা নিরীহ পশুকে হত্যা করতে দেখে ওর ভয়ানক রাগ হল চিরাগের উপর। চট করে ওর মনে হল, রোজিনা ম্যাডামই ঠিক। যাদের মনে এমন জিঘাংসা, তারা কখনও স্বাভাবিক মানুষ হতে পারে না।

(চব্বিশ)

গার্ডের ডিউটি শেষ করে আউট হাউসে ফিরে এল চিরাগ। দেখল, ইমন মনোযোগ দিয়ে কী একটা বই পড়ছে। বরাবরই ওর বই পড়ার নেশা। ক্যাম্পেইমন সময় পেলেই রিলিজিয়াস বই এনে পড়ত। প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ অংশগুলো উদ্ধৃত করতেও পারত। কোরান পড়তে পড়তে কখনও

কখনও ওকে কাঁদতেও দেখেছে চিরাগ। ক্যালিফেটে নতুন জিহাদিদের মধ্যে এই কান্না একটা কম্পিটিশনের চেহারা নিত একেক সময়। কোরান পড়ার সময় যে যত করুণ সুরে কাঁদতে পারবে, কেঁদে ধর্মীয় আকুলতা ফুটিয়ে তুলতে পারবে, সে মৌলভীদের তত প্রিয় হয়ে উঠতে পারবে। এই প্রতিযোগিতায় চিরাগও একটা সময় নেমে পড়েছিল। লোক দেখানো নমাজ পড়ত দিনে পাঁচ ওয়াক্ত করে। কারণ-অকারণে ঘরের এককোণে হাঁটু গেড়ে বসত আল্লাহর কৃপা প্রার্থনার জন্য।

কাল দুপুর থেকেই ইমন একটু চুপচাপ। ওর মনের ভিতর যা ঝড় বয়ে গেল! পরশু রাতে টিভিতে দাদামশায়ের ফাঁসির খবর শুনে ও মারাত্মক অস্থির হয়ে পড়েছিল। সারা রাত একই কথা বলে বিরক্ত করেছিল, 'চল, আইএস ক্যাম্পে ফিইর‍্যা যাই।' ওর মনের মধ্যে থেকে ক্রোধের সেই আগুনটা নিভে গেছে বোধহয়। তাই দু'দিন ধরে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা আর বলছে না। পড়াশুনো করা ভাল প্রকৃতির ছেলে। জিহাদি জীবন ওর সঙ্গে খাপ খায় না। ও কী বই পড়ছে, সেটা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও চিরাগ চুপ করে গেল। খানিকক্ষণ পরে পোশাক বদলে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে ও বলল, 'রেন্ডিটাকে নিয়ে তোর পলাশস্যার ফিরে এসেছে কি না, ইমন জানিস?'

বই থেকে একবার মুখ তুলে ইমন কড়া চোখে ওর দিকে তাকাল। চিরাগ জানে, রোজিনা ম্যাডাম সম্পর্কে কোনও কটু কথা ইমন পছন্দ করে না। এর আগেও রেন্ডি কথাটা ও বলে ধমক খেয়েছে। কিন্তু বেশ্যাকে রেন্ডি ছাড়া আর কী বলবে? রোজিনা ম্যাডামের উগ্র মেক আপ আর পোশাক-আশাক দেখে তো তাই মনে হয় চিরাগের। বুকের দিকে তাকালে ওর শরীর গরম হয়ে যায়। কাবুল, করাচি, মোসুল, রাক্কায় মেয়েরা বোরখায় সারা শরীর ঢেকে রাখত। ওরা চোখ ছাড়া আর কিছু প্রদর্শন করত না। কসোভো, অন্টারিও বা নিউ ইয়র্কে পোশাকের ব্যাপারে অত রাখঢাক নেই মেয়েদের।

সেইসঙ্গে কোন পুরুষ কীভাবে তাকাল, তা নিয়ে এরা মাথা ঘামায় না। রোজিনা ম্যাডামের মধ্যেও সেই বেপরোয়া মনোভাব লক্ষ করেছে চিরাগ। উনি যে পোশাকই পরুন না কেন, ক্লিভেজ এমন বেরিয়ে থাকে, চিরাগের মনে হয়, তাতে মুখ ঘষে।

ইদানীং ওর যৌনক্ষুধাটা বেড়েছে। ক্যালিফেটে ধরে আনা বন্দি সিরিয়ান আর লেবানিজ মেয়েরগুলোর নগ্ন দেহ যখন-তখন ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অ্যাকশন সেরে ফিরে আসার পর যে সব জিহাদির শরীর ঠান্ডা করার দরকার হত, তাদের ওই মেয়েদের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। চিরাগের কপালে মাত্র একবারই প্রাইজ জুটেছিল। যেদিন প্রায় এক মাইল দূর থেকে গুলি করে একজন আমেরিকান জওয়ানকে ও মেরে ফেলেছিল। মেয়েদের শরীর থেকে সুখ নেওয়ার অভিজ্ঞতা অবশ্য সেই প্রথম নয়। করিমগঞ্জে থাকার সময়ই ও প্রায়ই যৌনক্ষুধা মেটাত। ওর মতো লোচ্চা ছেলে করিমগঞ্জে আর একটাও ছিল না। ইমনের কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে, চিরাগ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

ক্যালিফেটে থাকার সময় চিরাগ দেখেছে, জিহাদিরা নিজেদের জীবন সম্পর্কে সত্যি কথাটা কখনও বলে না। বেশিরভাগ জিহাদিরই অতীতটা কলঙ্কময়। অপরাধ জীবন থেকে সরে এসে ওরা মুজাহিদ্দিন হয়ে গেছে, একটা কাল্পনিক জগতের টানে। সেখানেও যদি বুঝতে পারে ঠকেছে, তার থেকে হতাশার আর কিছু হয় না। এখন চিরাগের মনে সেই হতাশা ঘুরে ফিরে আসছে। শরীরের চাহিদা প্রবল, কিন্তু কেউ জানে না, সেটা মেটানোর ক্ষমতা এখন ওর নেই। রাক্কায় ওর সেই ক্ষমতাটা কেড়ে নিয়েছিল আরব জিহাদিরা। মাস তিনেক ওকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। নিজেকে এখন হিঁজড়ে ছাড়া আর কিছু মনে হয় না চিরাগের। যতবার কথাটা মনে হয়, ততবারই রোজিনা ম্যাডামকে ধর্ষণ করার ইচ্ছেটা ওর জাগে।

ইমনকে সেদিন নিজের সম্পর্কে চিরাগ যা বলেছিল, সব মিথ্যে। ফিজিক্সে এমএসসি, ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করার সুযোগ! হা হা হা, গান্ডুটা সব বিশ্বাস করে নিয়েছে। আসল কথা হল, কোনও রকমে ও স্কুলের চৌকাঠ পেরিয়েছিল। ছোটবেলাতেই বদসঙ্গে পড়েছিল। বাংলাদেশের সিলেট থেকে চোরাপথে ড্রাগস আসত। তার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত সারাদিন। ড্রাগস কেনার জন্য হাতসাফাই, ছোটখাটো চুরি-চামারি করতে হত ওকে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় একবার পুলিশের হাতে ও ধরা পড়েছিল। লক আপেই ওর সঙ্গে আলাপ হয় ফরিদ মিঞার। কুশিয়ারা নদীর ধারে তার দেশি মদ আর ড্রাগসের ঠেক ছিল। মাসখানেক জেল খাটার পর ফরিদ মিঞার দলের লোকেরাই ওকে ছাড়িয়ে আনে। বাড়িতে ফিরে গেছিল চিরাগ, কিন্তু আববু লাথি মেরে ওকে বের করে দেন। সেই থেকে আববুর উপর ওর রাগ আর ঘৃণা বহুদিন জমা হয়ে ছিল।

কুশিয়ারা নদীর ধারেই শাগরেদদের কারও না কারও ঠেক-এ ওর দিন কাটত। করিমগঞ্জে মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি। মহরমের দিন ওখানে তাজিয়া নিয়ে বিশাল বিশাল মিছিল হত। একবার মহরমের মিছিলে রাস্তায় আম্মা-আববুদের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়। আম্মুর সঙ্গে কথা বলতে গেলে আববু ওকে জুতো খুলে মারতে ওঠেন। রাগ আর সামলাতে পারেনি চিরাগ। সবার সামনে আববুর মাথায় পিস্তল ধরে ট্রিগার টিপে দেয়। সারা জেলায় পিতৃহন্তা হিসেবে ওর বদনাম হয়ে যায়। এর পর গা ঢাকা দেওয়ার জন্য চিরাগ বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়ে বছর দুয়েক সেখানে ছিল। এইসময়ে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের গুলিতে ফরিদ মিঞার ইন্তেকাল হয়। শাগরেদদের অনুরোধে চিরাগ করিমগঞ্জে ফিরে স্মাগলিং ব্যাবসাটা কবজা করে। সেইসঙ্গে তোলা আদায়, গুণ্ডাগর্দিতে জেলার ত্রাস হয়ে ওঠে।

নারীমাংসের প্রতি লোভ চিরাগের মধ্যে কোনওদিনই জাগত না, স্বপ্না বলে মেয়েটা ওর জীবনে না এলে। নদীর ধারে এক গরিব হিঁদুবাড়ির বউ,

ছলাকলায় ওস্তাদ। মেয়েটার তীব্র যৌন আকর্ষণ চিরাগকে পাগল করে দিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই ও বুঝতে পারে, স্বপ্না শাগরেদদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিচ্ছে। পুলিশকেও গোপনে খবর সরবরাহ করে। ইতিমধ্যে অসমের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতো হিন্দু মৌলবাদীদের দল অসমে ক্ষমতা দখল করার মতো শক্তি বাড়িয়ে ফেলেছে। করিমগঞ্জে তখন হিন্দুদের আস্ফালন শুরু হয়ে গিয়েছে। চোরাপথে সিলেটে গরু পাচার করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সেইসময় একদিন সাগরেদদের একজন এসে খবর দেয়, স্বপ্না বজরঙ্গবলী দলের কোনও এক নেতার বাড়িতে গোবর্ধন পুজোয় কীর্তন গাইতে গিয়েছে। কীর্তনের আসর থেকে ওকে তুলে চিরাগ প্রথমে ঠেক-এ নিয়ে যায়। হাত-পা বেঁধে একের পর এক পাঁচ-ছয়জন মিলে ধর্ষণ করে। তার পর স্বপ্নার যৌনাঙ্গে গুলি করে দেহটা কুশিয়ারা নদীতে ফেলে দেয়।

স্বপ্নার বীভৎস মৃত্যু বিশাল বিতর্কের ঢেউ তুলেছিল সারা অসম জুড়ে। রাতের অন্ধকারে চিরাগ পালিয়ে গিয়েছিল ত্রিপুরায়। আর কখনও করিমগঞ্জে ফেরার সুযোগ পায়নি। স্বপ্নার সঙ্গে প্রেম, নিকাহ, ওর বাড়িতে হিন্দুদের চড়াও হওয়া... সব বাজে কথা। আগরতলা থেকে কলকাতা, তার পর কীভাবে ও কাবুল পৌঁছেছিল, সেটা আরেক রোমহর্ষক কাহিনি। সিনেমা করার জন্য সেই কাহিনি কেউ চাইলেও চিরাগ তা জানাবে না। ফের চিৎ হয়ে শুয়ে আড়চোখে ইমনের দিকে তাকিয়ে চিরাগ দেখল, ইংরেজি বইটার নাম 'লাইফ অফ আ জিহাদি।' লাল প্রচ্ছদে কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা মুখ। কাঁধ থেকে বেয়নেট উঁকি মারছে। ইমন গর্দভটা মাথা নিঁচু করে, অন্যের মনগড়া জীবন কাহিনি পড়ে যাচ্ছে।

ফের চোখ বুজতেই রোজিনা ম্যাডামের মালকিন মালকিন গলাটা ওর কানে ধাক্কা মারল। 'আজ দুপুরে এ বাসায় কাকে ধরে এনেছিলে চিরাগ?'

শুনে তখন চমকে উঠেছিল ও। আজ দুপুরে সত্যিই ও ডেকে এনেছিল তৌফিককে। বাসায় কোথায় কী অ্যাপস ফিট করা আছে, অথবা গোপন ক্যামেরা... ধরা পড়ে যাবে। এই দুর্ভাবনাটা ওর ছিলই। তাই সদর দরজা দিয়ে তৌফিককে ভিতরে আনেনি চিরাগ। বেসমেন্টের চোরাকুঠুরি দিয়ে নিয়ে এসেছিল। ওদের আউট হাউসের নিচে যে চোরাকুঠুরিটা আছে, সেটা গিয়ে শেষ হয়েছে উল্টো দিকের পার্কে। বেশ কয়েকবার ওই পথে যাওয়া আসাও করেছে চিরাগ। ঘরের ভিতর দিককার দরজাটা কার্পেটের তলায়। উপর থেকে কিছু বোঝা যায় না। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে, টানেল ধরে পাক্কা চার মিনিট হেঁটে গেলে ফের কাঠের সিঁড়ি। উঠে পার্কের পরিত্যক্ত টয়লেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। ওর অত সাবধান হওয়াটাও কাজে লাগেনি। কুত্তিটা জেনে ফেলেছে, তৌফিক এসেছিল। মুখ কাঁচুমাচু করে চিরাগ উত্তর দিয়েছিল, ‘ছেলেটার সঙ্গে মিঠাস রেস্টুরেন্টে আলাপ হয়েছিল। কথা বলার লোক নেই। তাই ডেকে এনেছিলাম।’

রোজিনা ঘাড় ঘুরিয়ে কড়া গলায় বলেছিলেন, ‘আর কখখনও এনো না। যাও, এ বার তুমি যেতে পারো।’

বাধ্য চাকরের মতো ঘাড় নেড়ে চিরাগ চলে এসেছিল। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, ম্যাডামের গুমোর ভাঙবে। তৌফিক একটা গ্লক নাইন্টিন হ্যান্ডগান দিয়ে গেছে। অস্ত্রটা হাতে নেওয়ার পর থেকেই ওর মধ্যে পুরনো নিষ্ঠুর সত্ত্বাটা ফিরে আসছে। মনে হচ্ছে, রোজিনা ম্যাডামের পরীর মতো সাজানো শরীরটার উপর একদিন এমন অত্যাচার করবে, যা ওলাকেও করেনি। রাক্কা শহরের এক নামকরা ডাক্তার সামি মারওয়ানের মেয়ে ওলা। রোজিনা ম্যাডামের মতোই সেক্সি। বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি নয়। কী কুক্ষণেই না সিরিয়ান মেয়েটা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এই তো সেদিনের ঘটনা। আমেরিকান সেনাদের মদতপুষ্ট সিরিয়ান বাহিনি তখন পাল্লা দিয়ে লড়ছে জিহাদিদের সঙ্গে। শহর কবজায় রাখতে গিয়ে,

একটা সময় প্রচুর জিহাদি জখম হচ্ছিল। ডাক্তারের অভাব, তাই তাদের চিকিৎসা ঠিকমতো হচ্ছিল না। সিভিলিয়ান ডাক্তাররা একদমই চাইছিলেন না, জিহাদিদের শরীরে ছুরি-কাঁচি চালাতে। কেননা, চিকিৎসায় কোনও রকম ভুলভ্রান্তি হলে, জিহাদিদের কোপ তাঁদের উপর গিয়ে পড়ছিল। একটা সময় ক্যালিফেট থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, হাসপাতাল, ক্লিনিক আর ওষুধের দোকানগুলোর নিয়ন্ত্রণ হাতে না নিলে আহত জিহাদিদের বাঁচানো যাবে না। রাতের দিকে টহল দেওয়ার সময় ডাক্তারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিরাগরা জানে মেরে দেওয়ার হুমকি দিত তখন। এই রকম এক পরিস্থিতিতে ওলাকে প্রথম দেখে চিরাগ।

কী আশ্চর্য, ওলার কথা ভাবতে ভাবতেই মেয়েটাকে চোখের সামনে দেখতে পেল ও। ইরাক, সিরিয়া, তুরস্কের মেয়েরা সৌদি আরব বা ইরানের মেয়েদের মতো পর্দানসীন নয়। রাস্তা-ঘাটে তাদের দেখতে পাওয়া যায়। তবে আব্রু ঢেকে রাখা অবস্থায়। লোক পাচার করে, এমন এক স্মাগলারের মারফৎ ক্যালিফেটে সদ্য খবর এসেছে, ডাক্তার মারওয়ান সপরিবারে গ্রিস হয়ে আমস্টারডমে পালিয়ে যাচ্ছেন। সেটা ঠিক কি না, তা জেনে আসার দায়িত্বটা পড়েছে চিরাগের উপর। রাতের অন্ধকারে ডাক্তার মারওয়ানের ক্লিনিকে গিয়ে ও দেখে, প্রচুর লোক চিকিৎসার জন্য বসে আছেন। দেখেই মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে ওর। ডাক্তার মারওয়ানকে বলল, ‘এখখুনি চলুন, আপনাকে আমাদের ক্যালিফেটে যেতে হবে।’

ডাক্তার মারওয়ান বললেন, ‘কী করে যাব? এই পেশেন্টদের তা হলে কে দেখবে?’

‘আপনারা অন্য কোনও ডাক্তারের কাছে যান।’ বলতে বলতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওলা। গায়ের রং ধবধবে ফরসা। মুখটা অদ্ভুত ধরনের নিষ্পাপ। পরনে সিরিয়ান মেয়েদের ট্র্যাডিশনাল পোশাক থোয়াব। গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত মোড়া ফুলছোপ সিল্কের লম্বা গাউন। তা সত্ত্বেও, মেয়েটা

শরীরের যৌন আবেদন লুকিয়ে রাখতে পারেনি। কয়েক পা সামনে এগিয়ে, ওর কাছে গিয়ে চিরাগ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কে তুমি? তোমার এত সাহস হল কী করে?'

'আমি সিরিয়ারই মেয়ে... ওলা। আপনার মতো বিদেশ থেকে আসিনি।'

পেশেন্টদের মধ্যে বয়স্ক তিন-চারজন উঠে এসে বললেন, 'আপনি বাইরে গিয়ে ওয়েট করুন। ডাক্তার মারওয়ানকে আমরাই এখন ছাড়ব না। আপনাদের উৎপাতে দিনের বেলায় কোনও ডাক্তারকে চেম্বারে পাওয়া যায় না। আমরা কার কাছে যাব?'

পিছন থেকে আরও দশ বারোজন সায় দিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাইরে যান। এখন ডিসটার্ব করবেন না।'

ওঁদের কথায় পিছিয়ে গেলে জিহাদিদের বদনাম হয়ে যাবে। তাই কোমরের পিস্তলে হাত রেখে চিরাগ বলল, 'ডাক্তার মারওয়ানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে। ওকে ক্যালিফেটে নিয়ে যেতে হবে।'

ওলা দৃঢ় গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী অভিযোগ শুনি?'

'আমাদের কাছে খবর আছে, উনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।'

'মিথ্যে অভিযোগ। উনি দেশ ছেড়ে যদি পালিয়েই যাবেন, তা হলে কয়েকদিন আগে এই ক্লিনিক খুললেন কেন? বিনে পয়সায় সাধারণ লোকের চিকিৎসা করছেন কেন?'

মেয়েটাকে তর্ক করতে দেখে সারা শরীর রাগে জ্বলে যাচ্ছে চিরাগের। ও বলল, 'বেশ তোমার কথাই ঠিক বলে ধরে নিচ্ছি। উনি যতক্ষণ ইচ্ছে এখানে বসে বসে চিকিৎসা করুন। তুমি আমাদের সঙ্গে ক্যালিফেটে চলো। উনি ক্যালিফেটে গেলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

ক্লিনিকের হল ঘরে 'হায় আল্লাহ' ধরনের একটা আওয়াজ ছড়িয়ে গেল। চেয়ার ছেড়ে পেশেন্টরা প্রায় সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। তাদের চোখ-মুখে প্রতিবাদের চিহ্ন। চিরাগের একে ফর্টি সেভেন চালিয়ে দিতে ইচ্ছে করল।

অন্য কোনও জিহাদি হয়তো সেটাই করত। কিন্তু পরক্ষণেই ক্যালিফের ভিডিয়োতে একটা কথা ওর মনে পড়ল, 'এমন কিছু তোমরা এখন করবে না, যাতে সাধারণ লোকের সমর্থন আমরা হারিয়ে ফেলি। ওদের বুঝতে দাও, ওদের জন্যই ধর্মযুদ্ধে আমরা জিততে চাইছি।' তখনই ওর হাত ধরে টানল সঙ্গী আরেক জিহাদি ওমর। ইংরেজিতে বলল, 'মেয়েটাকে ছেড়ে দাও। ওকে শায়েস্তা করার অনেক সুযোগ পরে পাওয়া যাবে। ওকে আমি চিনি। মসজিদের কাছে একটা ডাক্তারখানায় বসে।'

নিজের মান বাঁচানোর জন্য, ওমরকে দেখিয়ে চিরাগ চিৎকার করে বলল, 'এর কথায় তোমাদের আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু রাতের মধ্যে ক্যালিফেটে না পৌঁছলে ডাক্তার মারওয়ানকে কাল শেষ করে দিয়ে যাব।' কথাটা শেষ হওয়ার পর ওলার মুখের দিকে চোখ পড়েছিল চিরাগের। পাতলা ঠোঁটের আড়ালে তাচ্ছিল্যের হাসি। ওলার মুখটা ও মনের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল। দাঁত টিপে বলেছিল, 'এই হাসির মূল্য তোকে চুকাতেই হবে রেন্ডি কোথাকার। বিদেশি বলার ঔদ্ধত্যেরও...।' তখন চিরাগ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, ওলা মেয়েটাকে ধর্ষণ করার অপরাধে ওকে পুরুষত্ব খোয়াতে হবে।

'চিরাগ, এই চিরাগ। কী ক'স? ফের স্বপ্ন দ্যাখতাসিলি না কি?'

চোখ খুলে চিরাগ দেখল, কোথায় ওলা? ও আউট হাউসে শুয়ে আছে। ধড়মড় করে উঠে বসে ও বলল, 'রাক্কা ক্যাম্পের স্বপ্ন দেখছিলাম।'

ইমন বলল, 'ভুইল্যা যা হ্যায় দিনগুলার কথা।'

'ভুলতে তো চাই। কিন্তু পারছি কোথায়? শালা কুত্তার মতো জীবন কাটাচ্ছি। তোর রোজিনা ম্যাডাম আমাদের গলায় বকলস পরিয়ে দিয়েছে। যখন যেভাবে চাইবে, আমাকে সেভাবে চলতে হবে না কি? মেয়েদের কথায় ওঠ-বোস করার অভ্যেস আমার নেই।'

'রোজিনা ম্যাডামের উফর তর রাগটা কিসের লইগ্যা, আমি তো বুঝতে পারতাসি না।'

‘তুই বুঝতে পারবি না। শোন, ইসলামে মেয়েদের স্থান সবসময় পুরুষদের নিচে। পুরুষদের কাছে চিত হয়ে না শুলে ওদের জীবন বৃথা। আরে, এই রোজিনা মহিলা তো দেখি সবার উপর ছড়ি ঘোরায়। কীসের এত দেমাক? পলাশছ্যারের কে হয়, তুই কি জানিস? গুগল সার্চ করে সেদিন দেখলাম, পলাশছ্যার বিয়েই করেননি। তা হলে ইনি কে? এক বিছানায় শুচ্ছেন। রেন্ডি ছাড়া ইনি আর কী হতে পারেন?’

‘চি-রা-গ।’ রেন্ডি কথাটা শুনে ইমন চিৎকার করে উঠল। ‘তরে কইসি না, রোজিনা ম্যাডাম সম্পর্কে তুই নোংরা কথা কইবি না। আরেকবার যদি ক’স, তাইলে আমার মতোন খারাপ আর কেউ অইব না।’

ইমনের হুমকি শুনে চিরাগ মুখ বেঁকিয়ে হাসল। এতক্ষণ যা চাইছিল, তাতে ও সফল। ইমনকে ঝগড়ায় টেনে আনতে পেরেছে। ও পাল্টা গলার জোর দেখিয়ে বলল, ‘কী করবি অ্যাঁ, কী করবি, তুই বল। রেন্ডিকে রেন্ডি ছাড়া আর কী বলব।’

কথাটা বলেই বালিশের তলা থেকে চিরাগ গ্লক নাইন্টিন হ্যান্ডগানটা বের করে আনল। তার পর তাক করল ইমনের দিকে। এই পিস্তলটা তৌফিক আজ ওকে দিয়ে গেছিল।

(পঁচিশ)

গতকাল রাতে সিএনএন চ্যানেলে একটা টক শো দেখার পর, কালকেতুর ইচ্ছে হয়েছিল, লিলি গডউইনের সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। ব্রেকিং নিউজের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ওর চোখ আটকে গেছিল। ‘অ্যাডামসের আমলে আরেক কেলেঙ্কারি।’ ‘লিলি গডউইনের বিরুদ্ধে বিরাট অভিযোগ।’ লিলি গডউইনের নামটা দেখে ও চমকে উঠেছিল। ‘নায়গারায় টেররিস্ট হামলার খবর চেপে দেওয়ার অভিযোগ।’ ‘ঘটনার জের বাংলাদেশেও।’ ‘ওই হামলায় মৃত এক বাংলাদেশের সমাজসেবী মহিলা।’ ‘তাঁর চিকিৎসায় গুরুতর গাফিলতির অভিযোগ।’ ‘বাফেলোর মেডিক্যাল

হাসপাতালের বিরুদ্ধে।' একের পর এক খবর পর্দায় ভেসে উঠছে। এক পাশে লিলি গডউইনের মুখ।

প্যানেলে বসেছেন দুই বিশেষজ্ঞ। তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, একজন ডেমোক্রাট, অন্যজন রিপাবলিকান। লিলি গডউইন এবং তাঁর চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশন সম্পর্কে যা তা বলে যাচ্ছেন ডেমোক্রাট ভদ্রলোক। অন্যদিকে, রিপাবলিকান দলের আইনজীবী মহিলা লিলিকে সমর্থন করে নানা যুক্তি দিচ্ছেন। দু'জনে খানিকক্ষণ পর একমত হয়ে গেলেন, হামলার ঘটনা চেপে দিয়ে এফবিআই অন্যায় করেছে। অফিসার জন মিকেল এবং বাফেলোর শেরিফকে শো কজ করা উচিত। এর পরই পর্দায় ভেসে উঠল এলসা গিনেসবেরির মুখ। লিলি গডউইনের হয়ে উনি অনেক ভাল ভাল কথা বলতে লাগলেন। কয়েকদিন আগে কালকেতু এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলার জন্যই গোথেনবার্গে মেল করেছিল।

যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা চলছে, তার পুরোটাই কালকেতুর চোখের সামনে ঘটেছে। লিলি গডউইনের মতো একজন সম্ভ্রান্ত সমাজসেবী মহিলা, এই রকম একটা রাজনৈতিক তরজায় জড়িয়ে গেলেন, ভেবেই ওর অস্বস্তি হচ্ছিল। ওর আরও খারাপ লেগেছিল শুনে, অ্যাঙ্কর যখন বললেন, 'মিস গডউইন এই মুহূর্তে অসুস্থ। চারদিন আগে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ফলে তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়নি।' মুহূর্তে ওর চোখের সামনে করুণাময়ী একটা মুখ ভেসে উঠেছিল। নায়গারায় গাড়িতে ওঠার আগে যিনি বলছেন, 'ইউ হ্যাভ সেভড মাই লাইফ, সান।' তখনই কালকেতু ঠিক করে নিয়েছিল, ও হাসপাতালে লিলি গডউইনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। উনি চাইলে সিএনএন-এ গিয়ে সত্যি কথা বলতেও ও রাজি।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করে দিয়েছিলেন মি. বাম কিম। ঠিক বেলা বারোটার সময়। হাসপাতালের এক্সিট গেটের সামনে কালো রঙের একটা লিমুজিন

এসে দাঁড়াল। সঙ্গেসঙ্গে বাম কিমের ফোন, 'নেমে আসুন। আমার গাড়িটা আপনার ঠিক সামনেই। আমাকে ফলো করে যান।'

লিমুজিন থেকে ছোট্টখাট্টো চেহারার এক ভদ্রলোক বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। মঙ্গোলিয়ান টাইপের মুখ। গুগল সার্চ করে কালকেতু কাল রাতেই জানতে পেরেছে, বাম কিম দক্ষিণ কোরিয়ান। চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের একজন বোর্ড মেম্বার। বহু বছর ধরে আমেরিকায় আছেন। মিস গডউইনের খুব আস্থাভাজন। হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের ভিতর ঢোকার পর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'মিস গডউইন কেমন আছেন এখন?'

বাম কিম বললেন, 'মিডিয়া যেভাবে পিছনে লেগেছে, তাতে ভাল থাকবেন কী করে? আমাদের দেশে মিডিয়াকে বড্ড বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে গেছে। থাক সে কথা। চলুন, ম্যাডামের কেবিনে।'

কেবিনে ঢুকে কালকেতুর মনে হল, ও হোটেলের কোনও সুইটে এসেছে। লিলি গডউইন সোফার এককোণে বসে আছেন। তাঁর পাশে যিনি, তাঁকে ও আশাই করেনি। এলসা গিনেসবেরি। আরে, এই তো ঘণ্টা তিনেক আগে ভদ্রমহিলাকে ও টিভিতে দেখে এল। এর মধ্যেই গোথেনবার্গ থেকে উনি নিউ ইয়র্কে চলে এসেছেন! এলসা বেশ বয়স্ক, গলার কাছের চামড়াগুলো কুঁচকে গিয়েছে। তবুও ওঁর সৌন্দর্যে ঘাটতি পড়েনি। মাতৃময়ী মুখ, এইরকম এক নার্সের শুশ্রূষা পেলে রোগী এমনিতেই ভাল হয়ে যাওয়ার কথা। কালকেতু মনে মনে ছকে নিল, সুযোগটা ছাড়বে না। ভদ্রমহিলা কাফি বীরকে পাত্তা দেননি। কিন্তু ও খানিকক্ষণ কথা বলবেই। যতই ভদ্রমহিলা ওকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন না কেন।

কেবিনে ঢোকা মাত্রই লিলি গডউইনের মুখে মিষ্টি হাসি দেখতে পেল কালকেতু। তার মানে, ভদ্রমহিলা ওকে ভোলেননি। ফুলের তোড়াটা ও এগিয়ে দিতেই উনি সাগ্রহে নিলেন। ঘরে সোফায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরও

কয়েকজন বসে আছেন। একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক এবং আরও দু'জন মহিলা। একজনকে ওর এশিয়ান অরিজিন বলে মনে হল। বাম কিম ওকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর একে একে সবাই উঠে এসে হ্যান্ডশেক করে গেলেন। আন্দ্রিয়াস অ্যান্ডারসন ও সাশা ও'নীল। এলসা গিনেসবেরির বোনপো আর লিলি গডউইনের বোন। এশিয়ান অরিজিন বলে যাকে মনে হয়েছিল, তিনি বাংলাদেশের সাংবাদিক, রেজওয়ানা। পরিচয় পর্বের শেষে কালকেতু এগিয়ে গিয়ে এলসার সামনে দাঁড়াতেই উনি হাতজোড় করে বললেন, 'নমস্কার। আপনার নামটা কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?'

নমস্কার কথাটা শুনে কালকেতু মজা পেল। মুক্তিযুদ্ধের সময় এলসা গিনেসবেরি দীর্ঘদিন বাংলাদেশে ছিলেন। ওখানেই হয়তো নমস্কার কথাটা শুনে থাকবেন। সুযোগ পেয়ে ও বলল, 'হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনাকে আমি একটা মেল পাঠিয়েছিলাম।'

এলসা ম্যাডাম বললেন, 'ইয়েস। এবার আমার মনে পড়েছে। কিন্তু লিলির অসুস্থতার খবরে এমন দুঃশ্চিন্তায় ছিলাম যে, আপনাকে উত্তর দিতে পারিনি। ঠিক আছে, লিলি একটু পরেই চেক আপের জন্য নিচে যাবে। তখন আমরা কথা বলে নেব।'

লিলি এইসময় রেজওয়ানাকে বললেন, 'নায়গারায় সেদিন কী হয়েছিল, এই জেন্টেলম্যান তার সাক্ষী। তুমি এর সঙ্গে কথা বললেই সব বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, কালকেতু এখন বলো, কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলে? আমি তোমাকে অনেক আগেই এক্সপেক্ট করেছিলাম।'

লিলি এমন নিষ্পাপ দৃষ্টিতে তাকালেন, কালকেতুর সব গুলিয়ে গেল। ও বলল, 'ম্যাডাম, আপনার নামে টিভিতে কুৎসা আমার সহ্য হচ্ছিল না। নায়গারায় হামলা তো আপনি করাননি। উল্টে আমি যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, টেররিস্টদের টার্গেট ছিলেন আপনি। মিডিয়া আপনাকে দোষারোপ করছে কেন?'

আন্দ্রিয়াস বললেন, ‘এই কথাগুলো আপনি টিভি চ্যানেলে বলতে পারবেন?’

কালকেতু বলল, ‘কেন পারব না? সেই ব্যাপারে মিস গডউইনের পার্মিশন নিতেই তো এসেছি। সেদিন যা ঘটেছিল, আমি বলতে চাই।’

লিলি বললেন, ‘থাক। তুমি না জড়ালেই ভাল করবে। আমি জানি, তোমার উপর একবার অ্যাটাক হয়ে গেছে। আমার জন্য তুমি আবার বিপদে পড়ো, আমি চাই না। অন্য কোনও প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলতে পারো।’

চাইল্ড ডিটেনশন সেন্টার খোলার জন্য পলাশভাই একবার ওঁর কাছে যেতে চান সুপারিশের চিঠি নিতে। কথাটা মনে পড়া সত্ত্বেও, কালকেতু বলতে পারল না। ওই অনুরোধটা করার জায়গা হাসপাতাল নয়। ও বলল, ‘একটা অনুরোধ নিয়ে হয়তো পরে আপনার কাছে যেতে পারি। আগে আপনি সুস্থ হয়ে নিন।’

‘তা হলে বাম কিমের সঙ্গে তুমি যোগাযোগ রেখো।’

কথা বলেই লিলি একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। তার পর পাশ ফিরে এলসা ম্যাডামকে বললেন, ‘ডা. কিংসফোর্ড বলছেন, লেজার ট্রিটমেন্ট অন্তত বার পাঁচেক নিতে হবে। আজই শুরু করতে চান।’

এলসা ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোর্স শেষ হতে কতদিন লাগবে?’

‘দিন দশেক মনে হয়। আমি চাইব, আরও তাড়াতাড়ি যাতে শেষ হয়। চ্যারিটি শো-র বেশিদিন বাকি নেই। আমি রোগ নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। শো নিয়ে অ্যান্ডি আমাকে কয়েকটা প্রস্তাব দিয়েছে। আপনিও হয়তো জানেন সেকথা।’

‘শুনেছি, শো-টা ও লাস ভেগাসে নিয়ে যেতে চায়। মন্দ কী? আমাদের অনেক খরচ বেঁচে যাবে।’

‘তা হলে তো খুব ভাল হয়।’ শুনেই বলে উঠলেন লিলি ম্যাডামের বোন সাশা ও’নীল। এতক্ষণ চুপ করে কথা শুনছিলেন। এ বার বললেন, ‘শো-তে এ বার কাকে নিয়ে আসছ তোমরা?’

‘অ্যান্ডি চায়, রিহান্না ফেন্টিকে দিয়ে গান গাওয়াতে।’

সাশা বললেন, ‘আমিও ওর নামটাই বলতে যাচ্ছিলাম।’

‘কে এই মেয়েটা? আগে তো কখনও নাম শুনিনি?’ এলসা ম্যাডাম জানতে চাইলেন।

‘আমার ছেলেমেয়েরা তো সারাদিন ওর গান শুনছে। এখন আমেরিকার নাম্বার ওয়ান সিঙ্গার গ্র্যান্ডমা। বার্বাডোজের মেয়ে। একটা সময় ডামি সিঙ্গার ছিল। কিন্তু এখন ওর একেকটা অ্যালবাম মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়। ব্রিটনি স্পিয়ার্সরা অনেক পিছনে চলে গেছে। আমি তোমাকে বলছি দিদি, রিহান্নাকে যদি আনতে পারো, তা হলে তোমার চ্যারিটি শো মারাত্মক হিট হয়ে যাবে। ওর সঙ্গে তোমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা বলে নিও।’

‘কেন, এত তাড়াহুড়োর কী আছে?’

‘গসিপ কলামে দেখলাম, রিহান্না না কি এক সৌদি প্রিন্সকে বিয়ে করছে। তার নাম হাসান জামাল। রিহান্নাকে না কি সে এক মিলিয়নের একটা ডায়মন্ড রিং উপহার দিয়েছে। দেখো, তোমাদের শো-এর ডেট যেন ওর বিয়ের সঙ্গে ক্ল্যাশ না করে।’

সাশার আগ্রহ দেখে লিলি, এলসা ম্যাডাম, আর আন্দ্রিয়াস হাসতে লাগলেন। বাম কিমের সঙ্গে সেই মুহূর্তে লিলির চোখের ইশারায় কী যেন কথা হয়ে গেল। তার পরই লিলি ম্যাডাম বললেন, ‘এবার আমি উঠি। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।’

মিনিট দুয়েকের মধ্যে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। এলসা ম্যাডামের মুখোমুখি বসে কালকেতু। ম্যাডাম ওকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার মেল আমি মন

দিয়ে পড়েছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না, তুমি সেই মেয়েটার খোঁজ করছ কেন?'

পলাশভাইয়ের ইচ্ছের কথা জানিয়ে কালকেতু বলল, 'আর কিছুই না। বাংলাদেশি এক ভদ্রলোক তাঁর দিদিকে ফিরে পেতে চান। আপনি কি জানেন, তিনি কোথায়?'

এলসা ম্যাডাম বললেন, 'বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ারের সময় আমরা বেশ কয়েকটা বাচ্চা মেয়ের ট্রিটমেন্ট করেছিলাম। সব ক'টাই বার্ন কেস। কিন্তু তুমি যাকে খুঁজছ, সে এদের মধ্যে ছিল কি না, আমার পক্ষে এখন বলা সম্ভব নয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল।'

প্রথম উত্তরটা শুনে কালকেতু বুঝে গেল, এলসা ম্যাডাম ঠিকঠাক উত্তর দেবেন না। ও বলল, 'ম্যাডাম, আমি সেই মেয়েটার কথা জানতে চাইছি, যার ছবি নিউ ইয়র্ক টাইমসে বেরিয়েছিল।'

এলসা ম্যাডাম বললেন, 'ওহ, তুমি বেবির কথা জানতে চাইছ? হ্যাঁ, মনে পড়ছে, একটা সময় ওর প্রাণের ভয় ছিল। ওর ছবি কাগজে বেরনোর পর পাকিস্তানের খুব বদনাম হয়ে গেছিল। সারা বিশ্বের মানুষ ধিক্কার জানাচ্ছিল। পাক গুপ্তচররা চায়নি, মেয়েটা বেঁচে থাকুক। হাসপাতালের বার্ন ওয়ার্ডে ইন্ডিয়ান আর্মি ওকে আগলে রেখেছিল। সেইসময় কী অসম্ভব যন্ত্রণা যে মেয়েটা সহ্য করেছে, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।'

'মেয়েটিকে আপনি গোথেনবার্গে নিয়ে গেছিলেন, তাই না?'

'আরে না, না। বেবি মেয়েটা তো মাসখানেকের মধ্যেই মারা গেছিল। বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য আমি যে বাচ্চাকে গোথেনবার্গ নিয়ে গেছিলাম, তার নাম ছিল রোশনি।'

বাধা দিয়ে কালকেতু বলল, 'আপনি নিশ্চিত যে, মেয়েটার নাম ছিল রোশনি। শিউলি নয়?'

‘হান্ড্রেড পার্সেন্ট... রোশনি। মেয়েটা ট্রমা থেকে ফিরে আসতেই সময় নেয় প্রায় মাসআটেক। অনেকেই ওর ট্রিটমেন্টের দায়িত্ব নেবেন বলেছিলেন। কিন্তু কেউ কথা রাখেননি। আমরা রেড ক্রসের লোকেরা বাংলাদেশ থেকে চলে আসছিলাম। মেয়েটির উপর আমাদের সবার মায়া পড়ে গিয়েছিল। ওকে ঢাকায় ফেলে রাখতে আমাদের মন চাইছিল না। সেইসময় বিশ্বের অন্যতম সেরা ডার্মাটোলজিস্ট ডা. গডউইন গোথেনবার্গে ক্লিনিক চালাতেন। তাই তখন আমিই উৎসাহ দেখিয়ে রোশনিকে ডা. গডউইনের কাছে নিয়ে যাই।’

‘রোশনি এখন কেমন আছেন?’

‘শুনেছি, ওর পিঠের ক্ষত এখনও পুরো সারেনি। পেন কিলার খেয়ে ওকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। তাই বলে জীবনযুদ্ধে ও হার মানেনি। ঈশ্বর ওকে দিয়ে অনেক মহৎ কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।’

‘উনি কোথায়, সেটা কি বলা যেতে পারে?’

‘প্লিজ জানতে চাইবেন না। আর্লি লাইফ নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই। সেসব ওর স্মৃতি থেকে মুছেও গেছে। ও কোন পরিবারের মেয়ে, কোন দেশের সঙ্গে ওর শিকড় বাঁধা... এখন ওর কাছে সব অর্থহীন। সারা বিশ্ব জুড়েই ওর পরিবার। এটুকু আপনাকে বলতে পারি, রোশনি নিজেও সঠিক জানে না, ওর অতীত কী? কেউ জিজ্ঞেস করলেও বলতে পারবে না।’

‘কিন্তু ওর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক যাদের, তারা তো ওর খোঁজ করবেনই।’

‘আশ্চর্য!’ এলসা ম্যাডাম বিরক্ত, ‘এতদিন তাঁরা কোথায় ছিলেন? কী এমন ঘটল, যাতে ওর খোঁজ পড়ল?’

‘ম্যাডাম, আমি সম্পূর্ণ মানবিক কারণে আপনার কাছে এসেছি। পরিবারের লোকেরা মেয়েটিকে ফিরে পেতে চান। সেটা কি অন্যায়? এই তো কয়েক মাস আগে, দক্ষিণ কোরিয়ায় এক ছেলে তার মাকে উত্তর কোরিয়া থেকে খুঁজে পেলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর। গৃহযুদ্ধের কারণে ছেলে

আর মা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিলেন। এ রকম পুনর্মিলনের ঘটনা তো বিশ্বে কত ঘটছে।'

'অস্বীকার করছি না।' এলসা ম্যাডাম বললেন, 'কিন্তু আমি কিছু বলতে পারব না। তার কারণ আইনের বেড়াজালে আমি বাঁধা। বলার ইচ্ছে ছিল না। তবুও বলছি, মেয়েটির জীবনী নিয়ে একটা ফিল্ম তৈরি হচ্ছে হলিউডে। প্রি প্রোডাকশনের কাজ অলমোস্ট মাঝপথে। প্রোডিউসার আমাকে চুক্তিপত্রে সই করিয়ে রেখেছেন, ছবিটা রিলিজ না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটির আইডেন্টিটি প্রকাশ করতে পারব না। কথাটা আপনাকে বিশ্বাস করে বললাম। আশা করি, আপনি জানতে চাইবেন না, প্রোডিউসারটি কে? প্লিজ আমার হাতে আর সময় নেই। আমি উঠি। আমাকে গোথেনবার্গের প্লেন ধরতে হবে।'

আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। লিফটে করে নিচে নামার সময় কালকেতুর একটু রাগও হতে লাগল এলসা ম্যাডামের উপর। বাইরে থেকে মনে হয়, মাতৃময়ী। কিন্তু আসলে ধুরন্ধর মহিলা। একগাদা মিথ্যে কথা বলে গেলেন। কর্নেল মজুমদার বেবি বলে যে মেয়েটার কথা সেদিন বললেন, সে না কি একমাসের মধ্যে মারা গেছিল! তার জায়গায় রোশনি বলে একটা মেয়ের গল্প ফাঁদলেন এলসা ম্যাডাম। উনি হয়তো জানেন না, কাকে তিনি গোথেনবার্গে নিয়ে গেছিলেন, সে তথ্য ইন্টারপোল ইচ্ছে করলেই বের করে ফেলতে পারে। ওঁর কথামতো, যদি রোশনি বলে কেউ সত্যিই থাকে, তবে তার পরিচয়ই বা গোপন করার এত চেষ্টা কেন? চট করে আরও একটা প্রশ্ন কালকেতুর মাথায় এল। লিলি গডউইনের সঙ্গে এলসা ম্যাডামের সম্পর্ক নিয়ে। কথাবার্তা শুনে তো মনে হল, লিলি ম্যাডামকে উনি খুব স্নেহ করেন। এবং সম্পর্কটা বহুদিনের। ইস, কালকেতুর আফসোস হতে লাগল। কায়দা করে ওর জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, দু'জনের সম্পর্কের সূত্রপাতটা হয়েছিল কীভাবে?

এলসা ম্যাডাম হয়তো পরিষ্কার করে কিছু বলবেন না। উত্তরটা জানা যেতে পারে লিলি গডউইনের কাছ থেকে। কালকেতু ঠিক করে নিল, লিলি গডউইন সম্পর্কে আলাদা করে খোঁজখবর নেবে।

(ছাব্বিশ)

সারাটা দিন আজ দু'জনের কেটেছে ডালাস শহরের মাইল কুড়ি দূরে প্লেনো বলে একটা জায়গায়। ওখানেই ওঁরা বাচ্চাদের ডিটেনশন সেন্টারখোলার কাজে অনেকটা এগিয়েছেন পলাশ ও রোজিনা। যারা বিল্ডিংটা বানিয়ে দেবেন, সেই কনসালটেন্ট কোম্পানির লোকজনও প্লেনোতে হাজির ছিলেন। এখন ওখানে বিশাল চারতলা পার্কোম্যাট, সেটাই প্রাইভেট জেল করা হবে। সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞরা বললেন, পরিকাঠামোর খুব একটা অদলবদল করতে হবে না। মাস তিনেকের মধ্যে বিল্ডিংটা তাঁরা এমন বদলে দেবেন, বাচ্চাদের ডিটেনশন সেন্টার হিসেবেও মন্দ হবে না। পলাশ সব দেখে শুনে খুব খুশি। এখন মিস লিলি গডউইনের কাছ থেকে সুপারিশ পত্র জোগাড় করা বাকি। কালকেতুভাই তাঁর কাছে নিয়েও যেতে চান। কিন্তু লিলি এখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। তার উপর ক্রিসমাসের এক সপ্তাহ আগে থেকে অফিস-কাছারিতে সব গরহাজিরা শুরু হয়ে যায়। ফলে এখন আর কোনও কাজ এগোবে না।

নামকরা অনেকগুলো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ইদানীং তাদের হেড অফিস তুলে নিয়ে গেছে প্লেনোতে। আর একটা নতুন আইটি হাব হতে যাচ্ছে আমেরিকায়। ফলে ক্রমশ গুরুত্ব বাড়ছে জায়গাটার। আমেরিকানরা পারেনও আগাম ভাবতে। প্লেনোতে কর্পোরেট লোকজনের যাতায়াত ভবিষ্যতে বাড়বে, ভেবে নিয়ে ডালাসে ওঁরা তিনটে আলাদা এয়ারপোর্ট বানিয়েছেন। বিকেলবেলায় ডালাস থেকে প্লেনে ওঠার আগে পলাশভাই রোজিনাকে বলছিলেন, 'দ্যাখেন, দ্যাখেন, আকাশে প্লেনের লাইন লাইগ্যা

গ্যাসে। একটার পর একটা প্লেন নামতাসে আর উইড়া যাইতাসে। এয়ার ট্রাফিক কী বিজি। দুই-চাইর বসর পর প্লেনোরে আর চেনা যাইব না।' প্লেনোর কথা পলাশভাইয়ের মাথায় ঢুকিয়ে ছিলেন রোজিনা। সেজন্য তিনিও খুশি খুশি মনে নিউ জার্সিতে ফিরেছেন।

সারা দিনের ব্যস্ততার পর বাসায় ফিরে অন্যদিন পলাশ আড্ডা মারার জন্য কালকেতুভাইকে ডেকে নেন। কিন্তু আজ রাতে গাড়ি থেকে নেমে রোজিনাই বারণ করেছিলেন, 'থাউক, আইজ ওঁনারে ডাইকেন না। আফনেরে একডা খবর দেওনের আসে।'

পলাশ অতশত ভেবে কথা বলেন না। দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'জানি, আফনে কী খবর দিবেন। আমার পোইষ্যপুত্তুররা আবার বেচাল কিসু করসে বুঝি?'

পোইষ্যপুত্তুর মানে চিরাগ আর ইমন। রোজই ওদের নিয়ে দু'জনের মধ্যে মন কষাকষি হয়। রোজিনা ওদের বের করে দিতে চান। পলাশভাই ধৈর্য ধরতে বলেন। ছেলে দুটোকে নিয়ে ওঁর কী যেন একটা প্ল্যান আছে। খুলে বলেনও না মানুষটা। রোজিনার আচমকা কী মনে হল, পলাশভাইয়ের মুখটা দু'হাতে টেনে আলতো চুমু দিয়ে বললেন, 'না মশয়। হ্যারা নতুন কিসু করে নাই। আফনে যান, গোসল রুম থেইক্যা ফ্রেশ হইয়া আসেন। তার পর খবরডা হুইনেন।'

পলাশ বললেন, 'তাইর আগে কাইলকেতুভাইরে একবার মুখ দেখাইয়া যাই। মানুষডার সাথে দুই দিন কথা হয় নাই। আফনে যান, বেড রুমে গিয়া আমার লইগ্যা ওয়েট করেন।'

ঘাড় নেড়ে রোজিনা বেডরুমের দিকে পা বাড়ালেন। লিভিং রুম থেকে একবার বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখলেন, আউট হাউসে তখনও আলো জ্বলছে। তার মানে জিহাদি ছেলে দুটোর কেউ না কেউ জেগে আছে। ওরা সারাদিন আউট হাউসে কী করে, তা রোজিনা রোজ রাতেই জানতে পেরে যান।

আজকাল ফুরসত পেলেই তিনি ক্লোজ সার্কিট টিভি-র মনিটরে চোখ রাখেন। আউট হাউসে চিরাগ আর ইমন নিজেদের মধ্যে কী আলোচনা করে, সবই তিনি পর্দায় দেখতে পান। দরকার মতো পলাশকে তা জানিয়েও রাখেন। ছেলে দুটো অবশ্য সিসিটিভির কথা জানে না। প্রথম যে দিন রোজিনা ওদের দেখেন, সেদিনই তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল। পলাশও বলেছিলেন, 'আফনের ধারণাই ঠিক। আপাতত হ্যারা থাউক এহানে। কারে দিয়া কী কাম হয়, কেউ কইতে পারে না। ভবিষ্যতে হ্যারা আমাগো কামেও লাইগতে পারে।' মানুষটার মাথায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত খেয়াল চাপে বটে, কিন্তু উনি নির্বোধ নন।

পাশাপাশি দুটো বেডরুম। একটা পলাশের, একটা তাঁর। মাঝে একটা দরজা আছে। প্রথম প্রথম দরজাটা বন্ধই থাকত। এখন আর তার দরকার হয় না। নিজের বেডরুমে ঢুকে রোজিনা একটু অবাকই হলেন। ভোরবেলায় ডালাস যাওয়ার আগে যে অবস্থায় রেখে গেছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় পড়ে আছে। বিছানা অবিন্যস্ত, একধারে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে ল্যাপটপ। ঘরের চেহারা দেখে রোজিনা বুঝতে পারলেন, লারেইনা আজ ঘর গোছগাছ করতে আসেনি। ও যে আসবে না, তাও কিন্তু বলে যায়নি। ঘণ্টায় তিরিশ ডলার রোজগারের আশায় সাধারণত মেয়েটা কামাই করে না। চেষ্টাও করে এ বাড়িতে একটু বেশি সময় দিতে। কিন্তু কী হল মেয়েটার? ওর কথা পড়ে ভাবা যাবে ভেবে, বাইরের পোশাক খুলে ফেললেন রোজিনা।

ওয়াশরুমে ঢুকে আয়নায় নিজের নগ্ন দেহটা ভাল করে দেখলেন। না এখনও এতটুকু চর্বি জমেনি কোথাও। তলপেটে হাত দিয়ে তিনি বোঝার চেষ্টা করলেন, ভারি ভারি ঠেকছে কী না? নাহ, তেমন কোনও লক্ষণ নেই। অন্যদিন স্নান করার সময় সুগন্ধি জলে ভরা বাথটবে শুয়ে থাকতে রোজিনা ভালবাসেন। কিন্তু আজ সময় নেই। কালকেতুভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে পলাশ এখুনি ফিরে আসবেন। তাই, চুল না ভিজিয়ে শাওয়ার খুলে ঈষৎ উষ্ণ

জলে তিনি স্নান সেরে নিলেন। তার পর পাতলা নাইটি পরে বেরিয়ে এসে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, শরীরের চড়াই-উতরাইগুলো কতটা স্পষ্ট, তা দেখার জন্য। নিজের শরীরটা পলাশের হাতে তুলে দেওয়ার তাগিদ অনুভব করছেন রোজিনা। তার পর সুখবরটা দেবেন।

বিছানা থেকে ল্যাপটপ হাতে তুলে নিয়ে রোজিনা পলাশের ঘরে ঢুকে দেখেন, মানুষটা এখনও ফেরেনি। এখনও ওয়াশরুমে না কি? ভাবতে ভাবতে রোজিনার মনে হল, কাজের ব্যস্ততায় সারাদিন মেল চেক করা হয়নি। এখন দেখে নেওয়া যাক। পলাশের বিছানায় হেলান দিয়ে মোবাইলে মেল চেক করতে লাগলেন তিনি। ব্যাবসা সংক্রান্ত মেলগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ ড্যাডির পাঠানো একটা মেসেজ পেলেন। নিউ মেক্সিকো থেকে ড্যাডি রায়ান দেল বস্কে লিখেছেন, 'ক্রিসমাসের ছুটি কাটাতে র‍্যাঞ্চে চলে এসো। অনেকদিন পর আমাদের আত্মীয় স্বজনরা সবাই হাজির থাকবেন। তোমার বাংলাদেশি বয়ফ্রেন্ডকে সবাই দেখতে চান। বিশেষ করে তোমার মাম্মি।'

এমনিতেই মেজাজ আজ ফুরফুরে। তার উপর ড্যাডির মেল পড়ে মন আরও ভাল হয়ে গেল রোজিনার। বছর তিনেক হল, ক্রিসমাসের ছুটিতে তাঁর নিউ মেক্সিকোতে যাওয়া হয়নি। ফি বছর এই সময়টায় পলাশ এসে হাজির হন বাংলাদেশ থেকে। ব্যাবসার কাজে দু'জনই এমন ডুবে যান যে, ক্রিসমাস থেকে নিউ ইয়ারস ইভ, কোথা দিয়ে চলে যায়, টেরও পান না। ড্যাডিকে কী উত্তর দেবেন, রোজিনা ভেবে পেলেন না। পলাশ একটু লাজুক টাইপের। আত্মীয়রা তাঁকে দেখতে চান, বললে উনি আরও যেতে চাইবেন না। একে তো স্প্যানিশ ভাষাটা জানেন না। তার উপর একেবারে মিশুকে নন।

ড্যাডির র‍্যাঞ্চ নিউ মেক্সিকোর আলবুকার্ক শহরের কাছে। একশো দু'নম্বর ফ্রিওয়েতে। কলম্বিয়ার ড্রাগ রুটের গায়েই পড়ে আলবুকার্ক। ওই শহরেই

ড্যাডির তিনশো একর জমি ঘেরা একটা র‍্যাঞ্চ। সেখানে ঘোড়া, শূয়োর আর ভেড়া প্রতিপালন করা হয়। ছোটবেলা থেকে রোজিনা লোচ্চা টাইপের ড্রাগ মাফিয়াদের দেখতে অভ্যস্ত। কেননা, যাতায়াতের পথে মাফিয়াদের একটা অংশের ঠেক ছিল ড্যাডির র‍্যাঞ্চ। রাত-বিরেতে ড্রাগ পাচারের মাঝে মদের আসর বসত ক্যাসিনোতে। ড্রাগ মাফিয়াদের কেউ কেউ যে ওঁর দিকে হাত বাড়ায়নি, তা নয়। রোজিনা তাদের এমন হাল করেছেন, দ্বিতীয়বার উত্যক্ত করার সাহস আর কেউ দেখায়নি।

ওয়াশরুম থেকে খুট করে একটা শব্দ হল। ল্যাপটপ থেকে মুখ তুলে রোজিনা দেখলেন, দরজা খুলে পলাশ বেরিয়ে এলেন। ওঁর পরনে স্লিপিং গাউন। এমনিতেই পলাশ বেশ সুপুরুষ, তার উপর নো শেভ নভেম্বর পালন করার জন্য দাঁড়ি রেখেছেন। তাতে আরও রাশভারী লাগছে। রোজিনা নিশ্চিত, আত্মীয়রা কেউ ওঁর পছন্দের নিন্দে করবেন না। ফিয়াসেঁর দিকে এক পলক তাকিয়ে রোজিনা বললেন, 'ড্যাডি আফনেরে দাওয়াত দিসে পলাশ। ক্রিসমাসের সময় র‍্যাঞ্চে যাইবেন না হি?'

বিছানায় বসে পলাশ জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি লাস ভেগাস যামু ভাবসিলাম।'

মোবাইল সেট টেবলে রেখে রোজিনা দু'হাত উপরের দিকে তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। এই ভঙ্গিতে তাঁর সুডৌল স্তন দুটো দুলে ওঠে। কোমরটা কত সরু, তা বোঝা যায়। তখন মারাত্মক সেক্সি দেখায়। তিনি জানেন, পলাশ নিজেকে সামলাতে পারবেন না। তাঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবেন। ঠিক তাই হল, পলাশ দু'হাত বাড়িয়ে তাঁকে বুকের উপর টেনে নিয়ে ক্লিভেজে মুখ ডুবিয়ে দিলেন। কিন্তু রোজিনা এত সহজে নিজেকে ধরা দেবেন না। যে খবরটা পলাশভাইকে দিতে যাচ্ছেন, তার একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করা দরকার। তাই বেষ্টনী ছাড়িয়ে নিয়ে রোজিনা মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, 'কী ছেলেমানুষি করেন। ছাড়েন, একডা ইম্পরট্যান্ট কথা

হইতাসে। হ্যার মধ্যে আমারে ঠেইস্যা ধরেন কী কইর‍্যা? জ্বালাতনের শ্যাষ নাই। হোনেন, ড্যাডিরে অনেকদিন দেখি নাই। মন খুব চাইতাসে, এ বার র‍্যাঞ্চে যাই।'

'তাইলে চলেন। আফনে খুশ হইলে আমিও খুশ। চলেন, কাইলকেতুভাইরেও সাথে নিয়া চলেন।'

'কোনও অসুবিধা নাই। কিন্তু আফনের পোইষ্যপুত্তর দুইজনের কী অইব? অগো দুইজনরে কিন্তু এহানে রাইখ্যা যাম না।'

'ঠিক কইসেন, কহন কে কারে গুলি কইর‍্যা দিব, অগো বিশ্বাস করা যায় না।'

পলাশের কথা শুনে রোজিনা চুপ করে গেলেন। কাল রাতে আউট হাউসে ইমন আর চিরাগ যখন নিজেদের মধ্যে কথাকাটাকাটি করছিল, তখন মনিটরের সামনে বসে একা সব দেখেছেন রোজিনা। কী নিয়ে ওরা ঝগড়া করছিল, তাও তিনি শুনেছেন। ভাগ্যিস, সেই সময় লিভিং রুমে বসে পলাশ ড্রিঙ্ক করছিলেন কালকেতুভাইয়ের সঙ্গে। ঝগড়ার কারণটা পলাশকে বলেননি রোজিনা। শুধু বলেছেন, তর্কাতর্কিটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, চিরাগ পিস্তল তাক করে ইমনকে শাসিয়েছে। ওর কাছে পিস্তল আছে, সেটা রোজিনা জানতেন না। মনে হয়, ওদের দলের যে ছেলেটিকে চিরাগ কাল বাংলোতে নিয়ে এসেছিল, সে হাতিয়ারটা দিয়ে গেছে।

পিস্তল গায়েব করে দিতে রোজিনার অবশ্য খুব বেশি সময় লাগবে না। লারেইনাকে বলে দিলে, আউট হাউস গোছগাছ করার সময় পিস্তলটা ও হ্যাপিশ করে দিতে পারে। বাইশ-তেইশ বছরের পূর্ণ যুবতী। খুব বুদ্ধিমতী, সাহসী এবং বিশ্বস্ত। রোজিনা জানেন, পুলিশে চাকরি করার খুব ইচ্ছে লারেইনার। উৎসাহ দিয়ে আলবুকার্ক থেকে তিনিই মেয়েটাকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে এসেছেন। দরকার-অদরকারে ওকে টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করেন। ইদানীং একটা বয়ফ্রেন্ডও জুটিয়েছে বোধহয়। রোজিনার চোখে

পড়েছে, সেই ছেলেটা প্রায়ই গাড়ি করে ওকে নামিয়ে দিয়ে যায়। পিস্তল চুরি করা কেন, তিনি বললে লারেইনা ছলাকলায় বিছানায়ও টেনে নিয়ে যেতে পারে চিরাগকে। তার পর ধর্ষণের অভিযোগ তুলে ওর বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে।

চিরাগ ছেলেটাকে একদম সহ্য করতে পারেন না রোজিনা। ওর চোখ দেখলেই বুঝতে পারেন, সারা শরীরটা যেন চেটেপুটে খেতে চায়। জিহাদি জীবন কাটিয়ে এসেছে। হয়তো দীর্ঘদিন নারীসম্ভোগ করতে পারেনি। ওর কাম আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য মাঝে মধ্যে ছেলেটাকে কাছে ডাকেন রোজিনা। মৃদু ভর্ৎসনাও করেন। অতিরিক্ত কামমোহিত হলে পুরুষরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। তাই ইচ্ছে করেই,ওর যৌন আকাঙ্ক্ষায় সুড়সুড়ি দেন রোজিনা। চিরাগের দৌড় পরীক্ষা করবেন বলে। রেন্ডি বলে গাল দেওয়ার শোধটা এমনভাবে তুলবেন তিনি, যাতে ছেলেটা সারা জীবন মনে রাখে। নিজের উপর বিশ্বাস আছে রোজিনার। কেননা, ড্যাডির র‍্যাঞ্চে, চিরাগের চেয়েও বেশি খতরনাক ছেলেদের শায়েস্তা করেছেন তিনি।

‘কালকেতুভাইয়ের সাথে একবার পরামর্শ কইরবেন না হি?’ কথাটা বলেই পলাশ ওকে বুকের উপর টেনে নিলেন।

উফফ, মাথায় ঘিলু বলে কি কিছুই নেই মানুষটার? সারা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উত্তাপ ছড়িয়ে যাচ্ছে। এইসময় কালকতুভাইয়ের কথা মনে আসে কী করে? স্লিপিং গাউনের ফাঁসটা একটানে খুলে দিয়ে রোজিনা টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন পলাশের শরীরের উপর। তার পর ফিসফিস করে বললেন, ‘প্লিজ অহন ওঁনার কথা থাউক। আগে আমারে ভালা কইর‍্যা আদর কইর‍্যা দ্যান।’ বলতে বলতে রোজিনা পলাশের ঠোঁট আলতো করে কামড়ে ধরলেন।

পলাশকে তাতিয়ে তোলার জন্য এটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট। এর পরই চুম্বনের ঝড় উঠে যায়। সেই ঝড় থামতে মিনিট কুড়ি সময় লাগে। বিছানা ছেড়ে

ওঠার ক্ষমতাও তখন থাকে না রোজিনার। আজ কি একটু বেশি সময় নিলেন পলাশ? পাশে টানটান হয়ে শুয়ে রয়েছেন উনি। বুকটা হাঁপড়ের মতো ওঠা-নামা করছে। সেই বুকে মাথা রেখে রোজিনা বললেন, 'আমারে জড়াইয়া ধরেন পলাশ। শরীরডা ঝিমঝিম করত্যাসে।'

পাশাপাশি দুটো ঘরের দরজার আগল যেদিন প্রথম খোলা হয়, সেদিনও একই কথা বলেছিলেন রোজিনা। শরীরটা ঝিমঝিম করত্যাসে। সে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। সেই রাতে ও দিকের দরজায় টোকা মেরেছিলেন পলাশ। দরজা খুলে দিতেই বিছানা থেকে তাঁকে পাঁজকোলা করে তুলে নিয়ে গেছিলেন নিজের ঘরে। দু'জনেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁরা অনভিজ্ঞ। পরদিন সকালেই আলবুকার্কে ফোন করে তাঁর বাংলাদেশি মাম্মিকে রোজিনা জানিয়ে দিয়েছিলেন, কী ঘটেছে। পলাশ বাংলাদেশি জানার পর মাম্মি খুব খুশি হন। কিন্তু সেইসঙ্গে সতর্কও করে দিয়েছিলেন, 'বিয়া করার আগে কিন্তু বাচ্চা-কাইচ্যার কথা ভাইবো না রোজি মা। মনে রাইখো, তোমার বয়ফ্রেন্ড নন-আমেরিকান। হ্যারে বিয়া করার অনেক আইনি জটিলতা। হ্যায় কিন্তু চট কইর‍্যা আমেরিকান সিটিজেনশিপ পাইব না।' মায়ের কথা অবশ্য রাখতে পারেননি রোজিনা। সেই খবরটাই আজ পলাশকে দিতে চাইছেন। প্রেগনেন্সির খবরটা তিনি আজই জানতে পেরেছেন ক্লিনিক থেকে।

হঠাৎই পলাশের ফোনটা বেজে উঠল। এত রাতে কে ফোন করতে পারে? ফোনের পর্দায় পলাশ সোয়াইপ করতেই ও প্রান্ত থেকে কেউ জিজ্ঞেস করলেন, 'ইজ ইট পলাশ? নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে স্টিভ ম্যাকউইন বলছি।'

একটু অবাক হয়ে রোজিনার দিকে তাকিয়ে পলাশ বললেন, 'পলাশ হিয়ার। এত রাতে...'

'লারেইনা পেরেজ বলে কোনও মেয়েকে আপনি চেনেন?'

'চিনি। আমার বাড়িতে কাজ করতে আসে।'

‘আমাদের কাছে কমপ্লেন এসেছে, আজ সকাল থেকে মেয়েটা নিখোঁজ। তাকে শেষবারের মতো দেখা গেছে আপনার বাড়িতে ঢুকতে। মেয়েটা কোথায়, আপনি কি জানেন?’

স্পিকারে দু’জনের কথাবার্তাই শুনতে পাচ্ছেন রোজিনা। তিনি তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসলেন। লারেইনা এ বাড়িতে আজ এসেছিল? কই, না তো? ফিসফিস করে কথাটা পলাশকে জানাতেই উনি পুলিশকে একই কথা জানিয়ে দিলেন। ও প্রান্ত থেকে পুলিশ অফিসার বললেন, ‘ঠিক আছে। পরে আপনার সঙ্গে ফের কথা হবে।’ বলে ফোনের লাইন কেটে দিলেন।

লারেইনা কি সত্যিই এ বাড়িতে এসেছিল? কালকেতুভাই বলতে পারবেন। কিন্তু এত রাতে তাকে ডিসটার্ব করা কি উচিত হবে? ওর কথা আর বলতে পারে, পলাশের দুই পোষ্যপুত্তুর। ওরাও সারাদিন বাড়ির বাইরে কোথাও যায়নি। ওদের কথা মনে হওয়া মাত্র একটা আশঙ্কা অনুভব করলেন রোজিনা। নগ্ন অবস্থাতেই তিনি বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লেন। তার পর সিসিটিভি ক্যামেরা অন করে খুঁজতেই দেখলেন, হ্যাঁ, সত্যিই, গেটের সামনে গাড়ি থেকে নেমে লারেইনা হাত তুলে বয়ফ্রেন্ডকে বিদায় জানাচ্ছে। তার পরই ওর কাছে একটা ফোন এল। কথা বলতে বলতে লারেইনা ক্যামেরার ফোকাস থেকে সরে গেল।

(সাতাশ)

স্টারবাকস-এ খুব একটা ভিড় নেই। আমেরিকায় এসে এই ক্যাফেটোরিয়ার প্রেমে পড়ে গেছে কালকেতু। সেলসগার্লদের বলে দিলেই হল। পছন্দের ফ্লেভারে কফি চট করে বানিয়ে দেয়। জানলার ধারে রেজওয়ানা বসে আছে। মেয়েটা ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য হাসপাতালের রিসেপশনে অপেক্ষা করছিল। কাউন্টার থেকে কফির দুটো গ্লাস নিয়ে গিয়ে, উল্টো দিকের চেয়ারে বসে কালকেতু জিজ্ঞেস করল, ‘ঢাকায় আপনার বাসা

কোথায় রেজওয়ানা?' মেয়েটা কে, আগে তা ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। তার পর কেন কথা বলতে চায়, ও শুনবে।

রেজওয়ানা পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'ঢাকায় কি আপনি কখনও গ্যাছেন?'

'অনেকবার। ওখানে রিপোর্টার সার্কেলে আমার কিছু বন্ধুও আছেন।'

'আমাদের বাসা ঢাকা শহরে না, কালকেতুদা। ঢাকার শহরতলিতে। আমোদপুর বলে একটা জায়গায়।'

আরে, আমোদপুর তো পলাশভাইয়ের গ্রাম। কী আশ্চর্য, মেয়েটা সেই গ্রামের! বয়স বেশি না। সেই কারণে আপনির বদলে তুমিতে নেমে এল কালকেতু। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওখানকার পলাশ চৌধুরী বলে কাউকে চেনো?'

'চিনি। ভদ্রলোক মাল্টি মিলিওনার। ওঁনার আসল বাসা এখন ঢাকার ধানমণ্ডী এলাকায়। আমোদপুরে দেশের বাড়ি। ওঁনার রিলেটিভরা এখনও সেই বাড়িতে থাকেন। পলাশভাই কালীপূজার সময় আমাদের গেরামে যান। ওদের বাসার সঙ্গেই সেই কালীমন্দির। আপনি তারে চেনেন না কি?'

কী মনে হল, কালকেতু বলল, 'না। আমি এক বন্ধুর মুখে ওর নাম শুনেছি। আচ্ছা, মুক্তিযুদ্ধের সময় ওঁর এক দিদি নিখোঁজ হয়েছিলেন। তুমি কি তাঁর সম্পর্কে কিছু জানো?'

'হ্যাঁ, ওনাকে পাওয়া গেছিল বলে শুনেছি। কিছুদিন তিনি আমোদপুরের বাড়িতে ছিলেনও। কিন্তু পরে না কি ধরা পড়ে, তিনি চিটার। পলাশভাইয়ের টাকা পয়সা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য দিদি সেজে ওই বাড়িতে ঢুকে পড়েন। ওনার পিছনে বড় একটা চক্র ছিল।'

পলাশভাই কখনও এই খবরগুলো দেননি। আজই দেখা হলে ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে। প্রসঙ্গ বদলে কালকেতু বলল, 'তুমি না কি ঢাকার যুগযুগান্ত বলে একটা কাগজে চাকরি করো। কত বড় কাগজ যে, আমেরিকায় রিপোর্টার রাখার কথা ভাবতে পারে?'

প্রশ্নটা শোনার পর রেজওয়ানার মুখে রং সামান্য বদলাল। ও বলল, ‘কাগজটা নিউ ইয়র্ক থেকে ছাপা হয় কালকেতুদা। আপনি তো জানেন, আমেরিকায় প্রচুর বাংলাদেশি থাকেন। তাঁরা আগে অন লাইনে ঢাকা বা চিটাগংয়ের কাগজ ফলো করতেন। ইন্ডিয়ানদের ইন্ডিয়ান অ্যাব্রড বলে একটা কাগজ আছে, আমেরিকা থেকে বের হয়। তাদের দেখাদেখি বাংলাদেশিদেরও ইচ্ছে হয়েছিল, এখান থেকে একটা কাগজ বের করবেন। তাঁরাই এই যুগযুগান্ত কাগজটার ফাইনান্সার, তাঁরাই এই কাগজের সাবস্ক্রাইবার। সার্কুলেশন মন্দ না। প্রায় পঞ্চাশ হাজার। মেনলি বাংলাদেশ রিলেটেড আর্টিকেল থাকে।’

কথাবার্তার শুরুতেই কালকেতু বুঝে গেল, রেজওয়ানা মেয়েটাকে সন্দেহ করার কিছু নেই। তবুও, ও জিজ্ঞেস করল, ‘আমেরিকায় কদ্দিন আছ রেজওয়ানা? এসেছিলেই বা কী সূত্রে?’

‘চাকরি পেয়ে এসেছি। কামিং জানুয়ারিতে চারমাস হবে। এখন এই নিউ ইয়র্কেই থাকি। একটা ইন্ডিয়ান মেয়ের সাথে রুম শেয়ার করে।’

‘এ বার বলো, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছ কেন?’

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে রেজওয়ানা বলল, ‘কালকেতুদা, নায়গারায় লিলি ম্যাডামের উপর হামলার ঘটনার দিন যা ঘটেছিল, তা আমাকে একবার বলবেন প্লিজ। পরে বলব, কেন জানতে চাইছি?’

কালকেতু বলল, ‘নিশ্চয়ই বলব। ডিনার সেরে রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে দাঁড়াতেই সেই রাতে আমার চোখে পড়েছিল, পার্কের দিকের অন্ধকার থেকে একটা কালো রঙের মার্সিডিজ গাড়ি হঠাৎ মারাত্মক স্পিড বাড়িয়ে ইউ টার্ন নিল। ভারি টায়ারের চমকে দেওয়ার মতো একটা শধ শুনতে পেলাম। অপরাধ জগতের সম্পর্কে খোঁজ রাখি বলে আমি জানতাম, টেররিস্টরা এইভাবেই অতর্কিতে আক্রমণ করে। শব্দও ওদের হাতিয়ার। শিকারকে বিন্দুমাত্র সাবধান হওয়ার সময় দেয় না। ইউ টার্নের মুখেই দেখলাম, গাড়ির

জানলার কালো কাচ ধীরে ধীরে নেমে আসছে। থ্যাঙ্কস টু রেস্টুরেন্টের নিওন আলো। দেখি, জানালার কাছেই পিস্তলের নল, আমাদের দিকে তাক করা। তখনই আমার মস্তিষ্ক আমাকে অ্যালার্ট করে দিল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক মহিলার সঙ্গে তখন কথা বলছিলেন মিস গডউইন। আমার মনে হয়েছিল, টার্গেট উনিই।'

'কেন আপনার মনে হয়েছিল, উনি টার্গেট? অন্য কেউ নন?'

'দেখো, আমি দীর্ঘদিন ক্রাইম বিট-এ রিপোর্টিং করেছি। আগেই বললাম, ক্রিমিনাল ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে সামান্য খোঁজ খবর রাখি। আমি লিলি ম্যাডামের হাত ধরে টান দিয়েছিলাম। কারণ, আমার সিক্সথ সেন্স বলেছিল, উনি সিকিউরিটি গার্ড নিয়ে ঘুরছেন, উনি ভিভিআইপি। উনিই টার্গেট। ওঁর আশপাশে আমরা যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাঁরা সাধারণ মানুষ। অত অল্প সময়ের মধ্যে আমি কিন্তু ঠিক সিদ্ধান্তটাই নিয়েছিলাম।'

'তার মানে আপনিই ওঁকে বাঁচিয়ে দেন?'

'এখন তো দেখা যাচ্ছে, তাই। গাড়ি থেকে ছোঁড়া প্রথম গুলিটা আমার পাশ দিয়ে গিয়ে লাগে কাচের দেওয়ালে। আমারও শরীরে লাগতে পারত। ওই মোমেন্টামে টেররিস্টরা দ্বিতীয় বার ফায়ার করে। ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, গুলিটা লাগে বাংলাদেশি মহিলা... কী যেন নাম তাঁর, রোকেয়া সুলতানার গায়ে। রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে উনি যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। রাস্তাটা রক্তে ভেসে গেছিল। ওর পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে আমার মনে হয়েছিল, গুলিটা শরীরের তলার দিকে কোথাও লেগেছে। তখন অবশ্য আমার মনোযোগ ছিল লিলি ম্যাডামের দিকে। কিন্তু, তুমি এত ডিটেলে জানতে চাইছ কেন রেজওয়ানা?'

'নিজের সন্তুষ্টির জন্য। বিশ্বাস করে, আপনাকে কি একটা কথা বলতে পারি, কালকেতুদা? আজ দেখলাম, লিলি ম্যাডামকে আপনি খুবই শ্রদ্ধা করেন। তাই বলতে ভরসা পাচ্ছি না।'

শুনে কালকেতুর ভ্রুঁ কুঁচকে উঠল। ও বলল, 'কী ব্যাপার, খুলে বলো তো?'

'জটিলতাটা সৃষ্টি করেছেন লিলি ম্যাডামই। ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় আমাকে উনি বলেছিলেন, নায়গারায় হামলার কোনও ঘটনাই না কি ঘটেনি। রোকেয়া আপার গায়ে গুলি লেগেছিল কি না উনি জানতেনই না। ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের ওয়াশ রুমে গিয়ে ওঁরা না কি পোশাক বদলাবদলি করেননি। অথচ আমার কাছে যা এভিডেন্স আছে, তা প্রমাণ করে, উনি আমায় সত্যি কথা বলেননি।'

শুনে কালকেতু একটু অবাকই হল। বিরূপ মন্তব্য করলে লিলি ম্যাডামকে ছোট করা হবে। ও বলল, 'বুঝতে পারছি না, কেন লিলি ম্যাডাম সত্যি কথা বললেন না।'

'রেস্টুরেন্টের ভিতর ওঁর থেকে কতদূরে আপনি খেতে বসেছিলেন কালকেতুদা?'

'পাঁচ ছ'টা টেবল দূরে হবে।'

'লিলি ম্যাডাম আর রোকেয়া আপা নিজেদের মধ্যে কী কথা বলছিলেন, তা নিশ্চয়ই আপনি শুনতে পাননি। কিন্তু সেদিন ওরা কেন নায়গারায় মিট করেছিলেন, এবং কী আলোচনার জন্য রেস্টরেন্টটা বেছে নিয়েছিলেন, আপনি কি তা জানতে চান?'

কালকেতুউত্তরোত্তর অবাক হচ্ছে। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ও বলল, 'নিশ্চয়ই জানতে চাই। কিন্তু তুমি জানলে কী করে?'

রেজওয়ানা বলল, 'রোকেয়া আপা পুরো কনভার্সেশন মোবাইলে রেকর্ড করে রেখেছিলেন। যেটা লিলি ম্যাডাম ভাবতেও পারেননি। মারা যাওয়ার আগের দিন রোকেয়া আপা তাঁর ছেলেকে সত্যিটা জানিয়ে যান। ওঁর মোবাইল থেকে আমি রেকর্ড করে রেখেছি। শুনুন, সেই কনভার্সেশন।'

হ্যান্ডব্যাগ থেকে মোবাইল সেট বের করতে গিয়ে, কাকে দেখে যেন গুটিয়ে গেল রেজওয়ানা। তার পর বলল, ‘রেকর্ড শোনানোর সেফ জায়গা এটা নয়, কালকেতুদা। মোদ্দা কথা শুনে রাখুন, লিলি ম্যাডামের চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি ছিলেন রোকেয়া আপা। সারা বছর বাংলাদেশ থেকে ডোনেশন তুলে উনি পাঠিয়ে দিতেন নিউ ইয়র্কের হেড অফিসে। কিন্তু লিলি ম্যাডামের সঙ্গে নায়গারায় দেখা করতে যাওয়ার আগের দিন, ফাউন্ডেশনেরই একজন রোকেয়া আপাকে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দেন। বাংলাদেশ থেকে তোলা ডোনেশনের একটা অংশ তিনি মরিশাসের একটা ফাইনান্সিয়াল অর্গানাইজেশনে পাঠাতে বলেন। এবং সেটা যেন কেউ জানতে না পারে। এই অন্যায় আবদার শুনে রোকেয়া আপা সরাসরি তাঁকে না করে দেন। লোক জানাজানি হলে, ঢাকায় ওঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে বলে।’

শুনে কালকেতু মেনে নিতে পারল না। লিলি ম্যাডাম আর রোকেয়া সেদিন দু’জনেই হাসিহাসি মুখে কথা বলছিলেন। রেস্টুরেন্টের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় লিলি ম্যাডামকে ও বলতে শুনেছিল, ‘ওদের বলো, যেন ভায়োলেন্সের পথে না যায়।’ ওরা বলতে ম্যাডাম কাকে বুঝিয়ে ছিলেন, কালকেতুর মাথায় ঢোকেনি। রেজওয়ানাকে ও প্রশ্ন করল, ‘ফাউন্ডেশনের কে ডোনেশনের একটা অংশ মরিশাসের ফাইনান্সিয়াল অর্গানাইজেশনে পাঠাতে চাইছিলেন? এবং কেন?’

‘যতদূর আমি শুনেছি, ব্যক্তিগত ফায়দা তোলার কারণে।’

‘ব্যক্তিগত ফায়দা মানে? টাকাটা কি লিলি ম্যাডাম আত্মসাৎ করতে চাইছিলেন?’

‘ঠিক তা নয়। রোকেয়া আপা যা বলে গেছেন, সেটাই আপনাকে বলি। এ বার বিশ্ব শান্তি পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে লিলি ম্যাডামের। পেলে ফাউন্ডেশনের কদর বাড়বে। কেউ তাই চহিছিলেন, জুরি কমিটিতে যাঁরা

আছেন, তাঁদের ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য কিছু অর্থ দরকার। সেটা ফাউন্ডেশন ফান্ড থেকে তোলা যাবে না। সেই কারণেই কিছু অর্থ আলাদা জায়গায় সরিয়ে রাখা দরকার।'

'লিলি ম্যাডাম সম্পর্কে আমাকে এত কথা বললে কেন রেজওয়ানা?'

'বলতাম না। কিন্তু ম্যাডামকে তখন আপনি বলছিলেন, সত্যি কথাটা বলার জন্য আপনি মিডিয়ার কাছে যেতে চান। এর ভিতর নিজেকে জড়ালে কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি মুশকিলে পড়তে পারেন।'

শুনে ভাল লাগল না কালকেতুর। ও বলল, 'থ্যাঙ্কস রেজওয়ানা। আর কিছু বলবে? আমাকে এখনই নিউ জার্সিতে ফিরতে হবে।'

কথাটা বলতে বলতেই কালকেতু উঠে দাঁড়াল। তখনই ওর চোখে পড়ল, কফির কাপে একটা চুমুকও দেয়নি রেজওয়ানা। কলকাতায় স্টারবাকসে একেকটা কাপ কফির দাম প্রায় তিনশো টাকার মতো। সেটা নষ্ট হতে দেখে কালকেতু মনে মনে একটু অসন্তুষ্টই হল। পুরস্কার পাওয়ার লোভে লিলি ম্যাডাম ফাউন্ডেশনের অর্থ সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, অন্য কাউকে দিয়ে প্রস্তাবটা রোকেয়া সুলতানাকে দিয়েছিলেন, এই কথাটা ওর হজম হচ্ছিল না। মেয়েটার সঙ্গে ফের যোগাযোগ হওয়ার সম্ভাবনা ও উড়িয়ে দিল। কালকেতু ঠিক করে নিল, রেজওয়ানা ফোন করলেও ধরবে না। স্টারবাকস থেকে বেরিয়ে ও সিধে হাঁটতে শুরু করল এক্সিট গেটের দিকে।

তখনই মোবাইলে পিং হওয়ার শব্দ শুনল। মেসেজ খুলে কালকেতু দেখল, সুদীশ লিখেছে, 'মেয়েটা ছেড়েছে তোকে? তা হলে চলে আয়। তোর গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। একসঙ্গে নিউ জার্সি যাব।'

মাঝে দু'তিনদিন সুদীশের সঙ্গে ফোনেও কথা হয়নি। ও সম্ভবত নিউ ইয়র্কেই ছিল। কিন্তু সুদীশ জানল কী করে, ও হাসপাতালে এসেছে? পলাশভাই আর রোজিনা ম্যাডাম ছাড়া আর কেউ কথাটা জানে না। ওই দু'জনের কাছ থেকে খবরটা জানা সম্ভবও নয় সুদীশের পক্ষে। কেননা, বার

কয়েক অনুরোধ করার পরও সুদীশ ওদের সঙ্গে দেখা করতে চায়নি। প্রতিবারই বলেছে, 'তোর পলাশভাইয়ের কাছে আমাকে এমনিতেই যেতে হবে। ওঁকে যখন আমার দরকার হবে, তখন নিজে থেকেই যাব।' পার্কিং স্পেসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কালকেতুর মনে হল, সুদীশ সম্ভবত, অন্য কোনও কারণে হাসপাতালে এসেছিল। রেজওয়ানার সঙ্গে বসে যে ও এতক্ষণ কফি খাচ্ছিল, সেটা বোধহয় ওর চোখে পড়েছে।

আগের দিন গাড়ি চালিয়ে নিউ ইয়র্কে নিয়ে এসেছিল ইমন। আজ বোধহয় ওকে পলাশভাই অন্য কাজে পাঠিয়েছেন। সেই কারণে কালকেতু এসেছে চিরাগের সঙ্গে। গাড়িতে ওঠার সময় ছেলেটা রাগী গলায় বলল, 'আপনার এত দেরি হবে, আগে বলেননি কেন? আমি তা হলে কোথাও কিছু খেয়ে নিতাম।'

শুনে কালকেতু ভ্রু কুঁচকে তাকাল। ভারি অসভ্য তো? তুলনায় ইমন ছেলেটা অনেক ভাল। আগের দিন নিজের সিট ছেড়ে নেমে এসে ইমন গাড়ির পিছনের দরজা খুলে দিয়েছিল। চিরাগ কিন্তু গোঁজ হয়ে ড্রাইভারের সিটে বসে রইল। সুদীশও চটেছে, ওর আচরণে। দুটো আঙুল তুলে ইশারায় জানতে চাইল, এটা কি পলাশভাইয়ের বাড়িতে লুকিয়ে থাকা সেই দু'নম্বর জিহাদি? কালকেতু ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। দেখে সুদীশের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার কিছুক্ষণ পর ও স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'লিলি গডউইনকে কেমন দেখলি কালকেতু?'

'আজ থেকে ওঁর ট্রিটমেন্ট শুরু হবে। দেখে মনে হল, উনি খুব ভাল নেই।'

'ওখানে এলসা গিনেসবেরির সঙ্গেও নিশ্চয় তোর দেখা হয়েছে। কথা হল ভদ্রমহিলার সঙ্গে?'

প্রশ্নটা শুনে কালকেতু একটু অবাকই হল। সুদীশ জানল কী করে, এলসা গিনেসবেরিও হাসপাতালে এসেছিলেন? ও বলল, 'হ্যাঁ কথা হল। কিন্তু

আমার তাতে কোনও লাভ হল না। উনি সাফ জানিয়ে দিলেন, শিউলি বলে কারও নাম কখনও শোনেননি। আমাকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করলেন।

এলসা গিনেসবেরির সঙ্গে ওর যা কথাবার্তা হয়েছে, খুঁটিয়ে তা শুনে সুদীশ বলল, 'শুনেছি, ভদ্রমহিলা খুব সুবিধের নন। একবার যখন না বলে দিয়েছেন, তখন ওঁর মুখ থেকে কিছু বের করতে পারবি না। তুই বরং ডা. অ্যালান গডউইনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা কর।'

'আজ হাসপাতালে এসে হঠাৎ আমার কী মনে হল সুদীশ, জানিস। আমি যাকে খুঁজে বেরাচ্ছি, তিনিই আমার খুব কাছে আছেন। আজ শুনলাম, ছোটবেলায় মিসেস গডউইনের পিঠের দিকটা আগুনে পুড়ে গেছিল। এখনও তাঁর ট্রিটমেন্ট চলছে। একটু ভেবে দ্যাখ তো, এমনটা কি হতে পারে, এই মিসেস গডউইনই পলাশভাইয়ের শিউলিদিদি?'

শুনে চমকে উঠল সুদীশ। জিজ্ঞেস করল, 'তোর এটা মনে হচ্ছে কেন?'

'আমি কোথাও যেন একটা যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছি। শিউলিদিদি আর এই মিস লিলি গডউইনের রোগটা কমন। পুড়ে যাওয়া পিঠের চামড়া সংক্রান্ত। ট্রিটমেন্ট করেছেন ডা. গডউইন। শুধু তাই নয়, তখন নিজের সন্তান ছিল না বলে, ছোটবেলায় উনি লিলিকে অ্যাডাপ্ট করেছিলেন। নামটা হয়তো তখন বদলে দিয়েছিলেন। শিউলির বদলে লিলি। আমি এই লাইনে ভাবছি।'

সুদীশ বলল, 'মুশকিলটা হল, এলসা গিনেসবেরির কথা অনুযায়ী, মিসেস গডউইন নিজেও জানেন না, ছোটবেলায় তার নাম শিউলি ছিল কি না? ওই অধ্যায়টা ওঁর স্মৃতি থেকে মুছে গেছে।'

'হ্যাঁ, আমিও সেটাই ভাবছি। প্রমাণ করা মুশকিল হবে। তবে, ডিএনএ টেস্ট করালে হয়তো ধরা যাবে।'

এর পর খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। হঠাৎই কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'তুই হাসপাতালে কেন সুদীশ?'

সুদীশ বোধহয় এই প্রশ্নটাই শুনতে চাইছিল। ও বলল, 'কামাল বলে যে জিহাদি ছেলেটাকে আমরা পাবলিক স্টোরেজ থেকে ধরেছিলাম, কথাটা সেদিন বোধহয় তোকে বলেওছিলাম... সে এই হাসপাতালে ভর্তি আছে। এফবিআই ওকে এমন মার মেরেছে, প্রায় মরার অবস্থা হয়ে গেছিল। মিসেস গডউইনকে যারা খুন করতে চেয়েছিল, এই কামাল ছিল তাদের একজন। সে অপরাধ স্বীকারও করে নিয়েছে। ওর সঙ্গী ছিল একজন ইন্ডিয়ান জিহাদি। যার কোড নাম্বার আই সিক্সটি ফাইভ। তাকেও আমরা প্রায় হাতের নাগালে পেয়ে গেছি রে কালকেতু।'

চিরাগকে শোনানোর জন্যই কথগুলো বলছে সুদীশ। ওকে যাতে নার্ভাস করে দেওয়া যায়, সেই জন্য। ইমনের সঙ্গেও একই ট্রিটমেন্ট করেছিল ও। লুকিং মিররে চোখ পড়ায় কালকেতু দেখল, চিরাগ ওর দিকে তাকিয়ে। ওর চোখে সত্যিই ভয়ের চিহ্ন। সুদীশকে আরও উসকে দেওয়ার জন্য কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'তুই বলেছিলি, দু'জন জিহাদি নিউ জার্সিতেই লুকিয়ে আছে। এই আই সিক্সটি ফাইভ কি তাদেরই একজন?'

সুদীশ বলল, 'হ্যাঁ। এই দ্যাখ, তোকে আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটে গেছে। বাংলাদেশি যে জিহাদিটাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, আজই সকালে তাকে ধরেছি ওয়ালমার্ট থেকে। দু'চার চড়-চাপড় মারতেই, সে সব উগড়ে দিয়েছে। কান্নাকাটি করে সে বলেছে, দেশে মা-বাবার কাছে ফিরে যেতে চায়। এতদিনে না কি সে বুঝতে পেরেছে, আইএসে যোগ দিয়ে ভুল করেছে। ওকে আমরা অ্যারেস্ট করিনি। কেননা, ছেলেটাকে ছেড়ে রাখলে আমরা আরও অনেক খবর পাব। প্লাস আই সিক্সটি ফাইভকেও ধরে ফেলতে পারব।'

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'আই সিক্সটি ফাইভ সম্পর্কে ও কিছু বলেনি?'

'ওর সম্পর্কে যা আইডিয়া দিল, তা ভয়ংকর। সে না কি বলে বলে খুন করে। অসাধারণ না কি হাতের টিপ। অসমে থাকার সময়ও একটা মেয়েকে

ও নৃশংসভাবে খুন করেছিল। প্রথমে রেপ করে, তারপর মেয়েটার ভ্যাজাইনায় গুলি করে। ছেলেটা এমন ডেঞ্জারাস টাইপের, নিজের বাবাকেও প্রকাশ্যে গুলি করে মেরেছে। বাস্টার্ডটা না কি ফের ক্যালিফেটে ফিরে যেতে চায়। তাই এখান থেকে পালানোর সুযোগ খুঁজছে। জানে না, ওর নামে ইন্টারপোল রেড অ্যালার্ট জারি করে দিয়েছে। একবার ধরা পড়লে ফাঁসি ছাড়া আর কোনও শাস্তি ওর হতেই পারে না।'

'ইসসস, শুনে খুব খারাপ লাগছে রে।'

'এদের জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। শুনে তোর আরও খারাপ লাগবে, এই আই সিক্সটি ফাইভের মা আর বোনকে অসমের হিন্দু মৌলবাদীরা কাল রেপ করে মেরে ফেলেছে। ও এখনও তা জানে না। ভাবছি, অ্যারেস্ট করার পর ওকে সুখবরটা আমরাই প্রথম ওকে দেব। দুই-একদিনের মধ্যে ছেলেটার অ্যারেস্ট হওয়ার খবর তুই পেয়ে যাবি।'

লুকিং মিররের দিকে তাকিয়ে কালকেতু দেখল, চিরাগের মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেছে।

(আঠাশ)

অ্যাড্রিয়াটিকা রেসিডেন্সির অ্যাপার্টমেন্টে বোন সাশার সঙ্গে আড্ডা মারছেন লিলি গডউইন। বাইরে গুড়ি গুড়ি বরফ পড়ছে। তাপমাত্রা মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি। পাতলা বরফের আস্তরণ সবুজ লনগুলোতে। কাল সকালে সবুজের বদলে রংটা সাদা হয়ে যাবে। টিভিতে লিলি দেখেছেন, আরও পূর্বে বোস্টন আর শিকাগো না কি বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছে। ক্রিসমাস ইভ, বরফ ছাড়া ভাবা যায় না কি? এই সময়টায় নিউ ইয়র্কের বাইরে কোথাও গেলে তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। অ্যাড্রিয়াটিকা রেসিডেন্সির পুরোটা আলোর মালা দিয়ে এমন সুন্দর সাজানো হয়, দূর-দূরান্ত থেকে লোকে আসে তা দেখতে। লেকের মাঝে বিশাল একটা ক্রিসমাস ট্রি সবথেকে বড় আকর্ষণ। তার প্রতিবিম্ব লেকের জলে পড়ে। বিকালে একদল আবাসিক

ক্রিসমাস ক্যারল গাইতে গাইতে কমপ্লেক্স চত্বর ঘুরে বেড়ায়। এই বয়সেও দেখতে দারুণ লাগে।

বহুদিন পর ক্রিসমাসের সময় পরিবারের পনেরো-ষোলোজন একত্রিত হয়েছেন। সাশা থাকে লস অ্যাঞ্জিলেসের কাছে টোরেন্স বলে একটা জায়গায়। ওর স্বামী এডওয়ার্ড নামকরা ল'ইয়ার। একবার সেনেট নির্বাচনে প্রার্থীও হয়েছিল রিপাবলিকানদের হয়ে। মাত্র তিনশো ভোটে হেরে যায়। ছেলেটা অবশ্য রাজনীতির ময়দান থেকে সরে যায়নি। তিন ছেলেমেয়ে মানুষ করতে গিয়ে সাশা একেবারে জেরবার। ঘরোয়া টাইপের মেয়ে। তবে এডওয়ার্ডের সঙ্গে সমাজসেবাতেও যতটা পারে, অংশ নেয়। লিলির সঙ্গে তাঁর বয়সের তফাৎ প্রায় দশ বছরের। রক্তের সম্পর্ক নেই, তবুও দিদিকে ও মায়ের মতো সম্মান করে।

হল ঘরে ক্রিসমাস ট্রি সাজানো রয়েছে। তার গায়ে পাঁচ-ছ'টা লাল মোজা ঝোলানো। বাচ্চাদের আশা, কাল জেসাসের জন্মদিনের সকালে ঘুম থেকে উঠে ওরা গিফট পাবে ক্রিসমাস ট্রি-র নিচ থেকে। চিমনি দিয়ে ঘরে ঢুকবেন স্যান্টা ক্লস। মোজার ভিতর ওদের প্রত্যেকের জন্য গিফট রেখে যাবেন। ক্রিসমাস ট্রি-র পাশের সোফাতেই বসে আছে সাশা। একটু আগে বারান্দা থেকে ঘুরে এসেছে। বলল, 'ভাল বরফ জমছে লনে। আমাদের টোরেন্সে বরফ পড়ে না। কাল দেখবে, আমার ছেলেমেয়েদের তুমি ঘরের ভিতর আটকে রাখতে পারবে না।'

লিলি বললেন, 'ওদের আটকাস না। আমাদের ছেলেবেলার কথা তোর মনে নেই? মাম্মি তোদের বারণ করত না। কিন্তু আমাকে বরফে গড়াগড়ি খেতে দিত না। তবুও, লুকিয়ে-চুরিয়ে বরফ নিয়ে কেমন খেলতাম।'

'সত্যি, গোথেনবার্গের সেই দিনগুলো খুব ভাল ছিল। বরফের মধ্যে হর্স রেসিংও হত। আমার বেশি করে মনে পড়ে, কেননা এডওয়ার্ডের সঙ্গে

আমার প্রথম আলাপ ওই রেসিংয়ের সময়।' কথাগুলো বলে সাশা হাসতে লাগল।

ওয়াশিংটন থেকে এসেছে লিলির ভাই ড্যানিয়েলও, ওর স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে। ড্যানি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে খুব বড় পোস্ট-এ চাকরি করে। ওর মেয়ে মারিয়া নাসা স্পেস সেন্টারের বিজ্ঞানী। মারিয়া বিয়ে করেছে এক অ্যাস্ট্রেনটকে। ওরা থাকে হিউস্টনে। ওদের দুই ছেলে-মেয়ে। মারিয়াকে খুব ভালবাসেন লিলি। মারিয়াও একটা সময় পিসিঅন্ত প্রাণ ছিল। মাঝে মধ্যেই মেয়েটা ফোন করে হিউস্টন থেকে। নাসার কোনও না কোনও প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে মেয়েটা নিউ ইয়র্কে আসতে পারে না। এতদিন স্যাটার্নে স্পেসশিপ পাঠানোর প্রোজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সেটা সাফল্যের সঙ্গে ছাড়া হয়ে গেছে। তাই এ বার ক্রিসমাসে ছুটি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, মারিয়া সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওর শ্বশুর আর শাশুড়িকেও।

সাশা ছাড়া অ্যাপার্টমেন্টে আর কেউ নেই এই মুহূর্তে। বাকিরা গেছে ডিয়ার ফিল্ড বলে একটা বিশাল হাউসিং কমপ্লেক্সে। মাল্টি মিলিওনিয়ারদের কমপ্লেক্স। ক্রিসমাসের এক সপ্তাহ আগে থেকেই ডিয়ার ফি ল্ড ক্রিসমাস আলোর সাজে সেজে ওঠে। প্রত্যেকটা গাছে রঙিন এলইডি বালব। প্রত্যেকটা বাড়ি আর তার সামনের কোর্ট ইয়ার্ডও আলো দিয়ে সাজানো। কোথাও সান্টা ক্লজের রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে এল্ক হরিণের দল, কোথাও যিশু খ্রিষ্টের জন্ম হচ্ছে ন্যাজারথে। কোথাও মিউজিকের তালে তালে নাচছে সান্টা ক্লজ। কনটেস্টও হয় বাড়ি সাজানো নিয়ে। গতবার বিচারক হয়ে লিলি ডিয়ার ফিল্ডে গেছিলেন। জাঁকজমক আর ভিড় দেখে তিনি অবাক! সব ক'টা বাড়ির ডেকোরেশন তাঁর এত ভাল লেগেছিল যে, কাকে ফার্স্ট প্রাইজ দেবেন বুঝতে পারছিলেন না। সেই গল্পই দু'একদিন আগে তিনি করেছিলেন বাচ্চাদের কাছে। ওরা জোর করে বড়দের ধরে নিয়ে গেছে ডিয়ার ফিল্ডে।

সন্ধে প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজে। সবাই ফিরে এলে ডিনারে ওঁরা বসে যাবেন। মারিয়ার শাশুড়ি না কি খুব ভাল রান্না করেন। আজ সকালে উনি বলে বসলেন, ক্রিসমাস ইভে একটা কোর্স রান্না করে উনিই সবাইকে খাওয়াবেন। ঘরে হুইস্কি, রেড ওয়াইনের বোতলও মজুত আছে। সাশা নানা ধরনের ককটেল বানাতে পারে। সন্ধেটা খুব সুন্দর কাটবে ভেবে মনটা ফুরফুরে লিলির। তাঁর আরও ভাল লাগত যদি ড্যাডি হাজির হতে পারতেন। অ্যালান গডউইন থাকেন নিউ ইয়র্কেই গ্রিনউইচে। শরীরটা ভাল নেই। বয়স হয়ে গেছে পঁচাত্তরের কাছাকাছি। উনি আর ডাক্তারি করতে চান না। কিন্তু যে ক্লিনিকে উনি বসেন, তারা ওঁকে ছাড়তে চায় না। বাধ্য হয়েই ড্যাডি দিনে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য ক্লিনিকে যান। এর বাইরে এখন আর কোথাও বেরোন না।

কয়েকদিন আগে ড্যাডির সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন লিলি। লক্ষ করেছেন, উনি এখন একটু খিটখিটে স্বভাবের হয়ে গেছেন। কথা বলতে বলতে সাশা ড্যাডির প্রসঙ্গ তোলায় লিলি বললেন, 'ওঁর মাথায় এখন অদ্ভুত খেয়াল চেপেছে, গোথেনবার্গে ফিরে যাবেন।'

সাশা বললেন, 'কয়েকদিন আগে এড ওঁকে ফোন করেছিল, কই, তখন তো ওকে ড্যাডি কিছু বলেনি।'

'গ্র্যান্ডমার শরীর ভাল নেই। এখন না কি মাঝে মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। সেই কারণেই ড্যাড নিউ ইয়র্কের পাট তুলে দিতে চান।'

সুইডিশ মহিলারা এমনিতে একটু দীর্ঘায়ু হন। গড় আয়ু পঁচাশি বছর। গ্র্যান্ডমার বয়স অনেক বেশি, পঁচানববুই। এই কিছুদিন আগেও গ্র্যান্ডমা বেশ ফিট ছিলেন। প্রায়ই নিজে গাড়ি চালিয়ে বাল্টিক সাগরের তীরে চলে যেতেন রোদ্দূর পোহাতে। আমেরিকায় ছেলের বাড়িতে বেরাতে এলে গ্র্যান্ডমা ওকলাহামায় চলে যান ক্যাসিনো খেলতে। বিশ্বের সবথেকে বড় ক্যাসিনোটা ওখানে।

সাশা জিজ্ঞেস করল, 'দেশে ফিরে গেলে নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টের কী করবেন ড্যাডি?'

লিলি বললেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করিনি।' কথাটা সত্যি, লিলি জিজ্ঞাসা করেননি। কিন্তু ড্যাডি সেদিন নিজেই বলেছিলেন, অ্যাপার্টমেন্টটা লিখে দেবেন তাঁর চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের নামে। পাছে সাশা আর ড্যানিয়েল কিছু মনে করে সেই কারণে ড্যাডিকে মানা করে এসেছেন লিলি।

হঠাৎ সাশা জিজ্ঞোসা করল, 'অ্যান্ডি কেমন আছে রে? ওর কোনও খবর রাখিস?'

লিলি একটু রেখেঢেকে বললেন, 'ও যোগাযোগ রাখে। হঠাৎ ওর কথা তোর কেন মনে হল?'

'ওকে তখন বিয়ে করলে তুই ভাল করতি। তোদের ব্রেক আপ হল কেন, সেটা জানতে ইচ্ছে করে। এডও আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল।'

এলসা আন্টি কেন মানা করেছিলেন, সেই কথাটা বলা উচিত হবে না। লিলি বললেন, 'সব মেয়ের জীবনে সব ইচ্ছে তো আর পূরণ হয় না। আমার কপালে ছিল না। তবে, অ্যান্ডি এখনও বিয়ে করেনি। ও এখনও আমাকে ভুলতে পারেনি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমার জন্যই ও দাম্পত্য সুখ পেল না।'

'এখন তোর কী এমন বয়স হয়েছে? আজকাল তোর থেকেও বড় বয়সিরা বিয়ে করে মা হচ্ছে। তুই যদি বলিস তো, অ্যান্ডির সঙ্গে আমি কথা বলে দেখতে পারি। আমার খুব খারাপ লাগে যখন ভাবি, বাকি জীবনটা তুই একা কাটাবি কী করে?'

লিলি হেসে উড়িয়ে দিলেন কথাটা, 'কে তোকে বলল, আমি একা কাটাব? চাইল্ড কেয়ার ইউনিটগুলোতে আমার কত সন্তান, তুই জানিস? ওদের নিয়ে দিব্যি আমার জীবন কেটে যাবে। না, না, অ্যান্ডির সঙ্গে এ ব্যাপারে তুই কোনও কথা বলবি না।'

সাশা তর্ক করতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফোন। নিউ ইয়র্ক থেকে ভিডিয়ো কল। পর্দায় ড্যাডির মুখ, 'মেরি ক্রিসমাস হানি।'

ড্যাডিকে দেখে উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারলেন না লিলি, 'মেরি ক্রিসমাস। আমি আর সাশা এখখুনি তোমাকে নিয়ে কথা বলছিলাম। তোমাকে আমরা খুব মিস করছি। তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'আমি ঠিক আছি হানি। তুমি কেমন আছ?'

'রিসেন্টলি ডা. কিংসফোর্ডের কাছে গেছিলাম। উনি আমার লেজার ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিয়েছেন। এখন একটু ভাল বোধ করছি।'

'তোমাকে নিয়ে টিভিতে কী সব আজে বাজে কথা আলোচনা হচ্ছে লিলি? তুমি না কি ফাউন্ডেশনের অর্থ নয়-ছয় করছ?'

লিলি বললেন, 'ওতে কান দিও না ড্যাড। আমেরিকান মিডিয়াকে তো তুমি জানো। ওরা আমাকে আরও বিখ্যাত করে দিচ্ছে।'

'না, না হানি। এডওয়ার্ডকে বলো, যেন স্যু করে দেয়। এ রকম অপবাদ দেওয়ার মানেটা কী?'

'স্যু করার দরকার নেই ড্যাড। প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস টুইট করে বলে দিয়েছেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে কোনও স্টেপ নেবে না। উনি আজই আচমকা সিরিয়ায় চলে গেলেন। না হলে প্রেস কনফারেন্স ডেকে যা বলার বলে দিতেন। আমি জানি ড্যাড, কারা পিছন থেকে আমাকে টেনে নামানোর চেষ্টা করছে। এটা ডেমোক্রাটদের নোংরামি। আমাকে সামনে রেখে আসলে প্রেসিডেন্ট অ্যাডামসকে ওরা ঝামেলায় ফেলতে চায়।'

'তবুও, তুমি সাবধানে থেকো হানি। আর হ্যাঁ, তোমার গেস্টরা সবাই এসে গেছেন?'

'গেস্ট বলতে দু'জন ইউনিসেফে আমার কলিগ। বাকি তিনজনকে তুমি চিনবে না। এখনও ওরা আসেননি। বাকিরা সবাই ফ্যামিলি মেম্বার।'

‘ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন। শোনো হানি, আরও একটা কারণে তোমাকে ফোনটা করলাম। তুমি কি মি. কালকেতু ন্যান্ডি বলে কোনও ইন্ডিয়ান জেন্টেলম্যানকে চেনো?’

একট অবাক হয়েই লিলি জানতে চাইলেন, ‘ওঁর সঙ্গে আমার রিসেন্টলি পরিচয় হয়েছে ড্যাড। তুমি ওকে জানলে কী করে?’

ড্যাডির গলায় ঝাঁঝ, ‘আরে, উনি ফোনে যোগাযোগ করেছিলেন। আমার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে চান। মেনলি তোমার সম্পর্কেই নানা কথা জানতে চাইছিলেন। আমি সাফ বলে দিয়েছি, তোমার আর্লি লাইফ নিয়ে কোনও প্রশ্নের জবাব দেব না।’

‘আমার সম্পর্কে উনি ঠিক কী জানতে চাইছিলেন ড্যাড?’

‘এই যেমন, তোমাকে কীভাবে আমি দত্তক নিয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে বাংলাদেশের কোনও সম্পর্ক আছে কি না? তোমার পিঠের ইনজুরিটা কীভাবে হয়েছিল। এইসব কথা আর কী। আমি এত রেগে গেছিলাম যে নিজেই ফোনের লাইন কেটে দিই।’

শুনে লিলি একটু অস্বস্তিবোধ করলেন। ন্যান্ডির সঙ্গে এই আচরণ করা ড্যাডির উচিত হয়নি। তিনি বললেন, ‘ড্যাড, ওই ইন্ডিয়ান জেন্টেলম্যান কয়েকদিন আগে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। ওকে আর ওর দুই বন্ধু পলাশ আর রোজিনাকে আজ ডিনারে আমি নেমতন্ন করেছি। স্রেফ কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য। ড্যাড প্লিজ, এর পর উনি যদি ফোন করেন, তা হলে তুমি আমার সম্পর্কে যা জানো, ওকে বলে দিও।’

উল্টোদিকে ড্যাডি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, ‘তাই না কি? সরি হানি, আমি জানতাম না। কিন্তু কে তোমাকে মারার চেষ্টা করেছিল?’

টেররিস্ট অ্যাটাকের কথা শুনলে ড্যাডি টেনশনে পড়বেন। লিলি বললেন, ‘ও সব কথা এখন থাক ড্যাডি। শোনো, আমাকে নিয়ে তুমি একদম টেনশন

করবে না। জীবনের অর্ধেকটাই তুমি আমাকে নিয়ে টেনশনে ভুগেছ। আমি যখন পিঠের ব্যথায় কাতরাতাম, তখন রাতের পর রাত তুমি আমার বিছানার পাশে বসে কাটিয়েছ। আমার কাছে তুমি ঈশ্বরের থেকেও কম কেউ না ড্যাড। তোমার আশীর্বাদ থাকলেই হল। আমার কোনও ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।'

'থাক হানি, পুরনো কথা তুলো না। বয়স হয়েছে তো, শুনলে এখন আমি খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাই। শোনো, সাশা কি ধারে-কাছে আছে? ওকে ফোনটা দাও মা। ওকে উইশ করি। ওর বাচ্চাগুলোর জন্য গিফট পাঠিয়েছি। আজ রাতের মধ্যে তোমার বাড়িতে পৌঁছে যাবে।'

লিলি হেসে বললেন, 'সাশা এখন আমার পাশেই বসে আছে। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো।'

ফোনটা সাশার হাতে ধরিয়ে দিয়ে লিলি গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটার দিকে তাকালেন। প্রায় সাতটা বাজে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ইউনিসেফের গেস্টরা চলে আসবেন। ডিনারের আয়োজন ঠিকঠাক হয়েছে কি না, তা দেখার জন্য লিলি ছাদে বেরিয়ে এলেন। বিরাট একটা রঙিন সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। উপর থেকে বাহারি কোরিয়ান আলো ঝুলছে। একপ্রান্তে একটা ছোট্ট পোডিয়াম। তাতে পিয়ানো অর্গান রাখা। ডিনারের আগে সবাই মিলে ক্যারল গাইবেন। তখন পিয়ানোয় বসবেন লিলি। ছোটবেলায় টিচার রেখে তাঁকে পিয়ানো শিখিয়েছেন মাম্মি। তখন শারীরিক কারণেই মিউজিক আঁকড়ে ধরেছিলেন লিলি। কর্মজীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়ার পর কদাচিৎ পিয়ানোয় বসার সময় পান। এখনও তাঁর আঙুলের জাদু সুরের আশ্চর্য মায়াময় জগতে নিয়ে যায় শ্রোতাদের।

প্রায় পাঁচ-ছয় বছর পর নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ক্রিসমাস কাটাচ্ছেন লিলি। এই ক' বছর বিভিন্ন শহরে তাঁর চাইল্ড কেয়ার ইউনিটে বাচ্চাদের সঙ্গে অপার আনন্দে সময় কাটিয়েছেন তিনি। এ বছরই তাঁর যাওয়ার কথা ছিল

ইয়েমেনের সানা শহরে। আগে ওটাই ইয়েমেনের রাজধানী ছিল। কিন্তু বছর চারেক আগে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট হাডি হঠাৎ বন্দর শহর আদেনে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেছেন। সানার চাইল্ড কেয়ার ইউনিটে আশ্রিত বাচ্চাদের সংখ্যা প্রায় হাজার। লিলি ভেবেছিলেন, ক্রিসমাসে উপহারসামগ্রী নিয়ে গেলে ওখানে বাচ্চারা প্রচণ্ড খুশি হবে। মিডিয়ারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন। এই মুহূর্তে প্রায় মুমূর্ষ একটা জাতির পাশে গিয়ে দাঁড়ানো দরকার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সানায় যাওয়ার প্ল্যান লিলি বাতিল করেন সিকিউরিটি চিফ স্ট্যানলি গর্ডনের পরামর্শে। 'ম্যাডাম, পশ্চিম এশিয়া আপনার পক্ষে এখন নিরাপদ না। ওখানে যাওয়া মানে মিলিট্যান্টদের খপ্পরে পড়া।'

ছাদ থেকে লিভিং রুমে ঢুকে লিলি দেখলেন, ডিয়ার ফিল্ড থেকে পুরো পরিবার ফিরে এসেছে। ওখানে কী দেখেছে, সেটা বলার জন্য বাচ্চাগুলো একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। এডওয়ার্ড ওদের বকুনি দিয়ে বলল, 'এখন না। এখন না। অলরেডি ওই আর লেট। আন্টি তোমাদের কথা পরে শুনবেন। তোমরা সবাই চট করে ফ্রেশ হয়ে নাও। ডিনারের আগে এখুনি আমরা প্রেয়ারে বসব।' শুনে বাচ্চাগুলো হুড়মুড় করে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল।

তখনই নিচ থেকে স্ট্যানলি গর্ডনের ফোন পেলেন লিলি, 'ম্যাডাম, একটা আর্জেন্ট দরকার ছিল। আপনাকে ডিসটার্ব করার জন্য দুঃখিত।'

লিলি বললেন, 'ডাজন্ট ম্যাটার। কী বলবে বলো।'

'খানিকক্ষণ আগে ফ্রন্ট গেটে স্যান্টা ক্লজ সেজে একজন এসেছিলেন। তিনি আপনার অ্যাপার্টমেন্টে যেতে চাইছিলেন। ডিয়ার ফিল্ডে তার সঙ্গে না কি আপনার কাছে আসা বাচ্চাদের আলাপ হয়েছিল। বাচ্চারাই না কি তাঁকে এই অ্যাপার্টমেন্টে আসার জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু রেসিডেন্সির সিকিউরিটি স্টাফদের লুকোনো মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়ে, ভুয়ো স্যান্টা ক্লজের সঙ্গে একটা পিস্তল আছে।'

শুনে শরীরে উপর দিক থেকে একটা ঠান্ডা স্রোত নিচের দিকে নামতে শুরু করল লিলির। তার মানে টেররিস্টরা এখনও তাঁর পিছু ছাড়েনি। স্যান্টা ক্লজের ছদ্মবেশে কোনও টেররিস্ট তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারেন, তিনি তা স্বপ্নেও ভাবেননি। এই মুহূর্তে জানাজানি হলে ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে প্যানিক ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই লিলি বললেন, 'ওর কাছ থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে জন মিকেলকে খবরটা দাও। ওকে নিয়ে যা করার, এফবিআই করুক। প্লিজ, দেখো, গুলিগোলা যেন না চলে। আর রেসিডেন্টরা কেউ যেন জানতে না পারেন।'

স্ট্যানলি বলল, 'রেসিডেন্সির সিকিউরিটি এমন মার মেরেছে, লোকটা এখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন লিলি।

(উনত্রিশ)

প্লেনে উঠলে কখনও জানালার ধারের সিটে বসেন না রোজিনা। আকাশ থেকে নিচের দিকে তাকাতে তাঁর ভয় লাগে। কয়েক বছর আগে একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বোস্টন থেকে নিউ ইয়র্কে ফেরার পথে থান্ডার স্টর্মের মধ্যে পড়েছিলেন সেবার। এয়ারক্রাফটের একটা ডানা কাত হয়ে গেছিল। প্লেনটা এত কাঁপছিল, রোজিনার মনে হয়েছিল, এই বোধহয় ভেঙে পড়বে। আর তিনি বাঁচবেন না। দু'হাতে সিটের হ্যান্ডেল চেপে ধরে মনে মনে প্রভু যিশুকে ডেকেছিলেন। সেই এয়ারোফোভিয়া কাটাতে তাঁর অনেকদিন সময় লেগেছিল। তার পর থেকে প্লেনে চাপলেই তিনি আইল-এর সিটে বসেন। টেক অফের সময় থেকে ল্যান্ডিং পর্যন্ত পারতপক্ষে জানালার দিকে তাকান না।

আজ ক্রিসমাসের সকালে আলবুকার্ক যাওয়ার প্লেন ধরেছেন রোজিনা। উইন্ডো সিটে কালকেতুভাই, মাঝে পলাশ এবং আইলের সিটে তিনি। ড্যাডির আমন্ত্রণে ছুটি কাটাতে ওঁরা র‍্যাঞ্চে যাচ্ছেন। ভোর ছ'টায় নিউ

জার্সির বাংলো থেকে যখন ওরা বেরোন, তখন হালকা বরফ পড়ছে। তাপমাত্রা মাইনাসের অনেক নিচে। তবুও, দেশের বাড়িতে যাওয়ার আনন্দে ঠান্ডা বোধ করছিলেন না রোজিনা। ক্রিসমাস ইভ কাটিয়ে নিউ জার্সি তখন ঘুমোচ্ছে। এয়ারপোর্টমুখী অত ব্যস্ত একটা রাস্তা শুনশান। এয়ারপোর্টেও লোকজন খুব কম। এয়ারক্রাফট প্রায় অর্ধেক ফাঁকা।

লারেইনার দুঃশ্চিন্তায় গত দু'তিনটে রাত্তির ভাল করে ঘুমাতে পারেননি রোজিনা। রোজ ঘুম থেকে ওঠার পরই ওর মনে সেই দুর্ভাবনাটা ফিরে এসেছে। গেল কোথায় মেয়েটা? দিন তিনেক ওর পাত্তাই নেই। ওর সম্পর্কে পুলিশের কাছে কমপ্লেনটাই বা করল কে, রোজিনা সেদিন জানতে চাননি। নিউ জার্সিতে যে মেয়েটার সঙ্গে ও রুম শেয়ার করে থাকে, সে হতে পারে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে ফোন করেছিলেন রোজিনা। সে বলল, ইউনিভার্সিটি ছুটি বলে প্রায় সপ্তাহখানেক আগে হিউস্টনে বাবার কাছে চলে গিয়েছে। আলবুকার্কে লারেইনার বাড়িতে নিশ্চয়ই এখনও ওর উধাও হওয়ার খবরটা পৌঁছয়নি। পৌঁছলে এতক্ষণে ওর মা ফোন করতেন। রোজিনার অস্বস্তির সবথেকে বড় কারণ, র‍্যাঞ্চে পৌঁছবার পরেই লারেইনার মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। যদি ওর কথা ওঠে, তা হলে তিনি কী বলবেন?

আমেরিকায় ইয়ং মেয়েরা বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে নাইট আউট করেই। এটা নিয়ে এখানে বাবা-মায়েরা কেউ কিছু ভাবেই না। একই ছাদের তলায় থাকলে মায়ের কর্তব্য, মেয়ের হ্যান্ডব্যাগে কণ্ডোমের প্যাকেট রেখে দেওয়া। যাতে মেয়ে গর্ভবতী হয়ে না পড়ে। আর মেয়েরা আলাদা থাকলে দায়িত্ব তার নিজের। বড় ভরসা করে লারেইনার মা মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছিলেন রোজিনার কাছে। পরোক্ষে একটা দায় তো থেকেই গিয়েছে। মেয়েটার উধাও হওয়ার খবর এখন দিলে আন্টি বলতেই পারেন, 'এই ক'দিন জানাওনি কেন?' তী উত্তর দেবেন, প্লেনে বসে তা ভেবেই যাচ্ছেন রোজিনা।

ক্রিসমাসের এই সময়টায় সবাই ছুটি কাটাতে ব্যস্ত। কোথায় আর কার কাছে খোঁজ নেবেন রোজিনা? পলাশের ধারণা, বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে লারেইনাও কোথাও বেড়াতে গেছে। আলবুকার্কেও মায়ের কাছে যেতে পারে। কিন্তু এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মেয়ে লারেইনা নয়। আর কাউকে না বলুক, মেয়েটা ওঁকে অন্তত বলে যেত। কয়েকদিন আগে অবশ্য ও বলেছিল, ওর এক বন্ধু আদেলিনা আলবুকার্ক থেকে এই প্রথম আসছে নিউ ইয়র্কে। তাঁকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখাতে হবে। লারেইনা কি তা হলে নিউ ইয়র্কের কোথাও আছে? সেই কারণেই কাজে আসতে পারেনি? দুর্ভাবনার সবথেকে বড় কারণ, মেয়েটা ফোন তুলছে না। ওর ফোন বেজেই যাচ্ছে। রোজিনা অবশ্য একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, বলপ্রয়োগ করে কেউ ওর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। অন্য মেয়েরা উধাও হয়ে গেলে যে সব সম্ভাবনার কথা প্রথমে মাথায় আসে, লারেইনার ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য না। পুলিশ হতে চাওয়ায় মেয়েটা সেল্ফডিফেন্স ট্রেনিং নিয়েছে।

কাল রাতে কালকেতুভাই ওদের নিয়ে গেছিলেন মিস লিলি গডউইনের বাড়ি। ক্রিসমাস ইভের নেমতন্ন ছিল। অনেক রাতে ওরা তিনজন বাড়িতে ফিরে এসেছেন। ওই সময়টুকুতেই লারেইনার কথা রোজিনা ভুলে ছিলেন। ডিনার টেবলে পান করার সময় ক্রিসমাস উইশ জানাচ্ছেন সবাই একে একে। ঠিক সেই সময় কালকেতুভাই চমৎকারভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে ওঁদের প্রোজেক্টের কথা বললেন। প্লেনোতে ওদের চাইল্ড ডিটেনশন সেন্টার খোলার কথা। শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে লিলি গডউইন বললেন, 'আপনাদের এই মহৎ প্রচেষ্টা আটকাবে না। ইউনিসেফে আমার দুই কলিগ এখানে আছেন। আমার সঙ্গে তাঁরাও যতদূর সম্ভব, আপনাদের পাশে থাকবেন। নতুন বছরের শুরুতে আপনারা যাতে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের অ্যাপ্রুভাল পান, তা দেখব।' সত্যিই কালকেতুভাইয়ের তুলনা নেই। রিপোর্টার তো, গুছিয়ে ঠিক সময় ঠিক কথাটা উনি বলতে পারেন।

কাল লিলি গডউইনের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরোনোর পর খুশির মেজাজে রয়েছেন পলাশভাই। বিছানায় শোয়ার আগে জড়িয়ে ধরে একবার উনি জিজ্ঞেসও করেছিলেন, 'আমার ক্রিসমাস গিফট আফনের ক্যামন লাগল ম্যাডাম?'

গিফট মানে, চাইল্ড ডিটেনশন সেন্টারের অর্ধেক মালিকানা। তখন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি রোজিনা। চুম্বনের তীব্রতায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কতটা খুশি তিনি। ইস, বেচারিকে এখনও সুখবরটা দেওয়াই হল না। বাবা হতে যাচ্ছে। শুনলে পলাশের চোখ-মুখে কী ধরনের আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটে উঠবে, সেটা তিনি আন্দাজ করতে পারেন। রোজিনা ঠিকই করে রেখেছেন, র‍্যাঞ্চে কয়েকটা সুন্দর স্পট আছে। ঝরণার ধারে বসে পলাশভাইকে জানাবেন, তাঁর ক্রিসমাস গিফটের কথা।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর প্রিয় মানুষটার দিকে একবার তাকালেন রোজিনা। তখনই চোখাচোখি হয়ে গেল। পলাশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাবতাসেন ম্যাডাম?'

রোজিনা হেঁয়ালি করে বললেন, 'ভাবতাসি, এত সুখ আমার সইব কি না। প্লেনে ওঠার পর থেইক্যা আমার ডাইন চোখ লাফাইতাসে। ভালা লক্ষণ না।'

'কী আজে-বাজে কথা ক'ন।'

'ধরেন, এই প্লেনডা যদি ক্র্যাশ করে, তাইলে? যতক্ষণ না ল্যান্ড করতাসে, ততক্ষণ বিশ্বাস নাই। তার উফর বাসায় আফনের দুই পোইষ্যপুত্তুররে রাইখ্যা আইলাম। হ্যাগো উফর আমার ভরসা নাই।'

'চিন্তা কইরেন না। রিমোট কন্ট্রোলে সব লক কইর‍্যা আইসি। লক ভাঙার সাইধ্য হ্যাগো নাই। উল্ডা পাল্ডা না ভাইব্যা, আপনে আলবুকার্কের বাসার কথা ক'ন। র‍্যাঞ্চের কথা অনেক হুনসি। হলিউডের ছিনেমায়ও দ্যাখসি। আমার নতুন একডা অভিজ্ঞতা অইব।'

‘তিনশো একরের উফর ড্যাডির র‍্যাঞ্চ। সিনিক বিউটি সুপার্ব। আফনে রোম্যান্টিক মানুষ। এনজয় করবেন পলাশ। হর্স রাইডিং বা হান্টিংয়ে আপনার যদি ইন্টারেস্ট থাকে, তাইলে আরও ভালা লাইগব। আমার ড্যাডির র‍্যাঞ্চের ঘোড়া নর্থ আমেরিকায় খুব ফেমাস। গিয়া দেইখতে পাইবেন, হর্স কোর্স স্ট্যালিয়নে ভর্তি। দেখলেই চড়তে ইচ্ছা করব। হান্টিং স্পটও আছে জঙ্গলে। তবে, ভয়ের ব্যাপার হইল র‍্যাটল স্নেক আর উলফ। হ্যাগো কামড় খাইতে খাইতে আমি দুইবার বাঁইচ্যা গেসি।’

পলাশভাই জিজ্ঞেস করলেন, ‘অ্যানাকোন্ডা নাই?’

হিহি করে হেসে উঠলেন রোজিনা। তাঁর দাঁতের পাটি মুক্তোর মতো একবার ঝিলিক দিয়ে উঠল। রোজিনা বললেন, ‘কী বাচ্চাগো মতোন কথা ক’ন পলাশ। নর্থ আমেরিকায় অ্যানাকোন্ডা? অ্যানাকোন্ডা দ্যাখতে চান তো আফনেরে যাইতে অইব অ্যামাজনে। সাউথ আমেরিকায়।’

পলাশ জিজ্ঞেস করলেন, ‘হান্টিং স্পটের কথা কী য্যান কইতাসিলেন?’

‘ইচ্ছা করলে র‍্যাঞ্চের লাগোয়া ফরেস্টেও যাইতে পারেন। সেহানে হরিণ, ভালুক, নেকড়া, মাইগ্র্যান্ট বার্ডও আসে। র‍্যাঞ্চে অনেক লোক পাইবেন, যারা হান্টিং কইরতে আসেন। আমার ড্যাডি আর আঙ্কলরা উইক এন্ড-এ ফরেস্টে যান। হরিণ মাইর‍্যা আনেন। হরিণের মাংস পঁচাইয়া খাইলে যা টেস্ট হয়, ভুইলতে পারবেন না। চলেন, এইবার আফনেরে খাওয়াইমু।’

‘আমি খাইসি। ফর ইয়োর ইনফর্মেশন, আমার দাদামশায়ও খুব ভালা হান্টার সিলেন। হ্যায় খুলনায় গিয়া সুন্দরবন থেইক্যা প্রতিবসর রয়াল বেঙ্গল টাইগার শিকার কইর‍্যা আসতেন। আমোদপুরে আমাগো বাসায় গেলে দেইখতে পাইবেন স্টাফ করা বাঘের মুণ্ডু দেওয়ালে টাঙানো আসে। দাদামশায় না কি কালীপূজায় বইসতেন বাঘের চামড়ার আসনে। আচ্ছা, একডা কথা জিগাই, ফরেস্টে যে হব হরিণ, ভালুক, নেকড়ে থাকে, হ্যারা র‍্যাঞ্চের ভিতর কখনও ঢোকে?’

‘লোহার ফেন্সিং দেওয়া আছে। তবে, অনেক সময় ফেন্সিং টপকাইয়্য ভিতরে ঢুইক্যাও পড়ে। আফনের ভয়ের কিছু নাই। র‍্যাঞ্চের ফরেস্টে যে হব ভালুক, নেকড়ে থাকে, তারা কেউ ম্যানইটার না।’

‘আমাগো সুন্দরবনে কিন্তু বাঘেরা ম্যানইটার। গেরামে ঢুইক্যা মানুষ তুইল্যা নিয়া যায়।’

‘আপনে আমারে আমোদপুরের বাসায় লইয়্যা গেলেন কই?’

‘এইবার মনস্থির করসি, আফনেরে লইয়া যাম। খৈয়াছড়া প্রোজেক্টটা কিন্তু আমার মাথা থেইক্যা যায় নাই। আফনে খৈয়াছড়া ফলস দ্যাখলেই বুঝতে পাইরবেন, কত বড় প্রোজেক্ট অইতে পারে।’

কালকেতুভাই এতক্ষণ চুপ করে দু’জনের কথা শুনছিলেন। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘প্রোজেক্টটা কী ম্যাডাম?’

রোজিনা মিষ্টি হেসে বললেন, ‘আপনাকে বলেননি এখনও। পলাশের ড্রিম প্রোজেক্ট। ওদের দেশের খৈয়াছড়া ওয়াটার ফলস-কে উনি নায়গারা বানাতে চান।’

শুনে প্রসন্ন হলেন পলাশভাই। বললেন, ‘আফনে যতই মশকরা করেন না ক্যান ম্যাডাম, আমি করুমই। পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুই ওয়ান্ডার। আমেরিকায় নায়গারা, বাংলাদ্যাশে খৈয়াছড়া। দুইডা নামের মধ্যে কী রিদমিক মিল আছে লক্ষ করসেন?’

পলাশভাইকে উসকে দেওয়ার জন্য কালকেতু জিজ্ঞেস করল, ‘আরে প্রোজেক্টটা কী, সেটা কি আগে ডিটেলে শুনতে পারি?’

‘ক্যান পারবেন না?’ রোজিনার দিকে একবার লজ্জিত মুখে তকিয়ে পলাশভাই বলতে শুরু করলেন, ‘আমাগো চিটাগংয়ে খৈয়াছড়া ঝরণা হইল গিয়া বাংলাদেশের সবথেইক্যা বড়। লোকে ক’য় ঝরণার রানি। পাকিস্তানের আমলে কেউ জানত না মিরসরাই উপজিলায় হ্যায়রকম একডা ঝরণা আসে। পাহাড়, জঙ্গল মিলাইয়া জায়গাডা এমন দুর্গম, কেউ কুনওদিন খোঁজ নিতেও

যায় নাই পানি আইতাসে কুনখান থেইক্যা। দ্যাশ স্বাধীন হওয়ার পর ট্যুরিস্টরাই ডিসকভার করে খৈয়াছড়াতে অত সুন্দর একডা ঝরণা আসে।'

কালকেতু থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ঝরণা আর জলপ্রপাত কি এক হল পলাশভাই? আপনি খৈয়াছড়া ঝরণাকে নায়গারা ফলস বানাবেন কী করে?'

শুনে রোজিনা উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'একজ্যাক্টলি, কালকেতুভাই আপনি ঠিক জায়গাটা ধরেছেন।'

হাত তুলে আমাদের থামিয়ে দিলেন পলাশভাই, 'আগে হোনেন। ভাল কইর‍্যা না হুইন্যা প্রশ্ন তোলেন ক্যান? আমাগো দ্যাশের টপ জিওলজিস্টগো লইয়া আমি বারকয়েক মিটিং করসি। হ্যারা কইসেন, পসিবল। ফ্যাক্ট রিমেন্স, খৈয়াছড়া ফাউন্টেন-এর ওয়াটার সোর্স পাহাড়ের কোনও গুহা। ফ্যাক্ট রিমেন্স, নায়গারার জন্ম হইসিল কোনও গ্লেসিয়ার থেইক্যা। হেই আইস এজ-এ। বর্তমানে হ্যার ওয়াটার সোর্স এরি লেক। নায়গারার মতো পার মিনিট যাইট হাজার গ্যালন পানি ঢালার ক্যাপাসিটি খৈয়াছড়ার নাই। বাট উই ক্যান মেক ইট পসিবল। খৈয়াছড়ার ওয়াটার সোর্স চেঞ্জ কইর‍্যা।'

পলাশভাই বলছেনটা কী? একটু অবাক হয়েই কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে?'

'জিওলজিস্টরা কইসেন, যদি ব্রহ্মপুত্র নদের পানি কোর্স চেঞ্জ কইর‍্যা চিটাগংয়ে আনা যায়, তা ইলে সম্ভব।'

ভূতাত্ত্বিকদের মতো বিশেষজ্ঞ নয় কালকেতু। সাধারণ জ্ঞান থেকে প্রশ্নটা ও করল, 'কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের ওয়াটার লেভেল অত উচুঁতে নিয়ে যাওয়া কী করে সম্ভব?'

'গুড কোয়েশ্চেন।' পলাশভাই বললেন, 'খৈয়াছড়া ঝরণার আইটডা ধাপ আসে। যত নিচে নামসে, পানির ফ্লো তত ওয়াইড হইসে। এইটথ কাসকেড অর্থাৎ কী না, অষ্টম ধাপের হাইট খুব বেশি না। ব্রহ্মপুত্রের পানি সেখানে টানা যাইব। হ, পাঁইচ, ছয় হাজার কোটি ট্যাহার প্রোজেক্ট। হেইডা

সাকসেসফুল করতে হইলে গর্ভমেন্টের গ্রিন সিগন্যাল দরকার। প্রাইম মিনিস্টারের সাথে একবার কথা কইসি। উনি কইসেন হেইডার ব্যাপারে পলিটিক্যাল ডিসিশন নিতে অইব। ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স নষ্ট অইতে পারে কী না, তা নিয়া আলোচনা কইরতে অইব সায়েন্টিস্টগো সাথে। আফনে খোদার উফর খোদগিরি কইরবেন, সবদিক ভাইব্যা চিন্তা কইর‍্যাই তো আগাইতে অইব।'

কালকেতু বলল, 'উনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের দেশে নদীর উপর দেদার বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। পঁচিশ-তিরিশ বছর পর এখন দেখা যাচ্ছে, তার ফল ভাল হয়নি। নেচারের এগেনস্টে যাওয়া একেবারেই ঠিক হয়নি।'

কথার রেশ ধরে রোজিনা বললেন, 'তার থেকেও বড় কথা, এত বড় প্রোজেক্ট নিয়া ফায়দাটা কী হবে? শুধু নাম কামানোর জন্য অর্থ খরচ করার পক্ষপাতী আমি নই। অর্থটা কতদিনে রিটার্ন আসবে, সেটা আগে কষে নেওয়া দরকার। আমি বাবা কর্পোরেট দুনিয়ার লোক। আগে ডলারের হিসেব করে তার পর এগোনোর কথা ভাবি।'

পলাশভাই হার মানার পাত্তর নন। বললেন, 'হ্যায় দ্যাখেন কাইলকেতুভাই, ম্যাডাম কী ক'য়। আমার এত ট্যাহাপয়সা নিয়া করুমডা কী? সেই তো খালি হাতেই যাইতে অইব। খবরের কাগজে দ্যাখেন নাই, ফোর্ড ফ্যামিলির পোলা অহন খোল করতাল লইয়্যা ইসকনে হরি সংকীর্তন করত্যাসে। হ্যাগো তো ডলারের অভাব নাই। তাও ক্যান করত্যাসে? স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য। ম্যাডাম হেইডাই বুঝতে পারতাসেন না।'

রাজিনা বললেন, 'আফনের ট্যাহা, যা ইচ্ছা তাই কইরতে পারেন। কিন্তু বিজনেস অ্যাডভাইসার হিসেবে আমি আফনেরে কইতে পারি, খৈয়াছড়াতে যদি কিছু কইরতেই হয়, তাইলে র‍্যাঞ্চ খোলেন। আফনের মুখে যা হুনছি, তাতে জায়গাটায় র‍্যাঞ্চ অইতে পারে। ঘোড়া পালেন, কাউরে যাতে ঘোড়া কিনতে আরব দ্যাশে যাইতে না হয়। গরু পালেন। বিফ বিক্রি তো অইবই,

মিল্ক প্রোডাক্টও তৈরি কইরতে পারেন। র‍্যাঞ্চে হ্যাচারিও মন্দ অইব না। মাল্টিপল সোর্স অফ ইনকাম অইতে পারে। লাস্ট বাট দ্য লিস্ট, ট্যুরিজম বিজনেসও চালাইতে পারেন। কত লোকের চাকরি অইতে পারে, ভাবসেন কহনও? চলেন, ড্যাডির র‍্যাঞ্চে গেলেই আফনে ট্যার পাইবেন, কী কইতে চাইতাসি।'

পলাশভাই উত্তরে কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ককপিট থেকে ক্যাপ্টেনের গলা, 'আমেরিকান এয়ারলাইন্স আপনাদের ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আর পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা আলবুকার্ক এয়ারপোর্টে নামব। আলবুকার্কের তাপমাত্রা এখন মাইনাস টু। ক্লিয়ার স্কাই, সানি ডে। প্লিজ, আপনারা সিটবেল্ট বেঁধে নিন।'

মিনিট কুড়ি পর লাগেজ নিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে বেরোতেই রোজিনার চোখে পড়ল, মাম্মির গা ঘেঁষে লারেইনা দাঁড়িয়ে। মাই গুডনেস, মেয়েটা আলবুকার্কে চলে এসেছে! কাছে এসে মেয়েটা হাগ করতেই রোজিনা একটু ধমক দেওয়ার সুরেই বললেন, 'তুমি কি জানো, তোমাকে পুলিশ খুঁজছে?'

লারেইনা কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই মাম্মি বললেন, 'ওকে বকাবকি করিস না রোজি। ওর কোনও দোষ নেই। তোরা এখানে আসছিস শুনে আমিই ফোন করে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তোর ঘর পরিষ্কার করে রাখার জন্য। শোনামাত্র ও আলবুকার্ক চলে এসেছে।'

'কিন্তু মাম্মি আমাকে তো ও বলে আসবে। কী চিন্তা হচ্ছিল, কী বলব।'

লারেইনা বলল, 'ম্যাডাম, সিকিউরিটি গার্ড চিরাগ আপনাদের কিছু জানায়নি?'

শুনে রোজিনা বললেন, 'না। আগে বলো, ফোনে তোমায় পাচ্ছিলাম না কেন?'

হিহি করে হেসে ফেলল লারেইনা। বলল, 'শপিং মলে ভিক্টোরিয়া বেকহ্যামের দোকানে লিপস্টিক কিনতে গেছিলাম আমি আর আদেলিনা।

সেল ফোনটা ওখানে হারিয়ে ফেলেছি।'

(ত্রিশ)

পলাশছ্যাররা তিনজন বাইরে কোথাও বেড়াতে গেছেন। হাতে কোনও কাজ নেই। নাস্তা করার পর ইমনের মনে হল, জিহাদিদের উপর লেখা বইটা পড়া শেষ হয়নি। এই সুযোগে পড়ে ফেলা যাক। শেষের মাত্র দশ-বারোটা পৃষ্ঠা বাকি ছিল। জিহাদি আতাতুর্ক শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল কী না, জানার খুব কৌতূহল হল ওর। কাইলকেতুছ্যার মাঝে একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বইটা পড়ে কেমন লাগল। ইমন খুব লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। চার-পাঁচদিন আগে নিয়ে এসেছিল, এর মধ্যে বইটা ওর ফেরত দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইমন লক্ষ করেছে, যখনই ও বইটা নিয়ে বসে, তখনই চিরাগ ওকে উত্যক্ত করে।

ওকে পিস্তল দেখানোর পর চিরাগের উপর থেকে ইমনের সহানুভূতি উবে গেছে। এখন ভাবে, কী ভুলই না ও করেছিল, পাবলিক স্টোরেজ থেকে সেদিন চিরাগকে ডেকে এনে। সেদিনই ওর আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ছেলেটা একেবারে বদলে গেছে। সবসময় চিড়বিড় করে। রোজিনা ম্যাডামের নামে বাজে বাজে কথা বলে। পলাশছারের মতো একজন ভালামানুষকে খুন করার জন্য চিরাগের হাত নিসপিস করে। ইদানীং মাঝে মাঝেই চিরাগ উধাও হয়ে যাচ্ছে ঘণ্টা কয়েকের জন্য। বলেও যায় না, কোথায় যাচ্ছে। বা কার সঙ্গে আজকাল মেলামেশা করছে। তবে, ওর যে নতুন কয়েকজন সঙ্গী হয়েছে, সেটা ইমন টের পায় কখনও ওর কাছে কারও ফোন-টোন এলে।

জিহাদি সম্পর্কিত বইটা ইমন পেজমার্ক দিয়ে পরশু রাতে রেখেছিল বালিশের পাশে। সেটা খুঁজে পেল না। ডিভানের খাঁজে পড়ে গেছে ভেবে, ও উঁকি মারল। না, মেঝেতে কোথাও নেই। বইটা কি চিরাগ তা হলে লুকিয়ে রেখেছে? কথাটা মনে হতেই ওর মাথা গরম হয়ে গেল। বাস্টার্ড ভেবেছেটা কী? সঙ্গে সঙ্গে ও উল্টো দিকে চিরাগের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কম্ফর্টারটা আগোছালো অবস্থায় পড়ে আছে। বিছানার গদীটা তুলে ধরতেই ইমনের চোখে পড়ল, নতুন কয়েকটা সিডি আর জিহাদিদের লিফটলেট লুকোনো রয়েছে। একটা সিডি হাতে নিয়ে ও বুঝতে পারল, একেবারে নতুন। যাতে ক্যালিফেট আলজাওয়াকির সাম্প্রতিকতম ভাষণ রয়েছে। সিডিটা পেল কোথায় চিরাগ? ওর সঙ্গে কি তা হলে রাক্কার ক্যালিফেটের যোগাযোগ হয়েছে? অজানা একটা আতঙ্ক গ্রাস করল ইমনকে।

মাইনাসের নিচে তাপমাত্রা। তবুও ইমন ঘামতে লাগল। এ কী সর্বনাশ ডেকে আনছে চিরাগ? পুলিশ যদি কোনওদিন আউট হাউস সার্চ করতে আসে, তা হলে? এমনিতেই ইমন বুঝতে পারছে, সেইদিনটার খুব বেশি দেরি নেই। সুদীশছ্যারের কথাবার্তায় সেদিন ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আউট হাউস থেকে যদি জিহাদিদের এইসব ডকুমেন্ট পুলিশ উদ্ধার করে, তা হলে তো পলাশছ্যারকেও ওরা ছেড়ে দেবে না। না, না, ছ্যারের মতো ভালামানুষকে এই বিপদে ফেলা মানে গুনাহ। সিডি আর লিফটলেটগুলো চট করে ইমন একটা প্যাকেটে ভরে নিল। সুযোগমতো বাইরে কোথাও ফেলে দেবে। তার পর আউট হাউসের সদর দরজাটা বন্ধ করে এসে, খুঁজতে লাগল, আর কী কী চিরাগ লুকিয়ে রেখেছে।

মাথা ঠান্ডা করার জন্য এসি চালানো দরকার। বোর্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে ইমন একটা সুইচ টিপতেই, পিছন থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনতে পেল। ঘুরে তাকিয়ে দেখে, সিঙ্গল সোফা এবং তার নিচের কার্পেট একদিকে সরে গেছে। পা চালিয়ে কাছে গিয়ে ও দেখল, শোয়ানো একটা কাঠের পাটাতন। হা খোদা, এটাই তা হলে চোরাকুঠুরিতে ঢোকার রাস্তা! কাঠের সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। বহুদিন আগে চিরাগ বলেছিল বটে, আউট হাউসের তলায় চোরাকুঠুরিতে ওকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আর পর আর উচ্চবাচ্য করেনি। চোরাকুঠুরিতে কী আছে, তা দেখার প্রবল ইচ্ছেয়, ইমন সিঁড়ির

দিকে পা বাড়াল। চিরাগ সেদিন বলেছিল, চোরাকুঠুরিতে ও না কি এমন কিছু পেয়েছে, যা প্রমাণ করে পলাশছ্যার ভালামানুষ না।

নিচে নেমে পুরো চোরাকুঠুরি একবার চক্কর দিতে ইমনের সাত-আট মিনিট লেগে গেল। বড় দুটো হলঘর। গুদামও বলা যায়। তাতে পলাশ গারমেন্টস-এর বড় বড় পেটি। সম্ভবত বাংলাদেশ থেকে আনা। একপাশে একটা অফিসঘরের মতো। সেখানে দু'তিনটে ল্যাপটপ রয়েছে। একটা আবার খোলা অবস্থায়। যেন কেউ কাজ করতে করতে উঠে গেছে। সোফা, টেবল, চেয়ার দিয়ে ঘরটা বেশ সুন্দর সাজানো। তার পাশে একটা রেস্টরুমের মতো। কাচের সুইংডোর খুলে ওই ঘরে উঁকি মারতেই ইমন চমকে উঠল। প্রায় নগ্ন একটা যুবতী মেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। তার হাত আর পা বাঁধা। দরজা খোলার আওয়াজ পেতেই মেয়েটা চিৎ হওয়ার পর ইমন দেখল, তার মুখে কাপড় গোঁজা। চোখ-মুখে আতঙ্কের চিহ্ন। দেখেই ওর মনে হল, মেয়েটার উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। মেয়েটা এল কোত্থেকে? তা হলে চিরাগ নিয়ে এসেছে না কি!!

দ্রুত কাছে গিয়ে ইমন আগে ওর মুখের ভেতর থেকে কাপড় বের করে দিল। মেয়েটা অপ্রত্যাশিতভাবে পা ছুড়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'গো অ্যাওয়ে বাস্টার্ড।' একই কথা বারবার বলতে লাগল।

মেয়েটা উঠে বসার চেষ্টা করছে। কাছে গেলে ফের হয়তো হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। আশপাশে তাকিয়ে ইমন দেখল টেবলের উপর একটা পানির বোতল রাখা আছে। তাড়াতাড়ি বোতলটা এগিয়ে দিয়ে ও ইঙ্গিত করল, পানি খাবে? এ বার মেয়েটা প্রতিবাদ করল না। মুখ হাঁ করে পানি খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করল। কয়েক ঢোঁক পানি খাওয়ার পর মেয়েটা হাঁফাতে লাগল। ইমন আরও একধাপ এগিয়ে মেয়েটার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, 'তুমি কে? এখানে কীভাবে এলে?'

হাতে ভর দিয়ে কোনও রকমে বিছানায় উঠে বসে মেয়েটা গুম মেরে গেল। পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে। উরুতে রক্তের ছোপ দেখে ইমন শিউড়ে উঠল। ও ভাবতেই পারছে না, আউট হাউসের তলায় এমন জঘন্য কাজ হতে পারে। চিরাগ একা এই অপরাধটা করেছে, না কি আরও কেউ ওর সঙ্গে ছিল? সম্ভব, ওর পক্ষে সবই সম্ভব। বাইরের লোক ডেকে এনে নারীসম্ভোগ করা। তৌফিককে লুকিয়ে ও একদিন এই ঘরে নিয়ে এসেছিল। চিরাগ সেদিন কথায় কথায় আরও বলেছিল, এই চোরাকুঠুরির অন্য প্রান্তটা পার্কের দিকে। ইমনের জিহাদি ট্রেনিং মাথায় সিগন্যাল দিতে লাগল, আগে সেই প্রান্তটা বন্ধ করে আসা দরকার। চিরাগ যদি কাউকে সঙ্গে নিয়ে, পার্কের দিক থেকে ভিতরে ঢুকে আসে, তা হলে একা ওদের সঙ্গে যুঝতে পারবে না। সিদ্ধান্তটা নিয়ে ও মেয়েটাকে বলল, 'কুল ডাউন প্লিজ। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করতে আসিনি।'

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে ও দরজাটা বন্ধ করে দিল। হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছে। ইচ্ছে করলে মেয়েটা নিজেই পায়ের বাঁধন খুলে ফেলতে পারে। খুলুক, ওর বিশ্বাস অর্জন করার জন্য এটুকু করা দরকার। করিডর দিয়ে হাঁটার সময় ইমন ঠিক করে নিল, উপরে গিয়ে ফ্রিজ থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসবে। মেয়েটাকে দেখে মনে হয়, অভুক্ত। খাবার পেটে পড়লে ও খানিকটা স্বাভাবিক হবে। চোরাকুঠুরির অপর প্রান্তে গিয়ে ইমন দেখল, ভিতর থেকে লক করা আছে। সিঁড়ির পাশেই একটা ঘর। টেবলের উপর থার্মোকলের একাধিক প্লেট ও গ্লাস। মদের একটা বোতল। রেস্তোরাঁ থেকে আনা প্যাকেটে কিছু অভুক্ত খাবার পড়ে আছে। তার মানে ক্রিসমাস ইভ-এ ভাল মেহফিল বসেছিল এখানে। পলাশছ্যারেরা তখন কোথাও ডিনারে গেছিলেন। আর ও একা ঘরে বসে বিটিভিতে সিনেমা দেখছিল।

হঠাৎ টেবলের উপর জিহাদিদের নিয়ে বইটার মলাট ইমনের চোখে পড়ল। পৃষ্ঠাগুলো কুচি কুচি করে ছেঁড়া। মেঝের এককোণে জড়ো করা।

বইটা এখানে এল কী করে? একটু চিন্তা করতেই ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, চিরাগের সঙ্গে কাল রাতে যে বা যারা এই ঘরে ছিল, তারাও জিহাদি। ভোরবেলায় তারা বেরিয়ে গিয়েছে। ধরা পড়বে, সবাই ওরা ধরা পড়বে। ওরা জানে না, ইন্টারপোল অফিসাররা প্রতি মুহূর্তে ওদের উপর নজর রাখছেন। অফিসাররা খবর পেয়ে গেছেন, নিউ জার্সিতে জিহাদিরা আত্মগোপন করে আছে। কথাটা ভাবতে ভাবতেই ইমন দ্রুত পায়ে ফিরে এল উপরের ঘরে। ফ্রিজ থেকে ফ্রুট জু'স-এর প্যাকেট বের করে নিয়ে ফের নিচে নামল। হাতে খুব বেশি সময় নেই। যে কোনও মুহূর্তে চিরাগ আউট হাউসে চলে আসতে পারে। তার আগে মেয়েটাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া দরকার। নিচে

দরজা খুলে ঘরে ঢুকে ইমন দেখল, মেয়েটা বিছানায় নেই। বিছানায় পড়ে থাকা ওর পোশাকও নেই। সম্ভবত ও অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকেছে। ওর অপেক্ষায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ইমন বাথরুমের দরজায় নক করতে লাগল। কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে, দরজা খুলে ও দেখল, মেয়েটা বাথরুমেও নেই। তার মানে ও আসার আগেই মেয়েটা বাইরে বেরিয়ে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। বিছানায় মেয়েটার সেল ফোন পড়ে রয়েছে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ইমন বাইরে বেরিয়ে এল। নিশ্চয়ই কোনও একটা ঘরে আত্মগোপন করেছে। তাই ঘরে ঘরে ঢুকে ও অনুচ্চস্বরে ডাকতে লাগল, 'তুমি কোথায়। বেরিয়ে এসো।'

গুদাম ঘরের ভিতর হঠাৎ ইমনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল, ওর পিছনেই কেউ দাঁড়িয়ে। ক্ষিপ্রগতিতে ও একদিকে সরে যেতেই, ঠং করে একটা শব্দ। লোহার খাঁচায় ঠক্কর খেয়ে একটা রড ছিটকে পড়ল মেঝেতে। লাগলে ওকে আর উঠে দাঁড়াতে হত না। অনুরোধের সুরে ইমন বলল, 'কাম ডাউন প্লিজ। আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। বলো, তুমি কী করে এখানে এলে?'

মেয়েটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ইমন ওকে হালকা হতে দিল। তার পর সাহস করে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'উঠে বোসো। আগে বলো, তুমি কে?'

মেয়েটা উঠে চেয়ারে বসে বলল, 'আমি লায়লা। প্লিজ, তুমি আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে চলো। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তুমি আমাকে কোনও পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে দাও।'

'নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু কে তোমাকে এখানে নিয়ে এল, বলো।'

'মামুন... মামুন আল ফারখ। আমার দেশের বাড়ি ইস্তানবুলে। মামুন আমাদের প্রতিবেশী ছিল।'

নামটা চেনা চেনা মনে হল ইমনের। হ্যাঁ, আজ সকালেই টিভিতে শুনেছে। অ্যাড্রিয়াটিকা রেসিডেন্সিতে মামুন বলে ওই সিরিয়ান জিহাদিকে পুলিশ ধরেছে। তার কাছে একটা হ্যান্ডগান ছিল তখন। পর্দায় দেখাল, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, পুলিশ ওকে গাড়িতে তুলছে। মামুনের মুখটা দেখে ইমন চিনতে পেরেছিল। আরে, এই তো সেই ছেলেটা মোসুল ক্যাম্পে যাকে দেখেছিল। মামুনকে ওর আরও মনে আছে এই কারণে যে, ও ব্ল্যাক হ্যাট ক্র্যাকার। সামান্য একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে, যে কোনও লোকের পার্সোনাল ডিটেলস কয়েক মিনিটের মধ্যে বের করে ফেলতে পারে। ব্যাঙ্ক থেকে হ্যাপিশ করে দিতে পারে লাখ লাখ ডলার। এঁরা হচ্ছে সাইবার ক্রিমিনাল।

মোসুল ক্যাম্পে চিরাগের সঙ্গে তোলাবাজি করতে যেত মামুন। ও এখন নিউ জার্সিতে, এই কথাটা চিরাগ জানায়ওনি। দু'জনের মধ্যে ফের যোগাযোগটা হল কী করে, একটু ভাবতেই ইমনের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। টিভির খবরে যখন নিউজ রিডার বললেন, 'অ্যাড্রিয়াটিকা রেসিডেন্সিতে অনেক ভিআইপি থাকেন। তাঁদের মধ্যে একজন ইউনিসেফের

লিলি গডউইন। মামুন কী উদ্দেশ্যে ওখানে গেছিল, পুলিশ সেটা জানার চেষ্টা করছে।' হায় খোদা, মামুনকে তা হলে এখানে পাঠানো হয়েছে, লিলি গডউইনকে খুন করার জন্য। আর সেই ব্যাপারে সাহায্য করছিল চিরাগ!

লায়লা মেয়েটা ক্রমেই স্বাভাবিক হচ্ছে। এখন চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। ইমন জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে মামুনের সঙ্গে তোমার দেখা হল কী করে?'

'মেট্রো পার্ক স্টেশনে। এখানে আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। ট্রেনে করে নিউ ইয়র্ক ফিরে যাওয়ার জন্য যখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, তখনই মামুনের সঙ্গে দেখা। বলল, ওর সঙ্গে গাড়ি আছে। ও নিউ ইয়র্কেই ফিরে যাবে। কিন্তু, কাছেই ওর এক বন্ধুর বাড়ি। সেখানে মুখ দেখিয়ে ও বেরিয়ে আসবে। এ কথা বলে, মামুনই আমাকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। বুঝতে পারিনি, দু'দিন ধরে আমাকে আটকে রাখবে। আমাকে রেপ করবে।' টানা কথা বলে বোধহয় গলা শুকিয়ে গেছে লায়লার। ফ্রুট জু'সের প্যাকেট থেকে ও খানিকটা জু'স গলায় ঢালল।

মামুনের বন্ধু বলতে লায়লা নিশ্চয়ই চিরাগকে বোঝাচ্ছে। ইমন জিজ্ঞাসা করল, 'মামুনের বন্ধুটি এখন কোথায়, তুমি কি জানো?'

লায়লা বলল, 'মামুন কাল রাতে ফিরে আসেনি। কোথা থেকে একটা ফোন পেয়ে ওর খোঁজে ওর বন্ধু ভোরবেলায় তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। আমি বুঝতে পারিনি, মামুন আইএস জিহাদি। আমার উপর অত্যাচার করার জন্যই, ও আমাকে খুঁজে বের করেছিল।'

'তোমার এ রকম মনে হল কেন?

'আমার হ্যাজব্যান্ড ডেমির্টাস তুরস্কে কুর্দ আন্দোলনের নেতা। এখানে এসে বুঝতে পারলাম, ইস্তানবুলে মামুনরা ওদের রাইভাল। ডেমির্টাস এখন দেশে পুলিশ কাস্টোডিতে আছে। ও ইচ্ছে করেই জেলে ঢুকে গেছে। না হলে মামুনরা ওকে মেরে ফেলত। আইএস-এর সেই রাগটা এখন এসে পড়েছে

আমার উপর। আমি পুলিশকে সব বলতে চাই। প্লিজ, তুমি আমাকে নিয়ে চলো।'

'এখানে...মানে নিউ ইয়র্কে কি তুমি একা থাকো?'

'হ্যাঁ। আমার দুই ছেলে। ওরা ডালাসের এক হোস্টেলে থাকে। আমি নিউ ইয়র্কের একটা পার্লারে হেয়ার কাটারের কাজ করি। ওই পার্লারে সেলিব্রিটিরা চুল কাটেন।'

'তাঁদের মধ্যে কেউ তোমাকে চেনেন?'

'আছেন একজন। ইউনিসেফের মিস লিলি গডউইন। আমাকে উনি মেয়ের মতো দেখেন। আমার ছেলে দুটোকে উনি ওঁর হোস্টেলেই ঠাঁই দিয়েছেন। উনি মানুষ নন, আমার কাছে দেবী।'

লিলি গডউইনের নামটা শুনে ইমন চমকে উঠল। ওঁর জীবনে এই ভদ্রমহিলার নামটা বারবার ঘুরে ফিরে আসছে। লায়লা ভদ্রমহিলাকে নিশ্চয়ই রেপের কথা জানাবে। উনি প্রভাব খাটালে পুলিশ এক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে নিউ জার্সির এই বাড়িতে। নাহ্, যত দ্রুত সম্ভব, চিরাগকে ধরিয়ে দেওয়া দরকার। তেমন হলে ও কাইলকেতুছ্যারের সাহায্য নেবে। দ্রুত সিদ্ধান্তটা নিয়ে ইমন বলল, 'তোমাকে আমি নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেব লায়লা। যদি তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখো।'

শুনে নিষ্পাপ চোখে তাকিয়ে রইল লায়লা। একটু ইতস্তত করে ইমন বলল, 'এই বাড়ির ল্যান্ডলর্ড যিনি, তিনি অত্যন্ত সজ্জন মানুষ। উনি জানেনই না, এ বাড়িতে জিহাদিরা লুকিয়ে আছে। ইন ফ্যাক্ট উনি এখন বাড়িতেও নেই। ক্রিসমাসের ছুটিতে কোথাও বেড়াতে গেছেন। আমি এ বাড়িতে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করি। তুমি যদি পুলিশে কমপ্লেন করো, তা হলে প্লিজ এই বাড়িটার কথা উল্লেখ কোরো না।'

লায়লা বলল, 'তুমি কি মনে করো, আমি না বললে পুলিশ খুঁজে বের করতে পারবে না?'

খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো করে ইমন বলল, ‘তোমাকে আমি একজনের ছবি দিয়ে দিচ্ছি। তার নাম চিরাগ। ইন্টারপোল তার কথা জানে এবং তাকে খুঁজে বেরাচ্ছে। প্লিজ, পুলিশকে তুমি আমার কথা বোলো না। ফর নাথিং ওরা আমাকে হ্যারাস করবে। আমি নিজেও পুলিশ স্টেশনে ঢুকব না। কাছাকাছি তোমাকে নামিয়ে দিয়েই নিউ জার্সিতে ফিরে আসব।’

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল লায়লা। খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে ইমন বলল, ‘চলো। আমরা বেরিয়ে পড়ি।’

চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে লায়লার মাথা টলে গেল। তলপেট ধরে ও ফের বসে পড়ল। ইমনের বুঝতে অসুবিধে হল না, কোথাও ওর যন্ত্রণা হচ্ছে। দ্বিধা না করে ও পাঁজকোলা করে তুলে নিল লায়লাকে। তার পর সযত্নে ওকে উপরে তুলে এনে বলল, ‘এ বার কি তুমি হেঁটে গিয়ে গাড়িতে বসতে পারবে? বাইরে দেখবে একটা সিডান দাঁড়িয়ে আছে।’

দেওয়াল ধরে ধরে অতি কষ্টে লায়লা ঘরের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পর, সুইচ টিপে সোফাটাকে ফের যথাস্থানে বসিয়ে দিল ইমন। তার পর ঘরের চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে, রাইটিং প্যাড টেনে নিয়ে লিখল, ‘চিরাগ, আমি ক্রিসমাসের নেমতন্ন খেতে রোহিতের বাড়িতে যাচ্ছি। আমার জন্য ওয়েট করিস না। লাঞ্চ করে নিস। কখন ফিরব বলতে পারছি না।’

(একত্রিশ)

একটা র‍্যাঞ্চ যে এত বিশাল জায়গা নিয়ে হতে পারে, কালকেতু ভাবতেই পারেনি। কী নেই তাতে? পাহাড়, নদী, ঝরণা, জঙ্গল. সমতলভূমি... সব আছে। মেন এন্ট্রান্স থেকে রোজিনা ম্যাডামদের রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং পর্যন্ত পৌঁছতেই ওদের প্রায় আধ ঘণ্টা লেগে গেল। জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে আলবুকার্ক আসার ফ্লাইট ধরার জন্য বাড়ি থেকে ওরা ভোর পাঁচটায় রওনা হয়েছিল। সাড়ে পাঁচঘণ্টার প্লেন জার্নি। আলবুকার্ক এয়ারপোর্টে যখন প্লেন নামল, তখন বেলা পৌনে বারোটা। লারেইনা আর ওর মায়ের গাড়িতে

মালপত্তর তুলে দেওয়া হল। রোজিনা ম্যাডাম, পলাশভাইয়ের সঙ্গে ও র‍্যাঞ্চে পৌঁছল বেলা একটার সময়। মূল গেটের পাশে বড় করে লেখা, রোজি র‍্যাঞ্চ।

গাঢ় নীল আকাশ, ঝকঝকে রোদ্দুর। নিউ ইয়র্কের ওই শীতল আবহাওয়া থেকে নিউ মেক্সিকোতে এসে সবাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। শীতের পোশাকও খুলে ফেলেছেন। আলবুকার্কে এই মুহূর্তে অতটা ঠাণ্ডা নেই। র‍্যাঞ্চের ভিতর দিয়ে গাড়িতে যাওয়ার সময়ই কালকেতুর চোখে পড়ল, আকাশে রঙিন দশ-বারোটা বেলুন উড়ছে। কাছাকাছি যেতেই রোজিনা ম্যাডাম বললেন, 'ওগুলো হট এয়ার বেলুন। অনেক শৌখিন মানুষ আছেন, যাঁরা বেলুনে চড়ে সান রাইজ দেখতে চান। উপর থেকে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারও পরিষ্কার দেখা যায়। ওই দেখুন, বেলুনে ট্যুরিস্টরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পলাশভাই ট্যুরিস্টদের দেখার চেষ্টা করলেন। বেলুনগুলো খুব বেশি উচ্চতায় ভেসে যাচ্ছে না। খুশি গলায় পলাশভাই বললেন, 'সত্যি, আমেরিকানগো মতোন ইনোভেটিভ জাইত আর নাই। বিজনেস কী কইর‍্যা কইরতে হয়, হ্যাগো কাসে শিইখতে অইব। ম্যাডাম, বেলুন রাইডে আফনেরা কত কইর‍্যা চার্জ করেন?'

রোজিনা বললেন, 'সানরাইজ দেখার জন্য পার আওয়ার মিনিমাম ফাইভ হান্ড্রেড ডলার তো অইবই। অহন ঠিক কত হইসে, কইতে পারুম না। দুপুর বেলায় কিসু কম। ভয় নাই, আফনে আমার গেস্ট। আফনেরে কিছু দিতে অইব না।'

ম্যাডামের গলায় ঠাট্টার সুর। কালকেতু আরও উসকে দিয়ে বলল, 'পলাশভাই, চিটাগাংয়ের খৈয়াছড়ায় আপনি যদি র‍্যাঞ্চ করেন, তা হলে হট এয়ার বেলুনের একটা রাইড রাখবেন। আমাদের ইন্ডিয়ায় অনেকে শখ করে বেলুন রাইড করেন। আপনাদের দেশে আছে কি না জানি না।'

পলাশভাই বললেন, ‘প্রোফেশনালি হয় বইল্যা, আমি তো কহনও হুনি নাই। কালীপূজার দিন আমাগো ওহানে ফানুষ উড়ানোর চল আছে। আমাগো আমোদপুরে আমি নিজেও ফানুষ বানাইসি। অহন বাংলাদ্যাশের মার্কেট চাইনিজ ফানুষে ভর্তি হইয়্যা গেসে। আমি যদি বেলুন রাইড অ্যারেঞ্জ করি, তাইলে বাংলাদ্যাশে ফার্স্ট টাইম অইব। সান রাইজ রাইড... সমুন্দরের তলা থেইক্যা সূর্য উইঠ্যা আইতাসে, ভাবেন তো কী ফ্যান্টাস্টিক দৃশ্য অইব! ঠিক আসে কাইলকেতুভাই, আফনের রিকোয়েস্টটা আমার মনে থাইকব।’

রোজিনা ম্যাডাম ফুট কাটলেন, ‘গাসে কাঁঠাল, গুঁফে ত্যাল।’

পলাশভাই বললেন, ‘মশকরা কইরেন না ম্যাডাম। আমার ম্যাটারনাল গ্র্যান্ডফাদার কী কইতেন জানেন, জগতে অসম্ভব বইল্যা কিসু নাই। সাহস কইর‍্যা আগাইতে অইব। হ্যার নাম রণদাপ্রসাদ সাহা। ইস্ট পাকিস্তানে হ্যার মতোন রিচ তহন আর কেউ সিল না। ম্যাটারনাল গ্র্যান্ডফাদারের অ্যাডভাইস আমি সবসময় মাথায় রাখি।’

লম্বা কংক্রিটের রাস্তা এদিক ওদিক চলে গিয়েছে। র‍্যাঞ্চের কোন অঞ্চলে কী, বোর্ডে নির্দেশ দেওয়া আছ। কোথাও রুক্ষ প্রান্তর, মানুষজন নেই। কোথাও নদীর সাদা বালিয়াড়িতে অশ্বারোহীরা ঘোড়া ছোটাচ্ছেন। কাউবয়রা অনেককে হর্স রাইডিং শেখাচ্ছেন। কাউবয়দের মাথায় হ্যাট, পরনে একশো বছর আগেকার পোশাক। গাড়ি দেখে কাউবয়রা টুপি খুলে অভিবাদন জানাল। নদীর অপর প্রান্তে ঘোড়া আর বাইসনের দল আপন মনে চড়ে বেরানোর সময় ঘাস খাচ্ছে। একটা জায়গায় নেটিভদের বসতি চোখে পড়ল কালকেতুর। বোর্ডে লেখা, ‘হুয়ালাপাই ভিলেজ।’ গ্রামে ছোট ছোট কুটির, আলপনা দিয়ে সাজানো। খেতি জমিতে নেটিভরা চাষ করছে। তাদের বাড়ির সামনে কোথাও অদ্ভুত দেখতে মূর্তি দাঁড় করানো। কালকেতু বলেই ফেলল, ‘নেটিভদের বসতিটাও কি র‍্যাঞ্চের ভিতর?’

রোজিনা ম্যাডাম বললেন, 'হ্যাঁ, আজকাল ইকো ট্যুরিজম অনেক লোক পছন্দ করেন। অনেক ট্যুরিস্ট নেটিভদের সঙ্গে থাকা, ওদের খাওয়া-দাওয়ার স্বাদ পেতে চান। ওদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতেও ইচ্ছুক। সেই কারণে নেটিভদের এনে রাখা হয়েছে।'

'বাঃ'। পলাশভাই বলে উঠলেন, 'খৈয়াছড়ায় আমরাও তাইলে চাকমাগো আইন্যা রাইখতে পারি।'

পলাশভাইয়ের কথা শুনে কালকেতু মজা পাচ্ছে। উনি কিন্তু খৈয়াছড়া প্রোজেক্টের কথা ভোলেননি। ঠাট্টা ইয়ার্কির মাঝে গাড়ি এসে দাঁড়াল প্রাসাদের মতো একটা বাড়ির সামনে। উল্টোদিকে পার্কিং স্পেসে অন্তত শ'খানেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নীল উর্দি পরা সিকিউরিটি গার্ড। সদর দরজার ডানদিকে বিরাট এরিয়া জুড়ে ক্যাসিনো। বহু লোক বসে সেখানে খেলছেন। বাঁ দিকে রিসেপশনে লারেইনা আর ওর মা দাঁড়িয়ে আছে। ওদের পাশেই অপূর্ব সুন্দরী এক মাঝবয়সি মহিলা। পরনে জামদানি শাড়ি। দেখেই কালকেতু বুঝতে পারল, ইনি রোজিনার মা। কাছে এসে রোজিনা ম্যাডামকে জড়িয়ে ধরে উনি বললেন, 'কতদিন পর তরে দ্যাখলাম মা।'

পলাশভাইয়ের পাশে কালকেতু দাঁড়িয়ে। ভদ্রমহিলার মুখ দেখেই কালকেতু বুঝতে পারল, উনি আন্দাজ করতে পারছেন না, রোজিনা ম্যাডামের বয়ফ্রেন্ড কে? সন্দেহ নিরসন করার জন্য ও মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে বলল, 'আন্টি, আমি কালকেতু। পলাশভাইয়ের গেস্ট।'

রোজিনা ম্যাডাম মিটিমিটি হাসছেন। পলাশভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহেন, আমি পরিচয় করাইয়া দিই। হ্যায় আমার মাম্মি... হেমলতা। আর মাম্মি, হ্যায় পলাশ।'

পলাশভাইও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'কী আইশ্চর্য, আমার মায়ের নাম আশালতা। কী মিল দ্যাখছেন।'

হেমলতা হেসে বললেন, 'তহনকার দিনে আববা-আম্মুরা তো হ্যায় নামই রাখত। তা বাবা, তোমার বাসা ঢাকার কোথায়? আমি নারাণগঞ্জের মাইয়া।'

'আমি অহন থাকি ধানমণ্ডীতে। কিন্তু আমাগো দ্যাশের বাড়ি আমোদপুরে।'

রসভঙ্গ করলেন রোজিনা ম্যাডাম। তাড়া দিলেন, 'হ্যার ঠিকুজি পরে নিও মাম্মি। আমার মারাত্মক ঘুম পাইসে। লাঞ্চ কইর‍্যা একটু রেস্ট নিমু।' কথাগুলো বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না। লিফটের দিকে এগোলেন।

লারেইনার সঙ্গে পাঁচতলায় গেস্ট রুমে ঢুকে কালকেতুর চোখে বিস্ময় ঠিকরে বেরোল। এ তো কোনও ফাইভ স্টার হোটেলের কামরা। রোজিনা ম্যাডাম এত ধনী পরিবারের মেয়ে, সে সম্পর্কে ওর কোনও ধারণা ছিল না। সত্যি কপাল করে এসেছেন পলাশভাই। এমন একজন শিক্ষিত, তুখোড় বুদ্ধিসম্পন্ন, সুন্দরী মহিলাকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে পাবেন। জানালা দিয়ে বাইরে দিকে তাকিয়ে ও দেখল, একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। তার উপর বেশ কয়েকটা ইয়ট ভেসে বেরাচ্ছে। বিলাসের সব রকম উপকরণই র‍্যাঞ্চে মজুত। না এলে কালকেতু অনেক কিছু মিস করত।

লারেইনা তখনও ঘর ছেড়ে যায়নি। কালকেতু ওকে জিজ্ঞেস করল, 'র‍্যাঞ্চ যে এত লাক্সারিয়াস হয়, সে সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না।'

লারেইনা হেসে বলল, 'আলবুকার্কে এ রকম আরও পাঁচ-ছ'টা র‍্যাঞ্চ আছে। কিন্তু আমাদের রোজি র‍্যাঞ্চটাই সবথেকে বড়। মালিক মেক্সিকান বলে মেক্সিকো আর সাউথ আমেরিকা থেকে প্রচুর ট্যুরিস্ট আসেন। বিশেষ করে, কলম্বিয়া আর ভেনিজুয়েলা থেকে। বেশিরভাগই ড্রাগ ডিলার। হাতে প্রচুর ডলার। এখানে উড়িয়ে যান। এখন ক্রিসমাস উইক বলে কোনও রুম খালি নেই। কেমন লাগছে আমাদের র‍্যাঞ্চ?'

কালকেতু মনের কথাটাই বলল, 'দারুণ।'

‘সূর্য ডুবুক, তার পর দেখবেন অচেনা জগতে ঢুকে পড়েছেন। কত রকমের প্রোগ্রাম। কোথাও বেলি ড্যান্সের ফ্লোর, কোথাও গানের পোডিয়াম। ম্যাজিক দেখতে চান, সেখানে হাজির থাকতে পারেন। এখানে একটা ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। ছাদহীন বাসে করে ঘোস্ট জোনে ঘোরানোর। মাইল দশেক দূরে পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে একটা জায়গায় সত্যিই নানা রকম ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটে। খুব রোমাঞ্চকর সেই জার্নি। তিন-চারশো বছর আগে, হোয়াইটরা যখন এই অঞ্চলগুলো দখল করছিল, তখন নেটিভদের সঙ্গে ওদের লড়াই হয়েছিল। প্রচুর নেটিভ তাতে মারা যান। তাদেরই আত্মারা এখনও ওই অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। সাহস করে যাবেন না কি সেখানে? চলুন ঘুরে আসি।’

মজা করে কালকেতু বলল, ‘আমি গেলে পলাশস্যারের সঙ্গে যাব। দেখি, উনি রাজি হন কি না?’

শুনে লারেইনা হিহি করে হাসতে লাগল। তার পর বলল, ‘থাক, আপনাকে যেতে হবে না। রোজিনা ম্যাডাম তা হলে আমাকে আস্ত রাখবেন না। তার চেয়ে বরং চট করে তৈরি হয়ে নিন। বেলা দেড়টার সময় লাঞ্চ। ডাইনিং হলটা এই ফ্লোরেই।’

লারেইনা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ওয়াশরুমে ঢুকে কালকেতু ফের একবার চমকাল। একদিকে দেওয়াল জুড়ে কাচের আয়না। সেখানে ছোট পর্দার টিভি চলছে। ওয়াশরুমের দরজা বন্ধ করলে আপনা থেকেই টিভি চালু হয়ে যাচ্ছে। দরজা খুললে টিভি বন্ধ। প্রযুক্তির এমন চমৎকারিত্ব কালকেতু আগে কখনও দেখেনি। টিভির পর্দার দিকে কয়েক সেকেন্ড ও হাঁ করে তাকিয়ে রইল। এমন বিলাসবহুল র‍্যাঞ্চে সাধারণ মানুষরা তো আসেন না। তাঁদের কাছে স্নানের সময়টাতেও বিজনেস নিউজ গুরুত্বপূর্ণ। বাথটাবে শুয়েও যাতে টিভির পর্দায় তাঁরা চোখ রাখতে পারেন, তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

গরম জলে স্নান করার সময় ও নিউজ রিডারের গলা পেল। ‘গতকাল নিউ ইয়র্কের অ্যাড্রিয়াটিকা রেসিডেন্সি থেকে যে সিরিয়ান জঙ্গিকে পুলিশ ধরেছিল, সেই মামুন আল ফারখ কবুল করেছে, ক্রিসমাস ইভ-এ সে হত্যার উদ্দেশ্যেই ওই কমপ্লেক্সে ঢুকেছিল। তার টার্গেট ছিলেন চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট মিস লিলি গডউইন এবং তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে আমন্ত্রিত এক ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট কালকেতু ন্যান্ডি। উল্লেখ্য, আইএস টেররিস্টরা এর আগেও একবার ওই দু’জনকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। এফবিআই আন্দাজ করছে, কিছুদিন আগে রোহিঙ্গা মুসলিমদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার কারণেই মিস লিলি এবং মি. ন্যান্ডির নাম হিট লিস্টে।’

স্নান করা মাথায় উঠল কালকেতুর। টেররিস্টরা তা হলে এখনও ওদের পিছু ছাড়েনি। একটা প্রশ্ন ওকে ভাবিয়ে তুলল। টেররিস্টরা জানল কী করে, ও মিস গডউইনের বাড়িতে নেমতন্ন খেতে যাবে? খবরটা ওদের দিলই বা কে? চিরাগ, না ইমন? কাল রাতে রোজিনা ম্যাডাম নিজে ড্রাইভ করে অ্যাড্রিয়াটিকা রেসিডেন্সিতে ওদের নিয়ে গেছিলেন। চিরাগ বা ইমনের সেটা জানার কথা নয়। হ্যালোইনের দিন ভূতের কস্টিউম পরে ইমন গেছিল। আর কাল রাতে স্যান্টা ক্লজ সেজে মামুন। তা হলে কি সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে আছে! মিস গডউইনের কাছাকাছি এমন কেউ রয়েছে, যার সঙ্গে জিহাদিদের যোগাযোগ আছে? র‍্যাঞ্চে কয়েকটা দিন সুন্দর কাটবে, মনে হচ্ছিল। কিন্তু খবরটা শোনার পর এখন ওর মারাত্মক টেনশন হচ্ছে।

ঘরে ফিরে পোশাক বদলানোর ফাঁকে কালকেতু ঠিক করে নিল, ব্যাপারটা হালকাভাবে আর নেওয়া যাবে না। এখুনি একবার সুদীশের সঙ্গে কথা বলা দরকার। সুদীশ লিঁওতে ফিরে গেছে কি না, ও জানে না। মাঝে দু’দিন ওর সঙ্গে ফোনেও কথা হয়নি। সেল ফোনটা হাতে তুলে নিয়ে কালকেতু ধরল সুদীশকে। জিজ্ঞেস করল, ‘টিভির খবরটা কি তুই শুনেছিস?’

উত্তর না দিয়ে সুদীশ পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'তুই এখন কোথায়?'

'আলবুকার্কে। রোজিনা ম্যাডামদের র‍্যাঞ্চে বেড়াতে এসেছি। পলাশভাইও আমাদের সঙ্গে আছেন।'

'টিভির খবরটা ঠিক। এফবিআই জিহাদি মামুনকে পিটিয়ে, ওর মুখ থেকে সব বের করে নিয়েছে।'

'চিরাগ বা ইমন... কেউ ইনভলভড?'

'ইমন নয়, ফর সিওর। একটা খবর শুনলে তুই চমকে যাবি। নিউ জার্সির কোনও একটা বাড়ির বেসমেন্টে... আমার ধারণা পলাশভাইয়ের আউট হাউসে... মামুন আর চিরাগ একটা কুর্দ মেয়েকে তুলে নিয়ে আটকে রেখেছিল। তাকে দু'দিন ধরে রেপ করেছে। বাড়িরই একজন তাকে উদ্ধার করে নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশের কাছে পৌঁছে দেয়। মনে হয়, সে ইমন। কুর্দ মেয়েটা মামুন সম্পর্কে কমপ্লেন করেছিল। পুলিশ বুঝতে পেরে ওকে মামুনের ছবি দেখালে, মেয়েটা আইডেন্টিফাই করে। তবে, চিরাগ কিন্তু এখনও পালিয়ে বেরাচ্ছে।'

'অনেক আগেই তোদের উচিত ছিল, ওকে অ্যারেস্ট করা।'

'ভুল ধারণা। ওকে ছেড়ে না রাখলে, মামুনকে আমরা ধরতে পারতাম না। যাক গে, পলাশভাইকে তুই এখন কিছু জানাস না। আমি আজই হয়তো ওর বাড়িতে গিয়ে ইমনকে ইন্টারোগেট করব। আউট হাউস সার্চও করতে পারি। আর হ্যাঁ, দু'চারটে দিন তোদের নিউ জার্সিতে ফেরার কোনও দরকার নেই। মানে বলতে চাইছি, চিরাগ আমাদের হাতে ধরা পড়া না পর্যন্ত তোরা আলবুকার্কে থাকলে ভাল হয়।'

'কেন? ফের অ্যাটেম্পট হতে পারে না কি?'

'এই জিহাদিগুলো টার্গেট খতম না হওয়া পর্যন্ত হাল ছাড়ে না। একের পর এক লোক লাগিয়েই যায়। তবে, কদ্দিন পারবে, জানি না। প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস ছাড়নেওয়ালা মানুষ নন। ইন্টেলিজেন্স মারফৎ উনি সিওর হয়ে

গেছেন, জিহাদিদের দম ফুরিয়ে এসেছে। সিরিয়ায় গিয়ে কাল উনি আমেরিকান সোলজারদের একটা ট্রুপ তুলে নিলেন। জিহাদিরা নির্মূল হতে যাচ্ছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

মিনিট দুয়েক পর ডাইনিং হলে পৌছে কালকেতু টের পেল, ভাল খিদে পেয়েছে। প্লেনে বেলা ন'টার সময় একটা স্যান্ডউইচ, খানিকটা ফ্রুট স্যালাড আর এক কাপ কফি খেয়েছিল। র‍্যাঞ্চে ঢোকার পর বৈভব দেখে ও ভুলেই গেছিল, দীর্ঘসময় পেটে কিছু পড়েনি। ডাইনিং হলে ব্যুফের ব্যবস্থা করা আছে। অন্তত, তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ধরনের খাবার সাজানো। হলের একদিকে একটা পোডিয়াম। তাতে প্রায় সমবয়সী দু'জন ভদ্রলোক বসে আছেন। পনেরো-ষোলোজন অভ্যাগত চেয়ারে বসে। একটা ফাঁকা চেয়ারে কালকেতু বসে পড়ল।

তখনই মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে রোজিনা ম্যাডাম পোডিয়ামে উঠে বলতে শুরু করলেন, 'সবাইকে মেরি ক্রিসমাস। মঞ্চে যে দু'জন বসে আছেন, তাঁদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ডানদিকে যিনি বসে আছেন, তিনি আমার ড্যাডি রায়ান দেল বস্কে। এই ল্যাঞ্চের তিনিই হোস্ট। তাঁর পাশে যিনি বসে, তিনি বিশ্ববিখ্যাত ফোটোগ্রাফার রিচার্ড গাটম্যান। আজ তাঁর সম্মানেই লাঞ্চ। এঁরা দুই বাল্যবন্ধু। একটা সময় দু'জনে একই খবরের কাগজ... নিউ ইয়র্ক টাইমসে চাকরি করতেন। প্রায় এক দশক পর ওঁরা আজ মিলিত হয়েছেন। বন্ধুত্বের গোল্ডেন জুবিলি সেলিব্রেট করার জন্য।'

রিচার্ড গাটম্যান!! নামটা শুনে কালকেতুর মনে হল, নিয়তির কী আশ্চর্য পরিহাস। যাঁকে ও খুঁজে বেরাচ্ছে, তাঁর সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে এই র‍্যাঞ্চে দেখা হয়ে যাবে, ও ভাবতেই পারেনি! ভদ্রলোকের দিকে ও অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মাথায় ঝুঁটি বাঁধা চুল সাদা হয়ে গেছে। গালে খোঁচা দাঁড়ি। চশমার ফাঁকে উজ্জ্বল দুটি চোখ। চওড়া কাঁধ। উচ্চতা ছয় ফুটের বেশি। শরীরে এতটুকু মেদ নেই। পরনে খুব অল্প দামের হুডি। তাতেও ওর

আভিজাত্য কমেনি। তাঁর পাশে থ্রি পিস স্যুটে রায়ান দেল বস্কেকে অনেক বেশি কর্পোরেট মনে হচ্ছে। অগ্রজ দুই সাংবাদিককে দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এল কালকেতুর। লাঞ্চের কথা ও ভুলে গেল। ওর মন বলল, এঁদের কারোর কাছ শিউলিদিদির খোঁজ ও পাবেই। রোজিনা ম্যাডামকে কালকেতু ধন্যবাদ জানাল, ওকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে আসার জন্য।'

(বত্রিশ)

পলাশ আর রোজিনাকে বেশ ভাল লেগেছে লিলি গডউইনের। এমন একটা কাপল যদি তাঁর চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনে থাকত, তা হলে তিনি সোনা ফলিয়ে দিতেন। গত পরশু ক্রিসমাস ইভ ডিনারের পর ভাল করে আলাপ হল পলাশদের সঙ্গে। প্লেনোতে ওরা চাইল্ড ডিটেনশন সেন্টার খুলতে চায়, কালকেতু নন্দীর মুখে এ কথা শোনার পর তিনি এমনিতেই একটু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। পরে গল্প করার সময় বুঝতে পারলেন, শুধু লাভ করার উদ্দেশ্যে পলাশ সেন্টার খুলতে চাইছে না। এর পিছনে ওর সমাজসেবা করার ইচ্ছেটাও আছে।

নিকট পরিজনেরা যে যাঁর বাড়িতে ফিরে গেছে। টানা তিন-চারটে দিন বাচ্চাগুলো হুটোপাটি করে অ্যাপার্টমেন্ট আনন্দে ভরিয়ে রেখেছিল। ওরা চলে যেতেই লিলি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ফাউন্ডেশনের চ্যারিটি শো নিয়ে। হাতে আর বেশি সময় নেই। লাস ভেগাসে যেখানে শো হবে, সেই জায়গাটা দেখতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছে অ্যান্ডি। এ ব্যাপারে বাম কিমের সঙ্গে কথা বলেছিলেন লিলি। ঠিক হয়েছে, এ বার নিউ ইয়ারস ইভ ওই ভেনিসিয়ান হোটেলেই কাটাবেন ওঁরা। শো-র অর্ধেক দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে অ্যান্ডি। রোজই আজকাল একবার করে ফোন করে। ওর ভালবাসার উত্তাপটা নতুন করে টের পাচ্ছেন লিলি।

সেদিন কথায় কথায় পলাশের ফিয়াসেঁ রোজিনা একটা দারুণ সাজেশান দিল। 'ম্যাম, যাদের জন্য আপনার এই চ্যারিটি শো, তারা বঞ্চিত হবে

কেন? আপনার ফাউন্ডেশনে যেখানে যত বাচ্চা আছে, তাদের সববাইকে লাস ভেগাসে নিয়ে চলুন। ওদের জন্য শো। শুধু হলিউডের স্টাররা নন, শো-য়ের গ্র্যাঞ্জার ওরাও দেখুক। সারা জীবনের জন্য একটা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। ওদের দিয়ে যদি কোনও পারফরম্যান্স করানো যায়, নাচ বা গান যা-ই হোক না কেন, তা হলে তো কথাই নেই।'

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দশটা চাইল্ড কেয়ার সেন্টার আছে ফাউন্ডেশনের। ভিয়েতনাম থেকে গুয়াতেমালা পর্যন্ত। কমপক্ষে হাজার পাঁচেক বাচ্চা তো হবেই। যুদ্ধপীড়িত দেশের অনাথ ছেলে-মেয়ে। লেখাপড়ার সঙ্গে ওদের নাচ-গানও শেখানো হয়। যারা স্পোর্টসে আগ্রহী, তাদের সেদিকে ঠেলে দেওয়া হয়। কিন্তু বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ওদের লাস ভেগাসে নিয়ে যাওয়া কম ঝক্কির না কি! আইডিয়াটা অবশ্য রোজিনা মন্দ দেয়নি। একই মঞ্চে এশিয়ান, আফ্রিকান, বলকান, সেন্ট্রাল আমেরিকান বাচ্চারা বিশ্ব শান্তির গান গাইছে, সেটা একটা অভিনব দৃশ্য হবে। পলাশ খুব জোর দিয়ে সেদিন বলেছিল, 'ম্যাম, বাচ্চাগুলার জইন্য যা খরচ অইব, সব আমার। আফনে সিরিয়াসলি ভাবেন। আমি চাই, ইয়েমেনের বাচ্চারাও আফনের শো-তে আসুক। দ্যাশটার অবস্থা আফনের মুখে যা হুনলাম, হুইন্যা ইস্তক আমার প্রাণ কাঁদতাসে।'

এইসব কথা হওয়ার আগে কালকেতু বলেছিল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পলাশের এক দিদি না কি নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁর খোঁজ করার জন্য ও আমেরিকায় এসেছে। এই সেন্টিমেন্ট থেকেই যুদ্ধের কারণে অনাথ হওয়া বাচ্চাদের জন্য পলাশ কিছু করতে চান। মেক্সিকান বাচ্চাদের ডিটেনশন সেন্টার খোলার ব্যাপারে তাই উৎসাহী। ভাল কথা। কিন্তু সত্যি বলতে কী, লিলি একটু অবাকই হয়েছিলেন, প্রায় অর্ধ শতাধী আগে হারিয়ে যাওয়া এক মেয়েকে খুঁজে বের করার জন্য কালকেতু এ দেশে এসেছে শুনে। মেয়েটা

এখন পঞ্চাশোর্ধ। তার চেহারাও অনেক বদলে গিয়েছে। এতদিন পর তাকে খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব?

আবার অসম্ভব বলাটাও ঠিক না। বিশেষ করে, এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের যুগে। তাঁর চাইল্ড কেয়ার ইউনিটেই এই রকম পুনর্মিলনের ঘটনা কিন্তু ঘটেছে। পাঁচ বছর আগে সিরিয়ার এক শহর কাবোনে থেকে কয়েকটা অনাথ বাচ্চাকে ইউনিসেফ শিবির থেকে তুলে এনেছিলেন তিনি। জিহাদি আর সরকারি পক্ষের লড়াইয়ের জন্য শহরটা তখন একেবারে ধ্বংসস্তুপে পরিণত। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কুর্দরাই। বাচ্চাগুলো কেউ অসুস্থ, অভুক্ত, কেউ আহত। পরিবারের লোকজনের কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না। ডালাসে ওদের নিয়ে আসার জন্য গেছিলেন বাম কিন। ফিরে এসে পরে উনি পরামর্শ দেন, পরিবারের লোকজন যুদ্ধে মারা গেছে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। কেউ কেউ হয়তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। অথবা জিহাদিদের ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন। বাচ্চাগুলোর ছবি সোশ্যাল নেট ওয়ার্কিং সাইটে দিয়ে রাখা যাক। হয়তো কখনও পরিবারের কারোর চোখে পড়ে যাবে।

কুর্দ বাচ্চাগুলোর মধ্যে একটা ফুটফুটে মেয়েকে লিলি ভোলেননি। বয়স আট বছর, নাম রাশা। ডালাসে যখন ওকে নিয়ে আসা হয়, তখন ওর পিঠে দগদগে ঘা। আগুনে পুড়ে যাওয়ার জন্য। ওর ওই অবস্থা দেখে লিলির নিজের ছোটবেলাকার কথা মনে পড়েছিল। নিউ ইয়র্ক থেকে ড্যাডিকে ডালাসে নিয়ে গিয়ে তিনি রাশার চিকিৎসা করান। মাস ছয়েকের মধ্যে মেয়েটা সুস্থ হয়ে ওঠে। তার পরই ওর প্রতিভা ইউনিটের সবার চোখে পড়ে। রাশা সুন্দর গান গাইত। লিলি মাঝে মধ্যেই ওর খোঁজ নিতেন। বছর তিনেক এ ভাবে কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ ওর বাবা-মায়ের খোঁজ পাওয়া যায়। ততদিনে আমেরিকান সৈন্যরা কাবোনে শহর জিহাদিদের হাত থেকে

মুক্ত করে দিয়েছে। কুর্দরা শহরে ফিরে গিয়েছেন। সোশ্যাল নেট ওয়ার্কে মেয়ের ছবি দেখে, ওঁরাই ডালাসে এসে রাশাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

তার পর থেকে প্রতি বছর রাশাকে ক্রিসমাসের গিফট পাঠান লিলি। এ বারও মেয়েটা কার্ডের সঙ্গে একটা গানের সিডি পাঠিয়েছে। ওর জীবনের প্রথম অ্যালবাম। এখনও ওর গান শোনার সময় পাননি লিলি। চ্যারিটি শো-তে রাশাকে দিয়ে গান গাওয়ানোও যেতে পারে। ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা পেয়েছে বলে মেয়েটা এখন পুরোপুরি সুস্থ। মেয়েটাকে নিয়ে ভাবার সময় লিলির মনে হল, ইস, ছোটবেলায় ভুল স্কিন গ্র্যাফটিংয়ের জন্য এখনও তাঁকে ভুগতে হচ্ছে। চিকিৎসাটা ঠিকঠাক হলে তাঁর জীবন অন্য খাতে বইত। অ্যান্ডির স্ত্রী হিসেবে হয়তো বাকি জীবন তিনি লাস ভেগাসে কাটাতেন।

লিভিং রুমের দেওয়ালে প্রেসিডেন্ট নিকি অ্যাডামসের সঙ্গে তাঁর একটা ছবি ঝোলানো আছে। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তিনি অ্যাওয়ার্ড নিচ্ছেন। সেদিকে তাকিয়ে লিলি মৃদু হাসলেন। অ্যান্ডির স্ত্রী হিসেবে কি তিনি এই সম্মানটা পেতেন? মনে হয়, না। শুধু প্রেসিডেন্ট অ্যাডামসই নন, বিশ্বের বহু রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে তাঁর ছবি আছে। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে কৃষ্ণাঙ্গ বাচ্চাদের জন্য একটা চ্যারিটি শো-তে ম্যান্ডেলা এসেছিলেন। এলসা আন্টি মাঝে মাঝেই বলতেন, 'জীবনে যা পেয়েছ, তা খুব কম মহিলার ভাগ্যে জোটে। অনাথ বাচ্চাদের মুখে তুমি হাসি ফুটিয়েছ। এর থেকে বড় পাওনা আর কী হতে পারে? সবসময় তোমার জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ বরাদ্দ থাকবে।'

লিলির ফাউন্ডেশনের দফতরে আরও একটা প্রিয় ছবি টাঙানো আছে। হাতে অসংখ্য সাদা বেলুন নিয়ে বাচ্চাদের মাঝে হাসিমুখে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। পঞ্চাশ-ষাটটা ছোট ছোট হাত সেই বেলুনগুলো ছোয়ার চেষ্টা করছে। তাদের চোখ-মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি দেখে লিলি এখনও নতুন

করে উৎসাহ পান। ছবিটা তোলা ম্যাডিসন স্কোয়্যার গার্ডেন্সে। ফাউন্ডেশনের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। ওই অসাধারণ মুহূর্তের ছবিটা লিলিকে উপহার দিয়েছিলেন নামী ফোটোগ্রাফার রিচার্ড গাটম্যান। সেদিনের অনুষ্ঠানে রিচার্ড প্রধান অতিথি ছিলেন। দফতরে মাঝে মধ্যেই কোনও না কোনও ডোনার আসেন। হাঁ করে তাঁরা তাকিয়ে থাকেন ওই ছবিটার দিকে।

ছবির প্রতিটি বাচ্চার সম্পর্কে ডোসিয়ার আছে। ল্যাপটপ খুলে এক মিনিটেই লিলি বলে দিতে পারবেন, কাকে কবে কোত্থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। চাইল্ড কেয়ার ইউনিটে কার কতটা অগ্রগতি হল, সেই হিসেবটাও তাঁরা রাখেন। তাঁর ফাউন্ডেশনের বয়স প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেল। প্রথম দিকে যে শিশুদের তিনি তুলে এনেছিলেন, তারা অনেকেই এখন সমাজের মূলস্রোতে ঢুকে পড়েছে। কেউ কেউ ফাউন্ডেশনের হয়েও কাজ করছে। এই কয়েকদিন আগে ইউএস আর্মির পোশাকে একটা ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ছেলেটাকে প্রথমে তিনি চিনতে পারেননি। কিন্তু ও যখন বলল, ফাউন্ডেশনের প্রথম ব্যাচের ছেলে, তখন আনন্দে মনটা ভরে উঠেছিল লিলির। সঙ্গে সঙ্গে ডোসিয়ার বের করে জানতে পেরেছিলেন, অনাথ মার্কিন ছেলেটার নাম বিল কার্টার। ওর বাবা ইরাকের যুদ্ধে মারা গেছিলেন। লিলির আরও ভাল লেগেছিল জেনে, বিল সদ্য আর্মিতে ঢুকেছে। ওর প্রথম মাসের বেতন ডোনেট করতে এসেছে ফাউন্ডেশনে।

ঢং ঢং ঢং... গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক জানাল, বেলা ন'টা বাজে। হঠাৎ লিলির খেয়াল হল, সিকিউরিটি স্টাফরা কেউ পৌঁছয়নি। স্টাফদের মধ্যে চিফ স্ট্যানলি গর্ডন খুব বিশ্বস্ত। খবর না দিয়ে আগে কোনওদিন গরহাজির হয়নি। ইদানীং স্ট্যানলির মধ্যে খানিকটা ঢিলেমি লক্ষ করছেন লিলি। বিশেষ করে, নায়গারায় শ্যুট আউটের ঘটনার পর থেকে। হয় স্ট্যানলি কোথাও বেশি ডলারের চাকরির অফার পেয়েছে। মুখে সেটা বলতে লজ্জা পাচ্ছে। নয়তো নিজেই সিকিউরিটি এজেন্সি খুলে বসতে চায়। মুশকিল হচ্ছে, ইউনিসেফ

থেকে লিলিকে বলে দেওয়া হয়েছে, সিকিউরিটি ছাড়া উনি যেন বাইরে কোথাও যাতায়াত না করেন।

বাম কিমকে ফোন করার কথা লিলি ভাবছেন, এমন সময় সিকিউরিটি সিস্টেমের পর্দায় লায়লার মুখ। গেটের বাইরে থেকে কাঁদো কাঁদো মুখে ও বলল, 'ম্যাডাম, কয়েক মিনিটের জন্য আপনার কাছে আসতে পারি?'

লায়লার শুকনো মুখটা দেখে লিলির মনে কুডাক দিল। তা হলে কি ইস্তানবুলে ডেমির্টাসের খারাপ কিছু হল? অ্যাড্রিয়াটিকা রেসিডেন্সিতে ও কখনও আসেনি। নিশ্চয়ই জরুরি দরকার। সুইচ টিপে সদর দরজার গেটটা তিনি খুলে দিলেন। কয়েক মিনিট পর লায়লা ভিতরে এসে দাঁড়াতেই, ওর দিকে তাকিয়ে লিলি চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ওকে সোফা বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথেকে এলে?'

উত্তর না দিয়ে লায়লা মুখ দু'হাত দিয়ে ঢেকে কাঁদতে শুরু করল। লিলি বললেন, 'ইস্তানবুল থেকে কি কোনও খারাপ খবর পেয়েছ?'

লায়লা বলল, 'না, ডেমির্টাস ঠিক আছে। কিন্তু আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমাকে টেররিস্টরা তুলে নিয়ে গেছিল। কোনও রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লায়লা গুছিয়ে সব বলে ফেলল। পুলিশ যে ওকে মেডিক্যাল চেক আপের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেছিল, সে কথাও অকপটে বলল। একটা রাত্তির ও হাসপাতালে কাটিয়েছে। ভয় না পেয়ে ও পুলিশে কমপ্লেন করেছে শুনে লিলি মনে মনে তারিফ করলেন। পৃথিবীটা কী জঘন্য সব লোকে ভর্তি হয়ে গেছে। হাজার হাজার মাইল দূরে দুটো দলের মধ্যে তথাকথিত ধর্মযুদ্ধ চলছে। আর তার রেশ এসে পড়ছে আমেরিকার মতো একটা সুসভ্য দেশে। পুরো ঘটনাটা শুনে একটু খটকাও লাগল লিলির। তাঁর কাছের আরেকটা মানুষ জিহাদিদের টার্গেট হল। এটা কি জিহাদিরা প্ল্যানিং করেই করছে? লিলির একবার মনেও হল, লায়লা সবকিছু খুলে বলল না।

জিহাদিরা কোথায় ওকে আটকে রেখেছিল? কে ওকে বেসমেন্ট থেকে বের করে নিয়ে এসে পুলিশের কাছে পৌঁছে দিল? বেশ কয়েক বছর ধরে ও নিউ ইয়র্কে আছে। জায়গাটা চিনবে না, এমনটা হতে পারে না।

লায়লাকে লিলি বললেন, 'গেস্ট রুম গিয়ে তুমি রেস্ট নাও। ফ্রিজে খাবার আছে। গরম করে খেয়ে নিও। আমি ততক্ষণে জরুরি কয়েকটা কাজ সেরে নিই।'

লিভিং রুমে ফিরে লিলি হট লাইনে ধরলেন বাম কিমকে। 'কী ব্যাপার বলুন তো? স্ট্যানলি আর ওর কলিগরা কেউ কিন্তু এখনও আসেনি কেন?'

ওদিক থেকে বাম কিম বললেন, 'ম্যাডাম, জরুরি একটা দরকারে আমি আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। ভালই হল, ফোনটা আপনি করলেন। স্ট্যানলি আমায় কিছু বলে যায়নি। তবে, আমার সিকিউরিটির একজনের মুখে শুনলাম, ও না কি হঠাৎ মিচিগানে গেছে।'

'মিচিগানে কেন? ওর ফ্যামিলি ওখানে থাকে না কি?'

'না ম্যাডাম, ফ্যামিলি বলতে এখন ওর কিছু নেই। বউয়ের সঙ্গে রিসেন্টলি ওর ব্রেক আপ হয়ে গেছে। ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে ওর বউ পেনসিলভেনিয়ায় চলে গেছে। মিচিগানে স্ট্যানলির কোনও রিলেটিভ থাকে কি না, বলতে পারব না।'

'কতদিনের জন্য গেছে, বলেছে কিছু?'

'আমার সিকিউরিটি বলছিল, ইদানীং ও না কি অনেক বদলে গেছে। মনে হয়, সিকিউরিটি এজেন্সিতে ও আর কাজ করবে না। আপনি কিন্তু আর্মড সিকিউরিটি ছাড়া অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে বেরোবেন না ম্যাডাম। আমি এজেন্সিতে কথা বলে দেখছি, ও অ্যাবসেন্ট কেন? অন্য কাউকে পাঠাতে বলছি।'

'আপনি আমাকে ফোন করতে চাইছিলেন কেন?'

'ম্যাডাম, ফোনে কথাগুলো বলাটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না।'

‘আমাকে অযথা টেনশনে ফেলবেন না মি. কিম।’

‘ম্যাডাম মনে হচ্ছে, আমাদের সফটওয়ার সিস্টেম হ্যাকড হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সব ডেটা পাচার হয়ে যাচ্ছে। অ্যাকাউন্টসে নানা গরমিল দেখা যাচ্ছে। ক্রিসমাস ইভ-এর ছুটিতে কেউ এই কুকর্মটা করেছে।’

লিলি একটু উচ্চকিত স্বরে বললেন, ‘সে কী! কী করে হল?’

‘চ্যারিটি নেভিগেটর থেকে একজন হাই প্রোফাইল অফিসিয়াল প্রথমে আমাকে অ্যালার্ট করেন। শোনার পরই কাল রাত থেকে আমি ফাউন্ডেশনের অফিসে রয়েছি। জিমি রাইটস বলে আমার পরিচিত একজন এথিক্যাল হ্যাকারকে আমি সিস্টেমে বসিয়ে দিয়েছি। জিমি আমার খুব বিশ্বস্ত। গত দশ ঘণ্টা ধরে সে চেষ্টা করে যাচ্ছে, কোথা থেকে হ্যাকিং হয়েছে, সেটা খুঁজে বের করার। প্রাইমারিলি জিমি বলল, এর সঙ্গে জিহাদিদের লিঙ্ক খুঁজে পাচ্ছে। এবং সেটা হয়েছে নিউ জার্সির কোথাও থেকে।’

‘হ্যাকার কতটা ক্ষতি করেছে মি. কিম?’

‘জিমি বলল, খুব সামান্যই। ফাউন্ডেশনের টয় ডিভিশনের অ্যাকাউন্ট থেকে ক্র্যাকার হাফ মিলিয়ন ডলার ট্রান্সফার করেছে মরিশাসের এক ফাইনান্সিয়াল কোম্পানিতে। মনে হয়, ক্র্যাকার টোকা মেরে আমাদের রিঅ্যাকশন দেখতে চাইছিল। জিমি আরও বলল, হ্যাকিং অসমাপ্ত রেখে ক্র্যাকার অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত। আপনি যদি অনুমতি দেন ম্যাডাম, তা হলে আমি জন মিকেলের সঙ্গে যোগাযোগ করব। এফবিআইয়ের সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট খুব শক্তিশালী।’

শুনে সোফায় বসে পড়লেন লিলি। হ্যাকিং আধুনিক সভ্যতার এক অভিশাপ। একটা মানুষ বা প্রতিষ্ঠানকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে হ্যাকিং দানব। তাঁকে খুন করতে না পেরে জিহাদিরা তাঁর ফাউন্ডেশনেকে শেষ করে দিতে চায় না কি! যত বাচ্চা চাইল্ড ইউনিটগুলোতে থাকে তাদের খেলনা তৈরি করার জন্য ফাউন্ডেশনের একটা ডিভিশন আছে। মার্কেটে বিক্রিও হয়

এবং খেলনাগুলোর ভাল চাহিদা আছে। ফাউন্ডেশনের ভাল একটা রোজগার। সেখানকার হিসেবে গণ্ডগোল থাকলে চ্যারিটি নেভিগেটরের শংসাপত্র তিনি পাবেন না। ডোনাররাও ভবিষ্যতে পিছিয়ে যেতে পারেন। নাহ, লিলি তা হতে দেবেন না। নিরাপত্তা নিয়ে সব সাবধানবাণী তিনি ভুলে গেলেন। নিজেকে নিয়ে কোনওদিনই তিনি ভাবেননি। সবসময় লিলি অগ্রাধিকার দিয়েছেন তাঁর প্রতিষ্ঠানকে। লায়লা যে তাঁর আশ্রয়ে এসে উঠেছে, সে কথাও তাঁর মনে রইল না। বাম কিমকে তিনি বললেন, 'আমি এখুনি আসছি।'

(তেত্রিশ)

নিউ ইয়র্ক থেকে নিউ জার্সিতে ফেরার পথে ইমন একবার ওয়ালমার্টে গাড়ি পার্ক করল। বেলা দুটো বাজে। কিছু খাবার কিনে নেওয়া দরকার। পলাশছ্যারেরা কবে ফিরবেন, তা জানা নেই। নিজেদের উদরপূর্তির ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। পার্কিং স্পেস থেকে হেঁটে ওয়ালমার্টের ভিতর ঢোকার সময় ও রোহিতকে দেখতে পেল। ট্রলি ঠেলে এগোচ্ছে। পিছন থেকে ও ডাকল, 'এই রোহিত, রোহিত।'

যেন শুনতে পায়নি, এমন ভাব করে রোহিত এগিয়ে যেতে লাগল। দ্রুত পা চালিয়ে কাছে গিয়ে ইমন বলল, 'এ্যাই হালা, ডাকতাসি, হুনোস না ক্যান?'

আগের দিন দেখা হওয়ার পর রোহিতের চোখ-মুখে উচ্ছ্বাস লক্ষ করেছিল ইমন। আজ শুকনো মুখে বলল, 'শুনব না কেন? তোর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভয় হচ্ছে ইমন। প্লিজ, তুই যা।'

শুনে ইমনের মনে হল, কেউ ওকে শুকনো জমিতে আছাড় মেরেছে। আহত গলায় ও বলে উঠল, 'কী কইতাস তুই? কী হইসে খুইল্যা আমায় ক' ভাই।'

এ দিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে রোহিত বলল, 'সেদিন তোর সঙ্গে দেখা হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ এসে হাজির হয়েছিল আমার বাসায়। তোর ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করছিল। পুলিশ বলল, তুই না কি জিহাদি হয়ে গেছিস!'

চিরাগের মতো স্মার্ট হয়ে গেল ইমন। বলল, 'আইশ্চর্য! তর সাথে দেখা হওয়ার পর পুলিশ তো আমারও কাসে আইসিল। তর সম্পক্কে আমারে একই কথা জিগাইল। এক কাম কর, আমি জিহাদি কি না, আমার অফিসে খোঁজ নিয়ে দ্যাখ। তাইলেই ট্যার পাবি।'

'কেন মিথ্যে কথা বলছিস ইমন? তোর অফিসে খোঁজ করেছিলাম। টয়োটা কোম্পানি থেকে বলল, তোর নামে ওদের কোনও এমপ্লয়ি নেই। প্লাস, এই ওয়ালমার্টের সিসিটিভির ফুটেজ পুলিশ আমায় দেখিয়েছে। তুই আর আমি যখন রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছিলাম, সেইসময়কার ছবি। পুলিশ তোকেই খুঁজছে। ইসস, আমি ভাবতেই পারছি না, আমার কলেজের একজন টপার, সে জিহাদি হয়ে মানুষ খুন করে বেরাচ্ছে। মাসি এ কথা জানতে পারলে হয়তো মরেই যাবে। মাসি-মেসোর জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।'

ইমন বলল, 'তর কোথাও ভুল হইতাসে। চল, তর সাথে আমি পুলিশের কাসে যাম।'

রোহিত পাত্তাই দিল না কথাটার, 'থাক ভাই। বউ-বাচ্চা নিয়ে সংসার করি। অনেক কষ্টে একটা চাকরি জোগাড় করেছি। তোর জন্য সব ভেসে যাক, আমি চাই না। প্লিজ, তুই যা। দেখা হলে আর কখনও আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করিস না।'

কথাটা বলেই ট্রলি ঠেলে সবজির দোকানগুলোর দিকে হাঁটা দিল রোহিত। সেদিকে তাকিয়ে ইমনের মাথা নিঁচু হয়ে গেল। কেনাকাটা করার ইচ্ছেটাই ওর উবে গেল। ওর আসল পরিচয় রোহিত জেনে গেছে। খবরটা আমোদপুরে পৌঁছতে সময় নেবে না। আম্মি খুব ধর্মভীরু টাইপের।

দাদামশয়ের ফাঁসির পর বিরাট একটা শক পেয়েছে। ওর সম্পর্কে খবরটা মৃত্যুশেল হয়ে যাবে আম্মির কাছে। কেনাকাটার ইচ্ছেই উবে গেল। পার্কিং স্পেসে ফিরে আসার সময় ওর লায়লার কথা মনে হল। ইমন জানে না, পুলিশের কাছে জবানবন্দি দেওয়ার সময় লায়লা কতটা রেখে ঢেকে বলেছে। পুলিশ খুঁচিয়ে ওর পেট থেকে কথা বের করে নেবেই। আর তখন চিরাগের খোঁজ করতে এসে পুলিশ ওকেও ছাড়বে না।

কাম হোয়াট মে। ভাবতে ভাবতে একটা ঘোরের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে ইমন পলাশছ্যারের বাসায় এসে পৌঁছল। চিরাগ ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে কি না, ও নিশ্চিত নয়। একটু পরেই ওর মনে পড়ল, গেটের রিমোট কন্ট্রোল তো ওর কাছে। চিরাগ বাসায় ঢুকতেই পারবে না। গাড়ি গ্যারেজ করে ও আউট হাউসে ঢুকে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ইস, পলাশছ্যারেরা বাসায় ফিরে যখন চিরাগের কুকর্মের কথা জানতে পারবেন, তখন এক মিনিটও দেরি করবেন না, দু'জনকেই বের করে দিতে। রোজিনা ম্যাডামের যা মেজাজ, তাতে পুলিশ ডেকে ধরিয়েও দিতে পারেন। পরক্ষণেই একটা কথা ভেবে ইমনের গা হিম হয়ে গেল। বাসার বাইরে থাকলেও তো বাসার ভিতর কোথায় কী হচ্ছে, পলাশছ্যার তা জেনে যান। এমন অ্যাপস না কি ওঁর ঘড়ির সঙ্গে ফিট করা আছে। আগের বার চিরাগকে অপদস্থ করেছিলেন, লুকিয়ে বাসার ভিতর ঢোকার জন্য। এ বারও কি ওঁরা জেনে গেছেন, আউট হাউসে কী ঘটেছে?

বিছানায় শুয়ে থাকার সময় হঠাৎ ইমনের মনে পড়ল, চিরাগের বিছানার তলা থেকে উদ্ধার করা ক্যালিফের ভাষণ দেওয়া সিডি আর কিছু জিহাদি লিফলেট গাড়ির ভিতর পড়ে রয়েছে। বাইরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসার জন্য ও সেগুলো নিয়ে গেছিল। কিন্তু রোহিতের কথাবার্তা শুনে এত আপসেট হয়ে পড়ে, ভুলেই গিয়েছে সিডিগুলোর কথা। দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে ইমন ঘরের ভিতর তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল, আরও আপত্তিকর কিছু

পাওয়া যায় কি না? ডিপ ফ্রিজ খুলে ও দেখতে পেল, পিস্তলটা লুকোনো রয়েছে। হাতে নিয়ে চেম্বার খুলে ও দেখল, ছটা গুলিই আছে। সঙ্গে সঙ্গে ও পিস্তলটা পকেটে পুরে নিল। চিরাগ কি নিচে চোরাকুঠুরিতেও কোনও অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে? হয়তো সকালে চোখে পড়েনি। তবুও, যাচাই করার জন্য, ইমন ফের সুইচ টিপে সোফা সরাল।

চোরাকুঠুরির অফিস ঘরে ঢুকে দুটো ল্যাপটপের দিকে তাকাতেই ইমন বুঝতে পারল, একটা কেউ ব্যবহার করছিল। উঠে যাওয়ার আগে বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছে। তা হলে কি মামুন? কারও সিস্টেমে হ্যাকিং করছিল না কি? কার সর্বনাশ করছিল? কৌঁতূহল হতেই ওর আঙুলগুলো সচল হয়ে উঠল। উইন্ডোস কম্পিউটার নিয়ে কাজ করতে ও স্বচ্ছন্দ। কয়েক মিনিট ঘাঁটাঘাটি করার পর ইমন বুঝতে পারল, মামুন হ্যাকিং করার জন্য ওয়ারশার্ক সফটওয়ার ব্যবহার করেছে। কর্পোরেট তথ্য চুরি করে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিকে সেই তথ্য বেচে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সফটওয়ার কাজে লাগে। ল্যাপটপের পাশে একটা পেনড্রাইভ পড়ে আছে। সেটাকে ল্যাপটপে ঢুকিয়ে খানিকক্ষণ পরই ইমন পর্দায় দেখতে পেল প্রতিষ্ঠানের নাম। চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশন টয় ডিভিশন। আরে, এটা তো সেই ম্যাডামের অর্গানাইজেশন, যাঁকে চিরাগ খুন করতে গেছিল নায়গারায়। কী যেন নাম? লিলি গডউইন। ছিঃ, জিহাদিরা এত নিচে নাইম্যা গ্যাসে! বাচ্চা পোলাপানগো ভালা-র জন্য একডা অর্গানাইজেশন, হ্যার ট্যাহাও চুরি করত্যাসে?

ভদ্রমহিলার সঙ্গে কালকেতুছ্যারের ভাল পরিচয় আছে। ছ্যারকে জানিয়ে দিলে লিলি গডউইন বড় ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাবেন। পেন ড্রাইভে টয় ডিভিশনের সব ডেটা তুলে নিয়েছে মামুন। বিশেষ করে মার্কেটিং আর সেলস-এর সব তথ্য। অন্য যে কোনও খেলনা কোম্পানির হাতে দিলে তারা লুফে নেবে। ক্রিসমাস ইভ-এর রাতে অপারেশনের জন্য বেরোনোর মুখে

মামুন পেন ড্রাইভটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। ভেবেছিল, ফিরে এসে নিশ্চিন্তে বাকি সব ডেটা বের করে নেবে। ইমন গাল দিল, 'চুইতমারানির পোলা, ভাবসিলি পার পাইয়া যাবি। আরে, তর বাপ এহানে বইস্যা আসে। যা গরমিল করছস, এহানে বইস্যাই আমি ঠিক কইর‍্যা দিমু।'

অতীতে ঢাকায় বহুবার বহুলোকের সাহায্যে এসেছে ইমন। খচ্চর প্রোগ্রামারদের শায়েস্তা করার জন্যও অনেকে ওকে নিয়ে যেতেন। বিশেষ করে, কর্পোরেট জগতের লোকজন। প্রোগ্রামারদের উপর নজরদারির কাজটা ওকে দিয়ে বিনে পয়সায় করিয়ে নিতেন। দু'একবার বাংলাদেশ রাইফেলসকেও ইমন সাহায্য করেছে। একটা লিঙ্ক ধরিয়ে দিয়ে ওরা জানতে চেয়েছিল, হ্যাক করে বলে দিতে হবে, দু'দেশের মধ্যে কী কী অস্ত্র কেনা-বেচা হয়েছে। দেশের সুরক্ষার প্রশ্ন। ইমন কাজটা করে দিয়েছিল। নিজেকে অপার ক্ষমতার অধিকারী বলে ওর মনে হয়েছিল। সারা বিশ্ব যেন হাতের মুঠোয়। কিন্তু পরে বিডিআর-এর আরেকটা কাজ করতে গিয়ে ও টের পায়, রাশিয়ান লিঙ্ক হ্যাক করা দুঃসাধ্য। সফটওয়ার টেকনোলজিটাকে ওরা এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। দাদামশায়কে পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে দেশ সম্পর্কে ইমনের বিতৃষ্ণা এসে যায়। পরে আর কখনও বিডিআরের অনুরোধ শোনেনি।

অপরাধের জন্য যারা এই দুষ্কর্মগুলো করে, তাদের হ্যাকিং কালচারে বলা হয়, ক্র্যাকার বা ব্ল্যাক হ্যাটস। আর যারা নিজেদের মুনাফার কথা না ভেবে কাজটা করে, তাদের বলা হয় হোয়াইট হ্যাটস। ব্ল্যাক আর হোয়াইট হ্যাটসের মাঝে আরেক ধরনের হ্যাকার আছে। তারা গ্রে হ্যাটস। এরা মজা করার জন্য কারও সিস্টেমে ঢোকে। কিন্তু পরে ব্ল্যাক হ্যাটসদের দলে ভিড়ে যায়। জিহাদি ক্যাম্পে ব্ল্যাক হ্যাটসদের কাজটাই করত মামুন। হালায়, অহন পুলিশ কাস্টোডিতে। ইমন আফসোস করল, হায় রে, কালকেতুছ্যারের বন্ধু

সুদীশছ্যারের ফোন নাম্বারটা যদি ওর কাছে থাকত, তা হলে চিরাগ আর মামুনের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারত।

কম্পিউটারে বসে ঘণ্টা দুয়েক ধরে চুরি মেরামতির কাজটা করার পর ইমন যখন উপরে উঠে এল, তখন ওর মারাত্মক খিদে পেয়েছে। চোরাকুঠুরির দরজাটা বন্ধ করে ও প্রথমেই টিভি চালিয়ে দিল। তার পর ফ্রিজ থেকে ম্যাকডি-র দুটো ভেজ বার্গার বের করে চিবোতে লাগল। আমেরিকান টিভিতে আজকাল রোজই প্রেসিডেন্ট নিকি অ্যাডামসের সমালোচনার বন্যা। কেউ ওঁকে বলছেন জোকার, কেউ লায়ার বলতেও ছাড়ছেন না। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের বনিবনা হচ্ছে না। ভদ্রলোক মেক্সিকান বর্ডারে ইস্পাতের দেওয়াল তুলবেনই। অনুপ্রবেশকারীদের আটকানোর জন্য। অন্যদিকে, ডেমোক্রাটরা জিদ ধরেছেন কিছুতেই সেই অর্থ বরাদ্দ করবেন না। কংগ্রেসে ডেমোক্রাটদের সংখ্যা বেশি। প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস হুমকি দিচ্ছেন, দেওয়াল তোলার অর্থ না দিলে কমপ্লিট শাট ডাউন করে দেবেন। এর মানে, সরকারি কর্মীরা বেতন পাবেন না। এতে বিরাট জনবিক্ষোভের মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে। তবুও, তিনি পিছু হটবেন না।

বার্গার চিবানোর সময় ইমন ভাবতে লাগল, প্রেসিডেন্ট অ্যাডামসকেও কি জিহাদি বলা যায়? আইএস সমর্থকরা ধর্মযুদ্ধে নেমে জিহাদ ঘোষণা করেছে। নির্বোধের মতো শিয়া আর সুন্নিরা নিজেদের মধ্যে কোন্দল করে যাচ্ছে। আর সেই সুযোগে বিধর্মীরা একটা দলকে সমর্থন করার নাম করে, ক্রমশ নির্মূল করে দিচ্ছে মুসলিমদের। এ যেন সেই ঈশপের গল্পের মতো। রুটি ভাগ করা নিয়ে দুই বানরের ঝগড়া। মধ্যস্ততায় নেমে পুরো রুটিটাই উদরস্থ করে ফেলল নেকড়ে। প্রেসিডেন্ট অ্যাডামসও তো নেকড়ের ভূমিকাটা নিয়েছেন। মাঝখান থেকে অস্ত্র কেনার বায়না পেয়ে যাচ্ছেন জিহাদি আক্রান্ত দেশগুলো থেকে। ধর্মীয় কারণে মামুনদের যদি জিহাদি বলা হয়, তা হলে প্রেসিডেন্ট অ্যাডামকেও জিহাদি বলা হবে না কেন? ওঁর জিহাদ রাজনৈতিক কারণে।

মেক্সিকান জাতিটাকে উনি বিচ্ছিন্ন করে দিতে চান। উনিও তো একই অপরাধ করে যাচ্ছেন। তা হলে নেকড়ের ভূমিকটা ওকে পালন করতে দেওয়া হবে কেন?

প্রতি দশ মিনিট অন্তর টিভি চ্যানেলে পশ্চিম এশিয়ায় আইএস-এর কার্যকলাপ নিয়ে খবর থাকে। এবং সবটাই আমেরিকানদের কৃতিত্ব নিয়ে। আর আমেরিকান মাটিতে কোনও জিহাদি ধরা পড়লে তো কথাই নেই। একটা খবর শুনে ইমন নড়েচড়ে বসল। মিচিগানের এক মসজিদে তিনজন ক্রিশ্চান ধর্ম বদলে মুসলিম হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন প্রাক্তন সেনা। একজন কোনও সিকিউরিটি এজেন্সিতে চাকরি করতেন। আর তৃতীয়জন কার্পেন্টার। পুলিশের ধারণা, জিহাদি হওয়ার তাগিদে এই তিনজন ধর্ম বদলেছে। পুলিশ এদের উপর নজর রাখছে। শুনে ইমন একটু অবাকই হল। আমেরিকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা নগণ্য। এক শতাংশের সামান্য বেশি। উল্টে, মুসলিমরাই গ্রিন কার্ড পাওয়ার আশায় ক্রিশ্চান হয়ে যাচ্ছে। সেখানে কোন দুর্বুদ্ধিতে লোকগুলো ধর্মান্তরিত হচ্ছে?

টিভি দেখার সময়ই লনে ধুপ করে একটা আওয়াজ শুনতে পেল ইমন। বব ক্যাটের উৎপাত ভেবে অতটা গুরুত্ব দিল না ও। বব ক্যাট সাইজে বেশ বড়। পিছনের জঙ্গল থেকে প্রায়ই খাবারের লোভে বাসায় ঢুকে পড়ে। একদিন সন্ধেয় লন পেরিয়ে আউট হাউসে আসার সময় বব ক্যাটের জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দেখে ও ভয় পেয়ে গেছিল। বার্গার খাওয়া শেষ করে ইমন প্যাকেটটা বিনস-এ ফেলতে যাবে, এমন সময় দেখে, দরজায় চিরাগ দাঁড়িয়ে। তার মানে পাঁচিল টপকে ও-ই ভিতরে ঢুকে এসেছে। চোখাচোখি হতে চিরাগ জিজ্ঞাসা করল, 'রোহিতের বাসা থেকে কখন এলি ইমন?'

তার মানে, রোহিত আরও একবার আউট হাউসে এসেছিল। এবং ওর জন্য লিখে রাখা চিরকুট দেখেছে। চিরাগের মুখে ক্রুর হাসি। দেখে ইমনের

ভাল লাগল না। সঙ্গে সঙ্গে ও স্থির করে নিল, যা হওয়ার আজই চূড়ান্ত কিছু হয়ে যাক। তবুও, মাথা ঠান্ডা রেখে ও বলল, 'ঘণ্টাখানেক আগে।'

চিরাগ বলল, 'তোকে নেমতন্ন করেছিল। রোহিত কিছু খেতে দেয়নি বুঝি?'

হাতে ধরা ম্যাকডি-র প্যাকেট বিনস-এ ফেলে এসে ইমন খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'হ্যার বাসায় গেসিলাম। কিন্তু ঢুইকতে পারি নাই। দূর থেইক্যা দেখি, রোহিতের বাসার সামনে সিটি পুলিশের গাড়ি দাঁড়াইয়া আসে। দেইখ্যা আমি পলাইয়া আইসি। তুই গেসিলি কোথায়?'

ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে শুয়ে পড়ল চিরাগ। প্রশ্নটার কোনও উত্তর দিল না। পুলিশের ভয় দেখানো সত্ত্বেও ওর মুখের রেখায় কোনও বদল নেই। এমন ডেসপারেট হয়ে গেছে। ইমন সতর্ক হয়ে ওর দিকে লক্ষ রাখতে লাগল। আগেরবার আউট হাউসে ফিরে নিশ্চয়ই চিরাগ একবার চোরাকুঠুরিতে গেছে। লায়লাকে দেখতে না পেয়ে ও কতটা ক্ষিপ্ত, সেটা ইমন আন্দাজ করতে পারছে। সন্দেহটা ওর উপরই পড়া স্বাভাবিক। ও ঠিক করে রাখল, চিরাগ যতক্ষণ না নিজে থেকে লায়লার কথা তুলবে, ততক্ষণ ও উচ্চবাচ্য করবে না।

চিরাগ বিছানায় উঠে বসে বলল, 'কমান্ডার রববানি নিউ জার্সিতে এসেছে। তার সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম। সন্ধেবেলায় ওকে এখানে নিয়ে আসব। তুই কিন্তু তখন থাকিস।'

ইমন জানে, এখন বুঝতে পারে, চিরাগ ওকে ভয় দেখাচ্ছে। অ্যাদ্দিন ওকে ধোঁকা দিয়ে এসেছে। পাল্টা ওকেও ধাঁধায় ফেলতে হবে। আগের মতো ও প্রতিবাদ করল না। উল্টে বলল, 'তরে হ্যায় মারধর করেন নাই?'

'মারবে কেন? আমি কী অন্যায় করেছি? কামালের মতো একটা খাঁজা মাল আমার সঙ্গে পাঠিয়েছিল। নায়গারায় সাকসেস পাইনি কেন, ওকে আমি বুঝিয়ে বলেছি।'

‘হ্যায় আর কী কইল? আমাগো ক্যালিফেটে ফিরত নিয়া যাইব?’

‘সে রকম কোনও কথা হয়নি। কাল পরশুর মধ্যে উনি মিচিগানে যাবেন। আমাদেরও তৈরি থাকতে বললেন। মিচিগানে জিহাদি অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়ে গ্যাছে। অনেকে ইসলামে কনভার্ট হয়েছে।’

‘হ, এড্ডু আগে আমিও টিভিতে খবরডা হুনলাম। কিন্তু, সিএনএন যে একডা ব্যাড নিউজও দিল। রাক্কার হাফ টেরিটোরিগর্ভমেন্ট ফোর্স দখল কইর‍্যা ফ্যালছে। হালায় ওয়েস্ট এশিয়ায় না কি জিহাদিগো টিইকতে দিব না। হত্য না হি?’

‘বাজে কথা। আর কেউ ঠাঁই দিক না দিক, আমাদের জন্য পাকিস্তান আছে। আফগানিস্তানে তালিবানরা আছে। দ্যাখ না, আর ক’দিন পর জিহাদিরা পাকিস্তানকে কোথায় তুলে নিয়ে যায়। পাকিস্তানে বসে আল কায়দা, আর জইশ ই মহম্মদ মিলে পুরো ইন্ডিয়াকে তছনছ করে দেবে। যাক গে, তোর সঙ্গে এসব আলোচনা করা বৃথা। তুই একটু বাইরে যা। এখন আমি প্রেয়ারে বসব।’

বিছানা থেকে নেমে চিরাগ হাঁটু ভাঁজ করে বসল। কোনও অ্যাকশনে যাওয়ার আগে জিহাদিরা প্রেয়ার করতে বসে। আল্লাহতালার কৃপা প্রার্থনা করে। তখন কেউ বিরক্ত করুক, চায় না। চিরাগের মতলবটা কী? ওকে খুন করার আগে প্রস্তুত হচ্ছে না কি? না, না, পলাশছ্যারের বাড়িতে ইমন খুন খারাপি হতে দেবে না। ছল করে চিরাগকে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে হবে। তার পর কে কাকে খুন করে, দেখা যাবে। পকেটে এখন পিস্তল আছে। তার পুরো চেম্বার ভরা। একটা গুলিই যথেষ্ঠ। চিরাগ সবে প্রেয়ার শুরু করেছে, ওকে চটানোর জন্যই ইমন জিজ্ঞেস করল, ‘রববানিরে এহানে আনবি, যদি রাইতে থাইকতে চায়, তাইলে খাওয়াইবি কী?’

কড়া চোখে ওর দিকে তাকিয়ে চিরাগ বলল, ‘সেই ব্যবস্থাটা তুই করে রাখ। মিঠাস থেকে ভেজ আইটেম কিন্তু আনিস না। পাশের পাকিস্তানি

দোকানটা থেকে বিফ, টার্কি যা পাবি, নিয়ে আয়। খাবার পছন্দ না হলে কমান্ডার রববানি কিন্তু তোর উপর ঝাল ঝাড়বেন।'

ইমন বলল, 'তাইলে ভাই, তুই আমার উপর দায়িত্ব দিস না।'

চিরাগ খেপে গেল কথাটা শুনে। লাফ দিয়ে উঠে প্রথমে ফ্রিজের কাছে গেল। ডিপ ফ্রিজের ডোর খুলে একবার নজরে বুলিয়ে, প্রত্যাশিত জিনিসটা না পেয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'মাদারচোত, আমার পিস্তল কোথায় বল? খুদা কছম, তোকে আজ খুনই করে ফেলব।'

মায়ের নামে গালি! শুনে ইমনের রক্ত গরম হয়ে গেল। ও দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'কী কইলি তুই?'

চিরাগ বলল, 'মাদারচোত, মাদারচোত। হালা গদ্দার...' বলতে বলতে চিরাগ আরও কাছে এগিয়ে আসছে। মাথা ঠিক রাখতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা বের করে ইমন ট্রিগার টিপে দিল। অনভ্যস্ত হাত কাঁপছে। লক্ষভ্রষ্ট হয়ে গুলিটা গিয়ে লাগল দেওয়ালে। চিরাগের চোখ থেকে বিস্ময় ঠিকরে বেরোচ্ছে। ও ভাবতেই পারেনি, ইমন গুলি করে দেবে।

'তোর এত সাহস? কোত্থেকে হল? রেন্ডি রোজিনার সঙ্গে শুয়েছিলি নাকি? মাদারচোত, আমি জানি, ইন্টারপোল অফিসারের কাছে আমার সম্পর্কে সব ইনফর্মেশন তুই দিয়েছিস। লায়লা মাগিটাকে তুই-ই পুলিশ স্টেশনে ছেড়ে এসেছিস। তোর বাঁচার অধিকার নেই।' বলেই বুনো জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল চিরাগ। ইমন তৈরিই ছিল। সঙ্গেসঙ্গে বাঁ দিকে সরে গিয়ে ও সজোরে কনুই চালাল চিরাগের মুখ লক্ষ করে। চিরাগ ছিটকে গিয়ে পড়ল দরজার বাইরে। ওর নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। ইমন টের পেল, রক্ত দেখে ওর জিহাদি সত্ত্বাটা ফের জাগছে। চিরাগ উঠে দাঁড়ালে ক্ষ্যাপা কুত্তার মতো আক্রমণ করবে। ও যাতে আর দাঁড়াতে না পারে, বাইরে গিয়ে চিরাগকে দমাদম লাথি আর ঘুসি মারতে শুরু করল ইমন।

(চৌত্রিশ)

ডাইনিং হলে রিচার্ড গাটম্যানের সঙ্গে নিজে যেচে গিয়ে আলাপ করল কালকেতু। গেস্টদের হাতে তখন বিয়ার আর ওয়াইনের গ্লাস। এক কোণে টেবলে বিয়ারের মগ নিয়ে বসে রয়েছেন রিচার্ড। হাতের সেল ফোনের দিকে চোখ। কাছে গিয়ে কালকেতু বলল, 'স্যার, আমি একজন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট। নাম কালকেতু নন্দী। আমি রোজিনা ম্যাডামের গেস্ট। আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারি?'

জার্নালিস্ট শুনে রিচার্ড স্মিত হেসে বললেন, 'সিওর। কোন নিউজপেপার... ইত্তেফাক?'

উল্টোদিকের চেয়ারে বসে কালকেতু বলল, 'না স্যার। ইত্তেফাক ঢাকা থেকে পাবলিশ হয়। আমি কলকাতার জনবার্তা কাগজের।'

'ইয়েস, ইয়েস।' রিচার্ড বললেন, 'আমার যে বয়স হচ্ছে, এখন বুঝতে পারছি। পঞ্চাশটারও বেশি দেশে কভার করতে গেছি। এখন অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না।'

সুযোগটা ছাড়ল না কালকেতু। বলল, 'আপনি তো একবার বাংলাদেশেও গেছেন।'

'অফ কোর্স গেছি। তখনও বাংলাদেশ হয়নি। ওয়েট ওয়েট, জনবার্তার একজন ফোটোগ্রাফারের কথা মনে পড়ছে। তাঁর নাম রামা... রামাপ্রসাড চাকলাডার। এক্সিলেন্ট ফোটোগ্রাফার। ঢাকায় আমরা একইসঙ্গে বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার কভার করেছিলাম।'

'উনি রমাপ্রসাদ চাকলাদার। ওর কাছে আপনার নাম শুনেছি। আপনি যে লিবারেশন ওয়ারের ছবির জন্য পুলিৎজার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন, আমি জানি। ছবিটা ইন্টারনেটেও দেখেছি।'

'রামাপ্রসাদও সেবার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। ওয়ার্ল্ড'স বেস্ট ওয়ার পিকচারের জন্য। ওরই পুলিৎজার পাওয়া উচিত ছিল। অ্যাওয়ার্ডটা আমি

নিয়েছিলাম বটে, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বে। আমার ওই ছবিটা নিয়ে আমেরিকায় অনেক কন্ট্রোভার্সি হয়েছিল। আমেরিকান গর্ভমেন্ট বলেছিল, ছবিটা সাজিয়ে তোলা... কনককটেড। কেউ প্রশ্ন তুলেছিল, নগ্ন মেয়েটার ছবি ছাপানো উচিত হয়নি। যতই তার বয়স ছয়-সাত বছর হোক না কেন? ইন ফ্যাক্ট, নিউ ইয়র্ক টাইমসে আমার কলিগরাও ছবিটা ছাপার আগে তিনবার ভেবেছিলেন। কিন্তু এডিটর ফার্ম ডিসিশন নেন, ছবিটা ছাপানো হবে।'

'আপনি যে মেয়েটাকে নিজে অর্ধদগ্ধ অবস্থা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে কথা বলেননি?'

'মাই গুডনেস, আপনি তো সবই জানেন দেখছি। হ্যাঁ, বলেছিলাম। ঢাকায় আমার সঙ্গে গেছিল আজকের পার্টি হোস্ট রায়ান। রোজিনার ফাদার। ও নিউ ইয়র্কে ফোন করে এডিটরকে কনভিন্স করেছিল, ছবিটা সাজানো নয়। রায়ান যদি সেদিন আমার পাশে না দাঁড়াত, তা হলে হয়তো বদনাম নিয়েই আমাকে পেশা ছাড়তে হত। এই কারণেই ওর সঙ্গে এখনও আমার বন্ধুত্বটা টিকে আছে। আপনি তো জানেন, আমাদের পেশায় বন্ধু পাওয়া কতটা কঠিন।'

'হ্যাঁ জানি।' বলে কালকেতু প্রসঙ্গ ঘোরাল, 'আচ্ছা, এ কথাটা কি ঠিক, ওই ছবি তোলার পর আপনি না কি জীবনে আর কখনও যুদ্ধের ছবি তোলেননি?'

'ঠিকই শুনেছেন। যুদ্ধে আমার ঘেন্না এসে গেছিল। আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ওটাই আমার জীবনের সেরা ছবি কি না, আমার উত্তর হবে, না।'

কোথায় যেন কালকেতু পড়েছিল, প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির মার্ডারের ছবি তোলা নিয়ে রিচার্ডের লেখা একটা বই একটা সময় টানা একবছর বেস্টসেলার হয়েছিল। প্রসঙ্গটা তুললে উনি খুশি হবেন। প্রশ্নটা করার আগে কালকেতু দেখল, পলাশভাই টেবলের সামনে এসে

দাঁড়িয়েছেন। রিচার্ডকে লক্ষ করে উনি বললেন, 'আমি কি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি?'

রিচার্ডের সঙ্গে বোধহয় আগেই পলাশভাইয়ের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন রোজিনা ম্যাডাম। চিনতে পেরে উনি বললেন, 'হোয়াই নট? মাই প্লেজার।'

বিয়ারের মগে চুমুক দিয়ে রিচার্ড বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি কী যেন বলতে চাইছিলেন মি. ন্যান্ডি।'

'আপনি তো প্রেসিডেন্ট কেনেডির মার্ডার নিয়ে একটা বইও লিখেছিলেন।'

'হ্যাঁ। বইটা দুই মিলিয়ন কপি বিক্রিও হয়েছিল।'

বিশ লাখ!! শুনে কালকেতু অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'এত হিউজ কপি বিক্রি হওয়ার কারণ?'

রিচার্ড বললেন, 'প্রেসিডেন্ট যেদিন অ্যাসাসিনেটেড হল, আমি সেদিন ডালাসে হাজির ছিলাম। লাকিলি, এমন কয়েকটা ছবি পেয়েছিলাম, যা কোনও ফোটোগ্রাফার পাননি।'

পলাশভাই ইংরেজিতে বললেন, 'সে তো পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা। আমার জন্মেরও পনেরো-ষোলো বছর আগে। পরে ম্যাগাজিনে কেনেডি মার্ডারের কথা পড়েছি। আপনার লেখা বইটা কি পড়া যাবে?'

রিচার্ড বললেন, 'বইটা এই র‍্যাঞ্চের লাইব্রেরিতে আছে। আমি রায়ানকে এক কপি পাঠিয়ে ছিলাম। কাল লাইব্রেরিতে গিয়ে শুনলাম, ট্যুরিস্টদের মধ্যে বইটা এখনও খুব পপুলার।'

কালকেতু প্রশ্ন করতে গেল, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার নিয়ে কোনও বই লেখেননি? কিন্তু তার আগেই পলাশভাই জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'অসওয়ার্ল্ড কি সত্যিই প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে খুন করেছিলেন? এ নিয়ে নাকি অনেক কন্ট্রোভার্সি হয়েছিল?'

রিচার্ড খুশি হয়ে বললেন, 'গুড কোয়েশ্চেন। আপনি ঠিকই বলেছেন, বিতর্কটা উঠেছিল আমার বই পাবলিশ হওয়ার পর। প্রেসিডেন্টের মৃত্যু আর আমার বই পাবলিশ হওয়ার মাঝে তখন তিনটে বছর কেটে গেছে। '

পলাশভাই বললেন, 'যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে ডিটেলে বলবেন?'

'কেন নয়? তখন আমার বয়স পঁচিশ বছর। সবে ডালাস নিউজে চাকরি পেয়েছি। সারাদিন ভাল ছবি তোলার আশায় টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম। দিনটার কথা এখনও আমার মনে আছে। বাইশে নভেম্বর ১৯৬৩। ডালাসে সেদিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির আসার কথা। ডেমোক্রাট দলের কর্তাদের মধ্যে ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রেসিডেন্টের লাঞ্চের ব্যবস্থা হয়েছিল ডিলে প্লাজার ট্রেড মার্ট বলে একটা বাড়িতে। তার কাছাকাছি একটা রাস্তা... এলম স্ট্রিটে গিয়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। ওখান দিয়ে হুডখোলা লিমুজিনে করে প্রেসিডেন্ট লাঞ্চে যাবেন, ডালাসের মানুষের অভিবাদন নিতে নিতে। বেলা বারোটা বাজে। ঝকঝকে রোদ্দুর। ডিলে প্লাজায় উৎসবের মেজাজ। প্রেসিডেন্ট কেনেডি আর তাঁর স্ত্রী জ্যাকুলিন জনতার উদ্দেশে হাত নাড়ছেন। হঠাৎ গান ফায়ারের শব্দ। দেখলাম, প্রেসিডেন্ট কেনেডি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কয়েক সেকেন্ড বাদে পর পর আরও দুটো শব্দ। আমি ছবি তুলেই যাচ্ছি। দেখি, ফার্স্ট লেডি জ্যাকুলিন গাড়ির পিছন দিককার বনেটে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে কিছু জড়ো করার চেষ্টা করছেন। আশপাশ থেকে সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা দৌড়ে আসছে গাড়ির দিকে।'

রিচার্ড নিখুঁত বর্ণনা দিচ্ছেন সেদিনকার ঘটনার। টেবলের আশপাশে আরও অনেকে জুটে গেছেন। চেয়ার টেনে রায়ানও বসে পড়েছেন রিচার্ডের পাশে। বিয়ারে চুমুক দিয়ে রিচার্ড ফের বলতে শুরু করলেন, 'তখনও আমি বুঝতে পারিনি কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি তুলেছি। কালো লিমুজিন রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে। তখনই গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে, প্রেসিডেন্টকে অ্যাসাসিনেট করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন টেক্সাসের গর্ভনর কনোলিও। হঠাৎ আমার চোখে

পড়ল, ভিড়ের বাইরে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা স্যুট পরা একজন দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছেন প্লাজার দিকে। ছবি প্রিন্ট করার পর দেখি, ছাতার আড়ালে লোকটা পিস্তল তাক করে আছে প্রেসিডেন্টের কনভয়ের দিকে। আমার বইয়ে এই ছবিটাই বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। কে এই লোকটা? তাকে পুলিশ ধরতে পারল না কেন?'

পলাশভাই বলে উঠলেন, 'আপনি বলতে চান, অসওয়াল্ডের গুলিতে কেনেডি মারা যাননি?'

রিচার্ড বললেন, 'ডিলে প্লাজার একটা বাড়ির ছ'তলার জানালা দিয়ে অসওয়াল্ড গুলি চালান। সেই বুলেটে প্রেসিডেন্ট মারা যাননি। উল্টো দিক থেকে আসা অন্য একটা বুলেট প্রেসিডেন্টের মাথায় লাগে। ভয়ানক ব্যাপার হল, মাথার ঘিলু গাড়ির পিছনের বনেটে ছিটকে পড়েছিল। আর সেটাই ফার্স্ট লেডি জড়ো করার চেষ্টা করছিলেন। আমার বইয়ে ছবিগুলো পর পর সাজানো আছে। দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। অনেকগুলো প্রশ্ন উঠেছিল। ষড়যন্ত্র তো বটেই। পুলিশ কাস্টোডিতে অসওয়াল্ড মারা গেলেন কেন? ছাতা মাথায় লোকটা কে? প্রেসিডেন্ট যে রুট দিয়ে ট্রেড মার্টে লাঞ্চে যাবেন, সেটা মিডিয়ায় জানানো হল কেন? কমিশনের পর কমিশন বসেছে। এখনও কিন্তু প্রেসিডেন্টের মৃত্যু রহস্যের জট খোলেনি।'

ভিড়ের মাঝখান থেকে কে যেন প্রশ্ন করলেন, 'মি. গাটম্যান, কারা ষড়যন্ত্রে সামিল ছিলেন, সে ব্যাপারে কি আপনার বইতে কোনও হিন্ট দেওয়া আছে?'

রিচার্ড বললেন, 'পড়লেই বুঝতে পারবেন। ওয়ারেন কমিশন আমাকে ওয়াশিংটন ডিসি-তে ডেকে পাঠিয়েছিল। যা ওরা জানতে চেয়েছিল, বলে দিয়েছিলাম। মার্ডার মিস্ট্রির রিপোর্ট করেছিল যারা, তাদের মধ্যে একজন আমার সামনেই বসে আছে। রায়ান ভাল বলতে পারবে, কন্সপিরেসি থিওরি সম্পর্কে।'

রায়ান ব্যারিটন গলায় বলে উঠলেন, 'আমাকে আর এর মধ্যে টেনো না রিচার্ড। আমি এখন বিজনেস করে খাই। কে কোত্থেকে পিছনে লেগে যাবে, কে জানে?' শুনে সবাই হেসে উঠলেন। রায়ান ফের বললেন, 'আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, রিচার্ড এখনও প্রতি বছর বাইশে নভেম্বর বেলা বারোটার সময় ডালাসের ডিলে প্লাজায় যায়। প্রেসিডেন্টের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। গত পঞ্চান্ন বছরে তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ বারও গিয়েছিল। স্পটে গিয়ে ও নিজের সই করা বই বিক্রি করে। লোকের প্রশ্নের উত্তর দেয়।'

'ওয়াও'। একসঙ্গে বিস্ময়সূচক আওয়াজ ছিটকে বেরোল অনেকের মুখ থেকে। হাত তুলে তাঁদের চুপ করিয়ে দিয়ে রিচার্ড মজা করে বললেন, 'শুধু শ্রদ্ধা নয়, আমি কৃতজ্ঞতাও জানাতে যাই। প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর পর আমার লাভ হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক টাইমসে আমি চাকরি পাই। টানা তিনটে দশক ওখানেই সসম্মানে চাকরি করেছি।'

পলাশভাইয়ের কৌতূহলের শেষ নেই। আরও কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন। রোজিনা ম্যাডাম এসে জমাটি আড্ডাটা ভেঙে দিলেন। 'লাঞ্চ রেডি। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। রিচার্ড আঙ্কল এখন দিনতিনেক থাকবেন র‍্যাঞ্চে। অনেক সময় পাবেন, ওর কাছে গল্প শোনার। এখন চলুন ব্যুফে টেবলের দিকে।'

ব্যুফে টেবলে সাজানো মেক্সিকান খাবার। এনচিলাদা চিকেন, শ্রিম্প এনচিলাদাস, বুরিতো এগরোল, চিলি চিজ ক্রাঞ্চর‍্যাপ, চিকেন ফাজিতাস, চিজি বিফ কেসাডিয়াস, পর্ক টাকোস, করন স্যালাড, কেটো টাকিটোস। খাবারের নামগুলো কালকেতুর জানা রোজিনা ম্যাডামের সৌজন্যে। চিকেন আর শ্রিম্পের দুটো পদ প্লেটে তুলে নিয়ে এসে কালকেতু বসল একটা চেয়ারে। কাছেই একটা টেবলের চারপাশে বসেছেন রিচার্ড, রায়ান, হেমলতা, রোজিনা আর পলাশভাই। খেতে খেতে ওঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। রিচার্ডের দিকে তাকিয়ে হাত কামড়াতে লাগল কালকেতু। ইস,

কথায় কথায় তখন রিচার্ড নিজেই মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। আর একটু হলেই শিউলিদিদি সম্পর্কে কথা উঠতই। কিন্তু মাঝখান থেকে সব ভণ্ডুল করে দিলেন পলাশভাই।

রিচার্ডের টেবলের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় হঠাৎ কালকেতুর মনে হল, আমোদপুরে যে বাচ্চা মেয়েটিকে উনি উদ্ধার করেছিলেন, তার সম্পর্কে রায়ানও নিশ্চয় জানেন। কেননা তিনিও একাত্তরে বাংলাদেশের যুদ্ধ কভার করতে গেছিলেন। পরক্ষণেই ওর খটকা লাগল, যে ভদ্রলোক একটা সময় সাংবাদিকতা করতেন, তিনি এই বিশাল র‍্যাঞ্চের মালিক হলেন কী করে? এই বিপুল সম্পত্তি কি পৈতৃক সূত্রে পাওয়া? কালকেতুর তীব্র কৌতূহল হল, এটা জানার জন্য যে, হেমলতার সঙ্গে রায়ানের পরিচয়ও কি ঢাকায় ওই সময় হয়েছিল? ভদ্রমহিলার বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি। দেখে অবশ্য তা বোঝা যায় না। তা হলে রায়ানের সঙ্গে হেমলতার বয়সের ব্যবধান কমপক্ষে পনেরো-ষোলো বছরের। নিউ মেক্সিকোর এই র‍্যাঞ্চে একজন বাংলাদেশি মহিলা নিজেকে কীভাবে ক্যারি করছেন, অবাক হয়ে তা কালকেতু দেখতে লাগল।

পলাশভাই খাবার আনতে উঠে গেছিলেন। ফিরে আসার সময় ওকে দেখতে পেয়ে উল্টোদিকের চেয়ারে বসে উনি বললেন, ‘মেক্সিকান ডিশ-এর তুলনা নাই কাইলকেতুভাই। বুরিতো এগরোলগুলান কী মুইচমুইচ্যা হইসে, টেস্ট কইর‍্যা দ্যাখেন। আমি কী লাকি ভাবেন তো। ইন ফিউচার, মেক্সিকান ফুড তো খাইতে পামই, সেইসাথে বাংলাদেশি রান্না। আমার উড বি মাদার ইন ল এট্টু আগে কী কইল, হোনবেন? কইল, কাইল লাঞ্চে আমার জন্য শুটকি মাছের প্রিপারেশন রাইধ্যা খাওয়াইব। প্লাস সরস্যা-ইলিশ।’

কালকেতু মজা করার জন্য বলল, ‘দেখবেন, আমিও যেন শেয়ার পাই। কিন্তু আপনি ওই টেবল ছেড়ে উঠে এলেন কেন?’

‘রোজিনা ম্যাডামগো টেবলে কী হইতাসিল হোনবেন? আমারে নিয়া তামাশা। চিটাগংয়ে আমি র‍্যাঞ্চ করুম শুইন্যা অরা হাসাহাসি করতাসিলেন। আফনেরে কইয়া রাখতাসি, র‍্যাঞ্চ আমি করুমই।’

‘ওদের কথাবার্তা আপনি বুঝতে পারছিলেন কী করে? আপনি স্প্যানিশ জানেন?’

‘অ্যাক বিন্দুও না। ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন বা না জানেন, কেউ যদি আফনারে নিয়ে ফকরামি করে, আফনে ঠিকই বুইঝতে পাইরবেন। ঢাকায় ফিইর‍্যা গিয়াই আমারে স্প্যানিশ শিখতে অইব। হালায় ঢাকায় আবার স্প্যানিশ শেখার ইনস্টিটিউট আসে কি না, দ্যাখতে অইব।’

‘আপনার উড বি মাদার ইন ল-কে দেখে আমি একটু অবাকই হয়েছি পলাশভাই। রায়ান আর উনি... পৃথিবীর দু’প্রান্তের দু’জন মানুষ... কাপল হলেন কী করে?’

শুনে পলাশভাই হেসে বললেন, ‘উপরওয়ালা কার সাথে কার জুটি বাইধ্যা দেন, কহন যায় না কি? রোজিনা ম্যাডামের মুখে আমি যদ্দূর হুনসি, আমার উড বি মাদার ইন ল হ্যামলতা বাই প্রোফেশন নার্স সিলেন। রায়ানের সাথে হ্যার যহন আলাপ হয়, তহন হ্যামলতা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র নার্স। আর রায়ান নিউ ইয়র্ক টাইমসের ঢাকা করেসপন্ডেন্ট। হ্যার ফার্স্ট ওয়াইফ অসুস্থ হইয়া পড়ায় রায়ান প্রায়ই হাসপাতালে যাইতেন। সেহানেই হ্যামলতার সাথে রায়ানের আলাপ, প্রেম। আমাগো ঢাকা শহরটা ভালা লাগতাসিল না রায়ানের ফার্স্ট ওয়াইফের। হ্যায় ঝগড়া কইর‍্যা আমেরিকায় চইল্যা আসেন। তার পরের স্টোরিটা কইতে অইব না হি?’

রায়ান সম্পর্কে যে প্রশ্নটা এতক্ষণ ওকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল, সেটা কালকেতু করেই ফেলল, ‘রায়ান এত বড় একটা সম্পত্তি করলেন কী করে?’

‘এইডা হ্যার ম্যাটারনাল প্রোপারটি। হ্যামলতারে বিয়া করার পর হ্যার কপাল খুইল্যা গ্যাসে। ম্যাটারনাল গ্র্যান্ড ফাদারের কুনও পোলাপান ছিল না। সব প্রোপারটি হ্যায় রায়ানরে দিয়া গ্যাসেন। আগে এই র‍্যাঞ্চের নাম ছিল টার্ফগ্রাস র‍্যাঞ্চ। মাইয়্যা হওনের পর রায়ান নাম বদলাইয়া করসেন রোজি র‍্যাঞ্চ।’

কাঁটা-চামচ ব্যবহার না করে পলাশভাই হাত দিয়ে খাবার খাচ্ছেন। খেতে খেতেই বললেন, ‘ইভনিংয়ে হর্স রাইডিংয়ে যাম। আফনে যাইবেন?’

কালকেতু বলল, ‘না। ঘোড়ায় চড়ার সৌভাগ্য কোনওদিন হয়নি। বুড়ো বয়সে হাত-পা ভাঙার ইচ্ছে আমার নেই। আপনার অভ্যেস আছে না কি?’

হেসে পলাশভাই বললেন, ‘আমারও নাই। রোজিনা ম্যাডাম কইল, কাউবয়রা সাথে থাইকব। চিন্তা করনের প্রয়োজন নাই। এহানে দশ-বারো মাইল দূরে, পাহাড়ের কোলে ঝরণার ধারে না হি একডা স্পট আসে, পূর্ণিমার রাতে মাস্ট গো সাইট। এমন রোম্যান্টিক জায়গা না হি আলবুকার্কে আর নাই। হিসাব কইর‍্যা দ্যাখলাম, আজই পূর্ণিমা। রোজিনা ম্যাডাম আমারে সেহানে লইয়্যা যাইব। কিন্তু আফনে তাইলে কী কইরবেন? আরে মশয়, র‍্যাঞ্চ অইল ফূর্তির জায়গা। আফনে ইভনিংয়ে বেলি ড্যান্স দেইখ্যা আসেন।’

সন্ধেবেলাটা কীভাবে কাটাবে, কালকেতু মনে মনে ছকে নিল। একবার র‍্যাঞ্চের লাইব্রেরিতে ঘুরে এলে কেমন হয়? জিহাদিদের উপর বই পেলে ঘরে নিয়ে যাবে। নিউ জার্সিতে জিহাদিদের উপর লেখা একটা বই কিনল, কিন্তু পড়াই হল না। ইমন পড়বে বলে নিয়ে গেল, অথচ ফেরত দিয়ে গেল না। কী অদ্ভুত, নিউ জার্সির বাড়িতে দুই জিহাদি বসে আছে। অথচ বই পড়ে ওকে জানতে হচ্ছে জিহাদিদের সম্পর্কে। ইমন আর চিরাগ পলাশভাইয়ের কী ক্ষতি করে দেবে, কে জানে? চিরাগ ছেলেটা রাফ টাইপের। ওর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কিলার। নিজের চোখে কালকেতু একদিন ওকে কাঠবেড়ালি মারতে দেখেছিল। যে কোনও সময় ও মানুষ খুন করতে পারে।

লাঞ্চ শেষ করে কালকেতু নিজের ঘরে ফিরে এল। তখনই ওর ফোনটা বেজে উঠল। কী আশ্চর্য, অপর প্রান্তে সুদীশ। গলার স্বর পেয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কোথায় রে? নিউ জার্সিতে নেই?'

কালকেতু বলল, 'না। আমি পলাশভাইদের সঙ্গে নিউ মেক্সিকোতে এসেছি। কী খবর বল।'

'আমারও তাই মনে হল, তোরা কেউ নেই। শোন, চিরাগ বলে ছেলেটাকে প্রচণ্ড মারধর করে কেউ মেট্রো স্টেশনের কাছে পার্কিং স্পেসে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। ওর পকেটে তখন একটা পিস্তল ছিল। পুলিশ প্রথমে মনে করেছিল, ছিনতাইবাজ। রাতের দিকে যে সব প্যাসেঞ্জার নামে, তাদের লুট করার জন্য স্টেশনের কাছাকাছি ঘুরঘুর করছিল। পরে ওর আসল পরিচয় জানতে পারে। চিরাগ এমন মার খেয়েছে, হয়তো মরেই যেত আর্লি মর্নিংয়ে পুলিশের চোখে পড়ে না গেলে। পুলিশ ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এখনও ছেলেটার জ্ঞান ফেরেনি।'

'ইমন কোথায়?'

'মনে হয়, বাড়িতে নেই। ওর উপর আমরা লক্ষ রাখছি। মনে হয়, এটা জিহাদিদের নিজেদের মধ্যে মারামারি। এইভাবেই শালারা মরে। যাক গে, তোরা কবে ফিরছিস, বল?'

'বলতে পারছি না রে। তবে, পয়লা জানুয়ারির আগে তো নয়ই। তুই কি এখনও নিউ জার্সিতে?'

'না, নিউ ইয়র্কে। এখানে দু'তিনদিনের মধ্যে একটা বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। তাই আটকে গেছি। এখন ছাড়ি রে। পরে আবার কথা হবে।'

ফোন ছেড়ে কালকেতু ঠিক করতে পারল না, খবরটা এখনই পলাশভাইকে দেবে কি না।

(পঁয়ত্রিশ)

ফাউন্ডেশনের অফিসে পৌঁছে লিলি গডউইন দেখতে পেলেন, লাউঞ্জে বাম কিমের সঙ্গে জন মিকেল বসে কথা বলছেন। তাঁকে দেখে মিকেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ম্যাডাম, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। মিরাকলটা কীভাবে হল, আমরা বুঝতে পারছি না।'

অ্যাড্রায়াটিকা রেসিডেন্সি থেকে ম্যানহাটন... এতটা রাস্তা নিজে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। ড্রাইভ করার অভ্যাস অনেকদিন চলে গেছে। ড্রাইভারের সিটে সোজা হয়ে বসলেই এখন পিঠে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। এখনও ব্যথাটা তিনি অনুভব করছেন। লাউঞ্জের সোফায় বসে পড়ে লিলি বললেন, 'মিরাকল? কী হয়েছে?'

মিকেল বললেন, 'আপনার এখান থেকে মি. বাম কিম আমাদের একটা কমপ্লেন করেছিলেন। আপনার চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের অ্যাকাউন্ট না কি হ্যাকড হয়েছে। আমাদের সাইবার ক্রাইম সেল থেকে লোকজন নিয়ে এসে এখন দেখছি, কাউন্টার হ্যাকিং হয়েছে।'

'কী বলছেন মি. মিকেল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বাম কিম বললেন, 'আমি বুঝিয়ে বলছি ম্যাডাম। আপনাকে আগেও বলেছি, কাল রাতে একজন হোয়াইট হ্যাট প্রোগ্রামার জিমি রাইটসকে আমি ডেকে নিয়ে এসেছিলাম। ও বলেছিল, টয় ডিভিশন থেকে কেউ হাফ মিলিয়ন ডলার ট্রান্সফার করে দিয়েছে মরিশাসের একটা ফাইনান্সিয়াল অর্গানাইজেশনকে। একটু আগে পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেল-এর লোকরা অ্যাকাউন্ট ওপেন করে দেখেন, মরিশাস থেকে সেই অর্থ আবার ফিরে এসেছে। কী করে এটা হল, পুলিশের মাথায় ঢুকছে না।'

মিকেল বললেন, 'একজন হ্যাকার আপনাদের অ্যাকাউন্টস থেকে ডলার চুরি করল। সেই অঙ্কের ডলার আবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে ফিরে এল! এমন ঘটনা, আমার পুলিশ জীবনে কখনও দেখিনি

বা শুনিনি ম্যাডাম। আমার লোকেরা এখন খুঁজে দেখছে, চোররা কোন সার্ভারের থ্রু দিয়ে এই অপকর্মটা করেছিল।'

শুনে প্রভু যিশুকে মনে মনে স্মরণ করলেন লিলি। ডলারগুলো চুরি হয়ে গেলে মারাত্মক বদনামের ভাগী হতেন তিনি। চট করে তাঁর মনে পড়ল, রোকেয়া সুলতানার মৃত্যুর পর যখন তাঁকে ভিলেন বানানোর চেষ্টা চলছে, তখন টিভিতে একজন ডেমোক্রাট সেনেটর একদিন বলেছিলেন, লিলি গডউইন ফাউন্ডেশনের ফান্ড থেকে একটা অংশ মরিশাসে পাচার করতে চেয়েছিলেন। মরিশাসের কথাটা উঠল কোত্থেকে, তখন ভেবে লিলি কোনও সদুত্তর পাননি। সেই মরিশাসের নাম সত্যিই জড়িয়ে গেল। অন্তত কম্পিউটারে তো রয়ে গেল, হাফ মিলিয়ন ডলার মরিশাসে সরানো হয়েছিল? তা হলে কি ফাউন্ডেশনেরই কেউ এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত? কে হতে পারে?

লিলি বললেন, 'অফিসার, আমি চাই সত্যিটা প্রকাশ পাক। আমি জানতে চাই, কারা এই কন্সপিরেসিতে জড়িত? আপনার সাইবার এক্সপার্টরা আর কী আন্দাজ করছেন?'

মিকেল বললেন, 'ম্যাডাম, প্রাইমারিলি ওদের ধারণা কোনও টেররিস্ট অর্গানাইজেশন এর সঙ্গে যুক্ত। ওরাই কোনও লিঙ্ক ইউজ করেছে। কোন দেশের সার্ভার, সেটাই ওরা খোঁজা হচ্ছে। বালগেরিয়ান বা রাশিয়ান হলে ট্রেস করা যাবে না ম্যাডাম। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে, টেররিস্টরা আপনাকে ফাঁসানোর চেষ্টা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। উল্টোদিকে, ওই টেররিস্টদের মধ্যেই এমন কেউ আছে, যে আপনাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। সে মরিশাসের ওই সংস্থার অ্যাকাউন্টস হ্যাক করে, ডলার ফেরত এনেছে।'

লিলি টেনশনবোধ করছেন। বললেন, 'কারা হতে পারে?'

'আইএস টেররিস্টরা। রিসেন্টলি আপনারই রেসিডেন্সিতে মামুন বলে যে সিরিয়ান ছেলেটা ধরা পড়েছে, সে একজন ক্র্যাকার। আমাদের কাস্টোডিতেই

সে আছে। আমার এখন মনে হচ্ছে, কালপ্রিট সে-ই। মারধর করলেই সে বলে দেবে। আপনি অত উতলা হবেন না ম্যাডাম। দেখাই যাক না, আমার লোকেরা আর কী বের করতে পারে।'

কথাগুলো বলে মিকেল উঠে দাঁড়ালেন। মাথায় টুপিটা গলিয়ে বললেন, 'দেখছি, আপনি সিকিউরিটি ছাড়াই রাস্তায় বেরিয়েছেন। কেন ম্যাডাম? স্ট্যানলি কোথায়?'

লিলি বললেন, 'আজ ও কাজে আসেনি।'

'হাউ ইরেসপন্সিবল। ম্যাডাম, আমি একজন অফিসার পাঠিয়ে দিচ্ছি। দয়া করে বাড়ি ফেরার সময় আপনি একা ফিরবেন না।'

বাম কিম খুশি হয়ে বললেন, 'সো নাইস অফ ইউ স্যার। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই।'

ওঁরা দু'জন চলে যাওয়ার পর, নিজের চেম্বারে পৌঁছে লিলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মিকেলের কথাটা তাঁর কানে বাজছে, 'ওই টেররিস্টদের মধ্যেই এমন কেউ আছে যে, আপনাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে।' কে সেই লোক? দু'হাতে মুখ ঢেকে লিলি ভাবছেন। হঠাৎ খসখস আওয়াজ শুনে মুখ তুলে দেখলেন, অফিস কর্মীদের কয়েকজন উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে রয়েছে, প্রাইভেট সেক্রেটারি মার্থা। খরচ কমানোর জন্য খুব কম কর্মী নিয়ে ফাউন্ডেশন চালান লিলি। সব মিলিয়ে তিরিশজন, বয়স সবারই তিরিশের নিচে। বেছে বেছে এঁদের তিনি নিয়ে এসেছেন। এদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, এমন কেউ নেই। জঙ্গিদের সঙ্গে কারোর সম্পর্ক থাকতেই পারে না। মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে, ফাউন্ডেশনের সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল, এমন কাউকে তিনি খুঁজে পেলেন না।

মার্থারা সবাই খুব মুষড়ে পড়েছে। ফাউন্ডেশনের প্রধান হিসেবে, কর্মীদের মনোবল ফিরিয়ে আনা উচিত। ড্যাডির কাছে উনি এই শিক্ষাই পেয়েছেন। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে লিলি বললেন, 'তোমাদের টেনশনে পড়ার

কোনও কারণ নেই। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। যে যার কাজে লেগে যাও। মার্থা, আজ আমার কোন কাজ পেন্ডিং আছে, বলো।'

চোখের ইশারায় সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলল মার্থা। কৃষ্ণকায় ছোট্টখাটো চেহারার মেয়ে, সদা হাসিখুশি। শিকাগোর শাখা থেকে ওকে সদর দফতরে নিয়ে এসেছেন লিলি। বলল, 'বেলা বারোটার সময় সিঙ্গার রেহেন্না ফেন্টির প্রোমোটার ডগলাস কার্টিস আসবেন। উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

লাস ভেগাসের চ্যারিটি শো-তে ফেন্টিকে পারফর্ম করতে বলা হবে। আর্থিক কথাবার্তা হয়ে গেছে অ্যান্ডির সঙ্গে। ভদ্রলোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান কেন, লিলি বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'ডিল তো হয়ে গেছে, আমার সঙ্গে কথা বলতে চান কেন?'

মার্থা বলল, 'উনি আপনার অটোগ্রাফ নিতে চান। তার সঙ্গে ফেন্টির জন্য শুভেচ্ছা বার্তা। ওঁরা এখন থেকেই অনুষ্ঠানটা প্রোমোট করবেন ম্যাডাম। শুনলে আপনি খুশি হবেন, আমাদের শো-এর জন্য ফেন্টি মাত্র এক ডলার নিচ্ছেন। বলেছেন, লিলি গডউইনের মতো মহান এক মহিলা শো-এর জন্য আমার কথা ভেবেছেন, সেটাই আমার কাছে অনেক। ইয়েমেনের বাচ্চাদের জন্য একটা গান বানাচ্ছেন ওঁরা। লাস ভেগাসে ফেন্টি প্রথম সেই গানটা গাইবেন। গানের পুরো রাইটস উনি ফাউন্ডেশনকে দিয়ে দেবেন।'

শুনে খুব খুশি হলেন লিলি। বললেন, 'ঠিক আছে, বাচ্চাদের সঙ্গে আমার একটা ছবি বের করে রাখো। তার উপর অটোগ্রাফ দিয়ে দেব। আর হ্যাঁ, ফেন্টিকে আমার তরফে একটা চিঠি দাও। তাতে লিখো, আমরা ওর গান শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আর কী আছে, বলো।'

মার্থা বলল, 'ম্যাডাম, রোহিঙ্গা বাচ্চাদের নিয়ে আপনার ব্রিফিং আজ ইউনিসেফের হিউম্যান রাইটস কমিটিতে। বেলা তিনটের সময়। বাংলাদেশ থেকে রোকেয়া সুলতানা রোহিঙ্গা বাচ্চাদের যে ক্লিপিংসগুলো পাঠিয়েছিলেন,

তা পেন ড্রাইভে তুলে রেখেছি। আপনি একবার দেখে নিতে পারেন। ব্রিফিংয়ের সময় আপনার বলতে সুবিধা হবে ম্যাডাম।'

রোকেয়া অনেকদিন আগে ক্লিপিংসগুলো পাঠিয়েছিল। ছবিগুলোতে তখন একবার চোখ বুলিয়েছিলেন লিলি। এমন ছবিও ছিল, বার্মিজ সেনারা পালাতে চাওয়া বাবা-মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে বাচ্চাগুলোকে সাফ নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলছে। রোকেয়া হাসপাতালে শুয়েও অভিযোগ করেছিল, বাংলাদেশের উদ্বাস্তু শিবিরে বাচ্চাগুলো অবস্থা আরও খারাপ। বিনা চিকিৎসায়, খেতে না পেয়ে সেখানেও বাচ্চারা মরছে। রোকেয়া আজ বেঁচে নেই। ওর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারবেন না লিলি। আজ ইউনিসেফের খুব গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। কমিটি মেম্বারদের বোঝাতেই হবে, বাচ্চাগুলোকে এভাবে মরতে দেওয়া যাবে না। মার্থাকে তিনি বললেন, 'পেন ড্রাইভটা আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আর মি. বাম কিমকে বোলো যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করেন।'

রোহিঙ্গা শিশুদের কথা ভাবতে ভাবতে লিলির একবার মনে হল, যে দেশে তিনি বসবাস করছেন, সেই আমেরিকাতেও তো বাচ্চারা সুরক্ষিত নেই। প্রতিদিন পাঁচটা করে অত্যাচারিত বাচ্চা মারা যাচ্ছে এই দেশে। বছরে প্রায় সাত লাখ শিশু নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। চিল্ডেনস অ্যাডভোকেসি সেন্টারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বছরে প্রায় চৌত্রিশ লাখ শিশুকে তারা শারীরিক, মানসিক আর যৌননিগ্রহ থেকে বাঁচায়। এই অপরাধে জেল বন্দীদের মধ্যে একুশ শতাংশ বাবা। মায়ের সংখ্যা আরও বেশি, সাতাশ শতাংশ। কী ভয়ানক পরিস্থিতি! তবে প্রেসিডেন্ট অ্যাডামসের আমলে চাইল্ড অ্যাবিউস কিছুটা কমেছে। স্কুলগুলোও এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। মারধর করা তো দূরের কথা, বাড়িতে বাচ্চাদের অবহেলা করলে, স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি তা জানতে পারে, তা হলে বাবা-মায়েরা শাস্তির মুখে পড়ছেন।

প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস অন্তত বোঝাতে পেরেছেন, বাচ্চারা সুস্থ পরিবেশে মানুষ না হলে, জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

আমেরিকা এমন একটা দেশ, যেখানে সব ধরনের পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব। সরকারি দফতর আর ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, আমেরিকায় শিশু নিগ্রহের ক্ষেত্রে দায়ী সাতানববুই শতাংশ তাদের বাবা-মা অথবা অভিভাবক। যে সব বাচ্চার বাবা-মায়ের সম্পর্ক ভাল নয়, নিত্য গৃহবিবাদ, তারাই অত্যাচার আর অবহেলার শিকার হয় বেশি। মদ্যপান বা মাদক সেবনের চল বেশি, এমন পরিবারের বাচ্চারা দুঃসহ পরিবেশে বেড়ে ওঠে। আশঙ্কার কথা এই যে, যাদের বাল্যকাল দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটেছে, তারা যখন বাবা বা মা হয়, তখন সন্তানদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। আমেরিকায় তবুও এই তথ্যগুলো পাওয়া যায়। ইউরোপ ছাড়া বিশ্বের অন্য কোথাও এ নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। এই যেমন, ইয়েমেন থেকে লিলি পরিসংখ্যান আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রেও তাই। আজ মিটিংয়ে পরিসংখ্যানের থেকে তাঁকে অনেক বেশি আবেগ মেশাতে হবে বক্তব্যে। তা হলে হয়তো রোহিঙ্গাদের কল্যাণে কিছু করা সম্ভব।

মার্থা এসে পেন ড্রাইভটা দিয়ে গেল। ল্যাপটপে সেটা ঢুকিয়ে রোকেয়ার পাঠানো ছবিগুলো দেখতে শুরু করলেন লিলি। বাংলাদেশের পাটেঙ্গা সমুদ্রতটে কয়েকটি মৃত শিশু উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। তাদের বয়স এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে। লোনা জলে ভেসে এসেছে। গায়ের চামড়া সাদা হয়ে গেছে। চিটাগং থেকে মাত্র চোদ্দো কিলোমিটার দূরে এই পাটেঙ্গা বিচ। সম্ভবত ইয়াঙ্গন থেকে বাবা-মায়ের সঙ্গে নৌকো করে পালিয়ে আসার সময় মায়ানমারে কোস্টাল গার্ড ওদের ধরে ফেলেছিল। বাচ্চাদের মেরে জলে ভাসিয়ে দেয়।

কিছু দিন আগে আমেরিকান কাগজগুলোতে এই ধরনের একটা ছবি দেখেছেন লিলি। সিরিয়ান বাচ্চার ছবি গ্রিসের উপকূলে। এই ঘটনা ঘটেছে এল সালভাদোরেও। সারা বিশ্বে এ সব হচ্ছেটা কী?

ল্যাপটপের পর্দায় একের পর এক ছবি ভেসে উঠছে। আর বুকের ভিতরটা খালি হয়ে যাচ্ছে লিলির। নিজে মা হতে পারেননি। কিন্তু চাইল্ড কেয়ার হোস্টেলগুলিতে থাকা শিশুদের কাছে তিনি মায়ের থেকেও বেশি। লিলি নিজেও জানেন, অপত্যস্নেহ কী। সত্যিই তিনি বুঝে উঠতে পারেন না, ধর্ম বড়, না মানবতা? মায়ানমারে এই মুসলিম শিশুগুলো কী দোষ করেছিল? বৌদ্ধরা তাদের প্রতি কেন এত নির্মম? বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের ঠাঁই দিয়েছে বলে প্রশংসা কুড়োচ্ছে। কিন্তু কোথায়? ছবি দেখে মনে হচ্ছে, মূল ভূখণ্ড থেকে বহুদূরে রেখেছে, ওদের অচ্ছুত মনে করে।

এমন একটা দ্বীপ, সেখানে আগে কোনও জনবসতি ছিল না। অস্থায়ী আস্তানায় কোনও রকম রোহিঙ্গারা মাথা গুঁজে আছে। শক্তসমর্থ পুরুষদের সংখ্যা খুবই কম। পুষ্টিহীন, রুগ্ন বিভিন্ন বয়সি বাচ্চারা কিলবিল করছে। পানীয় জলের অভাব। চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা নেই, ওষুধ নেই। উদ্বাস্তু শিবিরে যা খাবার যাচ্ছে, তা যথেষ্ট নয়। ইয়েমেনের আডেন বন্দরে তাদের ফাউন্ডেশনের একটা জাহাজ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইয়েমেন সরকার দেশের ভিতর খাবার ও ওষুধ ঢুকতে দিচ্ছে না। লিলি ঠিক করে নিলেন, ব্রিফিংয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করবেন এইভাবে যে, ওই জাহাজটি বাংলাদেশের ঠেঙার চরে পাঠানো হোক, যাতে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের মধ্যে দ্রুত খাবার আর ওষুধ বিলি করা যায়।

ছবিগুলো দেখা শেষ হতে না হতেই চেম্বারে ঢুকে এলেন বাম কিম। সাইবার সেলের লোকজন কী বলে গেল, সেটা শোনার জন্য লিলি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কারা এই সর্বনাশটা করতে যাচ্ছিল, কিছু শুনলেন?’

বাম কিম বললেন, 'ম্যাডাম, আমি বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি। আপনার খুব কাছের লোক। রক্ষকই শেষ পর্যন্ত ভক্ষক হয়ে দাঁড়াল।'

লিলি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হেঁয়ালি করবেন না মি. কিম।'

'ম্যাডাম, যাকে আমি ইঙ্গিত করছি, সে আপনার সিকিউরিটি গার্ড স্ট্যানলি গর্ডন। সাইবার সেলের লোকজন বলছেন, ফাউন্ডেশনের ক্লোজ কেউ হ্যাকারের হাতে কিছু তথ্য তুলে দিয়েছিল। তাঁকে খুব মেহনত করতে হয়নি। আমার ধারণা, সে স্ট্যানলি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। তবে, ও একা নয়। ওর পিছনে আরও বড় কোনও মাথা থাকতে পারে।'

'আশ্চর্য, স্ট্যানলির উপর আপনার সন্দেহটা হল কেন?'

'এখুনি একটা খবর পেলাম, ওর এজেন্সি চিফের কাছে। স্ট্যানলি কী কারণে মিচিগানে গেছে, শুনবেন? কনভার্ট হতে। আমেরিকার সবথেকে বড় মসজিদটা হল মিচিগানে। স্ট্যানলি ওখানে গিয়ে মুসলিম হল। ও না কি দু'একদিনের মধ্যেই সিরিয়ায় যাচ্ছে। জিহাদি ফোর্সে জয়েন করার জন্য। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলছে কি না বলুন। ম্যাডাম, আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এই জঘন্য কাজটা স্ট্যানলি করতে গেল কেন? আমার মনে হয়, জিহাদি দলে যোগ দেওয়ার আগে, ওখানে নিজের ওজন বাড়ানোর জন্য।'

শুনে বিশ্বাস হচ্ছে না লিলির। সকাল থেকে সব দুঃসংবাদ শুনছেন। বাম কিম বললেন, স্ট্যানলি একা নয়। ওর পিছনে আরও বড় কোনও মাথা থাকতে পারে। এর পর কার নাম উঠে আসবে, ভেবে শঙ্কাবোধ করলেন লিলি। কার উপর ভরসা করে তিনি এগোবেন? এই মুহূর্তে অ্যান্ডি পাশে থাকলে তিনি মনের জোর পেতেন। সেটা ফিরে পাওয়ার জন্যই ফোনে লিলি ধরার চেষ্টা করলেন তাঁর প্রিয় মানুষটাকে।

(ছত্রিশ)

পলাশকে হর্স ব্রিডিং সেন্টারে নিয়ে এসেছেন রোজিনা। দূরে লাল পাহাড়ের গায়ে সূর্য তখন ডুবছে। সারা আকাশ জুড়ে হলুদ আভা। জায়গাটা

র‍্যাঞ্চের মূল গেস্ট হাউস থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে। দিগন্তব্যাপী সবুজ, গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা অদ্ভুত শান্ত প্রকৃতি। এমন কী, পাখির কলতানও নেই। কাঠের গুড়ো বিছানো রাস্তা। দু'পাশে পাঁচ ফুট উঁচু কাঠের সুন্দর বেড়া। টানা চলে গেছে ব্রিডিং সেন্টারের দিকে। একটা ঘোড়ায় চেপেছেন রোজিনা। অন্যটার উপরএকজন কাউবয়ের সঙ্গে বসে আপ্লুত পলাশ। পাশাপাশি কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন দু'জন। পলাশ যা দেখছেন, তাতেই মুগ্ধ। কাউবয়দের আগে কখনও তিনি দেখেননি। ওদের পরনে সাদা টি শার্ট, নীল জিনসের টাইট প্যান্ট। হাঁটু অবধি চামড়ার জুতো। মাথায় কাউবয় টুপি। কিশোরসুলভ কৌতূহলে উনি নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। আর হাসিমুখে রোজিনা ওঁকে আন্দাজ দিচ্ছেন, ঘোড়াদের ঠিকুজি নিয়ে।

'ম্যাডাম ক'ন কী? একটা ঘোড়ার দাম সেভেন্টি মিলিয়ন ডলার?' শুনে চোয়াল ঝুলে পড়েছে পলাশের। 'আমাগো ট্যাহায় কত দাঁড়াইল তাইলে? সাতশো কোটি ট্যাহা! অ্যা, এ তো দেহি, প্লেনের থেইক্যাও দাম বেশি। হ্যার কুলজি কুষ্ঠি কী?

'হ্যায় ঘোড়াডার নাম ফুসাইচি পেগাসাস। থরোব্রেড জাইতের। আইরিশ মালিকের নাম কুলমোর স্টাড। দাম শুইন্যা চমকাইতাসেন ক্যান। এ গুলা রেসের ঘোড়া। রেসে ফুসাইচির ফ্যান্টাস্টিক রেকর্ড। হ্যারে যদি আফনে দ্যাখতে চান, তাইলে আফনেরে কেনটাকি যাইতে অইব। ফুসাইচি অহন রেস থেইক্যা রিটায়ার করসে। কিন্তু ঘোড়ার ব্রিডিংয়ে... মানে জন্ম দেওয়ার কাজে অহনও হ্যার খুব নাম।'

পলাশ জিজ্ঞেস করলেন, 'ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ঘোড়া কুনডা ম্যাডাম?'

'আমারে যদি ক'ন তাইলে কমু অ্যারাবিয়ান ঘোড়া। কিন্তু আমেরিকানরা মাইনতে চায় না। হ্যারা মনে করে, হ্যাগো কোয়ার্টার হর্সই বেস্ট। শর্ট ডিসট্যান্স রানে এই ব্রিডের ঘোড়া খুব ফাস্ট। কিন্তু রেসের ঘোড়া হিসাবে দাম বেশি থরোব্রেডের।'

‘মোটরগাড়ির যুগে অহন ঘোড়ার ইম্পরট্যান্স আসে না হি? কী কামে লাগে?’

‘এই যে কইলাম, রেসে নামে। কোটি কোটি ডলার আয় করে। ঘোড়া স্পোর্টসের মাঠে লাগে। ইকোয়েস্ট্রিয়ান, ড্রেসেজ, পোলো খেলায় দরকার। ক্যাটল পাহারা দিতে লাগে। এই যে আমরা ঘুরতে বাইর হইসি যে ঘোড়ায়, হেই দুইডা কোয়ার্টার হর্স। দাম সত্তর-আশি লাখ ট্যাহা অইব। কাউন্টি সাইডে কোনও বাসায় একটা আস্তাবল থাকা মানে, লোকডার পয়সাকড়ি আছে।’

‘একটা ঘোড়া ক’দ্দিন বাঁচে ম্যাডাম?’

‘পঁচিশ-তিরিশ বৎসর। যে ঘোড়াডায় আমি যাইতাসি, হ্যার আর আমার বয়স এক। একই দিনে আমাগো জন্ম হইসিল বইল্যা ড্যাডি আমারে গিফট দিসিল। হ্যার নামও রোজি। আমি না থাকলে কেউ রোজির উপর চাপে না। রোজি আমারে এত চেনে, শিস দিয়া ডাকলেই চইল্যা আসে।’

হর্স ব্রিডিং সেন্টারের দিকে আসার সময় কিছু ঘোড়া কাঠের বেড়ার ওদিকে চরে বেড়াচ্ছিল। দিনের আলো নিভের আসার সঙ্গে সঙ্গে একে একে আস্তাবলে ঢুকে যাচ্ছে। রোজিনা ছোটবেলা থেকে র‍্যাঞ্চের রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন। প্রতিটা জায়গা তাঁর চেনা। পলাশকে তিনি ঝরণার ধারে নিয়ে যেতে চান। ঝরণাটা মাইল পাঁচেক দূরে। একটু পরেই চাঁদ উঠবে। জ্যোৎস্নায় আলাদা রূপ খুলবে র‍্যাঞ্চের। সেই রোমান্টিক পরিবেশে প্রিয়তমকে গোপন কথাটা বলতে চান রোজিনা। কিন্তু আস্তাবলটা দেখতে চাইছেন পলাশভাই। সেদিকে যাওয়ার সময় উনি নানা অদ্ভুত প্রশ্ন করছেন। যেমন, শীতে ঘোড়ার ঠান্ডা লাগে কী না, বৃষ্টিতে ভিজলে অসুস্থ হয় কী না? একটা ঘোড়া বছরে ক’টা ঘোড়ার জন্ম দিতে পারে? রোজিনার সব জানা। অবলীলায় উত্তর দিচ্ছেন। শেষে একটা প্রশ্নে রোজিনা হোঁচট খেলেন।

‘ম্যাডাম ঘোড়া দাঁড়াইয়া ঘুমায় ক্যান?’

রোজিনা বললেন, 'আমার জানা নাই। হোস্টলাররা মানে... যারা ঘোড়ার সহিস, হ্যারা কইতে পাইরব। খাড়ান, ডি'কস্টা বইল্যা একজন হোস্টলার আসে, অনেক পুরানা লোক, হ্যারে কইয়া দিম। আফনেরে বুঝাইয়া দিব।'

আস্তাবলের বাড়িটা বিরাট। চল্লিশটার মতো ঘোড়া আছে। নিউ ইয়ার্সের আগে আর দু'একদিনের মধ্যেই ঘোড়াদের নিলাম হওয়ার কথা। আমেরিকার অন্য স্টেটগুলো থেকেও লোকে ঘোড়া কিনতে আসে। সারা দেশে প্রায় সত্তর হাজারের মতো র‍্যাঞ্চ আছে। কিন্তু রেসের মালিকরা রোজি র‍্যাঞ্চে এসে ভিড় জমান। কেননা, ভাল জাতের ঘোড়া এখানে পাওয়া যায়। ছোটবেলা থেকে রোজিনা দেখছেন, দূরের শহর বোস্টন, শিকাগো, নিউ জার্সি, ডিট্রয়েট এমন কী হিউস্টন থেকেও লোকেরা এখানে এসে, ঘোড়া কিনে প্লেনে করে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এসে কাউবয়কে রোজিনা বললেন, 'তুমি গেস্ট হাউসে ফিরে যাও। আমরা পরে আসছি।'

লাল রংয়ের পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছেন রোজিনা। তাঁর পিছনে কোমর ধরে বসে পলাশ। ঘোড়ায় উঠেই তাঁর উন্মুক্ত পিঠে একটা দীর্ঘ চুমু দিয়েছেন। সারা শরীর কেঁপে উঠেছিল সেই চুম্বনে। তখন থেকে রোজিনা ভাবছেন, সুখবরটা কীভাবে দেবেন। ক্রিসমাসের দু'দিন আগে থেকে কথাটা পলাশকে বলার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কোনও না কোনও কারণে ভেস্তে যাচ্ছে। প্রথমদিন পুলিশ লারেইনার নিখোঁজ হওয়ার খবরটা দিল। তার পরেরবার লিলি গডউইনের ডিনার থেকে ফিরে পলাশ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, চাইল্ড ডিটেনশন সেন্টার নিয়ে। একেক সময় মনে হয়, মানুষটা ডলার ছাড়া কিছু বোঝেন না। আরেক সময় মনে হয়, ডলারের কোনও মূল্যই নেই ওঁর কাছে। মুখে কখনও বলেননি, আই লাভ ইউ। কিন্তু ওর চোখের ভাষায় রোজিনা বুঝতে পারেন, তাঁর জন্য পলাশভাই সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারেন।

আজ লাঞ্চের পর খুব অল্প সময়ের জন্য মাম্মির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলেন রোজিনা। মাম্মি জানতে চাইছিলেন, বিয়ে করার কথা ওঁরা ভাবছেন কি না। কথাটা বললেন এইভাবে, 'আমার শরীর ভালা যাইত্যাসে না মা। পিঠের যন্ত্রণায় ঘুমাইতে পারি না। এত বৎসর হইয়্যা গেল, অহনও সুস্থ হইলাম না। তরা যত তাড়াতাড়ি পারস বিয়া সাইর‍্যা ফ্যাল।' তিনি একমাত্র মেয়ে। মাম্মির উদ্বেগ স্বাভাবিক। ড্যাডিও নিশ্চয় চান, জাঁকজমক করে ওঁদের বিয়েটা হোক। কিন্তু রোজিনা মনে করেন, এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। তাঁর জন্মের তিন বছর পর মামি-ড্যাডির বিয়ে হয়েছিল লাস ভেগাসের এক হোটেলের গির্জায়। মাম্মি-ড্যাডি তাঁর বিয়ের সময়টা বেছে নেওয়ার ব্যাপারেও স্বাধীনতা দেবেন। রোজিনা মাম্মিকে আশ্বাস দিয়েছেন, বিয়ে যখনই করুন, র‍্যাঞ্চে ছাড়া অন্য কোনও জায়গায় তা, ভাবতেই পারেন না।

'এখানে চাঁদটা কত বড়, দ্যাখেন দ্যাখেন ম্যাডাম। অ্যামেজিং। মনে হইতাসে, চূড়ায় উঠলে হাতে ধরা যাইব।' পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে পলাশ উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠলেন।

'পাহাড়ে যাইবেন না হি? চূড়ায় একটা বাংলো আসে। হনিমুনে রাইত কাটানোর জইন্য কাপলরা ভাড়া নেয়। তবে, ওহানে নেকড়া আর কালা ভালুক আসে কিন্তু।'

'না, তাইলে রিক্স নেওনের দরকার নাই।' উত্তর শুনে রোজিনা অবাক। মানুষটা কী ধাতুর তৈরি? অন্য কোনও প্রেমিক হলে চট করে রাজি হয়ে যেত। সারা রাত ধরে শরীরের সুখ নিত। রোজিনা জানেন, কেননা, র‍্যাঞ্চে তাঁর প্রেমিকের অভাব ছিল না। অনেকেই কাছাকাছি আসার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু তিনি পাত্তা দেননি। পলাশ তাঁর মনের ইচ্ছেটাই বুঝতে পারলেন না।

রোজিনা ঠাট্টা করলেন, 'ভয় পাইসেন না হি? আমার কাছে গান আসে। কোমরে হাত দিয়া দ্যাখতে পারেন। ওয়ালথার পি নাইন্টি নাইন। জার্মান মেড, সেমি অটোমেটিক পিস্তল। র‍্যাঞ্চে আইলে পিস্তলটা সবসময় আমার সঙ্গে থাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে রোজিনা টের পেলেন, পলাশের হাত তাঁর কোমরে ঘোরাঘুরি করছে। লেদার জ্যাকেট আর প্যান্টের মাঝের অংশটুকু খোলা। পলাশের আঙুল তাঁর নাভিতে। অন্য কেউ হলে আঙুলগুলি আরও নিচে নেমে যেত। কিন্তু প্যান্টের খাঁজ থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে পলাশ বললেন, 'লাইসেন্সড না হি?'

'র‍্যাঞ্চের ভিতর লাইসেন্সের দরকার হয় না। পিস্তলডা যেহানে সিল, সেহানে রাইখ্যা দ্যান পলাশ।'

ফের কয়েক সেকেন্ড তলপেটে পলাশের আঙুলের স্পর্শ পেলেন রোজিনা। তাঁর মুখ থেকে শিৎকারের শব্দ বেরিয়ে এল। চোখ বুঁজে অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করলেন তিনি। আর থাকতে পারলেন না। ঘোড়া থেকে চট করে নেমে, দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আসেন, নাইম্যা আসেন। আমার ঝরণার কাসে আইয়া গেসি। ওই শোনেন, পানির শব্দ শোনা যাইতাসে। আমার অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল, আফনেরে নিয়া আসুম।'

পলাশ ঘোড়া থেকে নামতেই রোজিনা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। বুকে মাথা রেখে বললেন, 'আমারে এট্টু আদর কইর‍্যা দ্যান পলাশ। শরীরডা ঝিমঝিম করত্যাসে। আর থাইকতে পাইরতাসি না।'

এ বার পলাশের মধ্যে উত্তেজনা টের পেলেন রোজিনা। দু'হাতে তাঁর মুখটা তুলে পলাশ ঠোঁট চুষে যাচ্ছেন। চোখ খুলে আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রোজিনা মনে মনে বললেন, তুমি সাক্ষী। তোমারে সামনে রাইখ্যাই আইজ পলাশরে কমু আফনের সন্তান প্যাটে ধরসি।' শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। পলাশকে আলিঙ্গন করে না থাকলে হয়তো ভূমিশয্যা নিতেন।

ঝরণা দেখার জন্য রাস্তার ধারে লোহার কারকার্য করা বেঞ্চ আছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে, পলাশকে পাল্টা চুমু দেওয়ার ফাঁকে রোজিনা যৌনকাতর গলায় বললেন, 'চলেন, বেঞ্চের উপর গিয়া বসি।'

কয়েক পা দূরেই বেঞ্চ। পলাশ পাঁজকোলা করে তাঁকে তুলে নিলেন। তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে রোজিনা বললেন, 'আফনেরে একডা কথা কওনের জন্য এহানে নিয়া আইলাম।'

পলাশ বললেন, 'আমি জানি। কওনের দরকার নাই। আমি বাবা হইতাসি, তাই না?'

বিস্ময় ঠিকরে বেরোল রোজিনার মুখ থেকে, 'কার মুখ থেইক্যা হুনলেন?'

'আফনের গাইনির কাসে। কাইল আফনে যখন ইমনের সঙ্গে কথা কইতাসিলেন, তখন গাইনি ম্যাডাম আফনেরে ফোন করসিল। ফোনটা আমি তুলসিলাম।'

'আফনে খুশি তো? মুখ-চোখ দেইখ্যা তো মনে হইতাসে না।'

কোল থেকে তাঁকে সযত্নে নামিয়ে, হাঁটু গেড়ে বসে পলাশ বললেন, 'আমারে বিয়া কইরতে রাজি আসো রোজিনা? এতদিন কইতে সাহস পাই নাই।'

শুনে আনন্দে বুকের ভিতরটা কুলকুল করে উঠল। একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে রোজিনা বললেন, 'আমি রাজি।'

পকেট থেকে ছোট্ট একটা অর্নামেন্ট বক্স বের করে আনলেন পলাশ। তার পর তাঁর বাঁ হাতের অনামিকা টেনে নিয়ে আংটি পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমারে যেদিন প্রথম দেহি, হেইদিনই প্ল্যাটিনামের এই আংটিটা কিইন্যা রাখসিলাম। হেইদিনই ঠিক কইর‍্যা ফেলি, যদি কোনওদিন বিয়া করি, তোমারেই করুম।' কথাটা বলতে বলতে হাতে চুমু খেলেন পলাশ।

ঠান্ডা বাতাস বইছে ধীর গতিতে। ঝরণা থেকে উড়ে আসা জলবিন্দুর স্পর্শ পাচ্ছেন দু'জন। পরস্পরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে দু'জন নির্বাক হয়ে বেঞ্চের উপর বসে। যেন দু'জনেই ভাবছেন, এই বন্ধনটা যেন সারা জীবন অটুট থাকে। জীবনে এইরকম একটা মুহূর্ত একবারই আসে। মানুষটার কাঁধে মাথা রেখে রোজিনা সুখের সাগরে ভাসছেন। পলাশের সঙ্গে তাঁর আলাপ বছর চারেক আগে। এতদিন ধরে মানুষটা আংটি সামলে রেখেছেন উপযুক্ত একটা মুহূর্তে তাঁকে দেবেন বলে! মানুষটাকে এত রোম্যান্টিক বলে কখনও মনে হয়নি রোজিনার। কাঁধে মুখ রেখেই ফিসফিস করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হেইদিনডার কথা আফনের মনে আসে?'

পলাশ বললেন, 'ক্যান থাইকব না। মনের মানুষ তো একবারই জীবনে আসে। তোমারে আমি প্রথম দেহি, নিউ ইয়র্কে ডলবি থিয়েটারের বাইরে উল্কি আঁকার দুকানে। হাতের কবজিতে বাংলায় তোমার নামটা লিখাইতাসিলা, রোজিনা। তোমারে দেইখ্যা আমার মনে হইসিল, প্যারাগন অফ বিউটি। ভগবান য্যান তোমারে তুলি দিয়া আঁইক্যা পৃথিবীতে পাঠাইসেন। তহন ভাবলাম, আমেরিকান একডা মাইয়া বাংলায় উল্কি আঁকাইতাসে, কেসটা কী? তুমি হয়তো আমারে লক্ষ করো নাই। দোকান থেইক্যা তুমি বাইর হইয়্য গেলা। আমি আমাগো আমোদপুরের মা কালীরে মনে মনে ডাইক্যা কইলাম, মাগো হ্যার সাথে আবার য্যান আমার দেখা হয়। মায় আমার কথা হুনছিলেন। কয়েকদিন বাদে তোমার সাথে দেখা হইল। ম্যানহাটনে ইম্পোর্ট এজেন্সির আপিসে। হেইদিন তোমার পরনে সিল ফ্লেয়ার্ড জিনস, সিল্ক র‍্যাপ ব্লাউজ আর কাঁধে ঝোলানো হলুদ ব্যাগ। কী অপূর্ব দেখাইতাসিল।'

'মাই গুডনেস, তোমার এত ডিটেলে মনে আাসে?'

'তাইর পর কী করসিলাম, হুনবা? আর্টিস্টরে কইলাম, আগের মাইয়াডা যে উল্কি আঁকাইয়া গেল, হেইডা আমারে কইর‍্যা দাও। হ্যায় আমারে

জিগাইল, মাইয়াডা কে হয় তোমার, গার্লফ্রেন্ড? আমি কইলাম, এখনও কেউ হয় নাই। তবে শিগ্গির অইব। আমার কাঁধের মাঝে ম্যাডাম, তোমার নামটা কিন্তু ল্যাখা আসে।'

পলাশ আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ওঁর ফোনটা বেজে উঠল। না দেখেই লাইনটা কেটে দিলেন উনি। ফের ফোন বেজে উঠল। ফের বিরক্ত হয়ে লাইন কেটে দিয়ে পলাশ বললেন, 'সেল ফোনডা গেস্ট হাউসে রাইখ্যা আইলে ভালা অইত। ভেরি ডিসটার্বিং।'

রোজিনা বললেন, 'তোমারে প্রথম নোটিশ করি, যেদিন তুমি আমারে নিউ ইয়র্কের লা বেরনারদিন রেস্টুরেন্টে নিয়া গেলা। তুমি হেইদিনই ইম্পোর্টের কাগজপত্র হাতে পাইস। আমারে কইসিলা, ম্যাডাম, আফনে আমার জইন্য লাকি। আফনের জইন্য আমি এত বড় একডা কন্ট্রাক্ট পাইয়া গেলাম। হুইন্যা আমি মনে মনে হাসসিলাম। ফ্লার্ট করার একডা সীমা আসে। কিন্তু তুমি যহন সেকেন্ড টাইম আমেরিকায় আইলা, তহন আমার মনে হইল, জীবনে তোমার মতো কাউরে আমি খুঁজতাসি। তোমারে লাইফ পার্টনার হিসেবে চুজ করলে আমার মাম্মি খুব খুশি অইব।'

'রোজি, রেস্টুরেন্টে হেইদিনও তোমার পরনে কী সিল, অহনও ভুলি নাই। কমু না হি?'

'থাউক থাউক। আর পরীক্ষা দিতে অইব না।' রোজিনা বললেন, 'মাম্মির খুব পসন্দ হইসে তোমারে। আমারে এগবার জিগাইল, কবে বিয়া করবি? ঠিক করছস না হি? আমি কইসি, বাচ্চা হওনের দুই বৎসর পর। তোমার কোনও আপত্তি নাই তো?'

ঘাড় নেড়ে পলাশ জানালেন, তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তার পর বললেন, 'আমি তো ভাবতেই পারতাসি না, বাবা হইতাসি। আমি পোলা চাই না। আমার মাইয়া য্যান তোমার মতো সুন্দরী হয়। কী নাম রাখব্যা, ভাবসো কিসু?'

‘তোমার মাইয়া, তুমি নাম ঠিক করব্যা।’ নিজের তলপেটে হাত বোলাতে বোলাতে রোজিনা বললেন, ‘কী অইব যিশুই জানেন। আমি গর্ভে নিসি। প্রার্থনা করি, য্যান সুস্থ বাচ্চার জন্ম দিতে পারি।’

পলাশের ফোনটা তৃতীয়বার বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নৈঃশধ ভেঙে দুটো পেঁচা ডাকতে ডাকতে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে গেল। লাইনটা ধরে পলাশ বললেন, ‘কও ইমন। কী খবর?’

বুকে মুখ গুজে শুয়ে রোজিনা। ইমনের গলা শুনতে পাচ্ছেন। ও বলল, ‘ছ্যার, ডিসটার্ব করার জন্য সরি ছ্যার। ভেরি ভেরি সরি।’

পলাশ বললেন, ‘আরে, হইসেডা কী কও? এত প্যানিকি হওনের কী আসে?’

‘ছ্যার, চিরাগ... চিরাগরে জিহাদিরা খুনের চেষ্টা করসিল। আইজ বিহানে হ্যার খোঁজে পুলিশ আফনের বাসায় আইসিল। হ্যাগো মুখেই হুনলাম, জিহাদিরা চিরাগরে এমন মারসে, সেন্সলেস হইয়া অহন হ্যায় হাসপাতালে। ছ্যার, আমি জানতাম না, হ্যায় জিহাদি।’

পলাশ ধমক দিয়ে বললেন, ‘আমারে মিথ্যা কথা কইও না ইমন। আমি জানি, তোমরা দুইজনেই জিহাদি। অহন কও, পুলিশ কি তোমারে অ্যারেস্ট করসে?’

ও প্রান্তে ইমন কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপর ভাঙা গলায় বলল, ‘অহনও করে নাই ছ্যার।’

‘আহাম্মক কোথাকার। তোমাগো আমি এত উপকার করলাম, আর তোমরা আমারে এই প্রতিদান দিলা? অহন যাও, জেলের রুটি খাও গিয়া। আমারে ফোন করস ক্যান? আমি তোমর লইগ্যা কিছু কইরতে পারুম না।’

‘ছ্যার, আমারে বাঁচান। আমি বাঁইচলে, আফনেও বাঁচবেন। চিরাগ লুকাইয়া একজন জিহাদিরে বাসায় লইয়্যা আইসিল। হ্যায়, আফনের আউট হাউসের বেসমেন্টে বইস্যা, আফনের অ্যাকাউন্টস হ্যাক করসে। লিলি গডউইনের

অ্যাকাউন্টস হ্যাক কইর‍্যাও হ্যায় হাফ মিলিয়ন ডলার সরাইয়া নিসিল। কিন্তু আমার চোখে পড়ায়, কিসু ক্ষতি করতে পারে নাই। আফনের কোম্পানিরও যা সর্বনাশ করসে, আমি মেরামত কইর‍্যা দিতে পারুম। হ্যার জন্য আমার সময় দরকার। তার আগে যাতে পুলিশ আমারে অ্যারেস্ট না করে।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে পলাশ বললেন, 'তুমি হ্যাকিংয়ের ব্যাপারে জানলা কী কইর‍্যা?'

ইমন বলল, 'ছ্যার, আফনেরে আমি হত্য কথা কই নাই। আমি একজন ফার্স্ট ক্লাস সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। এথিক্যাল হ্যাকার। একডা সময় বাংলাদ্যাশ ডিফেন্স অ্যাকাডেমির হইয়্যাও কাম করসি। আমারে মাফ করেন ছ্যার। আহাম্মকের মতো জিহাদি হইসিলাম। অহন বুঝতে পারতাসি, কী ভুল করসি।'

কী ভেবে পলাশ বললেন, 'তুমি আহাম্মক বইল্যা, আমি তো আর আহাম্মকের মতো কাম করতে পারুম না। তুমি ডালাসের প্লেনো বইল্যা একডা জায়গায় চইল্যা যাও। সেহানে রোজিনা ম্যাডাম চাইল্ড ডিটেনশন সেন্টার খুলতাসেন। অ্যাড্রেস পাঠাইয়া দিম। সেন্টারের চার্জে আছেন ডগলাস বইল্যা একজন। হ্যার কাসে গিয়া কইব্যা, সিকিউরিটি গার্ডের জন্য তোমারে রোজিনা ম্যাডাম পাঠাইসে। আর হ্যাঁ, প্লেনে যাওনের চেষ্টা কইরো না। আমার সিদান গাড়িডা লইয়্যা যাও। প্লেনোতে পৌঁছাইয়া আমারে খবর দিবা। মাঝে আমারে বা রোজিনা ম্যাডামরে ডিসটার্ব কইরো না। মনে থাকে য্যান।'

কাছাকাছি কোথাও থেকে গররর শব্দ ভেসে আসছে। অভ্যস্ত কান, রোজিনা বুঝতে পারলেন, কোনও বন্য জন্তু এসে হাজির রয়েছে। সন্ধের দিকে এই সময়টাই নেকড়ে আর কালো ভালুকের দল ঝর্ণার জল খেতে আসে। তখন বেড়ার লোহার দরজাটা বন্ধ করে রাখা হয়। ঝরণার দিকে তাকাতেই ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় তিনি দেখতে পেলেন, চার-পাঁচটা নেকড়ে জল খেতে খেতে ওঁদের লক্ষ করছে। লোহার দরজাটা হাট করে খোলা।

ভিতরে ঢুকে সবাই মিলে আক্রমণ করলে ক্ষতবিক্ষত হতে হবে। একমাত্র উপায়, ঘোড়ায় উঠে পড়া। কিন্তু নড়াচড়া করলেই নেকড়ের দল ওঁদের তাড়া করবে। আরও ভয়ের ব্যাপার, রোজিকে কাছাকাছি কোথাও দেখতে পেলেন না রোজিনা। ঘোড়াটা বোধহয় আপনমনে কোথাও চরতে গেছে। শিস দিয়ে ডাকলে অবশ্য এখুনি ফিরে আসবে। কিন্তু আওয়াজ করাটাও ঝুঁকির হয়ে যাবে।

নেকড়ের দলটাকে পলাশ দেখতে পাননি। ফলে বিপদটাও টের পাননি। সেল ফোন পকেটে ঢুকিয়ে আপন মনে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছেন ইমনকে। ওকে মানা করতে যাওয়ার সময়ই বিস্ফারিত চোখে রোজিনা দেখলেন, নেকড়ের দল ওঁদের দু'জনের দিকে এগিয়ে আসছে।

(সাঁইত্রিশ)

নিউ ইয়র্কে দু'একদিনের মধ্যে বড় ধরনের কোনও ঘটনা ঘটতে পারে। কালকেতুর মাথায় সুদীশের এই কথাটাই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাঞ্চ করে ফিরে আসার পর ও অন্য কোনও কাজে মন বসাতে পারল না। বারবার ওর মনে হতে লাগল, চিরাগের খোঁজ নিতে পুলিশ এ বার পলাশভাইয়ের বাড়িতে যাবে। জিহাদিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ ওঁকে হেনস্থা করতে পারে। ওরা যে জিহাদি, পলাশভাই কি সত্যিই তা জানতেন না? উনি এতটাই সাধাসিধে মানুষ ধরে নেওয়া কি ঠিক? অন্তত রোজিনা ম্যাডামের আচার-আচরণে কখনোই মনে হত না, ছেলে দুটোকে, বিশেষ করে চিরাগকে উনি পছন্দ করেন। ওর সম্পর্কে বেশ কয়েকবার কড়া কথাও কালকেতু বলতে শুনেছে ম্যাডামকে। যে পলাশভাই ম্যাডামের পরামর্শ ছাড়া এক পাও এগোন না, তিনি কী করে সন্দেহজনক ছেলে দুটোকে আশ্রয় দিয়ে নিশ্চিন্তে ছিলেন? কালকেতু ঠিক করে নিল, সন্ধেবেলায় দেখা হলে পলাশভাইকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করবে।

চিরাগের ধরা পড়ার খবরটা কি মিডিয়া জানে? কথাটা মনে হওয়া মাত্রই কালকেতু টিভি চালিয়ে দিল। না, টিভিতে অন্য খবর দেখাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট অ্যাডামস দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। এই খবরটা নিয়ে ডেমোক্রাটদের উষ্মা ফেটে পড়ছে। সরকারি কর্মচারীদের হাতে বেতন পৌঁছচ্ছে না। কী ভাবে সংসার চালাবেন তাঁরা, তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানাচ্ছেন তাঁরা চ্যানেলে। বিরাট মিছিল বেরিয়েছে নানা শহরে। ভারতে এ সব খবরই নয়। সরকারি কর্মীরা অফিস করবেন, অথচ মাইনে পাবেন না, এই সিদ্ধান্ত কোনও রাজনৈতিক নেতা নিতে সাহসই পাবেন না। এই খবরটা আমেরিকান মিডিয়া সারাদিন ধরে চটকাবে। বিরক্তিতে সোফা ছেড়ে উঠে কালকেতু বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল। গোধূলিবেলায় আকাশে রং একেবারে বদলে হলুদ হয়ে গেছে। নদীতে সুদৃশ্য ইয়টগুলোর মধ্যে একটা বিলাসবহুল বোটও কালকেতুর চোখে পড়ল। সন্ধেবেলার পার্টির জন্য ঘাটের কাছাকাছি অপেক্ষা করছে।

ঘরের ভিতর সেল ফোনটা বাজছে। ফের ঘরে ঢুকে ফোন হাতে নিয়ে কালকেতু দেখল, পর্দায় লারেইনার হাসিমুখ। ওর পরনে ক্যারেটেকার সাদা পোশাক। কালকেতু বলল, 'এতক্ষণ প্র্যাকটিস করছিলে না কি?'

লারেইনা বলল, 'হ্যাঁ। নতুন বছরের শুরুতেই ব্ল্যাক বেল্টের পরীক্ষা দিতে হবে। তাই প্রিপারেশন নিচ্ছি। আপনি কী করছেন?'

'তেমন কিছু নয়। তোমার রোজিনা ম্যাডামরা কোথায়, জানো।'

'ওঁরা তো গেস্ট হাউসে নেই। মি. পলাশ হর্স ব্রিডিং সেন্টারে গেছেন। ওঁদের ফিরতে দেরি হবে। আপনার দায়িত্ব ওরা আমার উপর দিয়ে গেছেন।' বলে হিহি করে হাসতে লাগল লারেইনা। 'এখন বলুন, আপনি কোথায় যেতে চান?'

ওর প্রশ্ন শুনে কথাটা মাথায় খেলে গেল কালকেতুর। বলল, 'মি. রায়ানের সঙ্গে কিছুসময় কাটানো যাবে?'

লারেইনা বলল, ‘কেন নয়? কখন দেখা করতে চান, বলুন?’

‘এখন সম্ভব হলে এখনই।’

‘দেখা করার কারণটা যদি উনি জানতে চান, তা হলে কী বলব?’

‘বোলো, ওর সাংবাদিক জীবনের গল্প শুনতে চাই।’

‘তা হলে উনি এখুনি রাজি হয়ে যাবেন। এই বিশাল র‍্যাম্পের মালিক হওয়া সত্ত্বেও উনি সেইদিনগুলোর কথা ভোলেননি। বলতে খুব আনন্দ পান। কিন্তু আগে আমাকে একবার ওঁর পিএসের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে। ঠিক আছে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি রিংব্যাক করছি।’

ফোনটা বন্ধ করে কালকেতু ফের টিভির দিকে মন দিল। পর্দার একপাশে চিরাগের মুখ। তার পরই পুরো পর্দা জুড়ে মেট্রো স্টেশনের পার্কিং চত্বর। পাশ দিয়ে রোজ যাতায়াত করে বলে কালকেতু চিনতে পারল। প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলছেন সিএনএন-এর সাংবাদিক। ভোর পাঁচটায় ট্রেন ধরতে গিয়ে তাঁর চোখে পড়ে একটা রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে সিঁড়ির কাছাকাছি। তখনই তিনি নাইন ওয়ান ওয়ানে ফোন করেন। নিউজ রিডার বলছেন, ‘ধৃত জিহাদির কোড নাম্বার আই সিক্সটি ফাইভ। অনেক দিন ধরে নিউ জার্সিতে এফবিআই তার খোঁজ করছিল। এফবিআই সূত্র থেকে একটু আগে জানা গেল, আই সিক্সটি ফাইভ সাইবার ক্রাইমের সঙ্গেও যে যুক্ত ছিল, তার প্রমাণ মিলেছে। সে এবং তার সঙ্গী মামুন মিলে চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের অ্যাকাউন্টস হ্যাক করেছিল। এই ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট মিস লিলি গডউইন। নিউ জার্সিতে পর পর দু’দিন দুই জিহাদিকে গ্রেফতার করল পুলিশ।’

খবরটা শোনার সঙ্গেসঙ্গে লিলি গডউইনের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল কালকেতুর। গত পরশু দিনই ডিনার টেবলে অনেকক্ষণ ধরে ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওরা গল্প করে এসেছে। বাচ্চাদের কল্যাণ নিয়ে কত কী

উনি ভাবেন। বলছিলেন, অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সংস্থাটা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। ফাউন্ডেশনই ওঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। অথচ, উনি একফোঁটা কৃতিত্বও নিজে নিতে চাননি। প্রতিটা কথায় বলছিলেন, তাঁর মেন্টর এলসা গিনেসবেরি ছাড়া তিনি এত বড় একটা সংস্থা গড়ে তুলতেই পারতেন না। আশ্চর্য, আমেরিকান মিডিয়া কতটা নির্দয় হতে পারে! এমন এক মহিলাকে প্রতিদিন নিন্দামন্দ করছে।

ডোর বেলের শব্দ শুনে কালকেতু উঠে দরজা খুলে দেখল, লারেইনা। ও বলল, 'চলুন, আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। মি. রায়ান এখন ক্যাসিনো কন্ট্রোল রুমে আছেন।'

গেস্ট হাউসে ঢোকার সময় দুপুরে ক্যাসিনো এরিয়াটা চোখে পড়েছিল কালকেতুর। একতলায় রিসেপশনের বাঁ দিকে। লিফটে করে নামার সময় লারেইনা বলল, 'ইমন কি এখন ছুটিতে? না কি নিউ জার্সির বাড়ি পাহারা দিচ্ছে?'

কালকেতু খুব কৌতূহল হল বলে জানতে চাইল, 'ম্যাডামের বাড়িতেই ওর থাকার কথা। কিন্তু হঠাৎ তুমি ওর কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?'

'টিভিতে দেখলাম, ওর কলিগ চিরাগ জিহাদি সন্দেহে ধরা পড়েছে। আমার অনেক আগেই সন্দেহ হয়েছিল মিঃ ন্যান্ডি। আউট হাউসে ক্লিনিং করতে গিয়ে, ওর বিছানার তলায় আমি জঙ্গিদের কিছু লিফটলেট আর সিডি পেয়েছিলাম। ম্যাডামকে সঙ্গেসঙ্গে তা জানাই। ম্যাডাম বলেছিলেন, কোনও অস্ত্র দেখতে পেলে লুকিয়ে তা নিয়ে আসতে। ওর বালিশের তলায় একটা জার্মান পিস্তলও একদিন দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা হাপিশ করতে পারিনি। তার পর একদিন ফাঁকা আউট হাউসে চিরাগ আমাকে মলেস্ট করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ও জানত না, আমি মার্শাল আর্টস জানি। ওকে আমি তুলে আছাড় মেরেছিলাম। ও আমাকে হুমকি দিয়েছিল, জানে মেরে দেবে। পরদিনই আমি কাউকে কিছু না বলে আলবুকার্কে চলে আসি।'

‘তুমি মি. পলাশ বা রোজিনা ম্যাডামকে কিছু জানালে না কেন?’

‘আমার উপায় ছিল না। চিরাগ আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, গায়ে হাত দেওয়ার কথাটা যদি কাউকে বলি, তা হলে রোজিনা ম্যাডামকে খুন করে দেবে। চিরাগের অসভ্যতার কথা ম্যাডামকে আজই বলেছি, এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে করে আসার সময়।’

লিফট থেকে বেরিয়ে এসে কালকেতু বলল, ‘আমার প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু তুমি দাওনি।’

লারেইনা বলল, ‘কোন প্রশ্ন? ইমন সম্পর্কে? ছেলেটা চিরাগের মতো নয়। আমার সঙ্গে রিসেন্টলি ওর দেখা হয়েছিল, নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে। অনেকক্ষণ ধরে ও আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। আপনি কি জানেন, ছেলেটা সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার? পেটের দায়ে গার্ডের চাকরি করছে?’

কালকেতুর কাছে এটা নতুন খবর নয়। ইমন নিজেও একবার ওকে বলেছিল। কিন্তু কতটা সত্যি, সুদীশকে জিজ্ঞেস করে বাজিয়ে দেখেনি। প্রসঙ্গটা আর না বাড়িয়ে লারেইনা পিছু পিছু ও ক্যাসিনোর ভিতর ঢুকে পড়ল। এর আগে জীবনে একবারই ক্যাসিনো দেখার সুযোগ পেয়েছিল নেপালের কাঠমান্ডুতে গিয়ে। কিন্তু র‍্যাঞ্চের এই ক্যাসিনোটা তার চেয়েও চারগুণ বড়। প্রায় হাজার খানেক মানুষ সিটে বসে নিবিষ্ট মনে জুয়া খেলছেন। তাঁদের মধ্যে ইয়ং ছেলে-মেয়েরা যেমন আছে, তেমনি সত্তর আশি বছর বয়সিরাও। হুইল চেয়ারেও এসেছেন কেউ কেউ। কালকেতু শুনেছে, ক্যাসিনোয় সবথেকে সহজ খেলা হল ব্ল্যাকজ্যাক। তাসের পাত্তি দিয়ে খেলতে হয়। জেতার সম্ভাবনা এই খেলাটাতেই সবথেকে বেশি। আরও দু’একটা খেলার নাম ও জানে। রুলেট, পোকার, ক্র্যাপস। কোনওটা ডাইস দিয়ে খেলতে হয়, কোনওটা চিপস দিয়ে। ও নিজে অবশ্য কোনওদিন খেলেনি।

টেবলগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লারেইনা বলল, 'আমাদের বেসমেন্টে যেতে হবে। ওখানেই মি. রায়ানের অফিস।'

বেসমেন্টে নেমে কালকেতু অফিস দেখে হকচকিয়ে গেল। কম্পিউটারের সামনে বসে প্রচুর লোক কাজ করছেন। বিরাট একটা কাচের মনিটরে পুরো র‍্যাঞ্চটা দেখা যাচ্ছে। হাতে ওয়াকিটকি, নীল পোশাক পরা একদল সিকিউরিটি গার্ড লক্ষ রাখছেন, প্রতিটা অঞ্চলের দিকে। করিডর দিয়ে হাঁটতে হ্যাঁটাতে বেশ কয়েকটা নামী রেস্তোরাঁও চোখে পড়ল ওর। সুন্দরী মেয়েরা সাদা লো ফ্রক পরে রেস্তোরাঁয় ঢুকছে-বেরোচ্ছে। তাদের হাতে খাবার অথবা পানীয়ের ট্রে। উপরে যাঁরা জুয়া খেলছেন, মনে হয় তাঁদের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। কাঠমান্ডুতে কালকেতুর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, রাত যত বাড়ে, ক্যাসিনোর আকর্ষণ তত বাড়ে। র‍্যাঞ্চে বোধহয় রাত বলে কিছু নেই।

মিঃ রায়ানের চেম্বারটা বুলেট প্রুফ কাচ দিয়ে ঘেরা। চেম্বারে ঢুকতেই কালকেতু জুঁই ফুলের গন্ধ পেল। রায়ান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, হাতজোড় করে পরিষ্কার বাংলায় আপ্যায়ন জানালেন, 'আলেইকুম সেলাম। আসেন, বসেন।'

কথাটা বলে উনি স্মিত হাসিতে মুখটা ভরিয়ে দিলেন। কালকেতুও প্রতি নমস্কার করে বলল, 'ধন্যবাদ।'

চেয়ারে বসে রায়ান ইংরেজিতে বললেন, 'আর্লি সেভেন্টিজে আমি বছর তিনেক ঢাকায় ছিলাম। তখন ফ্লুয়েন্টলি বাংলা বলতে পারতাম। মাঝে অনেক বছর হয়ে গেছে। প্রায় ভুলে গেছি। রোজির মা অবশ্য আমাকে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দ্যান।'

'ঢাকার কথা কি আপনার এখনও মনে পড়ে?'

'প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেছে। খুব বেশি কিছু মনে নেই। ধানমণ্ডি অঞ্চলে প্রায়ই আমাকে যেত হত শেখ মুজিবর রহমানের বাড়িতে।

বাংলাদেশ সংসদেও যেতাম। ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের কথা আমার মনে আছে। লিবারেশন ওয়ারের সময় খবরের জন্য যেতাম। পরে যেতে হত, আমার ফার্স্ট ওয়াইফ অসুস্থ হওয়ার পর। তখন ঢাকায় ভাল প্রাইভেট হসপিটাল ছিল না।'

'সকালে মি. গাটম্যান বলছিলেন, যে ছবিটার জন্য উনি পুলিৎজার পেয়েছিলেন, সেটা যাতে ছাপা হয়, তার জন্য আপনি না কি এডিটরকে কনভিন্স করেছিলেন?'

'কথাটা ঠিক। বাচ্চা মেয়েটার জন্য রিচার্ড যা করেছিল, তার তুলনা নেই। কিন্তু পরে পুরো কৃতিত্বটা নিয়ে চলে গেলেন আরেকজন।'

'আপনি কার কথা বলছেন?'

'মিসেস এলসা গিনেসবেরি। অসম্ভব চতুর মহিলা। ওই নির্লজ্জ সুইডিশ মহিলা তখনই বুঝতে পেরেছিলেন, ওয়ার ভিক্টিম বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে ফায়দা তোলা যাবে। রিচার্ড নিশ্চয়ই বলেছে, সেইসময় ঠিক যুদ্ধের পর মেয়েটা কতটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সারা বিশ্বের। সবাই অর্থ সাহায্য করতে চায়। সেটা বুঝে ভদ্রমহিলা আগ বাড়িয়ে মেয়েটার অভিভাবক হয়ে সবসময় মিডিয়ার সামনে হাজির হতেন। আমি সেইসময় ঢাকায় ছিলাম বলে ভদ্রমহিলার মতলব বুঝতে পেরেছিলাম। তার পর থেকে ওঁকে নিয়ে লেখালিখি একেবারে বন্ধ করে দিই। যতদূর আমার মনে আছে, ডাক্তার জোন্সও চটে গিয়ে রেড ক্রসের কাছে ওঁর সম্পর্কে কমপ্লেন করেছিলেন।'

মি. রায়ান ঠিকই বলছেন। কালকেতুর মনে পড়ল, সুদীশ পেন ড্রাইভে যে পুরনো পেপারকাটিংসগুলো ওর কাছে পাঠিয়েছিল, তাতে বম্বিংয়ের পর মেয়েটার সম্পর্কে খবর ছিল আট-ন'মাস পর্যন্ত। তার পর কাগজে আর কোনও লেখা বেরোয়নি। মেয়েটা ট্রিটমেন্টের জন্য গোথেনবার্গে চলে যাওয়ার পর থেকে ঢাকার কাগজ থেকে উধাও হয়ে যায়। এলসা গিনেসবেরি কার অনুমতি নিয়ে ওকে তখন গোথেনবার্গে নিয়ে গিয়েছিলেন?

প্রশ্নটা কালকেতুর মুখ থেকে বেরোতেই, রায়ান বললেন, 'নতুন দেশ... তখন ডামাডোল চলছে বাংলাদেশে। বিপর্যস্ত অর্থনীতি। দলে দলে রিফিউজিরা দেশে ফিরে আসছেন। পাছে মেয়েটার কোনও ফ্যামিলি মেম্বার এসে হাজির হন, এই আশঙ্কায় ভুগছিলেন মিসেস গিনেসবেরি। তাই তাড়াহুড়ো করে ওকে নিয়ে গোথেনবার্গে চলে যান। শুনেছি, বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি নিয়েছিলেন উনি।'

আরও খোলসা করে জানার জন্য কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'বাচ্চা মেয়েটার নাম কি আপনার মনে আছে?'

রায়ান বললেন, 'আসল নাম কী ছিল, আমি বা রিচার্ড কেউ জানতাম না। হাসপাতালে ওর নামটা রেজিস্টার্ড ছিল বেবি হিসেবে। নাম জানানোর মতো ক্ষমতা মেয়েটার ছিল না। আট-নয় মাস সে ট্রমার মধ্যে ছিল। তার মধ্যে ওর ফ্যামিলির কেউ খোঁজ করতেও আসেনি। কিন্তু, আপনি পার্টিকুলারলি ওই মেয়েটাকে নিয়ে জানতে চাইছেন কেন?'

কালকেতুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার গোল্ডেন জুবিলি উপলক্ষে একটা ডকু ফিল্ম করতে চাইছেন। আমার উপর ভার পড়েছে, রিসার্চ করার। তাই কিছু তথ্য আমার জানা দরকার। মিসেস গিনেসবেরির সঙ্গেও আমার কয়েকদিন আগে দেখা হয়েছিল। বাচ্চা মেয়েটার সম্পর্কে কিছু বলতে চাইলেন না। তখনই আমার খটকা লেগেছিল। কী এমন ব্যাপার, যা উনি লুকোতে চাইছেন?'

'বললাম তো, অসুস্থ বাচ্চা মেয়েটাকে ভাঙিয়ে উনি প্রচুর কামিয়ে নিচ্ছিলেন। খোঁজ নিয়ে দেখবেন, গোথেনবার্গে ফিরে যাওয়ার পর উনি রেড ক্রসের চাকরিটা খোয়ান। কিছু করে খেতে হবে। সেই কারণে চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশন নামে সেখানে একটা এনপিও খুলে ফেলেন। এটা করার দরকার হয়ে পড়েছিল। না হলে বিদেশি থেকে যে পরিমাণ অর্থসাহায্য আসছিল, তা আত্মসাৎ করা যেত না। আমি রিচার্ডকেও সব খুলে বলেছিলাম। কিন্তু ও

একটু অন্য টাইপের মানুষ। আমাকে বলত, যা হচ্ছে, হতে দাও। আফটার অল, মেয়েটা তো সুস্থ থাকবে। কিন্তু এই চৌর্যবৃত্তি আমি মেনে নিতে পারছিলাম না।'

'তা হলে, মিসেস গিনেসবেরি ফাউন্ডেশন লিলি গডউইনের হাতে তুলে দিলেন কেন?'

'উনি ক্রমশ ধরা পড়ে যাচ্ছিলেন। মেয়েটাকে প্রথম দিকে বাংলাদেশের মুসলিম বলেও চালানোর চেষ্টা করেছিলেন মিসেস গিনেসবেরি। একটা মুসলিম নামও দিয়েছিলেন। মুসলিম ওয়ার্ল্ডের সহানুভূতি আদায়ের জন্য। সেইসময় সৌদি আরব থেকে ভাল পরিমাণ ডোনেশন আদায় করেছিলেন। গোথেনবার্গে তখন ওঁর ডান হাত ছিলেন ডা. গডউইন বলে একজন ডার্মাটোলজিস্ট। মেয়েটা যাতে চট করে সেরে না ওঠে, তার ব্যবস্থা করেন এই ডাক্তার। উনি ভুল ট্রিটমেন্টও করেছেন সেইসময়। ভাবতে পারেন, কী অমানবিক হতে পারে মানুষ, রোজগারের জন্য? ঢাকা থেকে তখন আমি একটা স্টোরি করেছিলাম, এই মতলববাজি নিয়ে। সুইডিশ সরকার তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে। তড়িঘড়ি ডাক্তার গডউইন আমেরিকায় পালিয়ে যান। তার আগে মেয়েটাকে ব্যাপটাইজড করে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন। যাতে ক্রিশ্চান কমিউনিটি বা চার্চ থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলেও মিসেস গিনেসবেরি বাঁচেননি। আর্থিক জালিয়াতির জন্য এক বছর ওকে সুইডেনের জেলে কাটাতে হয়েছিল।'

রায়ানের মুখে অতীতের এইসব কথা শুনে কালকেতু অবাক হয়ে যাচ্ছে। কথায় ঝাঁঝ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, উনি মারাত্মক চটে আছেন। রায়ান আরও কী উগড়ে দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় লারেইনা দরজা খুলে ঝড়ের গতিতে কী যেন বলল স্প্যানিশে। শোনার পর রায়ানের মুখ থেকে কে যেন রক্ত শুষে নিল। লাফ দিয়ে উঠে তিনি দ্রুত মনিটর রুমের দিকে এগোলেন। পিছন পিছন লারেইনা কাঁদতে কাঁদতে হাঁটছে। এই তো মেয়েটা একটু

আগে হাসিমুখে কথা বলছিল। কী এমন হল, এখন কাঁদতে শুরু করেছে? দু'জনের কারও কথা কালকেতু বুঝতে পারেনি। বসে না থেকে ও উঠে গিয়ে মনিটর রুমে ঢুকল। সিকিউরিটির লোকেরা সবাই মনিটরের পর্দার দিকে তাকিয়ে। সেদিকে চোখ যেতেই কালকেতু শিউড়ে উঠল।

চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে, ঝরণার কাছে দুটো নেকড়ের বিরুদ্ধে একা লড়াই করে যাচ্ছেন পলাশভাই। তার বাঁ হাতে একটা পাথরের টুকরো। ডান হাতে পিস্তল। জামা রক্তে ভিজে গেছে। তবুও, গুলি করে একটা নেকড়েকে ছিটকে ফেলে দিলেন পলাশভাই। গুলির শব্দে বাকি নেকড়েগুলো পিছিয়ে গিয়ে হিংস্র মুখে গররর করছে। রোজিনা ম্যাডামের ছিন্নভিন্ন দেহটা জমিতে পড়ে। তাঁকে কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে একটা নেকড়ে! দৃশ্যটা দেখার পর মাথায় চক্কর দিয়ে উঠল কালকেতুর।

(আটত্রিশ)

সকালে ঘুম থেকে উঠেই বমি বমি ভাব। দাঁত ব্রাশ করার সময়ই টের পেলেন লিলি। হজমের গণ্ডগোল হল না কি? এমনিতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকেন তিনি। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন। রাতের দিকে হালকা কিছু খেয়েই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন। লিলি মনে করার চেষ্টা করলেন, কাল রাতে এমন কী খেয়েছেন, যাতে অ্যাসিডিটি হতে পারে? না, এমন কোনও স্পাইসি খাবার তো খাননি। একটা ভেজ স্যান্ডউইচ আর এক গ্লাস কোল্ড কফি খেয়েই তিনি শুয়ে পড়েছিলেন। তা হলে বমি পাচ্ছে কেন? একটু আধটু শরীর খারাপ হলে রেসিডেন্সিরই এক আবাসিক এবং প্রতিবেশী ডাক্তার সুধা রামচন্দ্রনকে তিনি ফোন করে দেন। ভারতীয় মেয়েটা এসে যা ওষুধ দেওয়ার, দিয়ে যায়।

লেজার ট্রিটমেন্টের সময় ডা. কিংসফোর্ড নতুন ওষুধ দিয়েছিলেন। বমি বমি ভাবটা কি তারই রিঅ্যাকশন? লিলি মনে মনে বললেন, বমি যদি হয়, তা হলে ডা. কিংসফোর্ডের ফার্মাসিস্টকে তিনি একবার ফোন করবেন।

আমেরিকায় ডাক্তাররা ডায়গনোসিস করেন বটে, কিন্তু ওষুধ লিখে দেন ফার্মাসিস্টরা। শরীরের অস্বস্তিটা টেনশনের জন্যও হতে পারে। গত দুটো দিন হ্যাকিং নিয়ে লিলি মারাত্মক চিন্তায় ছিলেন। বারবার সেই পরিস্থিতিটার কথা ভেবেছেন, ফাউন্ডেশনের হাফ মিলিয়ন ডলার যদি মরিশাসের ওই কোম্পানির অ্যাকাউন্টে চলে যেত, তা হলে কী হত? ট্রাস্টিদের... বিশেষ করে এলসা আন্টিকে তিনি কী জবাব দিতেন? কোম্পানির অ্যাকাউন্টস সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব যে একমাত্র তাঁর। আরও গুরুতর ব্যাপার, চ্যারিটি শো-য়ের এই সময়টায় অর্থের খুব প্রয়োজন।

এফবিআইয়ের সাইবার সেল তদন্ত করে যাওয়ার পরই সেদিন অফিস থেকে ফোন করে অ্যান্ডিকে সব জানিয়ে ছিলেন লিলি। অ্যান্ডি আশ্বাস দিয়েছিল, 'যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমি লাস ভেগাস থেকে একজন সফটওয়ার এক্সপার্টকে পাঠাচ্ছি। সে সব গুছিয়ে দেবে।'

থ্যাঙ্কস গিভিং ডে-র পর থেকে অ্যান্ডি বেশ কয়েকবার নিউ ইয়র্কে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে এসেছে। ওঁর ভালবাসার উত্তাপটা আরও বেশি করে টের পাচ্ছিলেন লিলি। অ্যান্ডি রাত্রিবাস করায় দু'জনের মধ্যে শারীরিক মিলনও হয়েছে। অনাস্বাদিত সেই সুখ দু'জনকে আরও কাছাকাছি এনে দিয়েছে ইদানীং। লিলির খুব ইচ্ছে ছিল, ক্রিসমাসের ছুটিতে তিনি লাস ভেগাসে যাবেন। কিন্তু মাঝখান থেকে সাশা, ড্যানিয়েলরা বাচ্চাদের নিয়ে তাঁর কাছে ছুটিটা কাটাতে চাওয়ায় সেই ইচ্ছেটা পূরণ হয়নি। অ্যান্ডি বলেছে, নিউ ইয়ার্স ইভ দু'জনে একসঙ্গে কাটাবে অ্যাটলান্টিকের কোনও নির্জন দ্বীপের রিসর্টে। কাউকে তাঁরা বলে যাবেন না। অ্যান্ডি নিজে প্লেন চালিয়ে নিয়ে যাবে সেখানে। এবং আগামীকালই সেইদিন।

গুগলকে কফির অর্ডার দিয়ে, সোফায় বসে একবার প্রেসার মেপে নিলেন লিলি। খুব একটা গড়বড় নেই। একশো তিরিশ আর পঁচাশি। অ্যান্ডিকে ফোন করতে যাবেন, এমন সময় ফের গলার কাছে বমি উঠে এল।

ওয়াশরুমে গিয়ে হড়হড় করে বমি করার পর একটু সুস্থবোধ করতে লাগলেন লিলি। নাহ, সুধাকে একবার ফোন করা উচিত। কথাটা মনে হতেই তিনি ফোন করলেন। নাম্বার দেখেই বুঝতে পেরেছে সুধা। বলল, 'গুড মর্নিং ম্যাম। আপনার শরীর ঠিক আছে তো?'

লিলি বললেন, 'না। মনে হয় বিগড়েছে। সকাল থেকে বমিভাব পাচ্ছিল। একবার হয়েওছে।'

সুধা বলল, 'ঠিক আছে ম্যাম, আমি আসছি। হাসপাতালে যাওয়ার পথে আপনাকে দেখে আসব।'

হাতে অনেক কাজ। অ্যান্ডির সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাওয়ার আগে সব সেরে ফেলতে হবে। চাইল্ড কেয়ার ইউনিট গুলো থেকে মান্থলি রিপোর্ট এসেছে। সেগুলিতে চোখ বোলানোর জন্য ফের লিলি সোফায় গিয়ে বসলেন। ল্যাপটপে মেল খুলে প্রথম রিপোর্টেই দেখলেন, ডালাস ইউনিটের বাচ্চারা স্কুলের পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করেছে। কিন্তু উঁচু ক্লাসের কয়েকটি ছেলের মধ্যে অদ্ভুত আচরণ লক্ষ করা যাচ্ছে। ইউনিটের ডাক্তার বলেছেন, ড্রাগ অ্যাডিকশনের লক্ষণ। মেল পড়েই চমকে উঠলেন লিলি। কী সর্বনাশ! স্কুলের মধ্যে ড্রাগ ঢুকল কী করে? সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফোন করলেন ডালাস ইউনিটের ইনচার্জ ডলি স্যান্ডারসনকে। 'আমাকে খুলে বলো, কী করে হল?'

'ম্যাম, কয়েক সপ্তাহ আগে মিসেস গিনেসবেরি স্কুল ভিজেটে এসেছিলেন। তিনি বাচ্চাদের টফি দিয়ে যান। তার পর থেকে কয়েকটা বাচ্চার মধ্যে টফির চাহিদা বেড়ে যায়। ডাক্তারের মনে হচ্ছে, সেই টফিতে ড্রাগ মেশানো ছিল।'

শুনে লিলি রেগে গেলেন, 'তুমি কার উপর দোষ চাপাচ্ছ, জানো? উনি এতটা ইরেসপন্সিবল হতেই পারেন না। ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখো, অন্য কোনও সোর্স থেকে ড্রাগ আসছে কি না?'

ডলি বলল, 'ম্যাম, তা হলে আমাকে লোকাল অ্যাডমিনিট্রেশনের সাহায্য নিতে হবে। আপনি অনুমতি দিলে আমি পুলিশকে জানাতে পারি।'

লিলি বললেন, 'আমাকে একটু ভাবতে দাও। বাচ্চাগুলো কেমন আছে?'

'ওদের আইসোলেশনে রেখেছি। এমনিতে নর্মাল, কিন্তু কোনও কোনও সময় ভায়োলেন্ট হয়ে যাচ্ছে।'

'কে টফিগুলো বাইরে থেকে আনছে, জানতে পেরেছ? কাউকে সন্দেহ হয়?'

'ম্যাম, একজনকে কড়া নজরে রেখেছি। পেড্রো পেরেজ বলে একজন সিকিউরিটি স্টাফকে। মিসেস গিনেসবেরি তাকে চাকরি দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিলেন।'

শুনে লিলি একটু অবাকই হলেন। একে তো এলসা আন্টি ডালাসের ইউনিটে যাবেন, তা তাঁকে জানাননি, তার উপর তাঁকে না জানিয়ে একজনকে চাকরিতে বহাল করে এলেন! ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার হিসেবে অবশ্য এমন কোনও গর্হিত কাজ করেননি। আচমকা ইউনিটে হাজির হতেই পারেন, কী রকম চলছে, তা দেখার জন্য। কিন্তু পেড্রো ছেলেটার ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন হয়েছিল কি? প্রশ্নটা করতেই ডলি বলল, 'এমনিতে সব ঠিক আছে ম্যাম। ছেলেটাকে নিজে এলসা ম্যাডাম নিয়ে আসেন। কিন্তু ভিক্টিম বাচ্চাদের একজন আমাদের বলে ফেলেছে, টফি তারা পাচ্ছে পেড্রোর কাছ থেকে।'

'ডলি, পুলিশকে ইমিডিয়েট জানাও। আমি মি. বাম কিমকে ডালাসে পাঠাচ্ছি। খবরটা যদি লিক হয়, তা হলে আমাদের খুব বদনাম হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে ম্যাম।'

ল্যাপটপের দিকে ফের চোখ দিলেন লিলি। দ্বিতীয় মান্থলি রিপোর্টটা বোস্টনের। পড়তে পড়তে চমকে উঠলেন তিনি। ওই ইউনিটের কয়েকজন বাচ্চার ডায়েরিয়া হয়েছে। পানীয় জল থেকে সংক্রমণ। হচ্ছেটা কি?

কয়েকজন বাচ্চাকে না কি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। বাচ্চাদের শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকেন লিলি। কোনও বাচ্চা যদি মারা যায়, তা হলে চ্যারিটি নেভিগেটর কম পয়েন্ট দেবে। পানীয় জল খারাপ হল কী করে? প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল, অথচ বোস্টন ইউনিট তাঁকে খবরটাই বা দেয়নি কেন? ফোন করতেই বোস্টনের ইনচার্জ জুলিয়া কার্টার বলল, 'ম্যাম, বাচ্চারা সুস্থ হয়ে গেছে। আপনি চিন্তা করবেন ভেবে জানাইনি। তা ছাড়া, এলসা ম্যাডাম সব নিজের চোখে দেখে গেছিলেন। উনি বলেছিলেন, ওয়াটার রিজার্ভার বদলানোর কথা আপনাকে জানাবেন।'

এটা তাঁর কাছে একটা খবর। লিলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এলসা আন্টি কবে বোস্টন গেছিলেন?'

'এই মাসের প্রথম সপ্তাহে। দু'দিন এখানে উনি ছিলেন। অ্যাকাউন্টসও চেক করে গেলেন।'

লিলি হিসেব করে দেখলেন, এলসা আন্টি তার পর তাঁকে দেখতে নিউ ইয়র্কের হাসপাতালে এসেছিলেন। আশ্চর্য, বোস্টন ইউনিট ভিজিট করার কথা তখন কিন্তু বলেননি। তা হলে কি উনি নজরদারি শুরু করেছেন? না, না, তা কী করে হবে? আন্টি তাঁকে অপত্যস্নেহে মানুষ করেছেন। কোনও কারণেই তাঁকে অবিশ্বাস করাযায় না। দু'হাতে মুখ ঢেকে লিলি সোফায় বসে রইলেন। সময়টা খারাপ যাচ্ছে। পর পর এমন সব ঘটনা ঘটছে, তিনি সেই অপবাদ আর নিতে পারছেন না। বিশেষ করে, তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক কারচুপির অপবাদ। বাংলাদেশিদের কাগজ যুগযুগান্ত না কি লিখেছে, মরিশাসের কোনও ফাইনান্সিয়াল কোম্পানিতে তিনি না কি মানি ট্রান্সফার করেছেন! এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর হয় না।

'মে আই কাম ইন ম্যাডাম?'

মুখ তুলে লিলি দেখলেন, লিভিং রুমের দরজায় বাম কিম দাঁড়িয়ে। ওঁর আসারই কথা ছিল। লিলি বললেন, 'প্লিজ আসুন। আপনার জন্যই ওয়েট

করছিলাম।'

'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কোনও কারণে আপসেট? আবার কী হল ম্যাডাম?'

ডালাস আর বোস্টন ইউনিটের কথা বলতে গিয়েও চেপে গেলেন লিলি। বললেন, 'কিছু না। রেজওয়ানা বলে বাংলাদেশি যে মেয়েটা সেদিন হাসপাতালে আমার ইন্টারভিউ নিতে এসেছিল, তার কন্টাক্ট নাম্বারটা কি আপনার কাছে আছে মি. কিম?'

'হ্যাঁ আছে। তার সঙ্গে আমার একটু আগেই কথা হল। আপনাকে ধরার চেষ্টা করেছিল, পায়নি। আমাকে মেয়েটা জিজ্ঞাসা করছিল, চ্যারিটি শো-তে রিহান্ন ফেন্টি গাইতে আসছে কি না? কিন্তু আপনি তাঁকে খুঁজছেন কেন ম্যাডাম?'

'মেয়েটা যে কাগজের রিপোর্টার, তারা লিখেছে, আমি না কি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার চেষ্টা করছি। এবং সেই কারণেই...।'

মাঝপথেই তাঁকে থামিয়ে দিলেন বাম কিম। বললেন, 'আমি ওই রিপোর্টের ইংরেজি তর্জমাটা পড়েছি ম্যাম। এটা সত্যি, আপনি নন, আমাদেরই ফাউন্ডেশনের একজন সিরিয়াসলি চেষ্টা করছেন পিস প্রাইজের জন্য। নামটা শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন না।'

'কে তিনি? আমাকে বলুন।'

'মিসেস এলসা গিনেসবেরি। মাফ করবেন ম্যাডাম, গুজবটা কিছুদিন আগেই আমার কানে এসেছিল। কিন্তু পরে কনফার্ম করেছি।'

হাঁ করে বাম কিমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন লিলি। এতক্ষণ রেজওয়ানা বলে মেয়েটার উপর রাগ হচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে, ওর দোষ কী? ওদের রিপোর্টাররা খবর পেলে তো ছাপবেই। বাম কিম যখন বলছেন, তখন খবরের খানিকটা ভিত্তি আছে। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার কাছে কনফার্ম করলেন?'

‘ম্যাডাম, আগেই আপনাকে বলেছি, ইন্টারপোলের কিছু অফিসারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। তাদের কাছে জানতে পারলাম, মিসেস গিনেসবেরি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, সিলেকশন লিস্টে তাঁর নামটা তোলার। উনি জুরিদের কেনারও কাজ শুরু করে দিয়েছেন। দুঃখের কথা হল, আজকাল নোবেল, অস্কার এইসব প্রাইজগুলো এখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে। আপনার যদি কেনার সামর্থ না থাকে, তা হলে প্রভাবশালী অন্য কেউ, তাঁর স্বার্থে আপনার জন্য প্রাইজ জোগাড় করে দেবে।’

‘এলসা আন্টির জন্য এমন কেউ আছেন না কি?’

‘আছেন ম্যাডাম। তিনি একজন ডেমোক্রাট সেনেটর। প্রেসিডেন্ট অ্যাডামসের কট্টর বিরোধী। এ কথা আপনাকে জানাব না ভেবেছিলাম। দু’হাজার আঠারো সালে শেষবার নোবেল পিস প্রাইজ দেওয়া হয়। তা জয়েন্টলি পেয়েছিলেন কঙ্গোর গাইনোকলজিস্ট ডেনিস মুকওয়েজে আর ইরাকের মেয়ে নাদিয়া মুরাদ। চূড়ান্ত কয়েকজনের তালিকা থেকে এই দু’জনকে বেছে নেন জুরিরা। সেবারও মিসেস গিনেসবেরি তালিকায় ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নামটা তোলাতে পারেননি। এ বার কোমর বেঁধে নেমেছেন।’

‘নোবেল শান্তি পুরষ্কার দেওয়া হয় কিসের জন্য মি. কিম?’

বাম কিম হেসে বললেন, ‘বিশ্বশান্তির কোনও উল্লেখ্য অবদানের জন্য। ডেনিস মুকওয়েজে কঙ্গো যুদ্ধের সময় প্রায় দশ হাজার রেপ ভিক্টিমের চিকিৎসা করে, তাদের সুস্থ করে তোলেন। কোনও কোনও মহিলার একাধিকবারও অপারেশন করেছিলেন। আর নাদিয়া নিজেই একজন ওয়ার ভিক্টিম। ওর যখন উনিশ বছর বয়স, তখন আইএস জঙ্গিরা ওকে ইরাকের এক গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে গেছিল। বছর তিনেক যৌনদাসীও করে রাখে। সেখান থেকে পালিয়ে নাদিয়া কোনওভাবে জার্মানিতে যান। তার পর

থেকেই যুদ্ধে সেক্সচুয়াল ভিক্টিম মহিলাদের সাহায্যে একটা সংস্থা গড়ে তোলেন।'

লিলি বললেন, 'তাই যদি হয়, তা হলে এলসা আন্টিরও প্রাইজ পাওয়া উচিত। ওয়ার ভিক্টিম বাচ্চাদের জন্য উনিও তো কিছু কম করেননি।'

বাম কিম স্মিত হেসে উত্তর দিলেন, 'তা সত্ত্বেও উনি পাবেন না। কেননা, ওঁর বিরুদ্ধে পুলিশ রিপোর্ট আছে। আর্থিক জালিয়াতির জন্য উনি একবার জেলে গেছিলেন।'

চমকে উঠে লিলি বললেন, 'কী বলছেন আপনি? কই, আমি তো কখনও শুনিনি?'

'শুনবেন কী করে? আপনি তখন নিউ ইয়র্কে চলে এসেছেন। ম্যাডাম, আগে কখনও বলিনি, কিন্তু এ বার কথাটা যখন উঠেছে, তখন খোলাখুলি আপনাকে বলি, এই মহিলা থেকে সাবধান। সারা জীবন ইনি আপনাকে ভাঙিয়ে খেয়েছেন। আপনার ইমেজ এখন এত বেড়ে গেছে, ইনি তা সহ্য করতে পারছেন না। আপনাকে তাই ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন। ইনি সফল হলে পুরো ফাউন্ডেশনের বারোটা বেজে যাবে। কাল এফবিআইয়ের সাইবার সেলের ফাইন্ডিংস থেকে আমি বুঝে গেছি।'

শুনতে শুনতে দুর্বলবোধ করছেন লিলি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফাইন্ডিংসটা কী?'

'মিসেস গিনেসবেরি আপনার নামে আর্থিক কারচুপির অপবাদ লেপে দিতে চাইছেন। আপনাকে গতকাল একটা কথা বলেছিলাম, মনে আছে কি না জানি না। আমাদের টয় ডিভিশনের অ্যাকাউন্টস থেকে বিশাল একটা অঙ্ক মরিশাসের এক ফাইনান্সিয়াল অর্গানাইজেশনে পাচার হয়ে গেছিল। ইন্টারপোল এফবিআইকে জানিয়েছে, মিসেস গিনেসবেরি একটা সময় ছুটি কাটাতে প্রায়ই মরিশাসে যেতেন। আপনার নাম করে উনিই বাংলাদেশের রোকেয়া সুলতানাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ডোনেশন হিসেবে তোলা কিছু

অর্থ মরিশাসের ওই অর্গানাইজেশনে জমা দিতে। মারা যাওয়ার আগে সেকথা রোকেয়া তাঁর ছেলেকে বলে যান। টেপ করা সেই জবানবন্দি ইন্টারপোল পেয়ে গেছে। বাংলাদেশের মিডিয়ার কাছ থেকে।'

'কিন্তু আমাকে অপদস্থ করে এলসা আন্টির কি লাভ মি. কিম? আমাকে যদি মুখ ফুটে একবার উনি ফাউন্ডেশন থেকে চলে যেতে বলেন, আমি এক মুহূর্ত দ্বিধা করব না ছেড়ে দিতে।'

'ঘুণাক্ষরেও এ কথা মনে স্থান দেবেন না ম্যাম। আপনি চলে যেতে চাইলেও আমরা আপনাকে যেতে দেব? কিছুতেই না। মিসেস গিনেসবেরিকে এফবিআই অলরেডি ফ্রেম করার কথা ভাবছে। ওঁর সঙ্গে জঙ্গি কানেকশনেরও সূত্র খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে। রেড ক্রস থেকে ঘাড়ধাক্কা খাওয়ার পর মিসেস গিনেসবেরি মোসুলের এক আইএস ক্যালিফেটে নার্সের চাকরি করতে গেছিলেন। সেইসময় এক জিহাদি মামুন আল ফরখ-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে সেইসময় মামুন হাসপাতালে ছিল। মিসেস গিনেসবেরি তখনই জানতে পারেন, মামুন একজন ক্র্যাকার। রিসেন্টলি মামুন নিউ জার্সিতে ছিল। ওকেই আমাদের অ্যাকাউন্টস হ্যাকিংয়ের কাজে লাগিয়ে ছিলেন মিসেস গিনেসবেরি।'

'কী বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি ম্যাডাম। আমার তো মনে হচ্ছে, নায়গারায় আপনার উপর টেররিস্ট অ্যাটাকের পিছনেও মিসেস গিনেসবেরির হাত ছিল। আপনি যে নায়গারায় যাচ্ছেন, সেটা একমাত্র উনিই জানতেন। ওখানে জঙ্গিরা যদি সফল হত, তা হলে উনি ফাউন্ডেশন পুরোপুরি কবজা করে নিতেন।'

অপ্রত্যাশিত কথাগুলো শুনতে শুনতে লিলি সত্যিই অসুস্থবোধ করছেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বাম কিম হয়তো কিছু আন্দাজ করেছেন। সোফা ছেড়ে উঠে এসে উনি বললেন, 'ম্যাডাম, আপনাকে দেখে আমার ভাল লাগছে না। আমি এখুনি ডাক্তার ডাকছি।'

কথাটা ওঁর মুখ থেকে বেরতে না বেরতেই সুধা রামচন্দ্রনের সহাস্য মুখটা লিলি দেখতে পেলেন লিভিং রুমের দরজায়। বাম কিমও তাঁকে চেনেন। উনি বললেন, 'আপনি ঠিক সময়ে এসেছেন। ম্যাডামকে একটু পরীক্ষা করে দেখুন। মনে হচ্ছে, উনি ভাল নেই।'

সুধা বললেন, 'চলুন, আপনার গেস্ট রুমে চলুন। দেখি, প্রবলেমটা কী।'

গেস্ট রুমে গিয়ে লিলি ডিভানে শুয়ে পড়লেন। কয়েক মিনিট ধরে ধরা-বাঁধা চেক আপ করে সুধা মুচকি হাসলেন। তার পর বললেন, 'কনগ্র্যাটস ম্যাম। আপনি কনসিভ করেছেন। মা হতে যাচ্ছেন। বেটার লেট দ্যান নেভার।'

শুনে সঙ্গেসঙ্গে লিলি বিছানায় উঠে বসে বললেন, 'কী বলছেন? আপনি সিওর?'

সুধা বললেন, 'আমার তো তাই মনে হচ্ছে। কাল আমার লোক এসে আপনার ইউরিন স্যাম্পল নিয়ে যাবে। তার পর ডেফিনিট বলতে পারব।'

মাথা ঘুরতে শুরু করেছে লিলির। তিনি প্রেগনেন্ট! হ্যাঁ, অ্যান্ডির সঙ্গে একাধিকবার তাঁর যৌনমিলন হয়েছে। এবং কোনও প্রোটেকশন ছাড়াই। কেননা, এতদিন ধরে তিনি জানতেন, কোনওদিন মা হতে পারবেন না। কথাটা তাঁকে বলেছিলেন এলসা আন্টি। সেইসময় অ্যান্ডিকে তিনি জীবনসঙ্গী করার কথা ভাবছিলেন। তা হলে এলসা আন্টি তাঁকে মিথ্যে কথা বলেছিলেন? তিনি কি চাননি, বোনপো অ্যান্ডির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হোক?

তা হলে তো মি. কিমের কথাটাই ঠিক। এলসা আন্টি তাঁকে সারা জীবন ভাঙিয়ে খেয়েছেন! কিম আর যা যা বলছিলেন, মন থেকে কোনওটাই উড়িয়ে দিতে পারলেন না লিলি। গর্ভবতী হওয়ার খবরটা অ্যান্ডিকে এখনই দেবেন কি না, তিনি মনস্থির করতে পারলেন না।

(উনচল্লিশ)

ভোর রাতে ভয়ানক একটা স্বপ্ন দেখেছে ইমন। কোথায় যেন একদল নেকড়ে ওকে তাড়া করেছে। প্রাণপন দৌড়তে দৌড়তে ও পাহাড়ের চূড়ায় উঠে, পিছন ফিরে দেখে নেকড়ের দল উধাও। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুনের লম্বা লম্বা শিখাগুলো যেন ফুঁসছে। দূরদূরান্তে কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন নেই। গাছ-গাছালি নেই। আকাশটাও আগুন রংয়ের। দেখে ওর ভয় লেগে গেল। ছোটবেলায় দাদির মুখে ও শুনেছিল, যারা গুণাহ করে, তাদের ঠাঁই হয় দোজখে। সেখানে হাজার হাজার বছর ধরে আগুন জ্বলছে। এটা সেই দোজখ না কি? এখানে ওকে নিয়ে এল কে?

আতঙ্কিত হয়ে ইমন ফের পিছন দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, আগুনের মধ্যে থেকে নেকড়েগুলো বিকটদর্শন মানুষের রূপ ধরে উঠে আসছে। কাছে এসে মুখে তারা গররর শব্দ করতে লাগল। তার পর ওর হাত ধরে টেনে, ছুড়ে ফেলে দিল আগুনের মধ্যে। আগুনের মধ্যে দিয়ে ইমন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। দাদি বলেছিল, দোজখ এমন একটা গর্তের মধ্যে, উপর থেকে কোনও পাথর ফেললে, সেখানে পৌঁছতে সত্তর বছর সময় লেগে যায়। আগুনে পুড়ে খাক হতে হতে ইমন বুঝতে পারল, ওর ধারণাই ঠিক। আল্লা তালাহর বিধানে ও পাপী সাব্যস্ত হয়েছে। আগামী উনসত্তর হাজার বছর ওকে এই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেই কাটাতে হবে। দাদি বলত, দোজখের সাতটা দ্বার। জহিম, লাজাহ, সাকর, খুতামোহ এবং তার পর খাবিয়া। এই পঞ্চম দ্বারে ফরেস্তা এসে ওকে আগুন খেতে বলবেন। তার পর সাইর, যেখানে ওকে পেরোতে হবে তিনশোটা আগুনের পর্দা। ওর শরীর তখন কাঠকয়লার রূপ নেবে। একেবারে শেষের দ্বার হল জাহান্নুম। শাস্তির শেষ গন্তব্য।

অত ঠান্ডায় কম্ফর্টারের তলায় শুয়ে ইমন দরদর করে ঘামছে। ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসার পর অনেকক্ষণ ঠকঠক করে কেঁপেছে। জীবদ্দশায় দোজখ দর্শন ভাল লক্ষণ না। নিশ্চয়ই কোনও একটা মারাত্মক কিছু ঘটতে

যাচ্ছে ওর জীবনে। চিরাগ থাকলে ও ব্যাখ্যা করতে পারত। কিন্তু ও এখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে পুলিশ কাস্টোডিতে। অন্ধকার ঘরে বিছানায় বসে চোখ খুলতেই ভরসা পেল না ইমন। পাছে দোজখের ওই বিকটদর্শন লোকগুলোকে আবার দেখতে হয়। খানিকক্ষণপরেই ওয়ার্বলার পাখির ডাক শুনে ও স্বস্তি পেল। চড়ুইয়ের মতো দেখতে পাখিগুলো ভোরবেলায় এ গাছ থেকে ও গাছ উড়ে বেড়ায়। তার মানে ভোর হয়ে গেছে। আর ও নিউ জার্সিতে পলাশছ্যারের বাড়িতেই আছে।

বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে ইমন দেখতে পেল, আগুন নয়। লন জুড়ে হালকা সাদা কুয়াশা। মেন বিল্ডিংটা যেন মসলিন দিয়ে কেউ ঢেকে রেখেছে। কিন্তু ছবির মতো বাসাটা মৃত্যুপুরীর মতো মনে হচ্ছে। যেন কোনও দুঃসংবাদের অপেক্ষায়। হঠাৎ কেন যে ওর এ কথাটা মনে হল, ইমন বুঝতে পারল না। পলাশছ্যাররা ছুটি কাটিয়ে কবে ফিরে আসবেন, ও জানে না। যেন সহি সলামাত ফিরে আসেন। ওর আসল পরিচয় জানার পরও পলাশছ্যার ছুঁড়ে ফেলে দেননি। উল্টে, ওকে বাঁচানোর জন্য ডালাসে চলে যেতে বলেছেন। অন্য কেউ হলে কিন্তু, পুলিশের হাতে তুলে দিতেন। মানুষটার মনে এত দয়া! ইমন ভেবে রাখল, এর পর যেখানেই পলাশছ্যারের সঙ্গে ওর দেখা হোক না কেন, ছ্যারের দু'পা ও চেপে ধরবে। অনুরোধ করবে, 'ছ্যার, আমারে দ্যাশে নিয়া চলেন। হারাডা জীবন আফনের গোলাম হইয়া থাকুম।'

কম্ফর্টার জড়িয়ে ইমন বারান্দায় বেরিয়ে এল। পরশু রাতে ঠিক এইখানটাতেই চিরাগের উপর জমা রাগ ও উগড়ে দিয়েছিল। তার পর ওর অচেতন দেহটাকে সিদানে তুলে চলে গেছিল মেট্রো পার্ক স্টেশনের কাছে। ইচ্ছে করলে ওকে মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু পাপের ভাগী হতে চায়নি। আল্লা তালাহ-র দুনিয়ায় ও শাস্তি দেওয়ার কে? চিরাগ একজন রেপিস্ট, মার্ডারার... ওকে জাহান্নুমে পৌঁছে দেওয়ার বিচার আল্লাহ ঠিকই করবেন।

ইমন যে গর্হিত কাজটা শুধু করেছিল, সেটা হল, ঘৃণা উগড়ে দেওয়ার জন্য চিরাগের শরীরে থুতু ছিটিয়েছিল। তার পর স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে, উপর থেকে লক্ষ রাখছিল, পুলিশ কখন বডিটা তুলে নিয়ে যাবে। আকাশে আলো ফুটতে না ফুটতেই পুলিশের অ্যাম্বুল্যান্স এসে চিরাগের বডিটা তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ইমন বাসায় ফিরে আসে। তার পর বারান্দা থেকে রক্তের দাগ মুছেছিল।

বারান্দার সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে ইমন আরও একবার নিশ্চিন্ত হতে চাইল, রক্তের কোনও চিহ্ন পড়ে আছে কি না। আপাতদৃষ্টিতে নেই। কিন্তু ইমন জানে, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা কোনও একটা কেমিক্যাল স্প্রে করে থাকেন। তাতেই বুঝে যান, রক্তপাত হয়েছিল কি না? কাল বিকেলবেলায় পুলিশ যখন চিরাগের খোঁজে এ বাড়িতে আসে, তখন ইমন আউট হাউসে কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত। পলাশছ্যারের এক্সপোর্ট কোম্পানির নেটওয়ার্ক মেরামত করার জন্য। পুলিশ দেখে ওর উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা। কিন্তু কালকেতুছ্যারের বন্ধু সুদীশছ্যারকে দেখে ও ঘাবড়ায়নি। মানুষটা আউট হাউস সার্চ করে কিছুই পাননি। চিরাগ সম্পর্কে দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করেই উনি চলে গেলেন। ইমন ওঁকে সেই গল্পই করেছে, যা পলাশছ্যারকে বলেছিল। ওদের আলাপ পাবলিক স্টোরেজে। চাকরি গিয়েছে একই দিনে।

বারান্দায় বসে লনে খরগোশ আর কাঠবেড়ালির খেলা দেখতে দেখতে ইমন শুনতে পেল, ওর সেল ফোনটা বাজছে। এত সকালে কে ওকে ফোন করতে পারে? পুলিশের নয় তো? উঠে গিয়ে দেখল, ভিডিয়ো কল। সেল ফোনের পর্দায় আম্মিকে দেখে ইমন চমকে উঠল। আম্মির সঙ্গে ও শেষবার কথা বলেছিল, দাদামশায়ের তখন ট্রায়াল চলছে। তাও প্রায় এক বছর হতে চলল। তখন আম্মির উদ্বিগ্ন মুখটা দেখে ওর মন খারাপ হয়ে গেছিল। আম্মির চোখের কোণে কালি, শুষ্ক মুখ। পরনে ছিল সাধারণ ছাপা শাড়ি। যা গরিব ফ্যামিলির বউ-ঝিরা পরে। কিন্তু আজ আম্মির পরনে সাদা কারুকাজ

করা জামদানি শাড়ি। ফলে আগেকার আভিজাত্য ফিরে এসেছে। আম্মিকে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে।

কিন্তু আম্মি ওর এই ফোন নাম্বারটা পেলেন কী করে? সেল ফোনটা ওকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন পলাশছ্যার। ওঁর মাথায় হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত খেয়াল চাপে। একদিন নিউ ইয়র্ক থেকে ফেরার পথে ছ্যার জানতে চেয়েছিলেন, 'দ্যাশে ফেমিলির কারও সাথে যোগাযোগ আছে? না হি খোঁজই নাও না।' ইমন বলেছিল, 'আমার ফোন নাই ছ্যার।' পরের দিনই সেল ফোনটা গিফট করে পলাশছ্যার বলেছিলেন, 'এই নাও। রুজ আববা-আম্মির সাথে কথা কইবা। হ্যাগো কুনও বিকল্প নাই। এত দূরে আসো, দ্যাখবা, মনে শান্তি পাইবা।' না করতে পারেনি ইমন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমোদপুরে ফোন করার ইচ্ছে হয়নি ওর।

ও প্রান্ত থেকে আম্মি জিজ্ঞেস করল, 'ক্যামন আছস বাবা?'

শুনেই চোখে পানি এসে গেল ইমনের। গলার ভিতর একদলা বাষ্প আটকে গেল। কোনও রকমে ও প্রশ্ন করল, 'আপনে আমার ফোন নাম্বার পাইলেন কুথায় আম্মি?'

'কুসুমের আববু আইসে আমাগো বাসায়। হ্যায় তর নাম্বারটা ধইর‍্যা দিয়া কইল, আফনে ইমনরে চইল্যা আইসতে ক'ন আপা। ফতিমার নিকাহ-র আগে হ্যায় য্যান দ্যাশে ফেরে।'

ছোটবোন ফতিমার নিকাহ! শুনে ইমন ভুলেই গেল প্রশ্নটা করতে, কুসুমের আববু আমার ফোন নাম্বার পাইল কী কইর‍্যা? তার বদলে বলল, 'কোথায় ঠিক হইল হ্যার বিয়া?'

আম্মি বলল, 'তর দাদামশায় ঠিক কইর‍্যা গেসিলেন। নারাণগঞ্জের পোলা... আফতাব। হ্যায় আবার কুসুমের ক্লাসমেট। কুসুমগো বাসায় আফতাব না হি ফতিমারে একবার দ্যাখসিল। তহনই পসন্দ কইর‍্যা ফ্যালে। হ্যাগো ফেমিলির সবাই আমাগো বাসায় আইসিল। তহনই কথাবার্তা হব

হইয়্যা যায়। তর আববুর শরীল ভালা না। কবে চইল্যা যাইব দিন গুনতাসে। তুই দ্যাশে আয় বাবা।'

ইমন জিজ্ঞেস করল, 'ট্যাহা পয়সা জোগাড় কইরলেন কী কইর‍্যা?'

'যা আমাগো কাসে আসে, হইয়া যাইব। আফতাবের আববু এমন ভালামানুষ, আমাগো বাসায় আইস্যাই কইল, চৌধুরী মঞ্জিল থেইক্যা মাইয়া লইয়্যা যাম, হ্যায় আমাগো ভাইগ্যের কথা। মতিউর সাহেব আমাগো জইন্য অনেক করসেন। হ্যার ফাঁসি দিয়া গর্ভমেন্ট অন্যায় করসে। আফনে রাজি হইয়া যান। ফতিমারে আমরাই সাজাইয়া গুজাইয়া লইয়্যা যাম।'

শুনে ইমন একটু শান্তি পেল। তা হলে দেশে এমন মানুষও আছেন, যাঁরা রাজাকার ফ্যামিলি বলে ওদের ঘেন্না করেন না। ও জিজ্ঞেস করল, 'আফতাব কী করে আম্মি?'

'এমবিএ কইর‍্যা, অহন একডা এক্সপোর্ট কোম্পানিতে চাগরি করে। কুসুমের আববু কইল, প্রায়ই না হি ফরেনে যায়। পোলাডারে আমারও পসন্দ হইসে বাবা। আফতাব কইত্যাসিল তরে না হি চেনে। কুসুমের সাথে তরে না হি অনেকবার দ্যাখসে। ও তরে খুব রেসপেক্ট করে। তুই আইলে নিকাহর দিন ঠিক করুম বাবা। কুসুমও কইসে, সেই সময় দ্যাশে ফিরব।'

শুনে ইমন একটু অবাকই হল। কুসুম দেশে ফিরবে মানে? ও কি দেশের বাইরে? প্রশ্নটা করবে না করবে না, ভেবেও ও করে ফেলল, 'কুসুম অহন কোথায় আম্মি?'

'হ্যায় তো নিউ ইয়র্কে। যুগযুগান্ত বইল্যা খবরের কাগজের রিপোর্টার হইসে। তুই যেহানে থাকস, নিউ ইয়র্ক থেইক্যা কত দূরে রে?'

'অনেক দূর আম্মি।' লস অ্যাঞ্জিলেসের দূরত্ব আন্দাজ করে ইমন বলল, 'প্লেনেই প্রায় পাঁচ ঘণ্টার মতো লাগে। কিন্তু কুসুম চাগরিডা পাইল কী কইর‍্যা?'

‘হেইডা জানি না বাবা। মাইয়্যাডা এত ভালা, প্রায়ই ফোন কইর‍্যা আমার খোঁজখবর নেয়। তর কথাও জিজ্ঞাস করে। তর যে কী অইল, হ্যার মতো একডা মাইয়্যারে দাগা দিয়া চইল্যা গেলি। তুই ফিইর‍্যা আয় বাবা। তগো চাইর হাত এক কইর‍্যা নিশ্চিন্তে মাটির নিচে যাই।’

আম্মির কথা শুনে নিউ ইয়র্কের ট্রাফিক সিগন্যালে দেখা সেই মেয়েটাকে ইমনের মনে পড়ল। ওকে দেখে কুসুমের মতো মনে হয়েছিল। তা হলে ও-ই কুসুম! আম্মি চার হাত এক করার কথা বলছেন। সম্ভব? ওর নামের সঙ্গে জহ্লাদ চিহ্নটা জুড়ে গেছে যে! এফবিআই ধরলে কতদিন নিউ ইয়র্কের জেলে ওকে পচতে হবে, কে জানে? মাঝে পাঁচ-পাঁচটা বছর কেটে গেছে। তা সত্ত্বেও, কুসুম ওর খোঁজ নেয়। এই কথাটা আম্মির কাছে জেনে ইমনের বুকের ভিতরটা কুসুমের জন্য হু হু করে উঠল। আবেগ ওকে টানতে শুরু করল, দেশের দিকে। কিন্তু যুক্তি বলল, চেষ্টা করিস না। তর পক্ষে দেশে ফেরা কোনওমতেই সম্ভব না ইমন। হয় তর মৃত্যু অইব জিহাদিগো বুলেটে। না হয় সুদীশ ছ্যারেরা তরে টাইন্যা হিঁচড়্যা লইয়্য যাইব জেলে।

সরাসরি না বলে দিয়ে আম্মিকে দুঃখ দিতে চাইল না ইমন। ও বলল, ‘আম্মি আমার মালিকরে রিকোয়েস্ট করুম। উনি যদি সুটি দেন, তা ইলে দ্যাশে ফিরতেও পারি। আপনে আমার জন্য ফতিমার বিয়া ঝুলাইয়া রাইখবেন না। ফতিমা কি কাসাকাসি আসে? তাইলে দ্যান, হ্যার সাথে কথা কই।’

আম্মি বললেন, ‘হ্যায় বাসায় নাই। ঢাকায় খালার কাছে গ্যাসে। অহন খুব খুশি। আর হোন, কুসুমের আববু জাইনতে চাইতাসেন, আমেরিকায় তুই কোন শহরে থাকস?’

‘কহন কোথায় থাকি, ঠিক নাই আম্মি। আমারে অহন মালিকের সাথে ডালাস বইল্যা একডা জায়গায় যাইতে অইব। নিচে অরা ওয়েট করতাসেন। আফনেরা ভালা থাইকেন। আমি ছাড়ি।’ শেষ কথাটা বলার সময় ইমনের

গলা ধরে এল। ও জানে, কোনওদিনই আর ও ফোন করবে না। ফোন এলেও হয়তো ধরার সুযোগ পাবে না। জট পাকিয়ে গেছে ওর জীবনে। পাছে কুসুমের আববু কথা বলতে চান, সেই ভয়ে ইমন তাড়াতাড়ি লাইন কেটে দিল। তখনই ওর মনে প্রশ্নটা ফিরে এল, কুসুমের আববু ওর ফোন নাম্বারটা পেলেন কোথা থেকে? চিন্তা করার সময় ওর একবার পলাশছ্যারের কথা মনে এল। রোজিনা ম্যাডাম আর কালকেতুছ্যারের কথাও। কেননা, এঁরা তিনজন ছাড়া ফোন নাম্বার আর কেউ জানেন না। পরক্ষণেই সন্দেহটা মন থেকে ইমন সরিয়ে দিল। অ্যাবসার্ড। কুসুমের আববুকে ওঁরা চিনবেন কী করে? তা হলে কি রোহিত? নাহ, ওয়ালমার্টে ও রোহিতের ফোন নাম্বারটা নিয়েছিল বটে, কিন্তু নিজের নাম্বারটা রোহিতকে দেয়নি।

নিউ জার্সির আকাশে ঘন মেঘ। ওয়েদার ফোরকাস্ট আছে, সকাল ন'টা থেকে বৃষ্টি হতে পারে। তার আগে ঝোড়ো বাতাস বইবে। এই বাতাসটাই ডেঞ্জারাস। বারান্দা থেকে উঠে এসে ইমন কম্ফর্টারটা ভাঁজ করে তুলে রাখল বিছানায়। গোসল করার জন্য ওয়াশরুমে ঢুকে আয়নায় ও দেখল, খোঁচা দাড়ি বেরিয়েছে। খোঁচা দাড়ি একেবারেই পছন্দ করত না কুসুম। ওর সঙ্গে কোথাও দেখা করতে গেলে, ইমন শেভ করে যেত। কুসুমই ওকে শেভিং লোশন উপহার দিত। ব্র্যান্ডের নাম এখনও ইমনের মনে আছে... ব্রুট। গন্ধটা গালের সঙ্গে অনেকক্ষণ লেগে থাকত। ব্রুট লাগানোর পর একবার কুসুমের গালের সঙ্গে নিজের গাল ঘসে দিয়েছিল ইমন। তাতে মারাত্মক রেগে কুসুম বলেছিল, 'এই র'ম অসভ্যতা কইরলে আর তোমার কাসে আসুম না।' কত তুচ্ছ একটা ঘটনা। হঠাৎ মনের ভিতর জানান দিয়েই মিলিয়ে গেল।

পলাশছ্যার ওকে ডালাস যেতে বলেছেন। হয়তো আর এখানে ফিরে আসা হবে না। ওর পোশাক-আশাক, নিত্য ব্যবহার্য জিনিস যা কিছু আছে, সব গুছিয়ে নিতে হবে। দাঁড়ি কামাতে কামাতে ইমন প্ল্যান করে নিল। ছয়-সাতটা স্টেট পেরিয়ে ওকে টেক্সাসে পৌঁছুতে হবে। ভার্জিনিয়া, ওয়েস্ট

ভার্জিনিয়া, কেনটাকি, টিনেসি, আরকানসাস... তার পর টেক্সাস। দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার মাইলের মতো। কুঁয়াশা বাধ না সাধলে প্রায় পনেরো-ষোলো ঘণ্টার ড্রাইভ। রাতের দিকে ট্রাভেল করলে ট্রাফিকের ঝামেলা নেই। সময় একটু কম লাগতে পারে। পুলিশকেও এড়ানো যাবে। মুখ-চোখে জল দেওয়ার সময় ইমন স্থির করে রাখল, সন্ধে হলেই ও বেরিয়ে পড়বে।

তার আগে পলাশছ্যারের অসমাপ্ত কাজটা ওর সেরে ফেলা দরকার। বিছানার উপর ইমন ল্যাপটপ খুলে বসল। কাল রাতে অনেকক্ষণ ধরে ও চেষ্টা করেছিল হ্যাক করার। এ খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতো কঠিন। তবে হ্যাকিংয়ের কাজ খানিকটা সহজ করে দিয়েছিল মামুন। ল্যাপটপের পাশে একটা কাগজের চিরকুটে কোডের অসংখ্য পারমুটেশন ও কম্বিনেশন। মনে হয়, চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের অ্যাকাউন্টস হ্যাক করার কাজটা মামুন শুরু করেছিল অনেকদিন আগে। নেটওয়ার্কে ঢোকার পাসওয়ার্ড কেউ ওকে সাপ্লাই করেছিল। নিউ জার্সিতে আসার পর চিরাগই সম্ভবত ওর মাথায় ঢোকায়, যতটা পারো, পলাশছ্যার আর রোজিনা ম্যাডামের সর্বনাশ করো। ফাউন্ডেশনের অ্যাকাউন্টস ইমন মেরামত করে দিয়েছে। এখন পলাশছ্যারের উপকার ফিরিয়ে দেওয়ার পালা ওর।

চিরকুট থেকে পলাশছ্যারের কোম্পানি শিউলি এক্সপোর্টস-এর পাসওয়ার্ড খুঁজতে লাগল ইমন। ঘণ্টা তিনেক কঠিন চেষ্টার পর আল্লার মর্জিতে ও শেষপর্যন্ত বেরও করে ফেলল। বিরাট একটা দুঃশ্চিন্তার ভার মাথা থেকে নেমে যেতেই ওর খিদে পেয়ে গেল। কাল রাতে ওর কপালে শুধুমাত্র ম্যাক ডি-র একটা বার্গার জুটেছিল। ফ্রিজ খুলে ও দেখল, আপেল, আঙুর আর কলা পড়ে আছে। আপেলে কামড় দিতেই... এত ঠান্ডা সেটা, ওর দাঁতে কনকনানি শুরু হয়ে গেল। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফিরিয়ে আনতে কিছুটা সময় নেবে। আপেল টেবলের উপর রেখে, কম্পিউটারের পর্দায় চোখ দিতেই ইমন দেখল, তিনদিন আগে শিউলি এক্সপোর্টস-এর অ্যাকাউন্টস

থেকে বিরাট অঙ্কের ডলার আলবুকার্কের একটা ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করা হয়েছে। ওই অ্যাকাউন্টের মালিক হেমলতা দেল বস্কে। রোজিনা ম্যাডামের কোনও রিলেটিভ হবেন। কেননা, ম্যাডামেরও পদবি দেল বস্কে। ইমন বুঝতে পারল না, চিরাগই যদি মামুনকে দিয়ে হ্যাকিং করায়, তা হলে ডলার হেমলতা দেল বস্কের অ্যাকাউন্টসে যাবে কেন? তা হলে কি হ্যাকিংয়ের পিছনে অন্য কেউ?

পলাশছ্যার কি এই মানি ট্রান্সফারের কথা জানেন? ওঁর মেল চেক করলেই তা জানা যাবে। মেল খুলে ইমন খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে গেল। ব্যাবসাজনিত অসংখ্য মেল। প্রতিটা ওপেন করে দেখতে গেলে সারাটা দিন লেগে যাবে। বেছে বেছে কয়েকটা মেল খুলে ও অবাক হয়ে দেখল, মাসখানেক আগে ছ্যার ঢাকায় ওর দুটো শপিং মল আর চা বাগানগুলো বেচে দেওয়ার জন্য কয়েকজনের সঙ্গে দর কষাকষি করছেন। গারমেন্টস কোম্পানিগুলোও হাত থেকে ছেড়ে দেওয়ার কথাবার্তা চালাচ্ছেন। মেলগুলো পড়তে পড়তে, ইমনের আশঙ্কা হল, পলাশছ্যার বোধহয় কোনও কারণে আর বাংলাদেশে থাকতে চাইছেন না। অথবা থাকতে পারছেন না। ছ্যার রোজিনা ম্যাডামের পরামর্শ মতো চলেন। তা হলে কি উনি এসব রোজিনা ম্যাডামের কথায় করছেন? হয়তো রোজিনা ম্যাডামকে বিয়ে করে এখানেই উনি সংসার পাততে চান। মন্দ কী? দু'জনকে সুন্দর মানাবে।

বাইরে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। গাছ-গাছালির শনশনানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ভিতরে বসেই। শিলাবৃষ্টির কারণে জানালার কাচগুলো ভেঙে পড়ার উপক্রম। যেন কেয়ামতের দিন এসে গেছে। বাসার চার পাশে অসংখ্য দেবদারু আর পাইন গাছ। একটা ভেঙে পড়লে আউট হাউস গুঁড়িয়ে যাবে। নির্জন ঘরে কম্পিউটারের সামনে বসে ইমনের মনে হল, হ্যাকিং যেন দোজখ যাত্রার মতো। লোভের আগুনের দ্বার একটার পর একটা পেরিয়ে যেতে বাধ্য করে। কৌতূহল মেটাতে মেটাতে রোজিনা

ম্যাডামের লিঙ্ক পেয়ে গেল ইমন। কী খেয়াল হল, ম্যাডামের ডেটা ও হ্যাক করতে লাগল। ইয়াআল্লাহ, এ কী দেখছে ও? পলাশছ্যারের সব সম্পত্তি তো রোজিনা ম্যাডাম গ্রাস করে নিচ্ছেন! পলাশছ্যার কি তা বুঝতে পারছেন না?

(চল্লিশ)

আলবুকার্ক পুলিশ কয়েকটা প্রশ্ন তুলেছে। ঝরণার ধার থেকে র‍্যাঞ্চে ঢোকার যে লোহার দরজাটা সন্ধের পর বন্ধ থাকে, সেটা খোলা ছিল কেন? পলাশভাই যে পিস্তল দিয়ে একটা নেকড়ে মেরেছেন, সেটা কার? এমনিতে নর্থ আমেরিকায় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন কড়া। নেকড়ে মেরে ফেলার জন্য পলাশভাইয়ের জেলও হয়ে যেতে পারে। অবশ্য আত্মরক্ষার জন্য মারতে বাধ্য হয়েছেন, এটা ওঁকে প্রমাণ করতে হবে। সেদিন রাতে পুলিশ এসে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করছিল, তখন পলাশভাইয়ের জন্য কালকেতুর দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিল। তবে তার থেকেও বেশি ভয় হচ্ছিল রোজিনা ম্যাডামকে নিয়ে। ওঁর চোট আঘাত অনেক বেশি। ওঁর পরনে লেদার জ্যাকেট ছিল। তা সত্ত্বেও, নেকড়েটা ওঁর ডানহাতের কবজি এমন জোরে কামড়ে ধরেছিল যে, হাঁড় ভেঙে যায়। পলাশভাই গুলি না চালালে, হয়তো কবজিটাই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

নেকড়ের কামড়ে কেউ মারা গেছে, এমন ঘটনা খুব বিরল নর্থ আমেরিকায়। র‍্যাবিজে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা হলে, সেরে ওঠা সম্ভব। রায়ান পরদিন সকালেই বড় বড় ডাক্তার এনে হাজির করেন র‍্যাঞ্চে। তিন দিন হয়ে গেছে, রোজিনা ম্যাডাম আর পলাশভাইয়ের চিকিৎসা চলছে র‍্যাঞ্চেরই হাসপাতালে। পলাশভাই শরীরের খুব বেশি ক্ষতের চিহ্ন নেই। কিন্তু রোজিনা ম্যাডামের অবস্থা ভাল নয়। ডাক্তাররা বলেছেন, ছয়দিন নজরে রাখতে হবে। দরকার হলে ডানহাত

কবজি থেকে কেটে বাদ দিতে হতে পারে। শুনে হেমলতা কেঁদে ফেলেছিলেন রায়ানের কাছে। 'আমার ফুলের মতো মাইয়াডার অঙ্গহানি অইতে দিম না। আফনে ইংলন্ড থেইক্যা সার্জেন লইয়্যা আসেন।'

নিউ ইয়ার্সের সব আনন্দ উবে গেছে র‍্যাঞ্চ থেকে। রিচার্ড গাটম্যান নেকড়ের আক্রমণ নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখেছেন নিউ ইয়র্ক টাইমসে। সেটা প্রথম পৃষ্ঠায় বক্স করে বেরিয়েছিল। তার পর থেকে র‍্যাঞ্চে হাজির টিভি চ্যানেলের প্রচুর রিপোর্টার। রোজিনা ম্যাডামকে নিয়ে দু'বেলা খবর হচ্ছে। পশুপ্রেমীরা প্রশ্ন তুলেছেন, নেকড়ের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। গুলি করে মারাটা কি উচিত হয়েছে? পুলিশ, পশুপ্রেমী আর মিডিয়ার উৎপাতে মুখ শুকনো করে হাসপাতালেই পড়ে আছেন রায়ান আর হেমলতা। সারাক্ষণ ওঁদের পাশে লারেইনা। দেশে এ রকম কোনও মিসহ্যাপ হলে রায়ানের মতো বড়লোকেরা পুলিশকে ম্যানেজ করে নিতেন। কিন্তু এটা আমেরিকা। প্রশাসনের তলার লেবেলে দুর্নীতি নেই বললেই চলে। পুলিশ দফায় দফায় তদন্ত করতে এসে কড়া কড়া প্রশ্ন করছে। এ দেশে অপার বাকস্বাধীনতা, মিডিয়াও যা-তা মন্তব্য করে যাচ্ছে। অসীম ধৈর্য রায়ানের।

দ্বিতীয় দিন রোজিনা ম্যাডামকে দেখতে গেছিল কালকেতু। মুখ অসম্ভব ফুলে রয়েছে। ব্যাণ্ডেজ সত্ত্বেও তা বোঝা যাচ্ছে। ম্যাডাম আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছেন। তাঁর মুখ দিয়ে অনবরত লালা গড়াচ্ছে। ফলে ওঁর খুব কাছে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। র‍্যাবিজ না কি সংক্রামক রোগ। ম্যাডামের মুখের লালা থেকে অন্য কারও হতে পারে। ম্যাডামের তুলনায় পলাশভাই অনেকটা সুস্থ। উনি অন্তত কথা বলতে পারছেন। কথায় কথায় পলাশভাই একবার বললেনও, নেকড়েটা একবার লাফিয়ে উঠে তাঁর কাঁধের কাছটায় কামড় বসিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় উনি নেকড়ের অণ্ডকোষ লক্ষ করে কনুই চালান। ব্যথা পেয়ে তখনই নেকড়েটা কামড় ছেড়ে দেয়।

পলাশভাইকে এখনও পরিষ্কার জানানো হয়নি, রোজিনা ম্যাডামে ইনজুরি কতটা। ডাক্তাররাই বলতে মানা করে দিয়েছেন। তবুও, পলাশভাই একবার আক্ষেপ করলেন, 'প্লেনে আসার সময় ম্যাডাম একবার কইসিল, ডান চোখ লাফাইতাসে। লক্ষণ ভালা না। কথাডা আমি হালকাভাবে নিসিলাম। বারো ঘইণ্টার পর কথাডা এমনভাবে মিইল্যা যাইব, কে জাইনত? হ্যায় ক্যামন আসে, আমারে ক'ন কাইলকেতুভাই। আফনেরা আমারে কিছু চাইপ্যা যাইতাসেন না তো?'

র‍্যাঞ্চের হাসপাতালের গ্রাউণ্ড ফ্লোরেএকটা ক্যাফেটোরিয়া আছে। সেখানে বসে কালকেতু পলাশভাইয়ের কথাই ভাবছিল। রোজিনা ম্যাডাম র‍্যাবিজে আক্রান্ত হয়েছেন শুনলে উনি মারাত্মক শব্দ পাবেন। এমন সময় উপর থেকে নেমে লারেইনা বলল, 'চলুন, গেস্ট হাউসে যাই। লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে। হেমলতা আন্টি আপনাকে নিয়ে যেতে বললেন।'

কালকেতু বলল, 'ওঁরা লাঞ্চে যাবেন না?'

'যা মনের অবস্থা, লাঞ্চ করার ইচ্ছে কারও নেই। আপনি চলুন।'

ক্যাফেটোরিয়ার বাইরে কয়েকটা গল্ফকার্ট দাঁড়িয়ে। একটা ভেনু থেকে অন্য ভেনুতে যাওয়ার জন্য। তার একটাতে উঠে লারেইনা স্টিয়ারিং হাতে বলল, 'ভাবলাম, র‍্যাঞ্চে আপনাকে কত কী দেখাব। কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যে, সেই ইচ্ছেটাই উবে গেল।'

ওর পাশে বসে কালকেতু বলল, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন দু'জনই তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন।'

'আমি নিজে খানিকটা ইনভেস্টিগেট করেছি, জানেন মি. ন্যান্ডি। যার উপর আমার সন্দেহ, সে র‍্যাঞ্চ থেকে পালিয়েছে।'

লারেইনার ইঙ্গিত কালকেতুর বোধগম্য হল না। ও বলল, 'তার মানে তুমি বলছ, এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়? কেউ প্ল্যান করে ঘটিয়েছে!'

‘আমার তো তাই মনে হচ্ছে। পুলিশ সঠিক প্রশ্নটাই তুলেছে, ঝরণার কাছে লোহার দরজাটা খোলা ছিল কেন? দরজা খোলা বা বন্ধের ব্যবস্থা আছে সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম থেকে। এবং সেটা রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সেদিন সন্ধ্যায় জোন সিক্সের দরজা বন্ধ করার দায়িত্বে ছিল ম্যাক বলে একজন সিকিউরিটি স্টাফের। রোজিনা ম্যাডাম যে জোন সিক্সে যাচ্ছেন, সেটা একমাত্র ম্যাকই জানত।’

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কালকেতু বলল, ‘দরজা খোলা রেখে ওর লাভ?’

‘কারণটা একমাত্র আমি জানি। মাস ছয়েক আগে ম্যাডামের সঙ্গে আমি কয়েকদিনের জন্য র‍্যাঞ্চে এসেছিলাম। সেইসময় একজন গেস্টের সঙ্গে ম্যাক দুর্ব্যবহার করেছিল। ম্যাডাম সকলের সামনে ওকে চড় মারেন। কয়েক দিনের জন্য ওকে সাসপেন্ডও করেছিলেন। তার পর থেকে ম্যাডামের উপর ম্যাকের রাগ। দু’একজনের কাছে ও বলেওছিল, মালিকের মেয়ে বলে রোজিনা ম্যাডামকে ও ছেড়ে দেবে না। আমার মনে হচ্ছে, ও সেই অপমানের বদলা নিল। আজ সকালেই ম্যাক চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। বলে গেছে, আরকানসাসে একটা র‍্যাঞ্চে ভাল মাইনের চাকরি পেয়েছে। ওর উপর সন্দেহ হওয়ার কথাটা আমি এখনও কাউকে বলিনি। আপনার কি মনে হয়, পুলিশকে আপনার জানানো উচিত?’

‘অবশ্যই।’ কালকেতু বলল, ‘কিন্তু তুমি কী করে প্রমাণ করবে লারেইনা? কন্ট্রোল রুমে বসে অন্য কেউও তো এই দুষ্কর্মটা করতে পাবে। তুমিই তো বলছ, রিমোট কন্ট্রোলে দরজা খোলা বা বন্ধ করা যায়।’

‘এটা আপনি ঠিক বলেছেন। আসলে আমি ভাবছিলাম, আমি যখন পুলিশে চাকরি করব, তখন যদি এই ধরনের একটা কেস আসে, তা হলে কীভাবে আমি সলভ করব? একটা বিষয়েও আমার খটকা লাগছে, জানেন। নেকড়েদের বিহেভিরিয়াল প্যাটার্ন নিয়ে আমি আমাদের ইউনিভার্সিটির

জুলজির প্রোফেসরদের সঙ্গেও কথা বললাম। ওঁরা বললেন, তিন-চারটে নেকড়ে একযোগে কাউকে অ্যাটাক করেছে, এমন ঘটনা ওঁরা কখনও শোনেননি। নেকড়ে শিকার করে খায় ঠিক। কিন্তু শিকার করতে ওরা একা বেরোয়। ঝরণার জল খেতেও একসঙ্গে আসবে, এমনটাও হওয়ার নয়। সবথেকে বড় কথা হল, নেকড়েরা মানুষ শিকার করে না। হয়তো কোনও কারণে ভয় পেয়ে ওরা অ্যাটাক করেছিল। গুলির আওয়াজ শুনে পরে পালায়। আচ্ছা, আমি শুনেছি, আপনি ডিটেকটিভ। এই কেসটা এলে, আপনি কোত্থেকে শুরু করতেন মি. ন্যান্ডি?'

আচমকা প্রশ্নটা শুনে কালকেতু কী উত্তর দেবে, ভেবে পেল না। সত্যিই, এই কেসটা হাতে এলে ও কী করত? প্রথমেই ঘটনার সময়কার ক্লিপিংস ও খুঁটিয়ে দেখত। একটা না একটা ক্লু ওখান থেকে পাওয়া যেতই। দ্বিতীয়ত, পলাশভাইয়ের কাছে ও জানতে চাইত, প্রোভোগেশনটা কোনদিকে থেকে হয়েছে? ওঁরা কি এমন কিছু করেছিলেন, যাতে নেকড়েরা বিরক্ত বোধ করে? কালকেতু শুনেছে, চাঁদনি রাতে বিশেষ করে পূর্ণিমাতে, কোনও কোনও জন্তু হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত আচরণ করে। নেকড়েদেরও মধ্যেও নাকি এই প্রবণতাটা আছে। নেকড়েদের নিয়ে হলিউডে প্রচুর হরর ছবি তৈরি হয়েছে। বছর খানেক আগে এইরকম একটা ছবিতে কালকেতু দেখেছিল, চাঁদনি রাতে একটা মেয়ে তাঁর পুরুষ শিকারকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে হঠাৎ নেকড়েতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তার পর তাকে খুন করছে। হলিউডের ছবিতে গল্পের গরু গাছেও ওঠে। বাস্তবে এ সব অবশ্য হয় না।

উত্তর না দিয়ে কালকেতু পাল্টা প্রশ্ন করল, 'ফিয়াসেঁকে একটা রোম্যান্টিক স্পট দেখাতে নিয়ে গিয়ে রোজিনা ম্যাডাম অস্ত্র সঙ্গে নিয়েছিলেন কেন, তোমার কি জানা আছে? উনি কি র‍্যাঞ্চে এলে সঙ্গে কখনও গান ক্যারি করতেন?'

‘শ্যুটিংয়ে ম্যাডামের ভীষণ ইন্টারেস্ট ছিল। দু’হাতে গান ইউজ করতে পারতেন। র‍্যাঞ্চে কোনও কম্পিটিশন হলে বরাবর উনি পিস্তল ইভেন্টে জিততেন। কিন্তু মি. পলাশকে যে কারণে উনি ঝঁরণার ধারে নিয়ে যান বলে শুনেছি, তাতে সঙ্গে তখন পিস্তল রাখবেন কেন, ভেবে উত্তর পাচ্ছি না।’

‘কী কারণে ওঁরা ঝরণার ধারে গেছিলেন লারেইনা?’

‘হেমলতা আন্টির মুখে শুনলাম, ম্যাডাম ঝরণাকে সাক্ষী রেখে মি. পলাশকে একটা সুখবর দিতে চাইছিলেন। উনি মা হতে যাচ্ছেন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল, মিসহ্যাপের পর ম্যাডামের মিসক্যারেজ হয়ে গেছে।’

কথা বলতে বলতে গেস্ট হাউস এসে গেল। লারেইনা গল্ফকার্ট থেকে লাফিয়ে নেমে বলল, ‘আপনি ডাইনিং হলে চলে যান মি. ন্যান্ডি। আমি আমার মাকে ডেকে নিয়ে আসছি।’

ডাইনিং হলে আজ খুব বেশি গেস্ট নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে কালকেতু দেখল, কোণের দিকে একটা টেবলে বসে রিচার্ড গাটম্যান। ব্যুফে এরিয়া থেকে ওঁর জন্য প্লেটে খাবার নিয়ে যাচ্ছে একটা মেয়ে। সেদিন রিচার্ডকে একা পেয়েও শিউলিদিদির ব্যাপারে খুব বেশি তথ্য বের করতে পারেনি কালকেতু। পলাশভাই মাঝখান থেকে বসে পড়ে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়। যে কাজের জন্য পলাশভাই ওকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছেন, কালকেতুর এখন মনে হচ্ছে, তার কিছুই এগোয়নি। মাঝে ঢাকা থেকে ইত্তেফাকের রিপোর্টার চঞ্চল একবার ফোন করেছিল। খুব উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, ‘আফনের কাম সহজ হইয়্যা যাইব। আর একডা উইক আমারে দ্যান। শিউলি আপারে নিয়া সব ইনফর্মেশন হাতে আইস্যা যাইব।’

সপ্তাহ খানেক আগে চঞ্চল না কি প্রধানমন্ত্রী বিলকিস বেগমের সফরসঙ্গী হয়েছিল জাপানে। সেখানে একদিন বিলকিস বেগম যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডা মারছিলেন, তখন চঞ্চল শিউলি আপার প্রসঙ্গটা তুলেছিল।

প্রধানমন্ত্রীকে না কি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে শিউলি আপার স্থান পাওয়া উচিত। আমেরিকায় শিউলি আপার ওই ছবি প্রকাশিত না হলে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পাকিস্তানের মাথার উপর থেকে হাত তুলে নিতেন না। ঢাকায় পাকিস্তানও ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করত না। ফিরে এসে বিলকিস বেগম না কি সিক্রেট সার্ভিসের চিফকে নির্দেশ দিয়েছেন, যে কোরেই হোক, বেঁচে থাকলে শিউলি আপাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কালকেতু জানে না, কতটা গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার শিউলিদিদিকে খুঁজবে।

খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে রিচার্ডের টেবলের কাছে গিয়ে কালকেতু বলল, 'বসতে পারি?'

রিচার্ড বললেন, 'অত সংকোচ করবেন না। বসুন। সেদিন আপনি আমার কাছ থেকে কিছু জানতে চাইছিলেন। টপিক ঘুরে যাওয়ায় জানতে পারেননি। আজ স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

রায়ানকে সেদিন যা বলেছিল, কালকেতু রিচার্ডকেও তাই বলল, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আমি রিসার্চ করছি। যে বাচ্চা মেয়েটার ছবি তুলে আপনি সেনসেশন ফেলে দিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।'

'ওর ব্যাপারে রায়ান বলতে পারবেন। আরও ভাল জানেন, ওর স্ত্রী হেমলতা। ওয়ার ভিক্টিম মেয়েটা গোথেনবার্গে চলে যাওয়ার পর থেকে আমার সঙ্গে আর তেমন যোগাযোগ ছিল না। সম্ভবত, তখন দু'একবার মেয়েটাকে নিয়ে আমি লিখেও ছিলাম। মাঝে মাঝে রায়ান বলত বটে, মেয়েটাকে ভাঙিয়ে এলসা গিনেসবেরি রোজগার করে খাচ্ছেন। কিন্তু আমি আর নিজেকে এই কাদা ছোঁড়াছুড়ির মধ্যে জড়াইনি।'

'আপনি বললেন, মেয়েটির সম্পর্কে মিসেস হেমলতা ভাল বলতে পারবেন। কেন বললেন, এ কথাটা?'

‘যখন ঢাকার হাসপাতালে ওয়ার ভিক্টিম মেয়েটির চিকিৎসা চলছে, তখন ওখানেই জুনিয়র নার্স ছিলেন হেমলতা। ওঁর তখন কুড়ি বছর বয়স। মিসেস গিনেসবেরির কথাবার্তায় মুগ্ধ। হেমলতার কাছে তখন ভদ্রমহিলা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল। রেড ক্রশে চাকরির আশ্বাস দিয়ে মিসেস গিনেসবেরি হেমলতাকেও গোথেনবার্গে নিয়ে যান। আসল উদ্দেশ্য ছিল, ওঁকে দিয়ে ওয়ার ভিক্টিম মেয়েটার গভর্নেসের কাজ করানো। সেটা যখন হেমলতা বুঝতে পারেন, তখন দেশে ফিরে যেতে চান। রায়ানের মুখে আমি শুনেছি, পাঁচটা বছর হেমলতার পাশপোর্ট আটকে রেখেছিলেন মিসেস গিনেসবেরি, যাতে উনি দেশে ফিরতে না পারেন।’

‘রায়ানের সঙ্গে মিসেস হেমলতার পরিচয় কি ঢাকাতেই?’

‘হ্যাঁ। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর টানা দু’ বছর রায়ান নিউ ইয়র্ক টাইমসের ঢাকা করেসপন্ডেন্ট ছিলেন। ওয়ার ভিক্টিম মেয়েটিকে নিয়ে খবর করার জন্য তো বটেই, ওঁর প্রথম স্ত্রী লিজা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকার জন্যও রোজ রায়ান হাসপাতালে যেতেন। হেমলতার সঙ্গে ওঁর আলাপ ওই হাসপাতালেই। বয়সে প্রায় পনেরো বছরের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও দু’জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সেটা বুঝতে পেরে লিজা রাগে আমেরিকায় ফিরে আসে। পরে ডিভোর্স নেয়। তখন কী হয়েছিল, জানি না। হঠাৎ একদিন শুনি, মিসেস গিনেসবেরির সঙ্গে হেমলতা সুইডেনে চলে গেছেন। সেইসময় রায়ান মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছিলেন।’

‘ফের ওঁদের মধ্যে যোগাযোগ হল কী করে?’

‘এখানে একটা শপিং মলে হেমলতার সঙ্গে আকস্মিক ওঁর দেখা হয়ে যায়। ওয়ার ভিক্টিম বাচ্চাটাকে নিয়ে হেমলতা সেদিন খেলনা কিনতে বেরিয়েছিলেন। হেমলতা বলেন, খুব কষ্টের মধ্যে আছেন। মিসেস গিনেসবেরি জোর করে ওকে নিউইয়র্কে পাঠিয়েছেন। ডা. গডউইন বলে এক ডার্মাটোলজিস্টের বাড়িতে উনি বাচ্চা মেয়েটার দেখভাল করছেন। ওঁর

মুখে মিসেস গিনেসবেরির কার্যকলাপ শুনে রায়ান মারাত্মক চটে যান। মিসেস গিনেসবেরিকে হুমকি দিয়েই উনি হেমলতার পাশপোর্ট উদ্ধার করেন। তার পর রায়ান এমন একটা কড়া আর্টিকেল লিখেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত সুইডিশ সরকার নড়ে চড়ে বসে। আলটিমেটলি মিসেস গিনেসবেরির জেল হয়।'

এ সব কালকেতু রায়ানের মুখেও খানিকটা শুনেছিল। রিচার্ডের কথাগুলো শুনে ও মনে মনে তথ্যগুলো গোছাতে লাগল। ঢাকায় শিউলিদিদিকে হেমলতা প্রায় এক বছর দেখেছেন। তার পরের পাঁচ বছর গোথেনবার্গ ও নিউ ইয়র্কে। অর্থাৎ শিউলিদিদির বয়স যখন এগারো-বারো বছর, তখনও তিনি গভর্নেস। তাই যদি হয়, হেমলতাকে শিউলিদিদির মনে রাখা উচিত। দেখা হলে হয়তো শিউলিদিদি ওঁকে চিনলেও চিনতে পারেন। ধরেই নেওয়া যায়, ওই সময়টায় বাংলা ছাড়া শিউলিদিদি আর কোনও ভাষা জানতেন না। দু'জনের মধ্যে নিশ্চিতভাবে, ভাষা একটা বন্ধন তৈরি করেছিল। শিউলিদিদি সম্পর্কে আরও অনেক কিছু হেমলতার কাছে জানা যেতে পারে। কিন্তু ভদ্রমহিলা এখন যে মানসিক অবস্থার মধ্যে রয়েছেন, তাতে প্রসঙ্গটা ওঁর কাছে না তোলাই বাঞ্ছনীয়।

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস হেমলতাকে আপনি কতদিন ধরে চেনেন?'

রিচার্ড বললেন, 'উনি নিউ ইয়র্কে আসার পর থেকে। উইক এন্ড-এ প্রায়ই তখন আমরা স্পোর্টস বার-এ যেতাম। তার পর রোজিনা হল। মেয়েটা ঈশ্বরের আর্শীবাদ হয়ে এসেছিল রায়ানের জীবনে। কেননা, ও জন্মানোর পরই দাদুর এই র‍্যাঞ্চের মালিকানা পান রায়ান। সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে উনি আলবুকার্কে চলে আসেন। এখানেই ঘটা করে হেমলতার সঙ্গে ওর বিয়েটা হয়েছিল।'

‘আপনার কি মনে হয়, হেমলতা যদি ওয়ার ভিক্টিম মেয়েটিকে এখন কোথাও দেখতে পান, তা হলে কি উনি চিনতে পারবেন? মাঝে কিন্তু প্রায় সাতচল্লিশটা বছর পেরোতে চলল।’

একটু চিন্তা করে রিচার্ড বললেন, ‘হয়তো ফেসিয়াল চেঞ্জ অনেকটাই হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, যা দেখে চিনে ফেলা উচিত। এখনকার যুগে ফেসিয়াল চেঞ্জটাও বড় কথা নয়। আপনি যে কোনও ভাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স আর্টিস্টের কাছে চলে যান। ওয়ার ভিক্টিম মেয়েটার চেহারা এখন কেমন হতে পারে, কম্পিউটারে ফেলে আপনাকে তা দেখিয়ে দিতে পারেন। এই র‍্যাঞ্চেই কাল এমন একজনের সঙ্গে আমার আলাপ হল, যিনি খুব নামকরা গ্রাফিক্স আর্টিস্ট। তাঁর নাম জন রিড। উনি ইন্টারপোলের হয়ে কাজ করেন। অনেক দাগী ক্রিমিনালকে উনি ধরতে সাহায্য করেছেন।’

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, ‘মিস লিলি গডউইন বলে কাউকে আপনি চেনেন?’

রিচার্ড বললেন, ‘অবশ্যই চিনি। ইউনিসেফের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডার। ওঁকে কে না চেনেন? ওয়ার ভিক্টিম বাচ্চাদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে উনি অনেক কিছু করছেন। ওদের একটা অনুষ্ঠানে আমাকে একবার ইনভাইটও করেছিলেন। জানেন কি, এ বার নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ওঁর নামটা বিবেচনা করা হচ্ছে? আমি জানি, কেননা, আমার ওপিনিয়ন নেওয়ার জন্য পুরস্কার কমিটি থেকে একজন আমার কাছে এসেছিলেন। মিস লিলি যদি নোবেল প্রাইজ পান, তা হলে আমি খুব খুশি হব। উনি ডিজার্ভ করেন।’

খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছছেন রিচার্ড। আর বিরক্ত করা উচিত না। বয়স্ক মানুষ, লাঞ্চের পর হয়তো বিশ্রাম নেওয়া ওঁর অভ্যেস। কালকেতু মনে মনে খুশি, যাক, তবুও কিছু খবর তো জানা গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রিচার্ড বললেন, ‘নাউ ইউ হ্যাভ টু এক্সকিউজ মি

জেন্টেলম্যান। আর তোমার সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে। আমি আর খানিকক্ষণ পরেই ডালাসে ফিরে যাচ্ছি।'

কালকেতুও উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'আপনার মতো একজন জার্নালিস্টের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি, নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে।'

কাঁধে হাত রেখে রিচার্ড বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে আমারও ভাল লাগল। যোগাযোগ রেখো।'

ডাইনিং হল থেকে রিচার্ড বেরিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। পর্দায় বাম কিমের মুখ। শুভেচ্ছা জানিয়ে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় মি. ন্যান্ডি? এখনও কি আলবুকার্কে?'

'আপনি জানলেন কী করে?'

'টিভিতে আপনার বন্ধুদের দুর্ঘটনার কথা শুনেছি। ভেরি স্যাড। ওঁরা ভাল আছেন তো?'

কালকেতু বলল, 'এখনও বিপদ কাটেনি। আপনারা সবাই কেমন?'

মি. কিম বললেন, 'আমরাও ভাল নেই। আপনার সঙ্গে মিস লিলি গডউইন কথা বলতে চান। আপনারা র‍্যাঞ্চ থেকে ফিরলে প্লিজ, একবার কি দেখা করতে পারবেন মিস গডউইনের সঙ্গে?'

শুনে কালকেতু একটু অবাক হল। মিস লিলি নিজে ফোন করে কথা বলতে চাইছেন! কী বলতে চান উনি? 'আমরাও ভাল নেই।' তা হলে কি আবার টেররিস্ট অ্যাটাক? না কি পলাশভাইয়ের চাইল্ড ডিটেনশন সেন্টার নিয়ে কোনও খারাপ খবর আছে? বাম কিমকে ও বলল, 'আমরা কবে ফিরব, তা কিন্তু নির্ভর করবে, পলাশ এবং রোজিনা ম্যাডাম কেমন থাকবেন, তার উপর। নিউ ইয়র্কে ফিরেই আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'থ্যাঙ্কস', বলে বাম কিম লাইনটা কেটে দিলেন।

(একচল্লিশ)

এলসা আন্টির কুকীর্তির কথা জানার থেকে শরীরটা ভাল নেই লিলির। সত্যি, জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে যাচ্ছেন। এতদিন যাঁকে তিনি মনে মনে পুজো করে এসেছেন, তিনি এত স্বার্থান্বেষী হতে পারেন! কথাটা লুকোছাপা থাকেনি। সম্ভবত, বাম কিমের কাছ থেকে অনেকেই জেনে গেছেন। ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি মেম্বাররা সবাই তাঁকে ফোন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সমাজের নামী-দামি মানুষ। কেউ ব্যাঙ্কার, কেউ জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন কর্তা, কেউ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। সবাই বলেছেন, মিটিং ডেকে এখুনি এলসা গিনেসবেরিকে ছেঁটে দিন। কিন্তু অনেক ভাবনা-চিন্তার পর লিলি ধীরে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আইনের জালে কাউকে ফেলতে গেলে আমেরিকায় যথেষ্ঠ প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয়। লিলির মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে কোনও পদক্ষেপ নিতে গেলে, এলসা আন্টি জাল কেটে পালিয়ে যেতে পারেন। ওঁর বিরুদ্ধে পুলিশ আরও তথ্য প্রমাণ জোগাড় করুক।

গোথেনবার্গ থেকে এলসা আন্টি মাঝে দু'তিনদিন ফোন করেছিলেন। মনে হয়, ফাউন্ডেশনের হাল হকিকত জানার জন্য। কিন্তু, লিলি ফোন ধরেননি। পরে আন্টি একটা মেলও পাঠান। নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে। তারও কোনও উত্তর দেননি লিলি। শুধু চাইল্ড কেয়ার ইউনিট ইনচার্জদের ঘুরিয়ে একটা বার্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর এলসা গিনেসবেরি যদি কোনও ইউনিটে কর্তৃত্ব ফলাতে যান, তা হলে যেন সঙ্গেসঙ্গে তাঁকে জানানো হয়। ফাউন্ডেশনের অফিসেও লিলি যাচ্ছেন না। রোজই মার্থা আসছে কিছু ফাইলপত্র নিয়ে। অ্যাপার্টমেন্টে বসেই জরুরি ফাইলগুলোতে সই করে দিচ্ছেন তিনি।

এইসময়টায় লাস ভেগাসে অ্যান্ডির হোটেলে থাকার কথা ছিল তাঁর। চ্যারিটি শো-য়ের চূড়ান্ত রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু অ্যান্ডিকে মেল করে তিনি জানিয়ে দেন, জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় লাস

ভেগাস যেতে পারবেন না। আশ্চর্য, তার পর থেকে অ্যান্ডির তরফেও কোনও সাড়া নেই। যে মানুষটা দিনে একাধিকবার ফোন করে কথা বলত, এলসা আন্টি ধরা পড়ে যাওয়ার পরদিন থেকে সে একটা ফোনও করেনি। এই নীরবতা নিয়ে বাম কিমের সঙ্গে মাঝে একদিন কথা হচ্ছিল লিলির। বাম কিম ব্যাখ্যা করতে চাইছিলেন এই ভাবে, 'ম্যাডাম, আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, দু'জনে মিলেই হয়তো আপনাকে আরও বড় ফাঁদে ফেলার ষড়যন্ত্র করছিলেন। চ্যারিটি শো-য়ের নাম করে হয়তো এমন ঋণ চাপিয়ে দিতেন, যা শোধ করতে আমাদের জান বেরিয়ে যেত। আমার মনে হয়, শো লাস ভেগাসে করার দরকার নেই। অন্যবারের মতো, এবারও ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন্সেই আমাদের অনুষ্ঠানটা হোক।'

ডা. সুধা বলে গেছেন, 'এবার একটু শরীরের প্রতি নজর দেবেন ম্যাম। আপনার শরীরের মধ্যে কিন্তু আরও একটা শরীর বড় হচ্ছে। চিন্তা করবেন না, আমি আছি। মাঝে মাঝে এসে আপনাকে চেক করে যাব।' লিলি হিসেব করে দেখেছেন, কোনও জটিলতা দেখা না দিলে, অগাস্টের শেষ অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ডেলিভারি হতে পারে। ফাউন্ডেশনের বকেয়া কাজ আগামী তিন-চার মাসের মধ্যেই তাই সেরে ফেলতে হবে। কারণ, তার পর হয়তো দৌড়-ঝাঁপü করার সুযোগ তিনি পাবেন না। লিলি একবার ভেবেও ছিলেন, এত বেশি বয়সে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। কিন্তু বারান্দা থেকে যখন রেসিডেন্সির গির্জার দিকে তিনি তাকান, তখন মনে হয়, একজন ক্যাথলিক হয়ে এই পাপ তিনি কীভাবে করবেন? এখনও পর্যন্ত গর্ভধারণের কথা লিলি অবশ্য কাউকে জানাননি। এমন কী, অ্যান্ডিকেও না। এলসা আন্টির উপর এতটাই বিতৃষ্ণা এসে গেছে যে, তাঁর বোনপো অ্যান্ডিকেও তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

সারাটা দিন অ্যাপার্টমেন্টে একা। এলোমেলো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে লিলির মনের মধ্যে। অতীতের কথা যখনই ভাবছেন, তখনই মনে হচ্ছে, তিনি

আসলে কে? এটা জানা জরুরি। শৈশবের কথা তাঁর কিছুই মনে নেই। এলসা আন্টিকে যখন জিজ্ঞেস করতেন, তখন উনি বলতেন, 'তোমার জানার দরকার নেই। জানলে তোমার ক্ষতি হয়ে যাবে।' ওই সময়টায় পিঠের ক্ষত সবে সারছে। আন্টি ছাড়া তিনি তখন আরও একজনকে চিনতেন। গর্ভনেস হেমলতা আন্টি। বহু বছর পর হঠাৎ হেমলতা আন্টির কথা মনে করতে পারছেন লিলি। ছোটবেলায় এই আন্টি সবসময় ওঁকে আগলে রাখতেন। বিকেলবেলায় হাত ধরে নিয়ে যেতেন পার্কে। কখনও বা শপিং মলে। বলতেন, 'মামণি, তোমার কী কিনতে ইচ্ছে করছে বলো।' মামণি বলে ডাকার সময় তাঁর গলা থেকে স্নেহ ঝরে পড়ত।

কিন্তু এলসা আন্টি এই গর্ভনেস আন্টিকে মোটেই পছন্দ করতেন না। সবসময় তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। হেমলতা আন্টির মুখটা ভাল করে মনে নেই লিলির। কিন্তু তাঁর পোশাক-আশাক, হেয়ার স্টাইল একটু অন্য রকমের ছিল। তাঁর বিনুনি বাঁধা লম্বা চুল কোমরের কাছে নেমে আসত। দেখতেও ছিলেন খুব সুন্দরী। বাইরের অনেকেই ভাবতেন, তিনি হেমলতা আন্টির মেয়ে। মনে পড়ছে... সেই সব দিনগুলোর কথা লিলির মনে পড়ছে। এলসা আন্টির কাছে মাঝে মধ্যেই বিদেশ থেকে লোকজন আসতেন। তখন সেই লোকগুলোর সামনে আন্টি তাঁকে সাজিয়ে গুছিয়ে বসিয়ে দিতেন। লোক দেখানো খুব আদরও করতেন। বিদেশি লোকগুলো তখন তাঁর প্রচুর ছবি তুলতেন। দিনগুলো খুব আনন্দে কাটানোর কথা। কিন্তু, তিনি উপভোগ করতে পারতেন না। পিঠের ব্যথায় সবসময় কাঁবু হয়ে থাকতেন। লিলির মনে পড়ল, তাঁকে নিয়ে একবার দুই আন্টির মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল। গর্ভনেস আন্টিকে তিনি বলতে শুনেছিলেন, 'আফনে মানুষ না, আফনে জানোয়ার।'

সেই হেমলতা আন্টি হঠাৎ তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে গেলেন। তার পর চার্চের কোনও একটা অনুষ্ঠানে তাঁকে নিয়ে গিয়ে এলসা আন্টি বলেছিলেন,

‘আজ থেকে ডা. অ্যালান গডউইন তোমার ড্যাডি। তোমাকে ওঁর বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে।’ দত্তক কন্যার মানেটা অবশ্য অনেক পরে বুঝেছিলেন লিলি। ততদিনে সৎভাই ড্যানিয়েল আর সৎবোন সাশা হয়ে গেছে। ড্যাডি কখনও এই দু’জনের সঙ্গে তাঁকে আলাদা করে দেখেননি। বরং অসুস্থতার জন্য তাঁকে একটু বেশিই ভালবাসতেন। মাম্মির আচরণেও লিলি কখনও বুঝতে পারেননি, তাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই। খেলনা পুতুল নিয়ে ছোটবেলায় সাশা একবার জেদাজেদি করেছিল। মাম্মি ওকে এমন শাস্তি দিয়েছিলেন যে, জীবনে সাশা আর কখনও তাঁর সঙ্গে হিংসেমি করেনি।

কলেজে পড়ার সময় লিলির মনে একবার প্রশ্ন জেগেছিল, ডা. গডউইন যদি তাঁর পালক পিতাই হন, তা হলে তাঁর আসল ড্যাডি কে? তাঁর অসুস্থতার কারণটাই বা কি? ড্যাডি প্রথম প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছিলেন। কিন্তু পিঠ আগুনে ঝলসে যাওয়ার কারণটা পরে বলেছিলেন। হ্যালোইনের পার্টিতে ফায়ার ডান্সের সময় না কি আগুন লেগে জ্বলন্ত সামিয়ানা তাঁর পিঠের উপর পড়েছিল। উত্তরটা শুনে এতদিন লিলি সন্তুষ্টই ছিলেন। এখন ফের নতুন করে প্রশ্নটা মনে জাগছে। বিদ্যুৎ চমকের মতো তাঁর মাথায় একটা নাম উঠে এল, হেমলতা আন্টি! হ্যাঁ, উনিই পারবেন, পরিবারের শিঁকড় সম্পর্কে আন্দাজ দিতে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে? এলসা আন্টি কাকে যেন একবার বলছিলেন, চুরি করে হেমলতা আন্টি কার সঙ্গে যেন পালিয়ে গেছিলেন। সে প্রায় বছর চল্লিশেক আগের কথা। এখনও যে হেমলতা আন্টি নিউ ইয়র্কে আছেন, তা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না।

‘কী ভাবছেন ম্যাডাম?’ লায়লার গলা শুনে লিলি প্রায় চমকে উঠলেন। একা থাকার অভ্যেস। তাঁর মনেই ছিল না, গত তিন-চারদিন ধরে আরও একজন অ্যাপার্টমেন্টে আছে। লায়লার হাতে কফির পেয়ালা, ধুয়ো উঠছে। হাসিমুখে পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে ও বলল, ‘চমকে উঠলেন যে?’

কাপটা হাতে নিয়ে লিলি বললেন, 'পুরনো দিনের কথা ভাবছিলাম। খেয়ালই করিনি তোমাকে।'

লায়লা যেদিন বিধ্বস্ত অবস্থায় অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিল, সেদিনকার কথা মনে পড়ল লিলির। ধর্ষিতা হওয়ার যন্ত্রণা ও ভুলতে পারছিল না। ডা. সুধাকে খবর দিতে হয়েছিল। জিহাদিদের ভয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে ইতস্তত করছিল লায়লা। ওকে ছেড়ে দিতে মন চায়নি লিলির। ঠিক সময়ে বিয়ে-থা করলে তাঁর নিজের মেয়ে ও লায়লার বয়সি হত। মাঝে একদিন নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে লায়লা ওর কাজের টুল বক্স নিয়ে এসেছে। পার্লারে আট ঘণ্টা কাজ করে, প্রতিদিন এখানেই ফিরে আসছে। এখন অনেক সুস্থ আর স্বাভাবিক লাগছে ওকে। পোড় খাওয়া মেয়ে, খুব কাজের। কফিটা মনোমতো বানায়। কফিতে চুমুক দিয়ে লায়লা বলল, 'পুরনো দিনের কি এমন কোনও কথা ম্যাডাম, যা আপনি চেষ্টা করেও মনে করতে পারছেন না?'

'ঠিক তাই।' লিলি বললেন।

'তা হলে, একটা কুর্দিশ দাওয়াই আপনাকে দিতে পারি। যদি আপনি বিশ্বাস করেন, তবেই।'

'তুমি বলতে চাও, তা হলে আমি অতীতের কথা মনে করতে পারব? বেশ, কী করতে হবে আমাকে?'

'আপনার যা বয়স, তা থেকে এক পর্যন্ত... আপনাকে গুণতে হবে। প্রত্যেক সংখ্যার মাঝে দশ সেকেন্ড করে সময় দেবেন। দেখবেন, আপনি যা মনে করতে চাইছেন, তা মনে পড়ে যাবে। আমার মা কী বলতেন, জানেন? আমাদের ব্রেন হচ্ছে সুপার কম্পিউটার। প্রতি মুহূর্তের সবকিছু ধরে রাখে। ব্রেন কখনই তোমার সঙ্গে বিট্রে করবে না, যদি তোমার শরীর সুস্থ থাকে। ব্রেনের ভিতর যে অসংখ্য সেল থাকে, তাদের টক্সিনমুক্ত রাখতে হবে। মায়ের যখন পঁচাশি বছর বয়স, তখন দেখতাম, পাঁচ বছর বয়সে উনি কী করেছেন, সব বলে দিতে পারতেন।'

লায়লা সাধারণত এত কথা বলে না। ওর সঙ্গে কথা বলতে মন্দ লাগছে না। যদিও, নতুন কোনও কথা ও বলেনি। লিলি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মা কি বেঁচে আছেন লায়লা?'

'না ম্যাডাম, সিভিল ওয়ারে আমাদের পুরো পরিবারটাই শেষ হয়ে গেছে। আমার বাবা-মা, ভাইবোনেরা সবাই মারা গেছেন। আমি বেঁচে গিয়েছিলাম, এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছিলাম বলে। ওইদিনগুলোর কথা আর মনে করতে চাই না। ম্যাডাম, আপনি কি সত্যিই আপনার অতীতের কথা মনে করতে চান? তা হলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'কোত্থেকে তুমি এই চিকিৎসাটা শিখলে?' লিলি জানতে চাইলেন।

'ইস্তানবুলে আমি ডা. করিম বক্স বলে একজন হেকিমের চেম্বারে চাকরি করতাম। সেখানে জিহাদিদের নিয়ে আসা হত। থার্ড ডিগ্রি দেওয়ার পরও যেসব জিহাদি মুখ খুলত না, হিপনোটাইজ করে তাদের পেট থেকে কথা বের করে নিতেন ডা. করিম। এক ধরনের ব্ল্যাক ম্যাজিকও বলতে পারেন। তার কাছ থেকেই আমি শিখেছি ম্যাডাম। ওঁকে আমি অ্যাসিস্ট করতাম।'

'আমাকে এখন কী করতে হবে, বলো।'

'প্লিজ, আমাকে ঘণ্টাখানেক সময় দিন। এই সময়টায় কেউ যেন আপনাকে ডিসটার্ব না করে। নিজেকে বর্তমান জগৎ থেকে উইথড্র করে নিতে হবে। মানে... আপনার বাড়িতে এখন কেউ এলে কথা বলতে পারবেন না। ফোন এলে ধরবেন না। আপনি ধ্যান করেন বলে আপনার মনোসংযোগ করার ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি। ফলে, আপনার পক্ষে অতীতে ফিরে যাওয়া তুলনামূলক ভাবে সহজ।'

'বেশ, তা হলে এখনই চেষ্টা করো। আমি রেসিডেন্সির অফিস রুমে বলে দিচ্ছি, কেউ দেখা করতে এলে যেন ওঁরা অ্যাপার্টমেন্টে না পাঠান। ফোনেরও সুইচ অফ করে রাখছি। তোমার আর কী চাই, বলো। কোন ঘরে বসে চেষ্টাটা তুমি করতে চাও।'

‘ম্যাডাম, গেস্ট রুমে চলুন। ওখানে আমার টুল বক্স আছে।’

‘তুমি রেডি করো। আমি আসছি।’

মিনিট পাঁচেক পর লিলি গেস্ট রুমে গিয়ে দেখলেন, সব জানলার পর্দাগুলো লায়লা টেনে দিয়েছে। অন্ধকার ঘরে টেবলের উপর একটা নীল রঙের আলো জ্বলছে। লিভিং রুম থেকে রিক্লাইনার চেয়ারটা নিয়ে এসেছে লায়লা। সেটা টেবলের উল্টোদিকে বসিয়ে দিয়েছে। ঘরের ভিতরে বোধহয় কিছু স্প্রে করেছে। আতরের গন্ধে পুরো ঘর ম ম করছে। লায়লা বলল, ‘চেয়ারটার উপর আরাম করে শুয়ে পড়ুন ম্যাডাম। শরীরটাকে চেয়ারের উপর ছেড়ে দিন। চোখ বুঁজে মনে করতে থাকুন, আপনার শরীরটা নেই।’

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে স্মোক অ্যালার্ম বেজে উঠল। আওয়াজটা শুনে লিলি চমকে উঠলেন। অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটা ঘরে স্মোক অ্যালার্ম লাগানো আছে। কোথাও ধোঁয়া বেরলে আপনাআপনি অ্যালার্ম বেজে ওঠে। সিলিংয়ে অ্যালার্মের লাল আলো জ্বলছে। উপরের দিকে হাত বাড়িয়ে লায়লা ভেড়ার লোমের ঝাড়ন নাড়তে লাগল। লাল আলোটা নিভে গেল। লজ্জিত মুখে লায়লা বলল, ‘সরি ম্যাডাম, গন্ধের ধোঁয়াটা একটু বেশি পরিমাণে দিয়ে ফেলেছিলাম।’

এর পর কালো চামড়ার টুল বক্সটা খুলে ফেলল লায়লা। সেখান থেকে একটা শিশি বের করে, হাতে সবুজ তেল ঢেলে নিয়ে বলল, ‘এটা একটা হার্বাল অয়েল ম্যাডাম। এই তেল দিয়ে ম্যাসাজ করলে আপনি অদ্ভুত আরাম পাবেন।’

লিলির মাথায় তেল খানিকক্ষণ ঠেসে ধরে, তার পর ধীরে ধীরে ম্যাসাজ করতে লাগল লায়লা। তেল থেকে ল্যাভেন্ডারের সুন্দর গন্ধ বেরচ্ছে। লিলি জানেন, মিডল ইস্টে একটা সময় ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতি খুব উন্নত মানের ছিল। গাছের ফুল-ছাল-পাতা দিয়ে ওরা রোগ নিরাময় করতেন। তিনি টের পেলেন, তেল দেওয়ার পর থেকে মাথার ভেতরটা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

চুলের মধ্যে লায়লার আঙুলগুলো খেলা করছে। আর ঠান্ডা আবেশটা ঘাড়ের পিছনে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সঙ্গেসঙ্গে পিঠ থেকে চিনচিনানি ব্যথাটা উধাও। অ্যারোমাথেরাপি না কি? অ্যারোমাথেরাপি ম্যাসাজের কথা জানেন লিলি। একধরনের সুইডিশ ম্যাসাজ। ছোটবেলায় গোথেনবার্গে দেখেছেন, এলসা আন্টি মানসিক অবসাদ কাটানোর জন্য সপ্তাহে অন্তত দু'দিন সুইডিশ ম্যাসাজ নিতেন। শরীর ও মনের ক্লান্তি না কি দূর হয়ে যেত।

খানিক পরে লিলির মুখ থেকে স্বস্তিদায়ক আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'আঃ'।

তখনই লায়লা বলল, 'নীল আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকুন ম্যাডাম। চোখের পলক যেন না পড়ে।'

লায়লা কি পাতাল থেকে কথা বলছে? ওর গলাটা এমন ধাতব মনে হচ্ছে কেন? কথাগুলো ভেঙে ভেঙে ভেসে আসছে। লায়লাকে দেখতে চাইলেন লিলি। কিন্তু চোখের তারা ঘোরানোর চেষ্টা করেও তিনি সফল হলেন না। নীল আলোটার দিকে, চোখের তারা দুটো কে যেন আটকে দিয়েছে। লিলির হঠাৎ ভয় ভয় করতে লাগল। এই মুহূর্তে অ্যাপার্টমেন্টে আর কেউ নেই। লায়লার মনে যদি এলসা আন্টির মতো কোনও বদমতলব থাকে, তা হলে? প্রশ্নটা মনের আসার পরই মাথার ভিতর আলোর বিস্ফোরণ। ক্রিসমাসের রঙীন টুনি বালবগুলো যেন চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। তার পরই ঘন অন্ধকার।

'এ বার কাউন্ট শুরু করুন ম্যাডাম। আমি যেন শুনতে পাই।'

তাঁর বয়স এখন তিপ্পান্ন। লায়লার কথামতো লিলি বলতে শুরু করলেন, 'ফিফটি থ্রি।' সঙ্গেসঙ্গে লায়লা, মার্থা, বাম কিমের মুখটা দেখতে পেলেন তিনি। চোখের সামনে থেকে দ্রুত ফ্রেমটা সরে গেল। দশ সেকেন্ড পর তিনি 'ফিফটি টু' বলতেই ভেসে উঠল সাশা, ড্যানিয়েল আর ওদের ছেলে-মেয়েদের মুখগুলো। লায়লা জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাডাম, কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

লিলি বললেন, 'হ্যাঁ, আমার পরিচিত মুখগুলো।'

'যত পিছনের দিকের সংখ্যা গুণবেন, ততই পুরনো হয়ে যাওয়া মুখগুলো আপনি দেখতে পাবেন।'

সত্যিই, সদ্য ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা দেখতে পাচ্ছেন লিলি। লায়লার পার্লারের বাইরে অসুস্থ হয়ে পড়া। নিউ ইয়র্কের হাসপাতালে এলসা আন্টি আর অ্যান্ডির সঙ্গে দেখা হওয়া। নায়গারায় রোকেয়া সুলতানার সঙ্গে কথা বলা, কালকেতু ন্যান্ডির সঙ্গে পরিচয় হওয়া, বাফেলোর সেই হাসপাতাল। ফ্রেমগুলো একের পর এক সরে যাচ্ছে। সংখ্যাগুলো বলার সঙ্গেসঙ্গে অতীতের দিকে একেকটা বছর পিছোতে শুরু করলেন লিলি। ইয়েমেনের শহর আদেনে জাহাজে তাঁদের আটকে দেওয়া হয়েছে, সেখানে বুভুক্ষ বাচ্চাগুলোর মুখ। ইউনিসেফ দফতরের মিটিংয়ে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ। প্রেসিডেন্ট অ্যাডামসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার। চ্যারিটি নেভিগেটর দফতরে সংবর্ধনা। বোস্টনে চাইল্ড কেয়ার ইউনিটের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের পৃষ্ঠাগুলো একের পর এক উল্টে যাচ্ছে। জোহানেসবার্গে নেলসন ম্যান্ডেলার হাত থেকে পুরষ্কার নেওয়ার ছবিটাও দেখতে পেলেন লিলি। হোটেলে ফিরে এলসা আন্টি সে বার রাগে ফেটে পড়েছিলেন। উনি মনে করেছিলেন, ফাউন্ডেশনের সবথেকে বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে, ম্যান্ডেলার হাত থেকে পুরষ্কারটা নিতে উনিই মঞ্চে উঠবেন। কিন্তু সংগঠকরা ওঁকে পাত্তা দেননি।

হোটেলে ফিরে সবার সামনে এলসা আন্টি বলে ফেলেছিলেন, 'এখন বুঝতে পারছি, ঢাকার মেডিক্যাল হাসপাতালে তোমাকে মর্গে না পাঠিয়ে, সেদিন আমি খুব ভুল করেছিলাম। আজ তুমি যে অপমানটা আমায় করলে, তার যোগ্য উত্তর তুমি পাবে।'

কথাগুলো শুনে লিলি পরের সংখ্যাটা বলতেই ভুলে গেলেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ!! তা হলে কি তাঁর পরিবারের শিঁকড় বাংলাদেশের ওই

শহরে?

(বিয়াল্লিশ)

নিউ ইয়র্কের জেএফকে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে আছে ইমন। কাল রাতে কালকেতুছ্যার ফোন করে ওকে বলেছিলেন, ডালাসে যেতে হবে না। আলবুকার্ক থেকে ওঁরা ফিরে আসছেন। ও যেন গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে বেলা একটার সময় হাজির থাকে। আগে কখনও ইমন জেএফকে-তে আসেনি। বিশাল এয়ারপোর্টটা দেখে ও হকচকিয়ে গেছিল। টার্মিনালই আছে ছ'টা। একশো পঁচিশের বেশি গেট। ইমন গুগল সার্চ করে জেনে নিয়েছিল, জেটব্লু এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট আলবুকার্ক থেকে টার্মিনাল ওয়ানে এসে নামে। প্রতিদিন না কি আটশোর মতো ফ্লাইট অপারেট করে জেএফকে দিয়ে। যাত্রী সংখ্যা দেড় লাখেরও বেশি। টার্মিনাল ওয়ান দিয়ে ঢুকে ইমন দেখল, কথাটা সত্যি। ভিড়ে লোক গিজগিজ করছে।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত কম্পিউটারের সামনে বসে ও কাজ করেছিল। বেশ বেলা করে ঘুম থেকে উঠেছে। পলাশছ্যারের সব সম্পত্তি রোজিনা ম্যাডাম গ্রাস করে নিচ্ছেন, এই চরম সত্যটা ও কীভাবে বলবে, ইমন ভেবে পাচ্ছে না। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে। তবুও, পলাশছ্যারকে হ্যাকিংয়ের খবরগুলো না দেওয়া পর্যন্ত ও শান্তি পাচ্ছে না। ভালই হয়েছে, উনি ফিরে আসছেন। জিহাদি হিসেবে ধরা পড়ে যাওয়ার পর থেকে এমনিতেই ও পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। কিন্তু পলাশছ্যারের মুখোমুখি না হয়েও ওর কোনও উপায় নেই। ইমন জানে, যদি কেউ এখনও ওকে বাঁচাতে পারেন, তা হলে তিনি পলাশছ্যার। ফের ওর মনে হল, তেমন দরকার হলে ও ছ্যারের পা জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করবে।

আলোয় ঝলমল করছে বিশাল লাউঞ্জ। কত ধরনের দোকান। রেস্তোরাঁয় মুখোমুখি টেবলে বসে একই গ্লাস থেকে দুটি স্ট্র দিয়ে একটা কাপল

আইসক্রিম খাচ্ছে। দেখে চোখ আটকে গেল ইমনের। খেতে খেতে দু'জনে হাসি-মজা করছে। কুসুম কি কোনওদিন রাজি হত, ওর সঙ্গে এভাবে আইসক্রিম খেতে? 'মাইনসে কী কইব' বলে ও ঘুরে বসত। মুসলিম মেয়েদের কত রকম অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাতে হয়! কোনও মানে আছে? ক্যালিফেটে রোজ ওদের কোরাণ পড়তে হত। আরবিতে কোরাণের অনেকটাই ওর মুখস্ত হয়ে গেছিল। কোথাও বলা নেই, মেয়েদের ইচ্ছের কোনও মূল্য দিতে হবে না। আজকাল লেখাপড়া শেখা সত্ত্বেও মুসলিম মেয়েরা কেন যে পুরুষদের সমানাধিকার দাবি করছে না, সেটাই আশ্চর্যের।

হঠাৎই লাউঞ্জ হাততালির শব্দে গমগম করে উঠল। অনেক দূর থেকে শধটা ক্রমেই কাছে আসছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে সামনের দিকে তাকিয়ে ইমন দেখতে পেল, আমেরিকান সেনা বাহিনীর কয়েকজন জওয়ান হেঁটে আসছেন। তাঁদের দেখে লাউঞ্জের সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন। পরনে জলপাই রঙের ছোপছোপ পোশাক, মাথায় টুপি, কাঁধে অটোমেটিক রাইফেল। কী ঝকঝকে চেহারা ওরই বয়সি জওয়ানদের। কেউ একজন বলে উঠলেন, 'উই আর প্রাউড অফ ইউ ডাফবয়েজ।' লোকটার দিকে হেসে তাকিয়ে কাঁধ সোজা করে জওয়ানরা হেঁটে গেলেন গেটের দিকে। ওঁরা বোধহয় কোনও ফ্লাইট ধরবেন। গেটের সামনে দাঁড়ানো যাত্রীরা ওঁদের দেখে পিছিয়ে এলেন।

ইউ এস আর্মির জওয়ানদের ডাফবয়েজ বলে না কি? একজন জওয়ানের এত সম্মান! সেলেব্রিটিদের কপালেও জোটে না। দেখে চোখে জল এসে গেল ইমনের। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল ওঁর। এই সেনাদের মতো ওরাও বন্দুক কাঁধে নিয়েছে, মর্টার চালানো শিখেছে। সেনাদের মতো কৃচ্ছÉসাধনের জীবনযাপন করেছে ক্যালিফেটে। কিন্তু কত তফাৎ সেনাদের সঙ্গে ওদের! সেনারা বীর... দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করেন।

আর ওরা কাপুরুষ। ধর্মযুদ্ধ নামক এক অলীক স্বপ্নের পিছনে দৌড়ে কত দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করছে! বীরদের জন্য হাততালিটা এখনও থামেনি। ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে সেনাদের দলটার সঙ্গে। একটা বাচ্চা ছেলে মায়ের হাত ছেড়ে বেরিয়ে এসে, গোলাপের তোড়া তুলে দিল ওঁদের হাতে। ভবিষ্যতে সে হয়তো জলপাই রঙের পোশাক গায়ে চড়ানোর কথা ভাববে। ঝাপসা চোখে সেদিকে তাকিয়ে ইমনের মনে হল, হায় আল্লাহ, বড় ভুল হয়ে গেছে।

ওর যা শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে স্বচ্ছন্দে ঢুকে যেতে পারত। ওর মতো একজন এথিক্যাল হ্যাকার পেলে দেশের সিক্রেট সার্ভিস লুফে নিত। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব অটুট রাখার জন্য হয়তো 'বীরশ্রেষ্ঠ' পুরস্কারও পেতে পারত। তখন ঢাকার হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর দিয়ে হেঁটে গেলে, হয়তো দেশবাসীরা এইভাবেই ওকে সম্মান জানাতেন। আম্মি হয়তো বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন, 'অহন আমার মইর‍্যাও সুখ।' কিন্তু কী হল শেষপর্যন্ত? রাজাকারের তকমা পাওয়া ওর দাদামশয় চূড়ান্ত অপমানের শিকার হয়েছেন। আর ইমন? ওকেও হয়তো বংশ পরম্পরায় ঘৃণা বহন করে যেতে হবে। এই মুহূর্তে কেউ যদি জানতে পারেন, ও জিহাদি, তা হলে দেশে কী পরিমাণ লাঞ্ছনা জুটবে ওর পরিবারের কপালে, ইমন আন্দাজ করতে পারে। নিজেকেই ও প্রশ্ন করল, আচ্ছা, নতুনভাবে জীবনটা ফের শুরু করা যায় না? কিন্তু, ওর জিহাদি জীবনের অধ্যায়টা কী করে মুছে ফেলবে, ইমন ভেবে পেল না।

হাততালির ঘোর কাটতে না কাটতেই ও শুনতে পেল, 'কখন এসেছ ইমন?'

পাশ ফিরে কালকেতুছ্যারকে দেখে ইমনের চটক ভাঙল। পিছনে পলাশছ্যারকে দেখে ও একটু চমকে উঠল। ডান হাতে স্লিং লাগানো, হাফ হাতা শার্টের ডান হাতাটা ঝুলে আছে। ঘাড়ের এক পাশে লিউকোপ্লাস্ট।

ছ্যারের কি কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল? চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে। সদা হাস্যময় মুখটা কেমন যেন পাংশুটে। ওঁদের সঙ্গে রোজিনা ম্যাডামকে না দেখে ইমনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'ঘইণ্টাখানেক ওয়েট করতাসি। আফনেগো সাথে ম্যাডাম আহেন নাই?'

পলাশছ্যার বিড়বিড় করে বললেন, 'আইলেও কোনও লাভ হইব বইল্যা মনে হয় না।'

হঠাৎ কালকেতুছ্যারের দিকে চোখ পড়ায় ইমন দেখল, ইশারায় উনি কথা বাড়াতে মানা করছেন। তাই ও বলল, 'আপনেরা বাইরে গিয়া দাঁড়ান। আমি পার্কিং থেইক্যা গাড়িডা আনতাসি।'

এটা কী বললেন পলাশছ্যার! রোজিনা ম্যাডাম এলেও কোনও লাভ হবে না! তা হলে কি আলবুকার্কে দু'জনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়ে গেছে? ছ্যার বোধহয় জেনে গেছেন, ম্যাডামের কুকীর্তির কথা। বাজ পড়া গাছের মতো মনে হচ্ছে মানুষটাকে। কী এমন হল? ভাবতে ভাবতে রাস্তা পেরোল ইমন। টার্মিনাল ওয়ানের পার্কোম্যাট রাস্তার ওপাশে। লিফটে করে নিচের তলায় নেমে যেতে হয়। লিফটের জন্য অপেক্ষা করার সময় একটা সিদান গাড়ি থেকে রোহিতকে ও নামতে দেখল। পিছনের সিট থেকে নেমে এলেন ওর আম্মা-আববু। বোধহয় ওঁরা দেশে ফিরে যাচ্ছেন। সেই কারণেই প্লেনে তুলে দিতে এসেছে রোহিত। ডিকি থেকে সুটকেশগুলো নামাচ্ছে ও। ট্রোলির জন্য এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। যাতে চোখে না পড়ে, সেজন্য ইমন একটু ঘুরে দাঁড়াল।

তার পর আড়চোখে তাকিয়ে যাকে দেখল, তাকে ও একদম আশাই করেনি। কুসুম... গাড়ি থেকে নেমে কথা বলছে রোহিতের সঙ্গে। কুসুম যে নিউ ইয়র্কে, সে কথা তা হলে রোহিত জানত? তা হলে দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। গোলাপি রঙের সালোয়ার আর কামিজ পরেছে কুসুম। রংটা ওর খুব প্রিয়, ওকে মানায়ও। একটা হাত ওর সদা ব্যস্ত থাকে ওড়না

সামলাতে। ওড়না দু'কাঁধের নিচে ঝুলছে। পরীর মতো মনে হচ্ছে কুসুমকে। ইমনের একবার ইচ্ছে করল, কুসুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু কোন মুখে দাঁড়াবে? রোহিত ওর কলঙ্কময় অতীতের কথা জানে। নিশ্চয়ই কুসুমের কাছে উগড়ে দিয়েছে।

লিফট এসে দাঁড়িয়েছে। ভিতরে ওরই বয়সি ছিপছিপে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। ইমন দ্রুত ঢুকে পড়ল লিফটের ভিতর। ছেলেটার দিকে একবার তাকাতেই ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল, 'সাইবধান। মনে করার চেষ্টা কর, পোলাডারে কোথায় দেখছস।'

দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই ছেলেটার হাতে পিস্তল উঠে এল। প্রথমেই আরবিতে খিস্তি মেরে বলল, 'ইয়া এবেন আল শারমুতা। কুত্তীর বাচ্চা। পালাবি ভেবেছিস? তোর উপর আমাদের নজর আছে।'

তখনই একটু আগে শোনা হাততালির শব্দটা ইমন শুনতে পেল। বীরত্ব দেখানোর সময় এসে গেছে। হাতে হয়তো পাঁচ সেকেন্ডও সময় নেই। চট করে বাঁ দিকে সরে গিয়ে, ছেলেটার অণ্ডকোষ লক্ষ করে ও ডান পায়ে লাথি চালাল। ছেলেটা আশাই করেনি পিস্তল দেখেও ইমন পাল্টা আঘাত করবে। তলপেট ধরে বসে পড়ার সময় ওর হাত থেকে পিস্তলটা মেঝেতে ছিটকে পড়ল। সেটা দ্রুত কুড়িয়ে নিয়ে ইমন একবার ভাবল, চিরাগের মতো শাস্তি দেয়। এলোপাথাড়ি লাথি মেরে রাগ মেটায়। কিন্তু লিফট নিচের তলায় এসে দাঁড়াচ্ছে। পিস্তলটা পকেটে পুরে ইমন হুডির ঘোমটাটা মাথায় টেনে দিল। লিফট থেকে বেরনোর সময় ও পাল্টা খিস্তি দিয়ে বলল, 'ইয়া শারমুতা। কুত্তা কোথাকার।'

ভাগ্যিস, গেটের বাইরে কোনও লোক দাঁড়িয়ে নেই। দরজা বন্ধ হওয়ার আগে ইমন দেখল, আরবি ছেলেটা তখনও কাতড়াচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে ধীরগতিতে হেঁটে ও গাড়ির কাছে গেল। বেশিক্ষণ এয়ারপোর্টে থাকাটা উচিত হবে না। লিফটের মধ্যে নিশ্চয়ই লুকোনো ক্যামেরা আছে। চোখে পড়ে

গেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে ইমন জেএফকে-তে এসেছিল। তার মানে, জহ্লাদগুলো ওর উপর নজর রেখেছিল। ছেলেটাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। এই সাহসটাই যদি ক্যালিফেটে ওরা দেখাতে পারত, তা হলে ওদের দিয়ে আরবরা বাথরুম পরিষ্কার করানোর কথা ভাবতেই পারত না। গাড়ি নিয়ে বেরনোর সময় ইমন টের পেল, সর্বনাশ। ব্রেক ঠিকঠাক কাজ করছে না। জিহাদিরা আঁটঘাট বেঁধেই ওকে খুন করতে এসেছিল। ব্রেকের তার কেটে দিয়েছে।

পলাশছ্যারেরা রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন। জিহাদি প্রতিপক্ষের কথা মাথায় না রেখে আগে ওঁদের বাসায় পৌঁছে দিতে হবে। এদিক ও দিক তাকিয়ে ইমন কাছেই একটা সিদান গাড়ি দেখতে পেল। ব্রেক ইন করে গাড়িটা নিয়ে বেরনোর সময় ও মুখটাকে রুমালে আড়াল করল। তখনই ওর চোখে পড়ল, জিহাদি ছেলেটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মোবাইল ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। ইমনের একবার ওর মনে হল, ধাক্কা মেরে ছেলেটাকে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু জিঘাংসা দমন করে ও গাড়িটাকে উল্টো দিকের ফুটপাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল। ছ্যারদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে ওকে ফের এয়ারপোর্টে আসতে হবে। চুরি করা গাড়িটাকে ঠিক জায়গায় রেখে যাওয়ার জন্য।

পিছনের সিটে বসে ছ্যারেরা কথা বলছেন। কালকেতুছ্যার জিজ্ঞেস করলেন, ‘পলাশভাহ,এখন কোথায় যাবেন, কিছু ঠিক করলেন?’

পলাশছ্যার বললেন, ‘নিউ জার্সির বাসায় গিয়া কী কইর‍্যা থাকুম ক’ন। বাসা জুইর‍্যা হ্যার স্মৃতি। অহন পারুম না মশয়। আমারে নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়া চলেন।’

গাড়ি চালাচ্ছে বটে, কিন্তু ইমনের কান ছ্যারদের দিকে। ও বুঝতে পারল না, পলাশছ্যার তখন বললেন, ‘ম্যাডামের আইয়া কোনও লাভ অইব না।’ এখন বলছেন, ‘বাসা জুইর‍্যা হ্যার স্মৃতি।’ হয়েছেটা কী? ‘হ্যার’ বলতে

পলাশছ্যার রোজিনা ম্যাডামকেই বোঝাচ্ছেন। তা হলে কি ম্যাডামের সঙ্গে পাকাপাকি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে? কী ভয়ানক একটা খবর! এই তো আলবুকার্ক যাওয়ার দিন ম্যাডাম কবুতরের মতো বকবক করছিলেন। পলাশছ্যারকে স্প্যানিশ আদবকায়দা শেখাচ্ছিলেন। কী খুশিই না মনে হচ্ছিল, তাঁকে দেখে। এমন কী মনোমালিন্য ঘটল, ম্যাডাম এত দূরে সরে গেলেন? প্রশ্নটা করতে গিয়েও ইমন মুখে কুলুপ এঁটে রাখল। নিজেকে মনে মনে বলল, 'হালা, তুই হ্যাগো নোকরস্য নোকর। তর অত কিওরোসিটি দেখানোর দরগারডা কী হারামজাদা?'

পিছন থেকে কালকেতুছ্যার ওকে তখনই বললেন, 'ইমন, তুমি তো নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টটা চেনো। আপাতত, সেখানেই স্যারকে নিয়ে চলো।'

শুনে কুঁকড়ে গেল ইমন। ওই অ্যাপার্টমেন্টে ও মাত্র একবারই গেছিল। সেদিন কেন গেছিল, কালকেতুছ্যারের মনে আছে তা হলে। থাকবেই না কেন? সেদিন উনি প্রাণে বেঁচে গেছিলেন। কী বিরাট অপরাধই না করতে গিয়েছিল সেদিন ইমন। এই রকম একটা দয়ালু মানুষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলে, নিশ্চিত ওকে আল্লাহ দোজখে পাঠাতেন। ছোট্ট কথায় ও উত্তর দিল, 'জ্বী ছ্যার, চিনি।'

মিনিট পঁয়ত্রিশের ড্রাইভ। ইয়ার এন্ডিংয়ের ছুটি চলছে নিউ ইয়র্কে। ভর দুপুরে রাস্তায় গাড়ি খুব কম। অনেকটা পিছনে পুলিশের একটা গাড়ি হুটার বাজিয়ে আসছে। ইমনের বুকটা কেঁপে উঠল। গাড়ি চুরির কথা পুলিশ জেনে গেল না কি? লুকিং মিররে চোখ রেখে, ও দেখল, পুলিশের গাড়িটা থার্ড লেন ধরে ছুটছে। তার পিছনে একটা অ্যাম্বুল্যান্স। নাহ, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বোধহয় সামনে কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। নর্থ আমেরিকায় বেশ কিছুদিন কাটানো হয়ে গেল। অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে, এই দেশে ট্র্যাফিক পুলিশের জবাব নেই। হাইওয়ে বা ফ্রিওয়ের কোথাও ওঁরা চোখে পড়েন না। কিন্তু দরকার হলে চট করে হাজির হন। বিশেষ করে, কোনও দুর্ঘটনা

ঘটলে। সত্যিই, পুলিশের গাড়িটা ডানদিক দিয়ে ফ্যাশন অ্যাভেনিউতে ঢুকে পড়ল। নিশ্চিন্ত হয়ে ইমন গাড়ি ছোটাল চেলসির দিকে।

হঠাৎ পলাশছ্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'ম্যাডামরে ছাড়া আমি বাঁচুম কী কইর‍্যা কাইলকেতুভাই?'

কাইলকেতুভাই বললেন, 'অত উতলা হবেন না। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার মন অন্য জানান দিতাসে। হ্যার ভরসায় আমি বাংলাদ্যাশের পাট চুকাইয়া দিতাসিলাম। ওহানকার বিজনেস গুটাইয়া এহানে সেটল করুম ভাবতাসিলাম। কিন্তু মাইনষে ভাবে এক, হয় আর এক। হ্যায় না থাইকলে আমারে দ্যাশে ফিইর‍্যা যাইতে অইব।'

পলাশছ্যারের গলায় আক্ষেপ আর হা হুতাশ শুনে ইমনের ভাল লাগছে না। ছ্যার এতটা ভেঙে পড়েছেন কেন, ও বুঝতে পারছে না। ম্যাডামকে ছ্যার এত ভালবাসেন, বাংলাদেশ থেকে একেবারে চলে আসার কথা পর্যন্ত ভাবছিলেন। তার মানে, কাল রাত থেকে ওর মাথার মধ্যে যে সব কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল, সব ভুল! গোপনে হ্যাকিং করে রোজিনা ম্যাডাম ছ্যারকে সর্বস্বান্ত করার কথা ভাবেনইনি। উল্টে, ছ্যারই স্বেচ্ছায় দেশের সব ব্যবসা বিক্রি করে দিয়ে এখানে সংসার পাততে চাইছিলেন? আলবুকার্কে হয়তো কোনও কারণে ম্যাডামের সঙ্গে ছ্যারের ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে। ভালবাসার সম্পর্কে তো মাঝে মধ্যে টানাপোড়েন চলেই। আবার মিলমিশও হয়ে যায়। ছ্যার এত উদার মনের মানুষ, পারতেন না ম্যাডামকে ফের কাছে টেনে নিতে? ওঁকে ফেলে রেখে কেন ছ্যার নিউ ইয়র্কে চলে এলেন?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ইমন পৌঁছে গেল চেলসির অ্যাপার্টমেন্টে। গাড়ি থেকে নেমে কাইলকেতুছ্যার বললেন, 'লাঞ্চের পর তুমি একবার আমার কাছে এসো ইমন। তখন শুনব, চিরাগের কী হল?'

ইমন বলল, 'জ্বী ছ্যার। আমারে ফোন কইর‍্যা দিয়েন।'

দু'জন লিফটের দিকে এগিয়ে যেতেই ইমন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দু'জনই এমন অন্যমনস্ক, টেরও পাননি চুরি করা গাড়িতে করে এসেছেন। ইমন সঙ্গেসঙ্গে মনস্থির করে নিল। গাড়িটা কাছাকাছি কোনও রেস্তোরাঁর পার্কিং স্পেসে রেখে দেবে। নিজে লাঞ্চ করে তার পর ফিরে আসবে এই অ্যাপার্টমেন্টে। গাড়িতে ওঠার আগে হঠাৎ ওর চোখে পড়ল পিছনের সিটে কয়েকটা বাংলা কাগজ পড়ে আছে। সম্ভবত, ছ্যারদের মধ্যে কেউ ফেলে রেখে গেছেন। বহুদিন পর চোখের সামনে বাংলা খবরের কাগজ। বাংলা অক্ষরগুলো ওকে টানতে শুরু করল। ট্যাবলয়েড সাইজের কাগজটার নাম 'যুগযুগান্ত'। এই নামে কোনও কাগজ বেরোয়, ইমন জানতই না। কৌতূহলবশতঃ কাগজটা ও হাতে তুলে নিল। প্রথম পৃষ্ঠাতেই চোখ আটকে গেল ওর।

পাশাপাশি রোজিনা ম্যাডাম আর পলাশছ্যারের ছবি। তার নিচে বড় বড় করে হেডিং, 'র‍্যাঞ্চে নেকড়ের তাণ্ডব, ক্ষত বিক্ষত প্রেমিক যুগল।' 'প্রেমিকার অবস্থা সঙ্কটজনক।' পৃষ্ঠার তলার দিকে আরও একটা ছবি। নেকড়ের সঙ্গে লড়াই করছেন পলাশছ্যার। পাথুরে জমিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন রোজিনা ম্যাডাম। জ্যোৎস্না রাতে ঝরণার ধারে ছবিটা তোলা। তবুও, দু'জনকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। দুটো ছবির মাঝে বিশদ খবর। দ্রুত কয়েকটা লাইন পড়ে ফেলল ইমন। ইয়াল্লাহ, তা হলে এই কারণেই পলাশছ্যার জীবন সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন!

যুগযুগান্ত কাগজে আরও একটা জিনিস লক্ষ করে ইমন চমকে উঠল। খবরটা লিখেছেন, নিউইয়ার্কের সংবাদদাতা রেজওয়ানা চৌধুরী। আরে, কুসুমের ভাল নামও তো রেজওয়ানা। আম্মু সেদিন বলছিল বটে, কুসুম খবরের কাগজের রিপোর্টার। এই খবরটা ও-ই লিখেছে না কি? ইমন মনোযোগ দিয়ে খবরটা পড়তে লাগল।

(তেতাল্লিশ)

আলবুকার্ক থেকে জেটব্লু এয়ারওয়েজের ফ্লাইট ওড়ার পর পাইলট বলেছিলেন, নিউ ইয়র্কে আজ ঝকঝকে রোদ্দুর। পুরো দিনটাই সানি। লাঞ্চ সেরে গেস্টরুমের বারান্দায় বেরিয়ে কালকেতু দেখল, সাত তলার উপর থেকে নিউ ইয়র্কের স্কাইলাইনটা অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। আকাশটা ঘন নীল। দূরে নববুই-একশো তলার বিখ্যাত বাড়িগুলোর গা থেকে রোদ্দুর ঠিকরে পড়ছে। আড়াইশো থেকে পাঁচশো মিটার উঁচু, আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়, কোন বাড়ির কী নাম। প্রথমেই ওর চোখে পড়ল ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। আগে যেখানে ছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার... নাইন ইলেভেনে ভেঙে পড়া সেই টুইন টাওয়ার। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, ক্রাইসলার বিল্ডিং, ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা টাওয়ার, নিউ ইয়র্ক টাইমস অফিস, সেন্ট্রাল পার্ক টাওয়ার, রকফেলার প্লাজা, মেটলাইফ আর ট্রাম্প টাওয়ার...। নিউ জার্সিতে যাওয়ার আগে যে ক'দিন কালকেতু এই অ্যাপার্টমেন্টে ছিল, তখন রোজিনা ম্যাডাম ওকে বাড়িগুলো চিনিয়ে ছিলেন। কে জানত, মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যবধানে ম্যাডামের এইরকম বিয়োগান্ত পরিণতি হবে?

পলাশভাই মারাত্মক শক পেয়েছেন। এখনও তার ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি। অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেই উনি সোফায় মুখ ঢেকে খানিকক্ষণ বসে রইলেন। তার পর সেই যে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন, আর বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন না। অনেক বুঝিয়ে কালকেতু ওঁকে লাঞ্চ টেবল পযন্ত নিয়ে এসেও কিছু খাওয়াতে পারেনি। এক গ্লাস ফলের রস খেয়ে পলাশভাই উঠে গেলেন। বারবার উনি রোজিনা ম্যাডামের প্রসঙ্গ তুলছেন। আজ সন্ধের ফ্লাইটেই ম্যাডামকে অবশ্য নিয়ে আসছেন রায়ান আর হেমলতা। নিউ ইয়র্কের সেরা হাসপাতাল প্রেসবাইটেরিয়ানে ভর্তি করতে। অস্ট্রিয়া থেকে একজন র‍্যাবিজ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আসছেন ওঁকে দেখতে। কিন্তু গতকাল বিকালে র‍্যাঞ্চের হাসপাতালে গিয়ে রোজিনা ম্যাডামকে দেখে এসেছে। তার পর থেকে কালকেতু আর কোনও ডাক্তারের উপরই ভরসা রাখতে পারছে

না। ম্যাডামের সারা শরীর এমন বীভৎস ফুলে গেছে যে, সেরে ওঠার সম্ভাবনা খুব কম।

রোজিনা ম্যাডামকে ছেড়ে পলাশভাই আসতে চাইছিলেন না। কিন্তু সুদীশের কথায় ওঁকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে কালকেতু। কেননা, সুদীশ ফোন করে বলেছিল, ইন্টারপোল পলাশভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চায়। কালকেতু জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন, কোনও প্রবলেম হয়েছে না কি?' সুদীশ উত্তর দেয়, 'বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিস-এর কিছু কোয়ারিজ আছে। ভদ্রলোককে তুই ধরে বেঁধে নিয়ে আয়।' পলাশভাইয়ের মানসিক অবস্থা জানানোর পর সুদীশ বলেছিল, 'বাংলাদেশ সিকিওরিটি ইন্টেলিজেন্স ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে চায়। সেই ফাঁকে আমার সঙ্গেও ওঁর আলাপ হয়ে যাবে। উনি তো চাইছিলেন, আমার সঙ্গে আলাপ করতে। আরে, আমি থাকব। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' হেমলতাকে কথাটা জানাতেই উনি বলেছিলেন, 'আপনারা দু'জন আগে চলে যান। আমরা পরে যাচ্ছি।'

সুদীশরা কখন আসবে, নিশ্চিত করে কিছু বলেনি। বারান্দা থেকে গেস্ট রুমে ঢুকে কালকেতু বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। এই অ্যাপার্টমেন্টে আগে ও সবসময় রোজিনা ম্যাডামের উজ্জ্বল উপস্থিতি টের পেত। রোজ অত ব্যস্ততা সত্ত্বেও উনি একবার করে গেস্ট রুমে আসতেন। কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না, জেনে যেতেন। পলাশভাইয়ের খেঁয়ালিপনা নিয়ে মাঝে মধ্যেই উনি হাসিঠাট্টা করতেন। কিন্তু কখনই মাত্রার বাইরে যেতেন না। কালকেতুর মনে পড়ল, ও নিউ ইয়র্কে আসার পরদিনই পলাশভাই আর ওকে, রোজিনা ম্যাডাম টেনে নিয়ে গেছিলেন, বাড়ির কাছে আর্ট মিউজিয়ামে। সেদিন নামী শিল্পীদের আর্ট ওয়ার্ক নিলাম হচ্ছিল। রোজিনা ম্যাডাম কয়েক হাজার ডলার দিয়ে ডেলগাদোর একটা ছবি কিনেছিলেন। অত দাম! পলাশভাইয়ের মনঃপূত হয়নি।

গাড়িতে ফেরার সময় আলোচনা হচ্ছিল, ছবিটা কোথায় টাঙানো হবে। পলাশভাই সাদাসিধে উত্তর দিয়েছিলেন, লিভিং রুমে। যাতে সবাই দেখতে পায়। কালকেতুরও সেটাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ম্যাডাম বলেছিলেন, একদম না। ছবিটা গেস্টরুমে রাখবেন। লোক দেখানোর জন্য উনি কেনেননি। এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট। দশ বছর পর এই ছবিটা বিক্রি করলে দ্বিগুণেরও বেশি দাম পাবেন। কথাটা শুনে পলাশভাই তারিফ করেছিলেন, 'হেইডা কিন্তু আমার মাথায় ঢোকে নাই ম্যাডাম।' তখন রোজিনা ম্যাডাম বলেছিলেন, 'কালকেতুভাই, দাঁত থাকতে তো লোকে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। আমি যখন থাকব না, তখন আপনাদের পলাশভাই আমার অভাবটা টের পাবেন।' কত খাঁটি একটা কথা! ডেলগাদোর ছবিটা এখনও গেস্ট রুমের দেওয়ালে টাঙানো আছে। হয়তো আগামী দশ বছরও ওইভাবে ঝুলে থাকবে। কিন্তু রোজিনা ম্যাডাম নাও থাকতে পারেন।

আজ কেমন যেন সব শূন্য শূন্য মনে হচ্ছে। সত্যিই, ম্যাডামকে ছাড়া পলাশভাই এই অ্যাপার্টমেন্টে থাকবেন কী করে? সর্বত্রই ওঁর রুচি আর যত্নের ছাপ। অ্যাপার্টমেন্টের দেওয়ালের রং, আসবাবপত্র, আলোর সাজ, মায় প্রতিটা শো পিস রোজিনা ম্যাডামের পছন্দ করা। আইকিয়া বলে হোম ফার্নিশিংয়ের একটা শো রুম আছে। সেখান থেকে প্রায়ই উনি বেলজিয়ান অথবা ফ্রেঞ্চ শো পিস কিনে আনতেন। শখের জিনিস কেনা নিয়েও পলাশভাইয়ের সঙ্গে ওঁর মিষ্টি ঝগড়া হত। কালকেতুর মনে আছে, একবার ম্যাডাম মাইকেল কর্সের একটা হ্যান্ডব্যাগ কিনে এনেছিলেন। মাইকেল কর্স মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগের খুব নামী ব্র্যান্ড। তার দাম শুনে পলাশভাই চমকে উঠেছিলেন, 'ক'ন কী ম্যাডাম! দু'লাইখ ট্যাহা!'

তখন রোজিনা বলেছিলেন, 'অত অবাক হওনের কী আছে? আফনাগো দ্যাশে লেডিস হ্যান্ডব্যাগ তো খেজুর পাতা, তাল পাতা আর ব্যাত দিয়া তৈরি হয়। হ্যায় ব্যাগ নিয়া আমি পার্টিতে যাম না হি? যা বোঝেন না, তা

নিয়া কথা কইবেন না।' পলাশভাই তখন আমতা আমতা করে বলতেন, 'আমি তো খারাপ কই নাই। আফনের হাতে মাইকেল কর্স মানাইব। কিন্তু ভাবেন তো, আমাগো অফিসের মিসেস ডরোথি হ্যায় ব্যাগ নিয়া ঘুইর‍্যা বেরাইতাসে। লোকে কী কইব?' রোজিনা মৃদু ধমক দিয়ে বলতেন, 'থামেন তো। ফের লুজ টক। আমি কিন্তু ডরোথিরে কইয়্যা দিমু।'

টুকরো টুকরো স্মৃতি। মনে পড়ার ফাঁকেই কালকেতু টের পেল, ডোর বেল বাজছে। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই ও দেখল, সুদীশ দাঁড়িয়ে। ওর সঙ্গে এক বাংলাদেশি ভদ্রলোক। লিভিং রুমে আসার সময়ই সুদীশ পরিচয় করিয়ে দিল, 'কালকেতু, ইনি প্রিয়তোষ সাহা। বাংলাদেশ সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের অফিসার। তোর পলাশভাইয়ের সঙ্গে ইনি কথা বলতে চান।'

কালকেতু লক্ষ করেনি, ডোর বেলের আওয়াজ শুনে পলাশভাইও নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। উনি বললেন, 'আসেন, আসেন। আইজ আফনেগো ঠিকঠাক আপ্যায়ন করতে পারুম না। বাসার মালকিন অসুস্থ... হ্যায় হাসপাতালে।'

উনি আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাধা দিয়ে প্রিয়তোষবাবু বললেন, 'আমরা জানি। ভেরি স্যাড। আফনেরে ডিসটার্ব কইরতাম না। কিন্তু আমারে পরশুর মধ্যে দেশে ফিইর‍্যা যাইতে অইব। প্রাইম মিনিস্টারের অর্ডার। কেননা, তার পরের দিনই উনি কলম্বো যাইবেন। সার্ক কান্ট্রির কী একডা মিটিং আসে।'

প্রিয়তোষবাবু বোধহয় একান্তে কথা বলতে চান পলাশভাইয়ের সঙ্গে। সুদীশ চোখের ইশারায় বলল, বারান্দায় চলে যেতে। কালকেতু সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। কয়েক সেকেন্ড স্কাইলাইনের দিকে তাকিয়ে থেকে সুদীশ বলল, 'অনেক কপাল করলে, এসব জায়গায় থাকা যায়, বুঝলি কালকেতু।'

কালকেতু ঠাট্টা করে বলল, 'আক্ষেপ করিস না ভাই। অনেক কপাল করলে তোর মতো ইন্টারপোল অফিসার হওয়া যায়।'

'কলকাতার বিডন স্ট্রিটের যে বাড়িটায় আমি থাকি, তার কথা তুই ভাব। তা হলেই বুঝতে পারবি, আফসোসটা কেন করছি। যাক সে কথা। পলাশভাই লোকটাকে তো তুই বেশ কিছুদিন ধরে দেখছিস। ওর সম্পর্কে তোর অ্যাসেসমেন্ট কী, শুনি।'

'হ্যাপি গো লাকি টাইপ। রোমান্টিক। ওপেন হার্টেড। কখনও কখনও হুইমজিক্যাল বলেও মনে হয়।'

'এই রকম একটা লোক মাল্টি মিলিওনিয়ার হল কী করে, তোর মনে কখনও প্রশ্ন জাগেনি?'

কালকেতু ভ্রু কুঁচকে বলল, 'আমার তো মনে হয়, লোকে মাল্টি মিলিওনিয়ার তিনরকম ভাবে হতে পারে। এক, যদি কেউ পৈতৃক সম্পত্তি পায়। দুই, কোনও ক্রিমিনাল অ্যাকটিভিটির সঙ্গে যুক্ত থাকলে। তিন পলিটিক্যাল পাওয়ারের আশীর্বাদ পেলে। যেমন ধর, আমাদের দেশের উদাহরণ দিলে... এক, বিড়লাভাইয়েরা। দুই, নীরব মোদি-বিজয় মালিয়া। তিন, মুকেশ আম্বানি, অনিল আম্বানি।'

'কারেক্ট। তোর পলাশভাইয়ের ক্ষেত্রে তৃতীয় কারণটা প্রযোজ্য। ওঁর বাবা সুধাময় চৌধুরী একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। উনি পাক সেনাদের অত্যাচারে কলকাতায় পালিয়ে যান। ওখানে খুব অ্যাকটিভ ছিলেন। সেইসূত্রে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বাংলাদেশ হওয়ার পর পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছয়। সুধাময়বাবু সামান্য একটা গারমেন্টস ফ্যাক্টরি দিয়ে ব্যাবসা শুরু করেছিলেন। কারও কাছ থেকে লোন নিয়ে। পরে অবশ্য সোনালি ব্যাঙ্ক মদত দিয়েছে। সেই ব্যাবসাটাই পলাশভাই বাড়িয়ে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। বাংলাদেশের এখনকার প্রাইম মিনিস্টারের উনি খুব স্নেহধন্য ছিলেন। কিন্তু, রিসেন্টলি বাংলাদেশের সিকিওরিটি ইন্টেলিজেন্স...

মানে বিএসআই-য়ের হাতে কিছু ডকুমেন্টস এসেছে, যা তোর পলাশভাইকে বিপদে ফেলতে পারে।'

'কী ধরনের ডকুমেন্টস?'

'জিহাদিদের ফান্ডিং করা নিয়ে। তুই নিশ্চয় জানিস, বাংলাদেশে আইএস সংগঠন বাড়াচ্ছে। জামায়েতিদের মধ্যে ওরা ঢুকে গেছে। কয়েকজন ব্লগারকে পর পর ওরা খুন করেছে। ব্লগারদের মধ্যে একজন ছিলেন ঢাকার কাগজের নামকরা সাংবাদিক। সেই কেসের তদন্তে নেমে প্রথম বিএসআই জানতে পারে, পলাশভাইয়ের সঙ্গে জিহাদিদের লিঙ্ক আছে।'

'পলাশভাই আর জিহাদি গ্রুপ! কোথাও একটা ভুল হচ্ছে রে।'

'পলাশভাই সম্পর্কে তুই কতটুকু জানিস, কালকেতু? তুই কি জানিস, গতবার আমেরিকায় আসার পথে জিহাদিরা ওঁকে কিডন্যাপ করেছিল?'

'কই, উনি তো আমাকে কিছু বলেননি।'

'তা হলে আমার কাছে শোন। দুবাইয়ে পলাশভাইয়ের দু'দিন থাকার কথা ছিল। এয়ারপোর্ট থেকে উনি যখন হোটেলের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন জিহাদিরা ওঁকে তুলে নিয়ে যায়। দিন দুয়েক আটকেও রেখেছিল। জিহাদি জামায়েতিরা ডিম্যান্ড করেছিল, চিনাদের কাছ থেকে ওরা দশটা সুইসাইড বম্বারদের জ্যাকেট কিনতে চায়। তার দাম পলাশভাইকে দিতে হবে। উনি প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু জিহাদিরা ঢাকায় ওঁর শপিং মলে ব্লাস্ট করবে বলে ভয় দেখায়। ব্লাস্টে বেশ কয়েকজন মারা যান। সেই সূত্র ধরেই, ইন্টারপোলের সাহায্য নিয়ে বিএসআই দুবাই থেকে রফিকুল আলম বলে এক বাংলাদেশি জিহাদিকে ধরে। তার মুখ থেকে পুলিশ জানতে পারে, পলাশভাই সুইসাইড জ্যাকেট কেনার জন্য হাওলায় চিনাদের টাকা দিয়েছিলেন। নারাণগঞ্জ থেকে সেই জ্যাকেটগুলো পুলিশ পরে উদ্ধারও করে। বিএসআই প্রথমে পলাশভাইকে ঘাঁটাতে চায়নি। কেননা, ওরা জানত,

ভদ্রলোক পিএমের ঘনিষ্ঠ। কিন্তু, প্রায় একবছর কেসটা চাপা পড়ে থাকার পর, ইদানীং পিএমও থেকেই চাপ দেওয়া হয়, খোঁজখবর নাও।'

শুনে কালকেতু প্রমাদ গুনল। জিহাদিরা জোর করে র‍্যানসাম আদায় করেছে। ব্যাবসায়ী অথবা শিল্পপতিদের কাছ থেকে এভাবে চাপ দিয়ে অর্থ আদায়... নতুন কিছু নয়। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গেও তাঁদের আপোষ করে চলতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি যদি ইচ্ছে করে, তা হলে কাউকে ফ্যাসাদেও ফেলতে পারে। পলাশভাইও সে রকম কোনও পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন না কি? না হলে এক বছর পর ফের তদন্ত শুরু হল কেন? চট করে কালকেতুর মনে হল, কয়েকদিন আগে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল। সেইসময় একদিন পলাশভাই গুম হয়ে লিভিং রুমে বসে ছিলেন। তখন রোজিনা ম্যাডামকে ও বলতে শুনেছিল, 'আফনেরে এত কইর‍্যা কইলাম, জামায়েতিগো ফান্ডিং করতে অইব না। আফনে আমার কথা হুনলেন না। অহন সামলাইবেন কী কইর‍্যা, ভাবেন।' কথাটা মনে পড়ায় কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'বাংলাদেশের পিএম পলাশভাইয়ের উপর চটলেন কেন রে?'

সুদীশ বলল, 'নির্বাচনের সময় পলাশভাই এমন একটা পলিটিক্যাল পার্টিকে টাকা দিয়েছিলেন, যারা আওয়ামী লিগের বিরোধী। নামটা তোকে বলেই দিচ্ছি। জামায়েতি পার্টি। ভায়োলেন্স করার কারণে, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অধিকার জামায়েতিদের নেই। তবুও ওরা ঘুরপথে বিএনপি... মানে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির হয়ে এবার নির্বাচনে নেমেছিল। কিন্তু গোহারান হেরে গেছে। বুঝতেই পারছিস, পিএম-এর রাগের কারণটা কী হতে পারে। কাণাঘুষোয় পলাশভাই বোধহয় কিছু শুনেছিলেন। আমেরিকায় আসার কয়েকদিন আগে উনি পিএমকে ফোনও করেন। কিন্তু পিএম ফোন ধরেননি।'

'বিএসআই কি পলাশভাইকে অ্যারেস্ট করবে?'

‘আপাতত নয়। প্রিয়তোষবাবু শুধুমাত্র কথা বলতে এসেছেন। সত্যিই ওঁর সঙ্গে জিহাদিদের কোনও কানেকশন আছে কি না জানতে। তবে, বোকার মতো কয়েকটা কাজ কিন্তু পলাশভাই করে ফেলেছেন। যেমন, চিরাগ আর ইমনকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া। জিহাদিদের উপর এই সিমপ্যাথিটা উনি দেখাতে গেলেন কেন? উনি ভাল করেই জানতেন, ছেলে দুটো জিহাদি।’

কালকেতু বলল, ‘চিরাগের কথা বলতে পারব না। আমি এটুকু জানি, পলাশভাইয়ের গ্রাম আমোদপুরের ছেলে ইমন। হয়তো সেই কারণেই...সফট কর্নার, বলতে পারিস।’

‘ইমন এখন কোথায় রে? এখানে, না কি নিউ জার্সিতে?’

‘এখানে। নিচে পার্কিং স্পেসে কোথাও আছে। কেন, ওকে ডাকব?’

‘এখন না। ওর সঙ্গে আমি আর প্রিয়তোষভাই আলাদা করে কথা বলব। ওর সম্পর্কে আমার কাছে যা খবর আছে, তাতে মনে হয়, ছেলেটা ব্রিলিয়ান্ট। এথিক্যাল হ্যাকিংয়ের কাজটা খুব ভাল করে জানে। বাংলাদেশ ডিফেন্স বা সিকিউরিটি এজেন্সিগুলো ওকে কাজে লাগালে, উপকার পাবে। তোর মুখে শুনেছি, ছেলেটা সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে চায়। সেটা ওকে আমাদের সামনে বলতে হবে। তার পর দেখি, ওকে দেশে ফেরানোর জন্য আমরা কিছু করতে পারি কি না।’

‘পলাশভাই কিন্তু সেই কারণেই ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তো উনি নিজেই ফেঁসে রয়েছেন।’

সুদীশ হেসে বলল, ‘অত ভাবিস না। আমি যদ্দুর শুনেছি, পলাশভাই একবার পিএম-এর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। পিএম ওঁকে ছেলের মতো ভালবাসেন। তা না করে উনি বাংলাদেশ থেকে ব্যাবসা গুটিয়ে নিয়ে এ দেশে থেকে যেতে চাইছেন। সেই কারণেও পিএম ওর উপর আরও চটেছেন। পারলে তুই একটু ওঁকে বোঝাস।’

শুনে কালকেতু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'চিরাগ এখন কোথায় রে?'

সুদীশ বলল, 'হাসপাতাল ঘুরে ও এখন নিউ জার্সির হাডসন কারেকশনাল সেন্টারে। এমন একটা সেলে আছে যেখানে, মার্ডারার আর রেপিস্টদের ভিড়। রোজই খাবারের লাইনে দাঁড়িয়ে অথবা ওয়াশরুমে স্নান করতে যাওয়ার সময় চিরাগ প্রচণ্ড মারধর খাচ্ছে। এগেইন থ্যাঙ্কস টু ইমন। বলতে গেলে ও-ই চিরাগকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। সে এক অন্য গল্প।'

'চিরাগ ছেলেটা খুব খতরনাক টাইপের। পলাশভাইয়ের খুব ক্ষতি করে দিত।'

'ওর সম্পর্কে একটা ইন্টারেস্টিং খবর তোকে দিচ্ছি। কিন্তু কোত্থাও ডাইভালজ করবি না। তুই নিশ্চয় জানিস, কারেকশনাল সেন্টারগুলো কী রকম হোমোসেক্সচুয়ালদের আখড়া। ওখানে অন্য বন্দিরা জেনে গেছে, চিরাগ হিজড়ে। ওর লিঙ্গ নেই। ফলে ওর জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বন্দিরাই মারধর করে ওর পেট থেকে কথা বের করে নেয়। চিরাগ না কি স্বীকার করেছে, জন্ম থেকে ও হিজড়ে নয়। সিরিয়ার রাক্কায় ও একবার ওলা বলে একটা সিরিয়ানমেয়েকে আটকে রেখে দিনের পর দিন রেপ করেছিল। সিরিয়ান জিহাদিরা সে কথা জানতে পেরে ক্যালিফেটের মধ্যেই ওর লিঙ্গ কেটে নেয়। ভারতীয় হয়ে একজন সিরিয়ান মেয়েকে রেপ করার অপরাধে। তোকে একদিন বলেছিলাম না, আরব দেশের জিহাদিরা নন-আরব জিহাদিদের খুব নিচু চোখে দেখে। এটা তার গ্লেয়ারিং একজাম্পল।'

কথা বলতে বলতে ঘরের দিকে তাকিয়ে সুদীশ বলল, 'চল, ভিতরে যাই। তোর পলাশভাই আবার উল্টোপাল্টা কিছু বলে ফেললেন কি না, গিয়ে শুনি।'

সুদীশের পিছুপিছু কালকেতু ঘরে ঢুকে এল। লিভিং রুমে ঢুকে ও শুনতে পেল, পলাশভাই খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রিয়তোষবাবুকে বোঝাচ্ছেন,

খৈয়াছড়ায় উনি কীভাবে নায়গারার ফলসের বিকল্প তৈরি করবেন!

(চুয়াল্লিশ)

ইউনিসেফের কনফারেন্স রুমের বাইরে লিলি গডউইন অপেক্ষা করছেন। কাচের দেওয়ালের ও পাশে তিনি দেখতে পেলেন, লাউঞ্জে রেজওয়ানা, মার্থা আর মি. বাম কিম দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখে বাম কিম দূর থেকে দুটো আঙুল ভি আকারে তুলে দেখালেন। ভি ফর ভিক্টরি। দেখে লিলি খুশি হলেন। তার মানে, ইউনিসেফের মিটিংয়ে রোহিঙ্গা বাচ্চাদের নিয়ে তাঁর ব্রিফিং মন্দ হয়নি। বাম কিম এমনিতে একটু অর্ন্তমুখী টাইপের। চট করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন না। কিন্তু আজ নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে, কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে, হাসিমুখে উনি বললেন, 'কনগ্রাটস ম্যাডাম। আপনার সুপার্ব প্রেজেন্টেশন আজ আমাদের সবার মন ছুঁয়ে গেছে। ওয়ান্ডারফুল, অসাম।'

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে লিলি বললেন, 'থ্যাঙ্কস মি. কিম। রোহিঙ্গা বাচ্চাগুলোর জন্য কিছু করতে পারলে আমি খুব খুশি হব। তাই একটু তৈরি হয়েই এসেছিলাম।'

বাম কিমের দেখাদেখি, রেজওয়ানাও ভিতরে ঢুকে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'ম্যাডাম, অ্যাদ্দিন আপনাকে চিনতে পারিনি। রোকেয়া আপাকে আজ আপনি যা সম্মান দিলেন, বাংলাদেশের মানুষ তা কোনওদিন ভুলবে না।'

বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে রোহিঙ্গা বাচ্চাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ইউনিসেফের নজরে আনার জন্য কর্তাদের মিটিং ডাকতে অনুরোধ করেছিলেন লিলি। মিটিংয়ে এত লোক হবে, আজ সকালেও তিনি ভাবতে পারেননি। থ্যাঙ্কস টু মার্থা। পেন ড্রাইভে রোকেয়ার পাঠানো ছবিগুলো ভাগ্যিস সাজিয়ে দিয়েছিল। ছবিগুলো পর্দায় ফেলে লিলি যখন রোহিঙ্গা বাচ্চাদের উপর মায়ানমার সেনার নিষ্ঠুরতার বিবরণ দিচ্ছিলেন, তখন

ইউনিসেফ কর্তাদের মধ্যে অনেকেই আর চুপ করে থাকতে পারেননি। ‘শেম, শেম’ বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন। লিলির চোখেও জল এসে গিয়েছিল। বক্তৃতা থামিয়ে একাধিকবার তিনি রুমাল দিয়ে চোখও মুছেছিলেন। ‘এই বাচ্চাগুলোর জন্য এখুনি আমাদের কিছু করা দরকার। এখুনি। না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।’

কথা বলতে বলতে একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছিলেন লিলি। তখন আর টেররিস্ট অ্যাটাক, মৃত্যুভয়, ফাউন্ডেশনে হ্যাকিং, এলসা আন্টির ষড়যন্ত্র, অতীত জীবনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টার কথা তাঁর মনেই ছিল না। পর্দা জুড়ে মৃত রোহিঙ্গা শিশুর নিথর দেহ, তাতে জলজ প্রাণীর দংশনের চিহ্নগুলো তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল। কানে রোহিঙ্গা মায়ের তীব্র আর্তনাদ আর হাহাকারের শব্দ। মনের ভিতর থেকে গলগল করে কিছু কথা উঠে আসছিল। বক্তৃতায় হন্ডুরান, ইয়েমেনিজ, রোহিঙ্গা বাচ্চারা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছিল। ‘যে যেখানেই থাকুক, যে ধর্মেরই হোক, এরা সবাই মানবসন্তান, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।’ লিলি বলেছিলেন, ‘আমরা যেন তা না ভুলি। সেই তাগিদেই ঢাকায় আমি চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের একটা শাখা খুলতে চাই। অনাথ রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য। রোকেয়া সুলতানা চাইল্ড কেয়ার ইউনিট। আপনাদের অবগতির জন্য জানাই, রোহিঙ্গা শিশু নিগ্রহের যে ছবিগুলো একটু আগে আপনাদের দেখালাম, তা আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশের সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রোকেয়া সুলতানা। সম্প্রতি তিনি জঙ্গিদের আক্রমণে মারা গেছেন। ঢাকার ইউনিটের সঙ্গে আমি তাই তাঁর নামটা জুড়ে রাখতে চাই।’ লিলির ঘোর কেটেছিল অনেকক্ষণ পর, হাততালির শব্দে।

ইউনিসেফ কর্তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। ওঁরা কী সিদ্ধান্ত নেন, সেটা জানার জন্য লিলি বাইরে অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ কনফারেন্স

রুমে দরজা খুলে গেল। কর্মাধ্যক্ষের সচিব মেরি ক্লপের মুখটা উঁকি দিল, 'মিস গডউইন, দয়া করে আপনি ভিতরে আসুন।'

মিসেস ক্লপের সঙ্গে কনফারেন্স রুমের ভিতরে ঢুকতেই ফের হাততালির ঝড়। ফোটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ঝলকানি। লিলি পোডিয়ামে ওঠার পর কর্মাধ্যক্ষ অ্যান্টনি গোমস বললেন, 'মিস গডউইন আপনার বক্তব্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। আপনার প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করলাম। আপনি যত শিগগির পারেন, রোকেয়া সুলতানা চাইল্ড কেয়ার ইউনিট চালু করে দিন। আমি নিজে ইনঅগোরেশনের দিন সেখানে হাজির থাকব। ইউনিসেফ আপনার এই প্রোজেক্টের জন্য এক মিলিয়ন ডলার ডোনেশন দেবে।'

ফের কনফারেন্স রুমে হাততালি ঝড়। বেরিয়ে আসার সময় অনেকগুলো হাত ছুয়ে গেল তাঁর হাতকে। মন থেকে একটা বিরাট ভার নেমে গেল লিলির। রোকেয়ার আত্মা অন্তত শান্তি পাবে। ওর পরিবারের লোকেরা ভবিষ্যতে আর দোষারোপ করবে না। ভুল চিকিৎসায় বেচারি মারা গেছে। কিন্তু অ্যাদ্দিন দায় নিতে হচ্ছিল তাঁকে। মনের মধ্যে কথাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে রিসেপশনে নেমে এলেন লিলি। তখনই বাম কিম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি এখন অ্যাকোয়াটিকাতে ফিরে যেতে চাম ম্যাডাম?'

কী মনে হল, লিলি বললেন, 'না। আগে একবার ম্যানহাটন শপিং মলে যাব। অনেকদিন যাওয়া হয়নি।'

'কেন ম্যাডাম? কিছু কিনবেন?'

'না। ওখানে আমার ছোটবেলাকে খুঁজতে যাব।'

শুনে বাম কিম একটু অবাক হলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। এটা একটা বিরাট গুণ মি. কিমের। কোথায় চুপ করে যেতে হয়, জানেন।

মানুষটাকে এই কারণে লিলি পছন্দ করেন। এই একটু আগে ইউনিসেফ দফতরে যে প্রশংসাটা তিনি পেলেন, সেটা তাঁর প্রাপ্য ছিল না। ঢাকায় চাইল্ড কেয়ার ইউনিট রোকেয়ার নামে করার পরামর্শ বাম কিমই দিয়েছিলেন। 'ম্যাডাম, বাংলাদেশে আপনাকে নিয়ে যে সমালোচনা হয়েছে, তা সব মুছে যাবে, যদি এই প্রস্তাবটা পাশ করাতে পারেন।' ভদ্রলোক যে কতটা দূরদর্শী, আজই প্রমাণ হয়ে গেল। মিটিং থেকে বেরনোর পরই লিলি সেটা টের পেয়েছিলেন। রেজওয়ানা যখন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বাঙালিরা এ ভাবেই শ্রদ্ধা জানায়। ছোটবেলায় হেমলতা আন্টির কাছে তিনি শিখেছিলেন। বাম কিম মানুষটা ছোট্টখাট্টো। কিন্তু বুদ্ধিতে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং।

ইউনিসেফ বিল্ডিংয়ে যখনই তিনি আসেন, তখন আর বেরোতে ইচ্ছে করে না লিলির। প্রায় বছর দশেক চাকরি করেছেন তিনি এই বাড়িতে। বেবি ফ্রেন্ডলি ইনিসিয়েটিভ বলে একটা দফতরে। বাবা-মা আর বাচ্চার মধ্যে কীভাবে বন্ধন দৃঢ় করা যায়, সে ব্যাপারে পরামর্শ দেয় এই দফতর। বিশেষ করে, সদ্যোজাত শিশুদের সঙ্গে। বাচ্চাদের মানুষ করার ক্ষেত্রে অনেক ভুল ধারণা থাকে বাবা-মায়েদের। যেমন, হাতে খেলনা ধরিয়ে দিলেই বাচ্চাদের ব্যস্ত রাখা যায়। বাচ্চাদের অতিরিক্ত আদর দেওয়া ঠিক নয়। ওই দফতরে কাজ করার সময় লিলি অভিভাবকদের বোঝাতেন, যতটা পারুন বাচ্চাকে সময় দিন। আপনার মুখ দেখে বা কথা শুনে বাচ্চা পৃথিবী চিনতে শিখবে। সারা দিন বাচ্চা কোলে বাবা-মায়েদের দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন লিলি। আজও লিফটে করে নিচে নেমে দেখলেন, প্রথম বাবা বা মা হওয়া অনেকেই বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে রিসেপশনে বসে রয়েছেন। বাচ্চাদেরদেখে লিলির বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এত যত্ন কেন একজন ইয়েমেনিজ বা রোহিঙ্গা বাচ্চার কপালে জোটে না? তার জন্য দায়ী কারা?

রিসেপশনের পাশ দিয়ে সদর দরজার দিকে এগোনোর সময় লিলির চোখে পড়ল, রেজওয়ানা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কেমন যেন কুণ্ঠা। কাছে এগিয়ে এসে ও বলল, 'ম্যাডাম, এক মিনিট কথা বলা যাবে?'

লিলি হেসে বললেন, 'আমার গাড়িটা না আসা পর্যন্ত কথা বলতে পারো।'

রেজওয়ানা বলল, 'আমাদের কাগজে আপনার নতুন প্রোজেক্ট নিয়ে একটা রিপোর্ট করব। ঢাকায় কোথায় এই ইউনিট করবেন, ঠিক করেছেন কিছু?'

চট করে পলাশ চৌধুরী আর রোজিনার চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল লিলির। ওরা নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারবে। তাই বললেন, 'ঢাকায় পলাশ চৌধুরী বলে একজন প্রভাবশালী মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। উনি একবার আমার কাছে এসেছিলেন, এখানে চাইল্ড ডিটেনশন সেন্টার খোলার ব্যাপারে সুপারিশ নিতে। ওঁর দ্বারস্থ হতে পারি।'

রেজওয়ানা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'খুব ভাল হয় তা হলে। ভদ্রলোক আমারও খুব ওয়েলউইশার। খুব ভাল করে ওঁকে চিনি। কিন্তু ম্যাডাম উনি এই মুহূর্তে খুব বিপদের মধ্যে রয়েছেন।'

নিউ মেক্সিকোর এক র‍্যাঞ্চে গিয়ে পলাশ আর রোজিনা নেকড়ের পাল্লায় পড়েছিলেন। এই খবরটা দু'তিনদিন আগে নিউ ইয়র্ক টাইমসে চোখে পড়েছে লিলির। রেজওয়ানার মুখে পুরো ঘটনাটা শুনে বিষণ্ণবোধ করতে লাগলেন তিনি। এত সুন্দর একটা কাপল, তাঁদের কপালে এমন দুর্ভোগ, অকল্পনীয়। লিলি জিজ্ঞেস করলেন, 'রোজিনা কোন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, জানো? ভাবছি, ওকে দেখতে যাব কি না?'

'ম্যাডাম, প্রেসবাইটেরিয়ান হাসপাতাল।'

'দেখি, সময় করে উঠতে পারি কি না। তোমার আর কোনও প্রশ্ন আছে রেজওয়ানা?'

'ঢাকায় টার্গেট ডে কবে, ম্যাডাম?'

‘ইচ্ছা তো ছিল ইউনিভার্সাল চিল্ড্রেন্স ডে... মানে বিশে নভেম্বর ওপেন করার। কিন্তু তোমাদের দেশে ওইদিন জাগো ফাউন্ডেশন একটা বড় অনুষ্ঠান করে। অতদিন অপেক্ষা করা যাবে না। আমরা চেষ্টা করব ফোরটিন্থ্ মার্চ করার। কেননা, শেখ মুজিবর রহমানের জন্মদিন বলে তোমাদের দেশে ওইদিনটা চিল্ড্রেন্স ডে পালন করা হয়।’

কথাটা বলতে বলতেই লিলি লক্ষ করলেন, পোর্টিকোর নিচে তার জন্য রোলস রয়েস এসে দাঁড়িয়েছে। অফিস বা বাইরে বেরোলে এখন বাম কিম একই গাড়িতে রোজ তাঁকে চাপতে দেন না। জঙ্গিদের ভয়ে রোজ আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা করেন। নতুন একজন বডি গার্ড উনি অ্যাপোয়েন্ট করেছেন। অল্পবয়সি কোরিয়ান মেয়েটার নাম সেও ইয়ুন। প্রায় ছ’ফুটের মতো লম্বা। অনেক দুরে দাঁড়িয়ে থাকলেও ওকে চোখে পড়ে। মেয়েটা না কি এমন দক্ষ যে, টেক্সাস স্টেটে গভর্নর্স মেডেলও পেয়েছে। সাধারণ পোশাকে মেয়েটা সর্বদা ছায়ার মতো অনুসরণ করে। ওকে একবার দেখে নিয়ে লিলি রেজওয়ানাকে বললেন, ‘তুমি কী লিখলে, আমাকে দেখিও। আগেরবার কিন্তু তোমার লেখা আমাকে খুব অসুবিধের মধ্যে ফেলেছিল।’

রেজওয়ানা ঘাড় নেড়ে বলল, ‘ঠিক আছে ম্যাডাম, খবরটা পাবলিশ হলে আপনাকে দিয়ে যাব।’

গাড়িতে ওঠার সময় লিলি দেখলেন, সন্ধে হয়ে গেছে। ম্যানহাটন এখন আলোর সাজে সাজছে। কাছেই টাইমস স্কোয়্যারে মাত্র দু’দিন আগে নিউ ইয়ার্স ইভ-এ বল ড্রপ পার্টি হয়ে গেছে। সারা বিশ্ব থেকে টুরিস্টরা টাইমস স্কোয়্যারে এসে হাজির হন বল ড্রপ দেখার জন্য। ফর্টি সেকেন্ড অ্যাভেনিউ থেকে সেন্ট্রাল পার্ক পর্যন্ত লাখ লাখ লোক ঠান্ডায় জমে গিয়েও খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকেন। টাওয়ার থেকে একটা আলোর বল নিচের দিকে নেমে আসতে থাকে রাত ঠিক বারোটার সময়। সমবেত দর্শক গলা ফাটিয়ে প্রতি সেকেন্ড কাউন্ট করতে থাকেন, নতুন বছরকে স্বাগত

জানানোর জন্য। অ্যান্ডির সঙ্গে একবার বল ড্রপ দেখতে এসেছিলেন লিলি। কিন্তু তিনি এনজয় করতে পারেননি। একে তো বেলা দশটায় টাইমস স্কোয়ারে এসে জায়গা দখল করতে হয়েছিল, তার পর ভিড়ে নড়াচড়ার উপায় ছিল না। একটা সময় দমবন্ধ হয়ে এসেছিল লিলির। রাত্তির দুটো অবধি টয়লেটেও যেতে পারেননি।

মিনিট দশেক পরে গাড়ি এসে পার্ক করল ম্যানহাটন শপিং মলে। চল্লিশ বছর আগে প্রায়ই তিনি এই মলে আসতেন হেমলতা আন্টির সঙ্গে। বিশেষ করে ক্রিসমাসের আগে। একতলায় আইস স্কেটিং রিঙ্ক-এর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতেন, তাঁরই বয়সি ছেলে-মেয়েরা বাবা-মায়ের সঙ্গে স্কেটিং করছে। লিলির নিজেরও খুব ইচ্ছে করত, জমাট বরফের উপর নেচে বেড়ানোর। কিন্তু আন্টি তাঁকে আটকে রাখতেন। তখন কত বয়স হবে তাঁর? নয়-দশ বছর। দোকানে ঘোরার সময় লিলি যা চাইতেন, আন্টি কিনে দিতেন। কখনও না করতেন না। মনে আছে, একবার তিনি কার্পেট পিয়ানো কিনে দেওয়ার জন্য বায়না ধরেছিলেন। ছোট কার্পেটের মতো পিয়ানো, বিছিয়ে দিয়ে তার উপর দিয়ে হেঁটে গেলে নানারকম মিউজিক বাজতে থাকে। লিলি জানতেন না, পিয়ানোটার অনেক দাম। ওই একবারই হেমলতা আন্টি সেদিন তাঁকে কিনে দিতে পারেননি। কিন্তু মাসখানেক পরে বার্থ ডে পার্টিতে পিয়ানোটা উপহার দিয়ে চমকে দিয়েছিলেন।

শপিং মলের উত্তর দিকের গেটের মুখেই ফুড কোর্ট। লিলির মনে পড়ল, কাছাকাছি কোথাও তখন একটা ইতালিয়ান আইসক্রিম পার্লার ছিল। হেমলতা আন্টি মাঝে মাঝেই ওঁকে নানা ফ্লেভারের আইসক্রিম খাওয়াতেন। সাদা পোশাকপরা ইতালিয়ান মেয়েরা পছন্দমতো বানিয়ে দিত। সাদা, গোলাপি, নীল, সবুজ রঙের সব আইসক্রিম। কাচের শো কেসের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে লিলি তখন ভাবতেন, বড় হলে অবশ্যই আইসক্রিমের দোকানে কাজ করবেন। শপিং মলের ভিতরে হাঁটার সময় ডান

দিকে সেই পার্লারটার দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, একই রকম আছে। শো কেসের সামনে সুস্থ, সবল বাচ্চাদের ভিড়। ইয়েমেনি বা রোহিঙ্গা বাচ্চারা কোনওদিনই হয়তো সুযোগ পাবে না এই অমৃতের স্বাদ নেওয়ার। ভেবে, মনটা খারাপ হয়ে গেল লিলির।

এই শপিং মলেরই কোনও একটা ব্লকে অদ্ভুত একটা ঘড়ি ছিল। পনেরো ফুট উঁচু, তাতে চব্বিশটা ঘর। প্রতি ঘণ্টায় একবার করে সেই ঘরগুলোর দরজা খুলে যেত। একেকটা করে পাখি বেরিয়ে এসে সুরেলা গলায় ডাকত। সবথেকে উপরের ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসত এক মোরগ। তার ডাকেই বোঝা যেত ক'টা বাজে। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে পাক্কা এক মিনিট লাগত। লিলি তখন হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন ঘড়িটার দিকে। আন্টিকে একবার জিজ্ঞেসই করে ফেলেছিলেন, সারাদিন ঘরের ভিতর পাখিগুলো কী খায়, কী করে। হেমলতা আন্টি হেসে তাঁকে বুঝিয়ে ছিলেন, ওগুলো আসল নয়, কৃত্রিম পাখি। ঘড়ির ব্লকটা কোথায়, লিলির এখন অবশ্য মনে নেই।

হাঁটতে হাঁটতে তিনি এসে দাঁড়ালেন শপিং মলের ঠিক মাঝখানে গোল চত্বরে। চোখে পড়ল, ক্রিসমাসের চিহ্ন। বিশাল রথের উপর বসে আছেন সান্তা ক্লজ। আট-দশটা এল্ক হরিণ আকাশ থেকে সেই রথ টেনে নিয়ে আসছে। অতীতের একটা কথা মনে পড়ায় লিলি হাসলেন। এই গোল চক্করেই তিনি একবার হারিয়ে গেছিলেন। কাছেই একটা ফোয়ারা ছিল। জলে ঘুরে বেড়াত ছোট ছোট কচ্ছপ। সেই কচ্ছপ গুনতে গিয়ে হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করেন ধারে-কাছে হেমলতা আন্টি নেই। একটু আগে আন্টি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। গেলেন কোথায়? ভয়ে লিলি কেঁদে ফেলেছিলেন। তাঁকে ঘিরে ভিড় জমে গেছিল। সিকিউরিটি গার্ডেরা তাঁর হাতে ক্যান্ডি আর টফি গুঁজে দিয়েছিল। খানিক পরে দৌড়তে দৌড়তে এসেছিলেন হেমলতা আন্টি। তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এই তো সেই জায়গাটা। চোখের সামনে যেন আন্টিকে দেখতে পেলেন লিলি। লায়লার

চিকিৎসার দিন আন্টির কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু মুখটা এই এখুনি চোখের সামনে ভেসে উঠল। বিশেষ করে, ওঁর কপালের টিপ। কী সুন্দরই না দেখতে ছিলেন আন্টি!

কত ধরনের নতুন নতুন ব্র্যান্ড, কত দোকান! মেয়েদের পোশাকের একটা দোকানের সামনে লেখা নতুন কালেকশন এসেছে। কৌতূহলে দোকানের ভিতর ঢুকে পড়েই চমকে উঠলেন লিলি। খুব কাছে দাঁড়িয়ে এলসা আন্টি। এতক্ষণ অনুসরণ করছিলেন না কি? আক্রমণাত্মক মেজাজে আন্টি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার লিলি। আমার ফোন ধরছ না। মেল করলে উত্তর দিচ্ছ না। আমার সঙ্গে বেইমানি করার কথা ভাবছ না কি?'

অভ্যাসবশতঃ পিছন ফিরে একবার লিলি দেখলেন সেও ইয়ুন ধারে কাছে আছে কি না। তাকে দেখতে পেলেন না। তবুও, বললেন, 'আপনার মান থাকলে তো বেইমানির কথা উঠবে।'

'তোমার সঙ্গে আমার বোঝা-পড়া আছে। আমার সঙ্গে চলো।'

'সরি। যাওয়া সম্ভব না। আপনাকে আর বিশ্বাস করি না।'

'তোমার এত বড় স্পর্ধা। কাকে কী বলছ, তুমি জানো?'

'জানি, আমি একজন প্রতারকের সঙ্গে কথা বলছি।'

'তোমাকে আমি উচিত শিক্ষা দেব। চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশন আমার গড়া প্রতিষ্ঠান। তোমাকে কেয়ার টেকার হিসেবে রেখেছিলাম...।'

এলসা আন্টি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দু'জনের মাঝে লাফিয়ে এসে দাঁড়াল সেও ইয়ুন। ওর লম্বা শরীরে ঢাকা পড়ে গেলেন এলসা আন্টি। লিলি শুধু একটা আর্তনাদ শুনতে পেলেন।

(পঁয়তাল্লিশ)

আউট হাউসের ঘরে বসে ছটফট করছে ইমন। সারা দিনে পর পর এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল, আর টেনশন নিতে পারছে না ও। আজ দুপুরে

জেএফকে এয়ারপোর্টে জিহাদি ছেলেটা যদি গুলি চালিয়ে দিত, তা হলে এতক্ষণে ওর লাশ কোনও হাসপাতালের মর্গে পড়ে থাকত। ওকে আইডেন্টিফাই করার মতো কাউকে পাওয়া যেত না। কামাল ও খামিস ধরা পড়েছে। চিরাগ আর মামুনও জেলে। তবুও, জিহাদিরা ওর পিছু ছাড়েনি। এটাই ইমনের উদ্বেগের কারণ। এয়ারপোর্টে ও বুঝতে পেরেছে, প্রতি মুহূর্তে জিহাদিরা ওর উপর লক্ষ রাখছে। যে করেই হোক, আমেরিকা থেকে ওকে পালিয়ে যেতেই হবে। না গেলে, সবসময় ওকে মৃত্যুভয় নিয়ে বাঁচতে হবে। কিন্তু পালাবে কীভাবে, সেটা ইমন বুঝে উঠতে পারছে না। সেইসঙ্গে আর যে ভাবনাটা ওকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে, সেটা হল, পালিয়ে যাবেই বা কোথায়?

দুপুরে রোজিনা ম্যাডামের খবরটা যুগযুগান্ত কাগজে পড়ে, ইমনের মন আরও ভেঙে গেছে। এই মুহূর্তে পলাশছ্যার এমন একটা মানসিক অবস্থায় রয়েছেন যে, অন্য কারও ব্যাক্তিগত সমস্যা নিয়ে নিশ্চয় মাথা ঘামাতে পারবেন না। এই বিশাল মহাদেশের কোথাও না কোথাও কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন করে থাকা যায়। বিশেষ করে, পলাশছ্যারের মতো ক্ষমতাবান কোনও মানুষের হাত মাথায় থাকলে। এমন প্রচুর মানুষ এখানে অনুপ্রবেশ করে দিব্যি জীবন কাটাচ্ছেন। কিন্তু জিহাদিদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার পর, বাঁচার একটা নতুন পথ আঁকড়ে ধরতে চায় ইমন। সুদীশছ্যারের কথাগুলো ওর মাথায় ঢুকে গেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবে। সুদীশছ্যার যদি আশ্বাস দেন, তা হলে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতেও ও রাজি।

দুপুরে নিউ ইয়র্কে সুদীশছ্যারকে ও পলাশছ্যারের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে দেখেছিল। সঙ্গে আরও এক ভদ্রলোক ছিলেন। তখনই ইমনের মাথা খেলে গিয়েছিল, সামনে গিয়ে বলে, 'ছ্যার আফনের সাথে এড্ডু দরকার আসে।' কাল রাতে মামুনের কম্পিউটার ঘেঁটে ও যা জানতে পেরেছে। সেটা

সুদীশছ্যারকে জানিয়ে দেওয়ার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওর। না জানালে আর ক'দিন পর বাংলাদেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু এক পা এগিয়েও ইমন শেষে তিন পা পিছিয়ে যায়। কাইলকেতুছ্যারের অনুমতি না নিয়ে সরাসরি কথা বলাটা উচিত হবে না। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া হয়ে যাবে। তখন কাইলকেতুছ্যারের ফোনের অপেক্ষায় ইমন গাড়িতেই বসেছিল। অনেক পরে ছ্যার ফোন করে বললেন, 'তুমি নিউ জার্সিতে ফিরে যাও সুমন। কাল সকালে ফের চলে এসো।' চুরি করা গাড়িটা কলম্বাস সার্কেলের কাছে একটা পার্কোম্যাটে রেখে ইমন মেট্রো ধরে নিউ জার্সিতে চলে এসেছিল।

টেনশন কাটানোর জন্য ইমন বাইরে লনে বেরিয়ে এসে দেখল, গোধূলিবেলায় আকাশের রঙ একেবারে হলুদ। আমোদপুরে এইসময়টায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বাসায় ফিরে আসত। তিরের ফলার মতো দল বেঁধে। নদীর ধারের গাছগুলো ওদের কলকাকলিতে ভরে ওঠত। বোধহয় সারাদিনের হিসেব নিকেশ করত ওরা ওই সময়। কিন্তু, পলাশছ্যারের এই বাংলোটা আশ্চর্য রকমের শান্ত। পিছনদিককার জঙ্গলে পাখির কলরবও শোনা যাচ্ছে না। ইমন লক্ষ করল, লনের ঘাস বেশ বড় হয়ে গেছে। তারই মধ্যে দুটো ধূসর রঙের খরগোস কুটকুট করে ঘাস চিবোচ্ছে। ডানদিকের ছোট সুইমিং পুলে ঝরা পাতা ভাসছে। বাড়ির মালিকরা নেই। পরিচর্যা করার লোকও নেই। ইমনের মনে পড়ল, সুইমিং পুলে একদিন ঝরা পাতা দেখে রোজিনা ম্যাডাম মারাত্মক চটে গেছিলেন। নিক বলে যে লোকটা লনে ঘাস ছাঁটতে আসে বা সুইমিং পুলে ক্লোরিন ছেটায়, তাকে খুব বকাবকি করেছিলেন সেদিন।

পকেটে রাখা ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। সুইচ অন করে ইমন দেখল, পর্দায় কাইলকেতুছ্যার। ও বলল, 'সেলাম আলেইকুম ছ্যার। কহন যাইতে অইব ক'ন।'

কাইলকেতুছ্যার বললেন, 'নিউ ইয়র্কে তোমাকে আসতে হবে না ইমন। জাস্ট চেক করলাম, তুমি বাংলোয় আছ কি না। আমরা এখুনি নিউ জার্সির বাসায় ঢুকছি।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই লোহার গেট একদিকে সরে যেতে থাকল। একটা রোলস রয়েস ঢুকতে দেখল ইমন। সামনের সিট থেকে যিনি নামলেন, তাঁকে চিনতে পারল না ও। পিছনের সিট থেকে যিনি নেমে এলেন, তাঁকে দেখে ও চমকে উঠল। এই সেই লায়লা বলে মহিলা, যাঁকে ইমন পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। ভদ্রমহিলা তা হলে কথা রাখলেন না। পুলিশকে সব বলে দিয়েছেন! পুলিশ নিশ্চয়ই গ্রেফতার করতে এসেছে ওকে। লায়লার পিছনেই কাইলকেতুছ্যার আর সুদীশছ্যার। গাড়ি থেকে নেমে কাইলকেতুছ্যার লায়লাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাল করে দেখুন তো, এখানেই আপনাকে আটকে রাখা হয়েছিল কি না?'

লায়লা একবার মেন বিল্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করলেন। তার পর আউট হাউস দেখিয়ে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, এখানে। সেটা ভাল বলতে পারবে, এই ছেলেটা। কেননা, এই ছেলেটাই আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ স্টেশনে।'

সুদীশছ্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'ইমন, লায়লা যা বলছেন, সত্যি?'

মাথা নিচু করে ইমন বলল, 'হ ছ্যার।'

'আমাদের নিয়ে চলো সেই জায়গাটায় যেখানে তুমি আর চিরাগ লায়লাকে আটকে রেখেছিলে।'

ইমন অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'আফনেরা ঠিক কইতাসেন না ছ্যার। চিরাগের সাথে মামুন বইল্যা একজন সিল। আমি কিছু জাইনতাম না।'

ছ্যারদের সঙ্গে আসা অচেনা ভদ্রলোক হঠাৎ ঠাস করে ওর গালে চড় মেরে বললেন, 'তুই সিলি না মানে? হালার পো হালা, তহন তুই কোথায় সিলি?'

চড় খেয়ে চোখে পানি চলে এল ইমনের। ও বলল, 'আমি তহন ডিউটিতে সিলাম। চিরাগ হ্যারে চোরাকুঠুরিতে লুকাইয়া রাখসিল। আমি জানুম কী কইর‍্যা?'

অচেনা ভদ্রলোক ফের হাত তুলে শাসালেন, 'আবার একডা দিম না হি? কোথায় চোরাকুঠুরি, আমাগো দ্যাখা।'

গালে হাত বুলোতে বুলোতে ইমন আউট হাউসের ভিতরে ঢুকে এল। সুইচ টিপতেই সোফা সরে গিয়ে চোরাকুঠুরির দরজাটা বেরিয়ে পড়ল। সেটা দেখিয়ে ও বলল, 'এই দ্যাহেন।'

অচেনা ভদ্রলোক বললেন, 'সুদীশভাই, আপনি নিচে নাইম্যা দেইখ্যা আসেন। লায়লারেও সাথে লইয়্যা যান। আমি ততক্ষঁণ হাতের সুখ কইর‍্যা লই।'

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সুদীশছ্যার, কাইকেতুছ্যার আর লায়লা নিচে নেমে যাওয়ার পর কোত্থেকে সাহস জোটাল ইমন কে জানে? ও জিজ্ঞেস করল, 'ছ্যার আপনের পরিচয়ডা জাইনতে পারি?'

'আমার পরিচয় জাইন্যা তুই কী করবি?'

'আপনে কাইলকেতুছ্যারের সাথে আইসেন, তাই কিসু কইলাম না। নাইলে, আফনেরে দেখাইতাম, আমার হাতের জোর আফনের থেইক্যাও বেশি।'

'ক'স কী হালা? ঠিগ আসে, যহন জাইনতেই চাইতাসস, তহন কই, আমি বাংলাদ্যাশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্সের অফিসার প্রিয়তোষ সাহা। আমার কামই অইল, জিহাদিগো প্যাট থেইক্যা কথা বাইর করা। অহন চুপ কইর‍্যা থাক।'

কথা বলতে বলতে প্রিয়তোষছ্যারের চোখে পড়ল, একটা ল্যাপটপ খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পা চালিয়ে টেবলের কাছে গিয়ে উনি বললেন, 'কম্পিউটারে কাম করে কে? তুই না হি?'

এই রে, ইমন প্রমাদ গুণল। মামুনের জিহাদি লিঙ্ক খুঁজে বের করে কাল রাতে ইমন অনেক কথা জানতে পেরেছে। প্রিয়তোষছ্যার সব ঘেঁটে দেবেন না কি? উত্তর না দিয়ে ও চুপ করে প্রিয়তোষছ্যারের গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। মামুনের সঙ্গে ক্যালিফেটের কারও চ্যাট খোলা অবস্থায় রয়েছে। কম্পিউটার সম্পর্কে যদি ভদ্রলোকের সামান্য জ্ঞান থাকে, তা হলে পর্দায় সবকিছুই উনি দেখে ফেলবেন। প্রিয়তোষছ্যারের ধৈর্য বোধহয় একটু কম। পর্দায় কী লেখা রয়েছে, তাতে চোখ না বুলিয়ে উনি ফের জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে, উত্তর দিতাসস না যে?'

'আফনেই তো আমারে চুপ কইর‍্যা থাইকতে কইলেন।'

'তুই তো দেহি ত্যাড়াব্যাকা টাইপের পোলা। ল্যাপটপডা কার, অহন ক' দেহি?'

'মামুনের, যারে আফনেরা ধরসেন।' এর পরই প্রশ্ন উঠবে, ল্যাপটপে কী ল্যাখা আসে ক'। বলতে ইমনের আপত্তি নেই। কিন্তু বললে সুদীশছ্যারদের সামনে ও বলবে। তাই প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য ও বলল, 'ছ্যার, আফনে বাংলাদ্যাশ থেইক্যা আইসেন?'

প্রশ্নটা শুনে জ্বলন্ত চোখে তাকালেন প্রিয়তোষছ্যার। কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কথা বলতে বলতে চোরাকুঠুরি থেকে উঠে এলেন কাইলকেতুছ্যারেরা তিনজন। সুদীশস্যার বললেন, 'ফরেনসিক লোকদের আসতে বলে দিয়েছি। ওঁরা কিছু এভিডেন্স জোগাড় করে নিয়ে যান। মামুন আর চিরাগকে ফ্রেম করতে আমাদের সুবিধে হবে।'

প্রিয়তোষছ্যার বললেন, 'লায়লা কি জায়গাটা চিনতে পেরেছে?'

'হ্যাঁ।' কথাটা বলে সুদীশছ্যার ওকে বললেন, 'ইমন, তোমার এখানে কফি বানানোর ব্যবস্থা আছে না কি? যদি থাকে, তা হলে ভাল করে কফি বানাও তো আমাদের জন্য।'

শুনে ইমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এই দলটার সঙ্গে কাইলকেতুছ্যার আছেন। যতটা খারাপ পরিস্থিতির কথা ও ভাবছে, ততটা হয়তো হবে না। ও বলল, 'ব্যবস্থা আসে ছ্যার, দুই মিনিট সময় দ্যান।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কফি বানিয়ে ইমন পিছন ফিরে দেখে, লায়লা চুপ করে সোফায় বসে আছেন। বাকি তিনজন ল্যাপটপের সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন আলোচনা করছেন। ওকে দেখে ট্রে থেকে কফির কাপ তুলে নিয়ে সুদীশছ্যার বললেন, 'ল্যাপটপে এই চ্যাট কাদের মধ্যে হচ্ছিল, তুমি জানো ইমন। দেখে তো মনে হচ্ছে কনর্ভাসেশনটা হচ্ছিল জিহাদিদের মধ্যে।'

ইমন বলল, 'ঠিগ ধরসেন ছ্যার। কথা হইতাসিল মামুন আল ফরখের সাথে ক্যালিফেটের কোনও কম্যান্ডারের। আরবি ভাষায় ল্যাখা।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছিল। কী লেখা আছে, তুমি বলতে পারবে?'

'পারুম ছ্যার। পাঁইচ বসর হ্যাগো সাথে ঘর করসি। আরবি আমি পইড়তে পারি। এহানে যা ল্যাখা আসে, তা হুনলে আফনেরা চিক্কুর দিয়া উইঠবেন।'

ভ্রু কুঁচকে প্রিয়তোষছ্যার বলে উঠলেন, 'হ্যালায় যা জিজ্ঞাস করতাসে, আগে তার উত্তর দে। নাইলে এমন কানচাপাটি দিম, উইঠ্যা দাঁড়াইতে পারবি না।'

প্রিয়তোষছ্যারকে হাত তুলে থামালেন সুদীশছ্যার। নরম গলায় বললেন, 'কী লেখা আছে, বল তো ইমন?'

'জিহাদিরা বাংলাদ্যাশের গাজিপুরে ফিদাইঁন অপারেশন কইরব। কীভাবে কইরব, ল্যাখা আসে।'

শোনামাত্র সুদীশছ্যার চমকে উঠে তাকালেন প্রিয়তোষছ্যারের দিকে। তার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে করতে চায়, পড়ে আমাদের বলো তো?'

দু'জনের মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখে ইমন মনে মনে হাসল। কাল রাতেই বার দুয়েক চাটগুলো ও পড়ে ফেলেছিল। জেনে গেছে, জিহাদিরা

বাংলাদেশে কী করতে যাচ্ছে। প্রথমে ও বুঝতে পারেনি, এই ফিদাইন অপারেশনের গুরুত্ব কতটা? পরে গুগল ঘেঁটে জানতে পারে, জিহাদিরা সফল হলে, পুরো বাংলাদেশ প্যারালাইজড হয়ে যাবে। মহাকাশে বাংলাদেশের একটাই মাত্র স্যাটেলাইট। জিওস্টেশনারি কমুনিকেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং স্যাটেলাইট... বঙ্গবন্ধু ওয়ান। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের নামে। সেই স্যাটেলাইটের গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন গাজিপুরে। সেখানে যদি ফিদাইন অপারেশন হয়, তা হলে আড়াইশো মিলিয়ন ডলারের স্যাটেলাইট অকেজো হয়ে যাবে।

সুদীশছ্যার জানতে চাইলেন, ফিদাইন অপারেশন কবে হতে পারে। ল্যাপটপের সামনে বসে, পর্দায় চোখ রেখে ইমন বলল, 'ফোর্থ ফেব্রুয়ারি ছ্যার। আইজ এহানে থার্ড ফেব্রুয়ারির ইভনিং। তার মানে হইল গিয়া ঢাকায় ফোর্থ ফেব্রুয়ারি মর্নিং। আইজই দুপুরে ওহানে বোম্বব্লাস্ট অইব।'

'কও কী ইমন? কোথায় ব্লাস্ট অইব, আগে কও তো।' প্রিয়তোষছ্যার জিজ্ঞাসা করলেন।

'কইলাম তো... গাজিপুরে। বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্যাটেলাইটের গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনে। সেহানে একডা ফাংশন আসে আইজ দুপুরে। পিএম সেহানে থাইকবেন।'

'পিএম-এর ফাংশনে ফিদাইঁন অপারেশন... কী সাংঘাতিক!'

প্রিয়তোষছ্যারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 'কী সাংঘাতিক' কথাটা বলেই উনি পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কারও সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতে লাগলেন। ইমন দেখল, ভদ্রলোকের হাত কাঁপছে। ওঁর ওই অবস্থা দেখে সুদীশছ্যার বললেন, 'আপনি টেনশন করবেন না প্রিয়তোষভাই। আগে জেনে নেওয়া যাক, আপনাদের পিএম-এর গাজিপুরে যাওয়ার কথা আছে কি না।'

প্রিয়তোষছ্যার বললেন, ‘ক’ন কী সুদীশভাই। টেনশন করুম না? ফিদাইনরা ডেঞ্জারাস টাইপের হয়, হেইডা আফনের চে আর কে ভাল জানে? প্যাটে বম্ব বাঁইধ্যা একডা লোক ব্লাস্ট কইরব। নিজে মইরব, অন্যদেও মাইর‍্যা ফেইলব। আমাগো পিএম-এর অবস্থা যদি আফনেগো রাজীব গান্ধীর মতোন হয়, তাইলে আমাগো হক্কলের চাকরি যাইব। ভাবেন তো, এই কয়েকমাস আগে পিএম রিইলেকটেড হইয়া আইসেন। অহন ফিদাইন অপারেশন সাকসেসফুল হইলে, আমাগো দ্যাশে সিভিল ওয়ার লাইগ্যা যাইব। আমারে অহনই প্রাইম মিনিস্টার অফিসে খবরডা জানাইতে অইব।’

প্রিয়তোষছ্যার বারবার ঢাকার লাইন ধরার চেষ্টা করছেন। অথচ পাচ্ছেন না। আউট হাউসের বাইরে লনে গিয়ে উনি পায়চারি করছেন। পাগলের মতো ছটফট করছেন। অথচ, ইমন দেখছে, সুদীশছ্যার কী আশ্চর্য রকমের ঠান্ডা মাথার মানুষ! ইন্টারপোলের হেড অফিস লিওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে খবরটা জানিয়ে দেওয়ার পর উনি কাইলকেতুছ্যারকে বললেন, ‘লিওঁ থেকে এতক্ষণে ঢাকায় খবর চলে গেছে। ওরা ওখান থেকে প্রিয়তোষবাবুকে ফোন করবেন।’

ইতিমধ্যে লন থেকে আউট হাউসে ফিরে এসেছেন প্রিয়তোষছ্যার। বললেন, ‘ইমনভাই, চ্যাট থেইক্যা আর কী নিউজ পাইল্যা আমারে কও দেহি।’

‘ইমনভাই’ সম্বোধনটা শুনে মনে মনে হাসল ইমন। কিন্তু চড় খাওয়ার কথা ও ভোলেনি। প্যাঁচ মেরে ও জিজ্ঞেস করল, ‘আর কী জানতে চান, ক’ন।’

প্রিয়তোষছ্যার এত নার্ভাস, কথার মারপ্যাঁচ ধরতেই পারলেন না। পাশ ফিরে উনি বললেন, ‘ইমপ্লিকেশনডা বুঝতে পারতাসেন সুদীশভাই। গাজিপুরে ব্লাস্ট হইলে হারা দ্যাশের টেলিকমুনিকেশন সিস্টেম শ্যাষ।

ব্রডকাস্টিং, টেলিকাস্টিং অইব না। ব্যাঙ্কিং সিস্টেম অচল হইয়া যাইব। পুরা বাংলাদ্যাশে অ্যানার্কি শুরু হইব। না, না, হেউডা হইতে দেওন যায় না।'

কাইলকেতুছ্যার এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। প্রিয়তোষছ্যারকে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের দেশে কোনও ব্যাকআপ সিস্টেম নেই?'

'আর একডা গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন আসে। চিটাগাংয়ের বেতবুনিয়ায়। হেইডা বড় না। গাজিপুরে কিছু হইলে, ইমিডিয়েটলি আমাগো ইন্ডিয়ার কাছে হেল্প নিতে অইব।'

ঢাকার পিএম অফিস থেকে ফোনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে তিন ছ্যার মিলে আলোচনা করছেন, পিএম যাতে গাজিপুরে না যান, সে ব্যাপারে দ্রুত কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা নিয়ে। দরকার হলে ফাংশনটাই বন্ধ করে দিতে হবে। এমন সময় প্রিয়তোষছ্যারের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। মনে হয়, ঢাকা থেকে ফোন। রিং টোন শুনে ইমন চমকে উঠল। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' দেশের জাতীয় সংগীত। কত বছর পর শুনল ইমন! শুনে ওর বুকের ভেতরটা আবেগে উথলে উঠল। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সোনার বাংলা। কী মধুর শব্দ দুটো। বহুদিন পর ইমনের মনে হল, দেশ হল মা। মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা যায় না কি? গত পাঁচ বছর ধরে কী ভুলটাই না ও করেছে।

নিজেকে ফের ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল ইমনের।

(ছেচল্লিশ)

রোজিনা ম্যাডামের শারীরিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। ভোরবেলায় হাসপাতাল থেকে হেমলতা আন্টি খবর দিলেন, ম্যাডামের ডান হাতটা অসাড় হয়ে গেছে। ভাল লক্ষণ নয়। কালকেতু বুঝতে পারছিল না কী করবে? হাসপাতালে গিয়ে আন্টির পাশে দাঁড়াবে, না কি পলাশভাইকে সামলানোর জন্য অ্যাপার্টমেন্টে থেকে যাবে। পলাশভাইকে সবসময় চোখে চোখে রাখতে হচ্ছে। বেঁচে থাকার আগ্রহটাই যেন উনি হারিয়ে ফেলেছেন।

মদ্যপান করেই যাচ্ছেন। বারণ করা সত্ত্বেও শুনছেন না। গতকাল নিউ জার্সি থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেছিল। অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কালকেতু দেখে, পলাশভাই ক্যাপ্টেন মর্গানের বোতল খুলে বসে আছেন। মুখে একটাই কথা, 'রোজিনা ম্যাডাম না থাইকলে আমি বাঁচুম কী কইর‍্যা, কন দেহি?'

রোজিনা ম্যাডাম কেমন আছেন, সে সম্পর্কে পলাশভাইকে কিছু জানানো হয়নি। র‍্যাঞ্চ থেকে নিউ ইয়র্কে আসার দিন সকালে উনি হাসপাতালে ম্যাডামকে দেখতে গেছিলেন। দূর থেকে দেখেই বুঝে গেছেন, বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। ম্যাডাম সেদিন আবোল তাবোল বকছিলেন। ওদের সন্তান হলে, তার নাম কী রাখবেন, তা নিয়ে একাই কথা বলে যাচ্ছিলেন নিজের সঙ্গে। আবার কখনও ধমকাচ্ছিলেন, ম্যাক বলে র‍্যাঞ্চের এক সিকিউরিটি গার্ডকে। গেস্টদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার না করলে, পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। ডাক্তার বললেন, ডেলিরিয়ামের মতো হয়েছে। এর পরের স্টেজ হালুসিনিয়েশন। কাঁচের দেওয়ালের এ পাশে পলাশভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে কালকেতুর মনে হয়েছিল, এ কোন পাপের শাস্তি পেতে হচ্ছে ম্যাডামকে? পলাশভাই তো চোখ মুছতে মুছতে সরে গেছিলেন।

রায়ান অস্ট্রিয়া থেকে যে ডাক্তারকে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি জবাব দিয়ে গেছেন। নিউ ইয়র্কের প্রেসবাইটেরিয়ান হাসপাতালের কেবিনেই পড়ে আছেন রায়ান আর হেমলতা আন্টি। মৃত্যুর পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে দেখছেন মেয়েকে। রোজিনা ম্যাডামের মুখ দিয়ে সর্বদা লালা গড়াচ্ছে। এই লালা না কি ভয়ানক সংক্রামক। তাই ম্যাডামের ধারে কাছে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। র‍্যাবিজ আসলে জলাতঙ্ক রোগ। জল বা জলীয় কিছু দেখলেই ম্যাডামের শরীরে খিঁচুনির লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। প্রচণ্ড উগ্র আচরণ করছিলেন। ডাক্তার বলে গেছেন, ভাইরাস সংক্রমণ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে

পৌঁছলে ম্যাডাম আগামী কালও মারা যেতে পারেন। আবার এই অবস্থা মাস ছয়েক ধরেও চলতে পারে। ম্যাডামের সুস্থ হয়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই।

অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকালের নিউ ইয়র্ক দেখছে কালকেতু। হাতে ধূমায়িত কফির কাপ। হেমলতা আন্টির ফোনটা পাওয়ার পর দুঃশ্চিন্তায় আর ও শুয়ে থাকতে পারেনি। বারান্দায় আসার আগে একবার পলাশভাইয়ের বেডরুমে উঁকি মেরেছিল। দেখেছে, উনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মাস তিনেক আগে যে পলাশভাই ওর গল্ফগ্রিনের বাড়িতে গেছিলেন, সেই প্রাণচঞ্চল মানুষটা আর নেই। কালকেতু নিজেও অবাক, যে কাজের জন্য ও আমেরিকায় এসেছিল, অর্থাৎ কি না শিউলিদিদিকে খুঁজে বের করা, ঘটনাচক্রে সেই চিন্তা-ভাবনা ওর মাথা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ও বুঝতে পারছে, কলকাতায় বসে নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে রহস্যভেদ করা যতটা সহজ, বর্হিবিশ্বে এসে সেই কাজটা করা ততটাই কঠিন। দেশের আর কোনও রহস্যভেদী, ওর মতো এই চ্যালেঞ্জ, কখনও নিয়েছেন কি না, কালকেতু জানে না। যদি ও সফল হয়, তা হলে অসাধারণ একটা কীর্তি করে ফেলবে।

লিলি গডউইন কয়েকদিন আগে ফোনে অনুরোধ করেছিলেন, র‍্যাঞ্চ থেকে ফিরলে ও যেন ফাউন্ডেশনের অফিসে গিয়ে একবার দেখা করে। কিন্তু কালকেতুর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ও ঠিক করে রেখেছে, জন রিডের কাছ থেকে ছবিগুলো পেলে, তবে যাবে। র‍্যাঞ্চে থাকার সময় কম্পিউটার গ্রাফিক্স এই আর্টিস্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল লারেইনা। শিউলিদিদির ছয় বছর বয়সের ছবিটা দিয়ে কালকেতু তাঁকে অনুরোধ করেছিল, এই মেয়েটি পঞ্চাশ বছর বয়সে কেমন দেখতে হতে পারে, সেটা কি জানা সম্ভব? রিড খুব বিচক্ষণ মানুষ। কেন দরকার, সেটা জেনে নিয়ে উনি উৎসাহ দেখিয়ে ছিলেন সেদিন।

রিড বলেছিলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেহারা বদল অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে। কোন আবহাওয়া বা পরিবেশে তিনি থাকছেন, কতটা স্বাচ্ছন্দে তিনি বড় হয়েছেন, নীরোগ থেকেছেন কি না, কতটা মানসিক চাপ তাকে নিতে হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও, মূল চেহারাটা থেকে যায়। খুঁটিয়ে দেখলে মানুষটাকে চেনা কঠিন হয় না। কালকেতু তখন লিলি গডউইনের কথা বলেছিল। নায়গারা ফলস-এর কাছে লিলি গডউইনের সঙ্গে তোলা ওদের সেলফিটা ওর মোবাইল ফোনেই ছিল। সেটা দেখিয়ে কালকেতু বলেছিল, 'খবরের কাগজের ছবিটার সঙ্গে এই ভদ্রমহিলার মিল আছে কি না, সেটাই আপনাকে বলে দিতে হবে।'

রিড বলেছিলেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং। আপনার এই কেসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারব ভেবে, আমার খুব ভাল লাগছে। আমাকে দু'তিনটে দিন সময় দিন। ভদ্রমহিলার অন্তত তিন চারটে এজ গ্রুপের ছবি, মনে হচ্ছে আপনাকে দিতে পারব।' এখনও ছবিগুলো হাতে পায়নি কালকেতু। পেলে বুঝতে পারত, ঠিক লক্ষে যাচ্ছে কি না। আলবুকার্কে থাকলে হয়তো তাগাদা মারতে পারত। কিন্তু সেটা তো সম্ভব হল না। র‍্যাঞ্চ থেকে চলে আসার সময় কালকেতু ওর মেল অ্যাড্রেস দিয়ে এসেছে রিডকে। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই ওর কাছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার সময়ই সুদীশের ফোন পেল কালকেতু। ও প্রান্ত থেকে সুদীশ বলল, 'বাঙালের চাকরিটা বেঁচে গেল, বুঝলি।'

'বাঙাল' মানে প্রিয়তোষবাবুর কথা বলছে। তখনই কালকেতুর মনে পড়ল, ঢাকায় ফিদাইন অ্যাটাকের কথা। কাল রাতে ভদ্রলোককে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে ওরা দু'জন চলে এসেছিল। ঢাকায় শেষ পর্যন্ত কী হল, সেটা জানার আগ্রহে কালকেতু তাই জিজ্ঞেস করল, 'ফিদাইন অ্যাটাক আটকানো গেল?'

‘হ্যাঁ। আমাদের একটা কথা আছে না, ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। ঠিক সেই রকম। আসল কাজটা করে দিলাম ইমন আর আমি। পুরো ক্রেডিট নিয়ে গেলেন প্রিয়তোষবাবু। এই একটু আগে এটিএন ঢাকা চ্যানেলটা দেখছিলাম। তাতে ভদ্রলোকের ফাটাফাটি প্রশংসা। ঢাকা থেকে ওরা ফোন ইন করেছিল। টিভিতে বাঙালটা বলল, এইরকম একটা সাবোতাজ যে হতে পারে, সেটা না কি আগেই বাংলাদেশ ইন্টেলিজেন্সের কাছে খবর ছিল। শালা, এই ফালতু কেতা নেওয়ার কারণেই আমি বাঙালদের সহ্য করতে পারি না। আমি যদি ইন্টারপোলকে অ্যাকটিভ না করতাম, তা হলে...।’

গলার ঈর্ষার সুর শুনে কালকেতু হাসতে লাগল। বাধা দিয়ে ও বলল, ‘তুই এত জেলাস হচ্ছিস কেন ভাই? ভদ্রলোক একটা জাতীয় দুর্যোগ সামলালেন, তাতে যদি ওঁর পদোন্নতি হয়, তাতে তোর তো কোনও ক্ষতি নেই। ফিদাইন বম্বারকে কি শেষ পর্যন্ত ওরা ধরতে পেরেছেন?’

‘হ্যাঁ, গাজিপুরে সে ধরা পড়েছে। টিভির খবরেই শুনলাম, সে পুরুষ নয়, গাজিপুরেরই এক মেয়ে। নাম ফিরোজা খাতুন। সে আবার এক জিহাদি রফিকুল আলমের বউ। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, দুবাইতে তোর পলাশভাইকে যারা কিডন্যাপ করেছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র এই রফিকুলই পুলিশের কাছে ধরা পড়েছিল। সে এখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। গাজিপুরে জিহাদিদের প্ল্যান ছিল, পিএম-এর ফাংশন চলার মাঝে রফিকুলের মুক্তির দাবিতে ওরা প্রথমে স্লোগান দেবে। প্রতিশ্রুতি না পেলে ফিদাইন অ্যাটাক করবে। ফিরোজা বোরখার নিচে সুইসাইড জ্যাকেটটা এমনভাবে পরেছিল, যাতে দেখে মনে হয়, ও সাত-আটমাসের গর্ভবতী। পুলিশ প্রথমে চালাকিটা ধরতে পারেনি। ভাবতেই পারেনি, কোনও মেয়ে ফিদাইন অপারেশনে সামিল হতে পারে। তাই মেয়েটা একেবারে সামনের সারিতে গিয়ে বসতে পেরেছিল।’

কালকেতু জিজ্ঞেস করল, 'ও ধরা পড়ল কী করে?'

'জিহাদিরা ফিদাইন অপারেশনে যখন কাউকে পাঠায়, তখন তাকে কেপ্টাগন নামে এক ধরনের ট্যাবলেট খেতে দেয়। এই টাবলেট খেলে মানুষের মধ্যে ভয়ডর চলে যায়। তখন তার মনে হয়, যে কাজটা তাকে করতে দেওয়া হয়েছে, সেটা করতেই হবে। যদি জান চলে যায়, তাতেও পরোয়া নেই। তখন তার ব্যথা বেদনার অনুভূতিটাও থাকে না। ফিরোজার মধ্যে সেই অস্বাভাবিকতা পুলিশ টের পেয়েছিল। এগেইন থ্যাঙ্কস টু ইমন। জিহাদিদের বাংলাদেশি লিঙ্ক থেকে ফিরোজার ছবি ও উদ্ধার করে দিয়েছিল। সেটাই সার্কুলেট করা হয় পুলিশে। ইমন ছেলেটা দেশের জন্য এত ভাল একটা কাজ করল, কিন্তু কোনও দাম পাবে না কেন, বল? বাঙাল প্রিয়তোষের জায়গায় আমি থাকলে কী করতাম, জানিস? এই সুযোগে ইমন ছেলেটাকে ন্যাশনাল হিরো বানিয়ে দিতাম। বেচারি অন্তত দেশে ফেরার সুযোগটা পেত।'

'ইমনকে নিয়ে তোরা আপাতত কী ভাবছিস রে?'

'আমেরিকায় থাকাটা ওর পক্ষে সেফ না। ওর উপর যাতে বাংলাদেশি মানুষের সিমপ্যাথি জাগে, দরকার হলে সে রকম একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করতে হবে। আর এটা করতে পারে, মিডিয়া। হ্যাঁরে, বাংলাদেশি সেই মেয়ে সাংবাদিকটার কোনও কন্টাক্ট নাম্বার তোর কাছে আছে? দেখি, ওর সাহায্য নেওয়া যায় কী না।'

কালকেতু বলল, 'হ্যাঁ, রেজওয়ানা চৌধুরীর ফোন নাম্বার আমার কাছে আছে। হোল্ড কর, তোকে দিচ্ছি।'

রেজওয়ানার ফোন নাম্বারটা সুদীশকে দিয়ে কালকেতু বলল, 'আর কী খবর আছে আছে, বল।'

সদীশ বলল, 'রোকেয়া সুলতানা বলে ঢাকার একজন সোশ্যাল অ্যাকটিভিস্টকে কি তোর মনে আছে?'

কালকেতু বলল, 'ভাল মনে আছে। নায়গারায় জিহাদিদের গুলিতে উনি ইনজিওর্ড হয়ে ছিলেন। পরে ঢাকায় মারা যান।'

'ইয়েস, লিলি গডউইন তাঁর নামেই ঢাকায় অনাথ আশ্রম খুলছেন। খুব শিগগির উনি ঢাকায় যাবেন। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে, লিলি যেখান থেকে জার্নিটা শুরু করেছিলেন, সেখানেই শেষ করবেন।'

কালকেতু বলল, 'তোর মুখে ফুল চন্দন... সরি... চপ-কাটলেট পড়ুক। তোর ধারণা যেন সত্যি হয়। ভদ্রমহিলা আমাকে একবার দেখা করতে বলেছিলেন। ঠিক করেছি, খুব শিগগির ওর কাছে যাব।'

'বেস্ট অফ লাক। ফিরে এসে জানাস, কী হল। এখন ছাড়ি।' বলে সুদীশ লাইনটা ছেড়ে দিল।

বেলা বারোটার সময়, চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরোতেই কালকেতু দেখল, পলাশভাই লিভিং রুমে বসে কার সঙ্গে যেন ফোনে খুব চেঁচিয়ে কথা বলছেন। লিলি গডউইনের কাছে যাচ্ছে, কথাটা পলাশভাইকে বলে যাওয়া উচিত। সেই কারণে কালকেতু দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্য প্রান্তে যে কথা বলছে, তার নাম আফতাব। সে পলাশভাইয়ের এক্সপোর্ট কোম্পানির কোনও কর্মী। কথাবার্তায় কালকেতু বুঝতে পারল, ব্যাবসা নিয়ে নয়। আফতাব ছেলেটা বিয়ে করার জন্য দু'সপ্তাহের ছুটির কথা আগে থেকে ম্যাডামকে বলে রেখেছিল। কিন্তু কাগজে ম্যাডামের দুর্ঘটনার কথা পড়ার পর মত বদলেছে। বিয়েটা ও পিছিয়ে দিতে চায়।

এ দিক থেকে পলাশভাই তাকে বোঝাচ্ছেন, 'আহাম্মকের মতোন কাম কইরো না আফতাব। যারে বিয়া করবা মনস্থির করসো, হেই মাইয়্যাডার কথা তুমি ভাববা না? এ কী কথা? মাইয়াগো বিয়া তো জীবনে এগবারই হয়। হ্যায় মনডা প্রস্তুত কইর‍্যা বইস্যা আসে। আর তুমি হারে দাগা দিবা?

না, না, আমাগো কথা এক্কেরে ভাইবো না। তোমরা হনিমুনে চইল্যা যাইও। দ্যাশে ফিইর‍্যা তোমাগো আমি আশীর্বাদ কইর‍্যা আসুম।'

আফতাব বলে ছেলেটা বোধহয় ওদিকে গাইগুই করছিল, এ দিক থেকে পলাশভাই ধমকে উঠলেন, 'বলদের মতো কথা কইও না। যা কইলাম, কইরো।'

বলেই লাইনটা উনি কেটে দিলেন। তার পর ওকে চোখে পড়ায় বলে উঠলেন, 'দ্যাখসেন কাইলকেতুভাই। আইজকাইলকার পোলারা মাইয়াগো সেন্টিমেন্টই বোঝে না। হালায় কয়, আফনেগো এই অবস্থা। বিয়া করুম কী কইর‍্যা? যার সাথে বিয়া ঠিক হইসে, হ্যায় আমাগো গেরাম আমোদপুরের মাইয়া। তাইলে খুইল্যাই কই। ইমনের ছোট বুইন ফতেমা। আগেই বোধয়, এগবার কথাবার্তা হইসিল। পরে আফতাবের আববুরে কনভিন্স কইর‍্যা আমিই বিয়ার ঘটকালি করসিলাম। আফতাব ব্রিলিয়ান্ট পোলা। আমার এক্সপোর্ট কোম্পানি হ্যায় নিজেই সামাল দিতাসে। তা'ছাড়া, নারাণগঞ্জে হ্যাগো বিশাল সম্পত্তি। ফতেমা সুখে থাইকব হ্যার কাসে। বিয়ার পর হ্যাগো হনিমুনে দুবাইতে যাওনের কথা। প্লেনের টিকিট আমিই পাঠাইয়া দিসিলাম। আর দ্যাহেন, অহন বলদটা কইতাসে বিয়া পিছাইয়া দিবো।'

শুনে পলাশভাইয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কালকেতু। মানুষটা কী ধাতুর তৈরি! অধস্তন কর্মচারীর জন্যও এত ভাবেন? উল্টো দিকে, মালিকের সঙ্গেও কর্মচারীদের কী সুন্দর সম্পর্ক। আজকাল দেখাই যায় না। তা হলে, ওর ধারণাই ঠিক। পলাশভাই এমনি এমনি ইমনকে আশ্রয় দেননি। সফট কর্নার আছে বলে, উনি ঝুঁকি নিয়েও গ্রামের ছেলেকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, ওর পরিবারের লোকজন যাতে ভাল থাকে, আমেরিকায় বসে সে চিন্তাও মানুষটা করে যাচ্ছেন। কালকেতুর মনে অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে উঠে এল। বিশেষ করে, ইমনকে নিয়ে। কিন্তু সে সব প্রশ্ন করার সময় এখন কি না, ও বুঝে উঠতে পারল না। প্রসঙ্গ বদলে ও

বলল, ‘পলাশভাই, আমি একটু লিলি গডউইনের অফিস থেকে ঘুরে আসছি। উনি আমায় ডেকেছেন। আপনার ডালাস প্রোজেক্টটা নিয়ে কি ওঁকে কিছু জিজ্ঞেস করব?’

পলাশভাই জিজ্ঞেস করলেন, ‘ডালাসের কোন প্রোজেক্টের কথা, ক’ন তো?’

‘চাইল্ড প্রোকেটশন সেন্টার। প্লেনোতে আপনি আর ম্যাডাম যেটা স্টার্ট করতে চাইছিলেন।’

‘না, না। জিজ্ঞাস কইর‍্যা কোনও লাভ নাই। সেন্টার খুইল্যা কী অইব? ম্যাডামই থাইকব না, প্রোজেক্ট চালাইব কে? এহানে সব বিকরিবাট্টা কইর‍্যা আমি দ্যাশে ফিইর‍্যা যাম। যান, আফনে পারলে ইমনরে একবার ফোন কইর‍্যা ডাকেন। হ্যার সাথে আমার দরকার আসে।’

একটু ইতস্তত করেই কালকেতু জিজ্ঞাসা করল, ‘ইমনকে নিয়ে কোথাও বেরোবেন না কি?’

পলাশভাই বললেন, ‘হ। প্রথমে এহানকার মেক্সিকান পাড়ায় যামু। ওহানে মারসেডো সালিনাস বইল্যা একজন ব্ল্যাক ম্যাজিসিয়ান আসেন। রোজিনা ম্যাডাম হ্যারে খুব বিশ্বাস কইরতেন। ট্যাহা-পয়সা খরচ কইরলে হ্যায় মরা লোগরেও না হি বাঁচাইয়া দিতে পারেন। হ্যার সাথে আইজ দেখা করুম। তার পর যাম হাসপাতালে। ভালা কথা, আইজ ম্যাডামের আম্মির কাছ থেইক্যা কোনও খবর পাইসেন না হি?’

মি. সালিনাসের কথা রোজিনা ম্যাডাম একদিন বলেছিলেন বটে। যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, শিউলিদিদি এখনও বেঁচে আছেন। তবে অভিশাপের কারণে ফ্যামিলি থেকে ছিটকে গেছেন। টাকা পয়সা খরচ করলে না কি তাঁর খোঁজ পাওয়া যাবে। কথাটা মনে পড়ায় কালকেতু মনে মনে হাসল। মন যখন দুর্বল হয়, তখন লোকে জ্যোতিষীর কাছে যায়। মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই পলাশভাই মি. সালিনাসের কাছে যেতে চাইছেন। বাধা দেওয়া উচিত

না। তবুও, পলাশভাইকে একা ছেড়ে দিতে মন চাইল না কালকেতুর। ম্যাডামের ডান হাত প্যারালাইজড হয়ে গেছে শুনলে পলাশভাই আরও মুষড়ে পড়বেন। তাই ও বলল, 'ম্যাডাম একইরকম আছেন। ইমনকে আসতে বলে দিচ্ছি। নিউ জার্সির বাসা থেকে ওর আসতে ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই। আমি না হয় অন্য একদিন গিয়ে লিলি ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করে আসব। আজ চলুন, আপনার সঙ্গে মি. সালিনাসের কাছে যাই। আমারও ওকে দেখার খুব ইচ্ছে।'

পলাশভাই সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'চলেন তাইলে। একা একা আমার ভালা লাগতাসে না কাইলকেতুভাই। হায় হায়...আমি যে ম্যাডামরে ভুলতে পারতাসি না। এই অ্যাপার্টমেন্টে যে হ্যারে লইয়্যা আমি সংসার পাতুম, ঠিক করসিলাম। অ্যাপার্টমেন্টে হর্বত্র হ্যার ছোঁয়া। হায় রে, আইজ পর্যন্ত কোনও মানষের ক্ষতি করি নাই। কাউরে কটু কথা কই নাই। মিথ্যার আশ্রয় লই নাই। কোন পাপে জেসাস ক্রাইস্ট আমারে শাস্তি দিতাসেন, জানি না।' বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে পলাশভাই দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

যীশু খ্রীস্টের কথা শুনে কালকেতু চমকে উঠল। পলাশভাই তা হলে ক্রিশ্চান! ম্যাডামকে পাওয়ার আশায় উনি কি ধর্মও পরিবর্তন করেছিলেন? এতদিন একসঙ্গে রয়েছে। অথচ পলাশভাইয়ের সম্পর্কে ওর কত কী অজানা রয়ে গেছে!

(সাতচল্লিশ)

কাইলকেতুছ্যার ফোন করে ওকে নিউ ইয়র্ক যেতে বলেছেন। সিদান গাড়িটা নিয়ে বেরোবে, এমন সময় ডোর বেলের আওয়াজ শুনল ইমন। সিকিউরিটি সিস্টেমের সুইচ টিপে ও দেখল, পর্দায় লারেইনার মুখ। সদর দরজার বাইরে মেয়েটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পরনে জিনস, লেদার জ্যাকেট। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। এমনিতে মেয়েটার বয়স কুড়ি-টুড়ি হবে। কিন্তু

হেয়ার স্টাইল বদলানোর জন্য ওকে আরও কমবয়সি লাগছে। মেয়েটার মুখ এমন নিষ্পাপ, ওকে দেখেই ইমনের মনটা ভাল হয়ে গেল। হাসিমুখে ও বলল, 'তুমি! দাঁড়াও, দাঁড়াও, দরজা খুলে দিচ্ছি।'

সেন্ট্রাল পার্কে যেদিন লারেইনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেদিন ও নিজে যেচে এসে কথা বলেছিল। কিন্তু আজ ইমনের মনে হল, ওকে বাংলোয় দেখে মেয়েটা খুশি হয়নি। বোধহয়, আশা করেনি। পর্দায় ওকে দেখে লারেইনা বলেই ফেলল, 'তুমি এখনও নিউ ইয়র্কে যাওনি?'

সদর দরজা খুলে দিয়ে ইমন লনের মাঝামাঝি এগিয়ে এসে বলল, 'গাড়িটা নিয়ে জাস্ট বেরোচ্ছিলাম। আর একটু দেরি করলে তুমি কিন্তু আমাকে পেতে না।'

লারেইনা বলল, 'জানি। তুমি কি আমার জন্য কয়েক মিনিট ওয়েট করবে প্লিজ। তা হলে তোমার সঙ্গে আমি ফিরে যাব। আসলে একটা জরুরি দরকারে আমাকে আসতে হল। ক্রিসমাসের ছুটিতে আমি একটা কিট ব্যাগ এখানে রেখে গেছিলাম। সেই ব্যাগে আমার মার্শাল আর্টের পোশাক আর বাকি সব সরঞ্জাম রয়েছে। আজ ইউনির্ভাসিটিতে আমাকে ব্ল্যাকবেল্টের পরীক্ষা দিতে হবে। সেই কারণে ব্যাগটা নিতে এলাম।'

'কোথায় রেখেছ তোমার ব্যাগ?'

'মেন বিল্ডিংয়ে, আমার লকারে।' বলে বাংলোর দিকে হাঁটতে লাগল লারেইনা। কয়েক পা এগিয়ে কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে ও বলল,'কাল সারা রাত হাসপাতালে কাটিয়েছি। সরাসরি ওখান থেকে এলাম। আসার ইচ্ছে ছিল না। নেহাত পরীক্ষাটা আজ দিতেই হবে। না পারলে আরও ছ'মাস পিছিয়ে যাব। হেমলতা আন্টিই আমাকে জোর করে পাঠালেন। জানি না, ফিরে গিয়ে রোজিনা ম্যাডামকে জীবিত দেখব কি না।'

শুনে বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেল ইমনের। ম্যাডামের অবস্থা এতটাই খারাপ না কি? তা হলে পলাশছ্যারের কী হবে? সেদিন এয়ারপোর্ট থেকে

ছ্যারকে নিয়ে আসার সময়ই ও টের পেয়েছে, ভালবাসা কাকে বলে। কতটা খাঁটি হতে পারে। ইমনের মনে হয়েছে, ভালবাসা হল অনাবিল আনন্দে বেঁচে থাকা। যা গড়ে ওঠে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নির্ভরতা, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে। পলাশছ্যার প্রতি কথাতেই সেদিন বলছিলেন, 'ম্যাডামরে ছাড়া আমি বাঁচুম কী কইর‍্যা?' সত্যিই, ছ্যারের পক্ষে বাঁচা অসম্ভব। কিন্তু, একজন ভালামানুষের প্রতি আল্লাহ এতটা নির্দয় হতে পারেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহর মনে ভাল কোনও উদ্দেশ্য আছে। লনের ধারে দাঁড়িয়ে ইমন মনে মনে প্রার্থনা করল, সব কিছু যেন আবার আগের মতো হয়ে যায়। রোজিনা ম্যাডাম যেন আগের মতোই মালকিন হিসেবে বাসায় ফিরে আসেন।

লারেইনা মেন বিল্ডিংয়ে ঢুকে গেল। ইমন জানে, ওর কাছে এক সেট চাবি থাকে। মেয়েটা রোজিনা ম্যাডামের এমনই বিশ্বস্ত। মিনিট দুয়েকের মধ্যে কাঁধে কিট ব্যাগ ঝুলিয়ে, বেরিয়ে এসে ও বলল, 'একটা বিরাট ভুল হয়ে গেছে ইমন। রোজিনা ম্যাডাম ওঁর একটা জিনিস নিয়ে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু এখন দেখছি, তাড়াহুড়োয় ওঁর লকারের চাবি আনতে ভুলে গেছি।'

ইমন জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে এখন?'

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে লারেইনা বলল, 'আমার পরীক্ষা বেলা তিনটের সময়। এখন ফের নিউ ইয়র্কে গিয়ে চাবি নিয়ে ফিরে আসতে অনেক সময় লেগে যাবে। তার চেয়ে বরং পরীক্ষা দেওয়ার পর একবার চেষ্টা করে দেখব। হয়তো সন্ধে হয়ে যাবে। কিন্তু কোনও উপায় নেই, আমাকে ফের আসতেই হবে।'

ইমন জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাডামের জিনিসটা কাল সকালে এসেও তো নিয়ে যেতে পারো।'

'সেই সুযোগটা পাব কি না জানি না। ম্যাডামের অবস্থা খুবই খারাপ। যে কোনও সময় উনি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারেন। মরার আগে উনি

একটা ইচ্ছাপূরণ করতে চান। সেই দায়িত্বটা উনি আমাকে দিয়েছেন। সেটা পূরণ করতে না পারলে, সারা জীবন নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।'

'আমি কি একবার লকার খোলার চেষ্টা করব লারেইনা?'

'তুমি! তুমি লকার খুলবে কী করে? তোমার কাছে তো চাবি নেই।'

ব্রেক ইন করা ওর কাছে জল-ভাতের মতো ব্যাপার। ও যে তালা খোলার জাদুকর, সেটা লারেইনার জানার কথা না। ইমন রসিকতা করার ভঙ্গিতে বলল, 'ছোটবেলায় গ্র্যান্ডমার লকার খুলে প্রায়ই কয়েন চুরি করতাম। চলোই না, একবার দেখি, সেই স্কিলটা এখনও আছে কী না।'

'তুমি কি সিরিয়াস?'

'কেন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি। পরখ করে দেখে নাও তা হলে।'

'বেশ চলো।' কথাটা বলেই লারেইনা ফের মেন বিল্ডিংয়ের দিকে পা বাড়াল। ইমনও ওর পিছু নিল। এই বাসায় ও এতদিন ধরে আছে, কিন্তু কোনওদিন লিভিংরুম ছাড়া অন্য কারও ঘরে কোনওদিন ও ঢোকেনি। ম্যাডামের ঘরে ঢুকে লারেইনা আলো জ্বালিয়ে দিতেই, চারদিকে তাকিয়ে ইমন হতভম্ব হয়ে গেল। পাঁচতারা কোনও হোটেলের কামরা বলে মনে হচ্ছে। বিলাসের কোনও খামতি নেই। বেলজিয়াম কাচের একটা ঝাড়বাতি সিলিং থেকে ঝুলছে। তার আলোয় ছিটকে বেরোচ্ছে বৈভবের দম্ভ। এইসব রুম ঝকঝকে তকতকে করে রাখার দায়িত্বে আছে লারেইনা। রুমের প্রতিটি কোণ চেনে। ও সুইচ টেপায় একটা সাদা দেওয়াল ধীরে ধীরে সরতে শুরু করল। ইমন দেখল, স্টিলের কয়েকটা লকার রয়েছে ভিতরে। 'কোনটা?' ইমন প্রশ্ন করতেই লারেইনা আঙুল দিয়ে লকারটা দেখিয়ে দিল।

কয়েক সেকেন্ড জরিপ করে ইমন বলল, 'পারলে একটা টুল বক্স আর গ্লাভস নিয়ে এসো। দেখি, খুলতে পারি কি না।'

মালিকের বিনা অনুমতি বা অনুপস্থিতিতে লকার খোলা আইনত দণ্ডনীয়। কথাটা মনে পড়ায় ইমন দ্বিধায় পড়ল। আবার কোনও ঝামেলায় পড়বে না

তো? মুহূর্তের মধ্যে ও ঠিক করে নিল, কীভাবে লকার খুলছে,লারেইনাকে তা দেখাবে না। ইচ্ছে করেই ও গ্লাভস আনতে বলল। কোথাও ওর ফিঙ্গার প্রিন্ট থেকে যাক, এটা ইমন চায় না। মেয়েটাকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। তবুও, সাবধানের মার নেই। জিহাদি জীবন ওকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। নিজেকে আর কোনও ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে ইমন জড়াবে না। ম্যাডামের শেষ ইচ্ছে পূরণ করার জন্য মেয়েটা ওর সাহায্য চাইছে। খুলে দিলে ক্ষতি কী?

কয়েক মিনিটের মধ্যে লারেইনা টুল বক্স আর গ্লাভস এনে দিল। বক্সটা খুলে ইমন বলল, 'তুমি কি এক কাপ কফি খাওয়াতে পারবে লারেইনা? মনে হয়, তার মধ্যেই লকারটা আমি খুলে ফেলতে পারব।'

কথাটা শুনে লারেইনা অবাক চোখে তাকাল। ওর চোখে এই প্রথম সন্দেহ দেখতে পেল ইমন। মাত্র ওই একটা চাউনিই ওকে সতর্ক করে দিল। লারেইনা চলে যাওয়ার পর মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আঙুলের ভোজবাজিতে লকারটা ইমন খুলে ফেলল। দরজার পাল্লা টেনে ও দেখতে পেল, ছোট বড় অনেকগুলো জুয়েলারি বক্স সাজানো রয়েছে। আরও ভেতরে থরে থরে গোছানো ডলারের নোট। সঙ্গেসঙ্গে পাল্লা দুটো ও বন্ধ করে দিল। ওর মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'তুই ঠিক করতাসস না ইমন। মাইয়াডার কথায় বিশ্বাস কইর‍্যা, তুই যা করলি, হেইডা ক্রাইম।'

পরক্ষণেই পাশ ফিরে ইমন দেখতে পেল লারেইনাকে। নিঃশধে কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ও টেরও পায়নি। মেয়েটার হাতে ধূমায়িত কফির কাপ। এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খুলতে পেরেছ?'

কফির কাপ হাতে নিয়ে ইমন বলল, 'হ্যাঁ, খুলেছি। কিন্তু লকারটা বন্ধ করতে পারব না। সেই টেকনিক কিন্তু আমার জানা নেই।'

'দরকারও নেই। যদি কিছু মনে না করো, তুমি বাইরে গিয়ে একটু অপেক্ষা করবে, প্লিজ। ম্যাডাম যে জিনিসটা আমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন,

সেটা খুঁজতে হবে।'

কোনও প্রশ্ন না করে ইমন চুপচাপ ম্যাডামের বেডরুমের বাইরে বেরিয়ে এল। ওর মন বলতে লাগল, মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে। লারেইনাকে কতটুকুই বা ও চেনে? মেয়েটা যদি লকার ফাঁকা করে দেয়, তা হলে? দোষটা তো ওর উপরই এসে পড়বে। কেননা, সবাই জানে, ও একা এই বাংলো পাহারা দিচ্ছে। ছি ছি, পলাশভাই কী ধারণা করবেন, ওর সম্পর্কে? ওর উপর কাইলকেতুছ্যার বা সুদীশছ্যারের আস্থাও নষ্ট হয়ে যাবে। এইসব এলোমেলো ভাবনায় ইমনের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। কফি শেষ করে কাপটা ঘরে রাখতে গিয়েও ও পিছিয়ে এল। পর্দার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, যা ভেবেছিল, সেটাই ঠিক। লকার থেকে বের করে জুয়েলারি বক্স আর ডলারের বান্ডিলগুলো লারেইনা ওর কিট ব্যাগে ভরছে। দেখে ইমনের মারাত্মক রাগ হল। লারেইনার ওই নিস্পাপ মুখটার আড়ালে এত বড় একজন লোভী মানুষ লুকিয়ে আছে?

সময় ইমনকে অনেক অভিজ্ঞতা দিয়েছে। নিজেকেই ও বলল, 'হালা, অহন মাথা গরম কইরলে চইলব না। ঠান্ডা মাথায় লারেইনারে শিখখা দিতে অইব।' বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে, হাতের কাপটা ও সুইমিং পুলের জলে ছুঁড়ে ফেলল। যাতে ওর ফিঙ্গার প্রিন্ট না পাওয়া যায়। মনে মনে ও তারিফও করল, চুরির কী সুন্দর সময়ই না বেছেছে লারেইনা! রোজিনা ম্যাডাম মৃত্যুশয্যায়, পলাশছ্যারের মাথার ঠিক নেই। বাংলোয় ওঁরা কবে ফিরবেন, কেউ জানেন না। খুব শিগগির যে চুরি ধরা পড়বে, সে সম্ভাবনা ক্ষীণ। ইমন বুঝতে পারল না, এত বড় বিশ্বাসভঙ্গের কাজটা লারেইনা করতেই বা গেল কেন? না, না, ওকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। শাস্তি ওকে পেতেই হবে। দ্রুত প্ল্যান ছকে নিয়ে, মোবাইল ফোন বের করে, সুদীশছ্যারকে একটা মেল করে দিল ইমন। তার পর চুপচাপ গিয়ে বসে রইল সিদানে। খানিক পরে লুকিং

মিররে ও দেখল, কিট ব্যাগটা এত ভারী হয়ে গেছে, লারেইনা টানা হিঁচড়ে করে নিয়ে আসছে।

গাড়ির কাছে এসে লারেইনা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল, 'আমি কলম্বাস সার্কেলের কাছে যাব। ওখানে আমার বয়ফ্রেন্ড দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাকে লিফট দেবে, প্লিজ?'

ইমনও হেসে বলল, 'সিওর। উঠে পড়ো। আমি তো কলম্বাস সার্কেলের পাশ দিয়েই যাব।'

'থ্যাঙ্কস' বলে ব্যাগটা পিছনের সিটে রেখে, লারেইনা সামনের সিটে এসে বসল।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ইমন জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাডামের জিনিসটা কি খুঁজে পেলে?'

'পেয়েছি। অনেক কষ্টে। একটা ওয়েডিং রিং। ম্যাডামের হাসবেন্ড ওঁকে দিয়েছিলেন।'

'হাসবেন্ড মানে? কার কথা বলছ তুমি?'

'তুমি জানো না? রোজিনা ম্যাডামের হাসবেন্ড... নিক। এতদিন বাংলোয় আছ, তাঁকে কখনও দেখোনি? সপ্তাহে তিনদিন করে এসে উনি লনের ঘাস ছেঁটে দিয়ে যান, সুইমিং পুল পরিষ্কার করেন। একটু ভাবো, তা হলেই নিককে তোমার মনে পড়বে। লালচে মুখ, প্যাকাটে চেহারা, ময়লা পোশাক পরা। দেখলেই বোঝায় যায়, ড্রাগ অ্যাডিক্ট।'

সঙ্গেসঙ্গে লোকটাকে ইমনের মনে পড়ল। রোজিনা ম্যাডাম একদিন লোকটাকে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছিলেন, সুইমিং পুলের জলে, গাছের ঝরা পাতা ভাসছিল বলে। ওই ভিখারী টাইপের লোকটা ম্যাডামের স্বামী! বিশ্বাস করতে মন চাইল না ইমনের। লারেইনা গল্প বানাচ্ছে না কি? প্রশ্নটা ও করেই ফেলল, 'নিজের হাসবেন্ডকে দিয়ে ম্যাডাম ঝাড়ুদারের কাজ করাতেন কেন?'

‘সে এক লম্বা গল্প। অস্টিন ইউনির্ভাসিটিতে পড়ার সময় ম্যাডাম প্রেমে পড়েছিলেন নিকের। পড়াশুনো শেষ করে উনি বিয়ে করে ফেলেন নিককে। র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই ম্যাডাম বুঝতে পারেন, নিককে বিয়ে করে মারাত্মক ভুল করেছেন। তখন ঘাড় থেকে নামানোর উপায় আর নেই। শ্বশুরের পয়সায় দেদার স্ফূর্তির সুযোগ কেউ ছাড়ে? নিক রাতদিন ড্রাগের নেশা করে থাকতেন। গেস্টদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। ওঁর উৎপাতে রায়ান আঙ্কল আর হেমলতা আন্টি খুব বিরক্ত হয়ে গেছিলেন। রোজিনা ম্যাডামও রেগে গেলে মারধর করতেন নিককে। কিন্তু কখনও ডিভোর্স দিতে চাননি। শেষে রায়ান আঙ্কলকে স্বস্তি দিতেই ম্যাডাম নিককে নিয়ে চলে আসেন নিউ ইয়র্ক সিটিতে। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। জানোই তো সে কথা। একজন রিপাবলিকান সেনেটরের সুনজরে পড়ে ম্যাডাম চাকরি জুটিয়ে নেন ইমপোর্ট সেক্রেটেরিয়াটে। ওখানে মি. পলাশের সঙ্গে আলাপ। রেস্ট ইউ নো ইমন।’

গাড়ি চালাতে চালাতে ইমন প্রশ্ন করল, ‘পলাশছ্যার কি নিকের কথা জানেন?’

লারেইনা বলল, ‘না। নিকের সঙ্গে ম্যাডামের সমঝোতা হয়ে আছে। যতদিন উনি ডলার সাপ্লাই করে যাবেন, ততদিন নিক চুপ করে থাকবেন। আর যতদিন মি. পলাশ সেই ডলার সাপ্লাই দেবেন, ততদিন ম্যডাম তাঁর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় চালিয়ে যাবেন।’

‘কী বলছ তুমি লারেইনা?’

‘ঠিকই বলছি। রোজিনা ম্যাডাম যে কী ডেঞ্জারাস মহিলা, তুমি ভাবতেও পারবে না। নিকের সঙ্গে ওর কথাবার্তা আমি একদিন শুনে ফেলেছিলাম। শুনলে তুমি হয়তো বিশ্বাসই করবে না, মি. পলাশের সবকিছু ধীরে ধীরে ম্যাডাম আত্মসাৎ করে নিচ্ছেন। আর সেই অর্থ উনি হেমলতা আন্টির নামে জমা দিচ্ছেন আলবুকার্কের এক ব্যাঙ্কে। মি. পলাশ বছরে একবার করে

আমেরিকায় আসেন। অত তলিয়ে দেখার ইচ্ছেও দেখান না। রোজিনা ম্যাডাম মাঝে ওঁকে বুঝিয়ে ছিলেন, বাংলাদেশের সব ব্যবসা গুটিয়ে. নিয়ে এখানেই পাকাপাকি চলে আসতে। কিন্তু মি. পলাশ জানেন না, যেদিন নিঃস্ব হয়ে যাবেন, সেদিন রোজিনা ম্যাডাম নিকের মতো, ওঁকে দিয়ে ঝাড়ুদারের কাজ করাবেন। আমি জানি, তুমি মি. পলাশকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করো। তাই তোমাকে সত্যি কথাটা বললাম।'

সেন্ট্রাল পার্কে বসে মাসখানেক আগে এই লারেইনাই কত প্রশংসা করেছিল রোজিনা ম্যাডামের। আজ একেবারে উল্টো কথা বলছে। যা বলছে, তা কিন্তু মিথ্যে নয়। হ্যাকিং করে চার-পাঁচদিন আগে ইমন সব কুকর্মের কথাই জানতে পেরেছে ম্যাডামের। লারেইনাকে উসকে দেওয়ার জন্য ও বলল, 'কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে, রোজিনা ম্যাডাম তোমার মেন্টর।'

লারেইনা দপ করে জ্বলে উঠে বলল, 'এখনও সেটা অস্বীকার করছি না। ওঁর দেখানো রাস্তাতেই তো আমি হাঁটতে চাইছি। জেনে রাখো, আমি এবং আমার মম ওঁকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। আর সেই কারণেই ওঁর কাছ থেকে যা শিখেছি, সেটা ওঁকে ফেরত দিতে চাইছি।'

ওর গলার স্বর শুনে ইমন চমকে উঠে বলল, 'তার মানে?'

'তা হলে শোনো। তোমাকে আগেও বলেছি, আমার ড্যাড ওঁদের র‍্যাঞ্চের সিকিউরিটি চিফ ছিলেন। তোমাকে বলেওছিলাম, উনি মারা যান ড্রাগ ডিলারদের গুলিতে। আসলে তা নয়। ড্যাডকে গুলি করে মেরেছিলেন রোজিনা শয়তানিটা। শখ করে উনি তখন পিস্তল চালানো শিখছিলেন। মার্ডার করেও ম্যাডাম অনুতপ্ত ছিলেন না। রায়ান আঙ্কলকে বলেছিলেন, ভুল হয়ে গেছে। ভাগ্যিস, আমার মম সেই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। না হলে আমরা জানতেই পারতাম না, ড্যাডের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল। রায়ান আঙ্কল অনেক খরচ করে কেসটা চাপা দেন। তার পর থেকে উনি আমাদের

ভরনপোষণের ভার নেন। তখনই আমি ঠিক করি, এর বদলা একদিন আমি নেব। ম্যাডামের যাতে সাজা হয়, তার চেষ্টা করব। কিন্তু ওঁকে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা স্বয়ং ঈশ্বরই করেছেন। ওঁর মৃত্যুটা যেভাবে হতে যাচ্ছে, তা পাপের শাস্তি ছাড়া আর কী?'

ইমন আর নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। মুখ ফুটে বলে ফেলল, 'তুমিও তো একটু আগে একটা পাপ করে এলে লারেইনা। সেটা কি ঠিক করলে? তোমাকেও তো ঈশ্বর শাস্তি দেবেন।'

কথাটা শুনে লারেইনা ঘুরে বসল। ওর চোখ-মুখে রাগ ফুটে বেরচ্ছে। হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা পিস্তল বের করে হিসহিসিয়ে ও বলল, 'তা হলে তুমি দেখে ফেলেছ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লকারটা আমি ফাঁকা করে দিয়েছি। কিন্তু আমি মনে করি, কোনও পাপ করিনি। এটা আমার প্রাপ্য ছিল। ড্যাডের জীবনের দামও বলতে পারো। কাল রাতে হাসপাতালে ম্যাডাম যখন আমাকে ইশারায় বোঝালেন, নিকের দেওয়া ওয়েডিং রিংটা এনে দিতে, সেটা পরে উনি কবরে যেতে চান, তখনই মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। ওঁর আঙুলে এখনও কিন্তু পরানো রয়েছে, মি. পলাশের দেওয়া প্ল্যাটিনামের রিং। তখনই ঠিক করে ফেলি, আমাকেও আখের গুছিয়ে নিতে হবে। ম্যাডাম আরও বলেছিলেন, লকারের চাবি ওঁর কাছে নেই। মি. পলাশের কাছে আছে। তাই আমি যেন নিউ জার্সিতে গিয়ে তোমার সাহায্য নিই। কেননা, তুমি না কি তালা খোলার ব্যাপারে এক্সপার্ট।'

ওহ, তা হলে লারেইনা সব প্ল্যান করেই বাংলোতে গিয়েছিল। অভিনয়ে এই মেয়েটাও কম যায় না। বাইরের দিকে তাকিয়ে ইমন দেখল, ব্রুকলিন ব্রিজ পেরিয়ে এসেছে। আর অল্প সময়ের মধ্যে কলম্বাস সার্কেল পৌঁছে যাবে। ওখানেই কিট ব্যাগ নিয়ে লারেইনার নেমে যাওয়ার কথা। ঠান্ডা মাথায় ও বলল, 'অত এক্সাইটেড হওয়ার কোনও কারণ নেই লারেইনা। পিস্তলটা তুমি হ্যান্ডব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে নাও। ম্যানহাটনের রাস্তা

সিসিটিভি ক্যামেরায় ভর্তি। পরে ধরা পরে যেতে পারো। আমার দিক থেকে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। আমাকে অন্তত মি. পলাশের কাছে যেতে দাও। ম্যাডামের ছলনার কথা উনি অন্তত জানুন।'

অনুরোধটা মেনে নিল লারেইনা। পিস্তল হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে গম্ভীর মুখে বসে রইল। একটু পরে কলম্বাস সার্কেলে পৌঁছে দূর থেকে ইমন দেখতে পেল সুদীশছ্যারকে। রাস্তায় ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সাধারণ পোশাকে আরও দু'জন। মোড় পেরিয়ে, গাড়ি থামিয়ে ইমন বলল, 'তুমি কি ওয়েডিং রিংটা হাসপাতালে দিতে যাবে লারেইনা?'

বাঁকা হেসে লারেইনা বলল, 'তোমার মাথা খারাপ? দেল বস্কে ফ্যামিলির কারও মুখদর্শন আমি আর করতে যাব না। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে আমি আপাতত কানাডায় চলে যাচ্ছি। ওখানেই সেটল করব।' বলতে বলতে ও ব্যাগটা নামিয়ে রাস্তায় পা দিল।

গাড়ি ফের স্টার্ট দিয়ে, ইমন মনে মনে বলল, যা ভাবছ, তা কিন্তু হবে না। একটু এগিয়ে লুকিং মিররে ও দেখল, সুদীশছ্যারেরা তিনজন মিলে লারেইনাকে ঘিরে ধরেছেন।

(আটচল্লিশ)

মোজাম্বিক দেশটা ঘূর্ণিঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে দিন কয়েক আগে। ফাউন্ডেশনের অফিসে বসে আল জাজিরা চ্যানেলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনাবলীর দিকে লক্ষ রাখছেন লিলি গডউইন। আফ্রিকার দক্ষিণপূর্ব দিকে ভারত মহাসাগরের তীরে তিন কোটি মানুষের দেশ। আশপাশে মালাউই, জিম্বাবোয়ে, মাডাগাসকর। 'ইডাই' ঝড়ের তান্ডবে অসহায় অবস্থায় প্রায় দু'কোটি শিশু ওই অঞ্চলে অনাহারে দিন গুজরান করছে। মোজাম্বিকের বন্দর শহর বেইরা থেকে দু'দিন আগে লিলি একটা মেল পেয়েছিলেন, 'দয়া করে আমাদের বাচ্চাদের বাঁচান। কলেরা মহামারীর আকার নিয়েছে। প্রচুর বাচ্চা মারা যাচ্ছে।' ব্যস, ওইটুকুই। তার পর থেকে বেইরার ইন্টারনেট

পরিষেবা বন্ধ। তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি লিলি। মরিশাসে চাইল্ড কেয়ার ফাউন্ডেশনের কর্তাদের ফোন করে তিনি খাবার, ওষুধ আর পোশাক আশাক ভর্তি জাহাজ আজ সকালেই মোজাম্বিকের দিকে রওনা করিয়ে দিয়েছেন।

হলিউডের নামকরা ফিল্ম ডিরেক্টর জুইসেপ্পে বার্লুসকোনি দেখা করতে আসবেন আজ। তাঁর জীবনী নিয়ে যে ছবিটা করছেন, তার প্রোমো তৈরি করে ফেলেছেন বার্লুসকোনি। সেটাই একবার দেখিয়ে নিতে চান। তার আগে আসার কথা, নায়গারায় যে ইন্ডিয়ান ছেলেটা বাঁচিয়েছিল, সেই কালকেতু ন্যান্ডির। কিন্তু মোজাম্বিকের শিশুদের নিয়ে লিলি এমন বিচলিত যে, ওই দু'জনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করার কথাও একবার ভেবেছিলেন লিলি। পরে পিএ মার্থাকে বলে দিয়েছেন, এঁরা দু'জন ছাড়া আর কাউকে যেন তাঁর ঘরে পাঠানো না হয়। নিজের চেম্বারে বসে তিনি বিভিন্ন চ্যানেলে মোজাম্বিকের খবর দেখছেন এখন। লন্ডনের গার্ডিয়ান কাগজের এক রিপোর্টার ইডাইয়ের আগে বেইরাতে ছুটি কাটাতে গেছিলেন। টিভিতে তাঁর মুখে লিলি শুনলেন, আর্ত মানুষদের সাহায্যে না কি প্রথম ছুটে যান ভারত মহাসাগরে টহলরত ভারতীয় নৌসেনারা। প্রথম কয়েকটা দিন শরণার্থী শিবিরে খাবার-দাবারের ব্যবস্থা তাঁরাই করেছেন। বিমানে করে অসুস্থ মোজাম্বিকান বাচ্চাদেরও নিয়ে গেছেন মরিশাসে।

শুনে শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠেছে লিলির। এই বিশ্বকেই তো তাঁর মতো মানুষরা দেখে যেতে চান। যেখানে মানুষ একে অপরের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেবে। গায়ের রং বিচার করবে না। ধর্ম, ভাষা, কৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামাবে না। ভারতীয় নৌসেনাদের কথা ভেবে কোথায় যেন একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন লিলি। ভারত সম্পর্কে খুব বেশি ধারণা তাঁর নেই। কিন্তু তিনি জানেন, হাজার হাজার বছরের সভ্যতার দেশ। ভারতীয়রা যে নিজের জীবন তুচ্ছ করে, অন্যের জীবন বাঁচাতে পারেন, সেই নজির তো

তিনি একবার চোখের সামনেই দেখেছেন। এই ভারতীয়রাই প্রথম আত্মানুসন্ধানের কথা বলেছিলেন। আগে জানো, তুমি কে?

আত্মানুসন্ধান। কথাটা কয়েকদিন ধরেই মনে মনে নাড়াচাড়া করছেন লিলি। তিনি কে? কোথায় তাঁর শেকড়? এলসা আন্টির কাছ থেকে আঘাত পাওয়ার পর থেকে এই প্রশ্নটাই লিলির মনে ঘোরাফেরা করছে। সেদিন ম্যানহাটন মলেই আন্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা শেষ হয়ে গিয়েছে। এলসা আন্টি এমন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তাঁর দিকে এগাচ্ছিলেন যে, লিলির ধারণা হয়েছিল, জোর করে তুলে নিয়ে যাবেন। কিন্তু সেও ইয়ুন লাফিয়ে দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছিল। আন্টির হাত মুচড়ে ধরে বলেছিল, 'গো অ্যাওয়ে লেডি। আদারওয়াইজ আই উইল টিচ ইউ আ লেসন। ব্রেক ইওর হ্যান্ড।' ওর রুদ্রমূর্তি দেখে লিলি ভয় পেয়ে গেছিলেন। সত্যি সত্যিই আন্টির হাত ভেঙে দেবে না কি? এলসা আন্টিও ভয় পেয়ে, কোনওরকমে হাত ছাড়িয়ে এক্সালেটরে করে নিচের তলায় নেমে যান।

সেই থেকে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন লিলি। এলসা আন্টির উপর এতটা কড়া মনোভাব নেওয়া কি উচিত হয়েছে? মন খারাপ করে কোনও কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারছিলেন না। তখন বাম কিমই বলেন, 'সত্য গোপন করা অপরাধ ম্যাডাম। তহবিল তছরুপের কথা ছেড়ে দিন। আপনার আইডেন্টিটি প্রকাশ করার ব্যাপারে ওঁর এত অনীহা ছিল কেন? এর পিছনে কী স্বার্থ আছে? মিসেস গিনেসবেরির সংশ্রব ত্যাগ করে আপনি কোনও অন্যায় করেননি।' বাম কিম বিচক্ষণ মানুষ। উনিই পরামর্শটা দেন। 'মিস গডউইন, আপনি গ্রিনউইচ ভিলেজে গিয়ে একবার অ্যালানের সঙ্গে দেখা করুন। ওঁর কাছ থেকে সরাসরি জানতে চান, আপনি ঢাকায় জন্মেছিলেন কি না? সুইডেনে গেলেনই বা কী পরিস্থিতিতে?'

বাম কিমের কথা মতো লিলি মাঝে একদিন ড্যাডির কাছে গিয়েওছিলেন। ড্যাডি কী বিশ্রী ব্যবহারই না করলেন তাঁর সঙ্গে! রূঢ় গলায় জানতে

চাইলেন, ‘এলসার সঙ্গে তুমি কেন এত অসভ্যতা করলে লিলি? এতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারলে? তুমি জানো না, উনি তোমার জন্য কী করেছেন?’

লিলি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, এলসা আন্টি ফাউন্ডেশনের তহবিল তছরুপ করেছেন। শুনে ড্যাডি বিশ্বাসই করলেন না। কথায় কথায় লিলি জানতে চেয়েছিলেন, গোথেনবার্গে যাওয়ার আগে তিনি কোথায় ছিলেন? ঢাকা শহরে কি? কিন্তু প্রশ্নগুলো এড়িয়ে ড্যাডি বারবার একই কথা বলতে লাগলেন, ‘যতক্ষণ না তুমি এলসার কাছে ক্ষমা চাইছ, ততক্ষণ তোমার কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেব না।’ শেষে আর মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেননি লিলি। বলেই ফেলেন, ‘তুমি যদি এই অন্যায় আবদারটা করো, তা হলে তোমার সঙ্গে আজই আমার সম্পর্ক শেষ।’ রাগ করে লিলি ড্যাডির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন।

আজীবন চেনা মানুষগুলো একে একে দূরে সরে গেলেন। এলসা আন্টির সঙ্গে অ্যান্ডিও। ওর সন্তান পেটে ধারণ করেছেন, অথচ সেটা জানানোর সুযোগও লিলি পেলেন না। ড্যাডির সঙ্গে মনোমালিন্যের পর সাশা, এড, ডানিয়েলরা এখন আর কেউ যোগাযোগও করে না। যে সাশা দিনে অন্তত একবার ফোনে কথা বলত, সে ফোন করা তো দূরের কথা। এখন ফোন করলেও ধরে না। বিষণ্ণতার পর্বটা ধীরে ধীরে কেটে যাওয়ার পর এখন একটা জিদও চেপে বসেছে লিলির মনে। অতীতকে খুঁড়ে বের করতেই হবে। কিন্তু কে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন? অনেক চিন্তা-ভাবনার পর লিলির মনে পড়েছে, আছেন এমন একজন। তিনি গভর্নেস হেমলতা আন্টি। গোথেনবার্গ থেকে যিনি আমেরিকায় এসেছিলেন, তাঁর দেখাশুনো করার জন্য। কিন্তু এখন তিনি কোথায়, কে জানে?

আর একজনও সাহায্য করতে পারে। সে কালকেতু ন্যান্ডি। ক্রিসমাস ইভ পার্টির ডিনার টেবলে কালকেতু একবার বলেছিল, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ারের সময় হারিয়ে যাওয়া, শিউলি বলে একটা মেয়েকে খুঁজতে ও

আমেরিকায় এসেছে। সেই মেয়েটার পিঠও না কি আগুনে ঝলসে গিয়েছিল। শিউলির সঙ্গে নিজের কোথায় যেন মিল খুঁজে পাচ্ছেন লিলি। কালকেতু কি মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছে? লিলি ভেবে রেখেছেন, ছেলেটা দেখা করতে এলে, তিনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করবেন।

টিভিতে মোজাম্বিকের খবর দেখাচ্ছে। প্রবল বৃষ্টির ফলে বহু অঞ্চলে বন্যার পরিস্থিতি। জলমগ্ন গ্রামে ত্রাণ সামগ্রী ফেলা হচ্ছে কপ্টার থেকে। পর্তুগাল সরকার দ্রুত ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে বেইরাতে। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগে মোজাম্বিক পর্তুগিজ উপনিবেশ ছিল। সেই কারণেই হয়তো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। টিভির দিক থেকে চোখ সরিয়ে লিলি লক্ষ করলেন, কাচের দরজা অল্প ফাঁক করে মার্থা মুখ বাড়িয়েছে। হাসিমুখে ও বলল, 'ম্যাডাম, মি. ন্যান্ডি এসে গেছেন।'

টিভি বন্ধ করে লিলি বললেন, 'নিয়ে এসো।'

মিনিটখানেক পরেই কালকেতু ঘরে ঢুকে বলল, 'গুড আফটারনুন ম্যাডাম।'

ছেলেটাকে দেখেই মনটা ভাল হয়ে গেল লিলির। স্নেহের সুরে তিনি বললেন, 'গুড আফটারনুন। হাতে সময় নিয়ে এসেছ তো?'

কালকেতু কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে বলল, 'সরি ম্যাম, কয়েকদিন আগেই আমার আসা উচিত ছিল। কিন্তু...'

'জানি। রোজিনা কেমন আছে এখন?'

'ভাল নয়। যে কোনও মুহূর্তে খারাপ খবর আসতে পারে হাসপাতাল থেকে। সে যাক, আমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন, ম্যাডাম? বলুন, আমার হাতে যথেষ্ট সময় আছে।'

ফের সেই শব্দটাই মাথায় এল। লিলি রহস্য করে বললেন, 'আত্মানুসন্ধানের জন্য। তোমাদের হিন্দুধর্মে তো শুনেছি, এ নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। ঋষি-মুনিরা অনেক শাস্ত্র লিখে রেখে গেছেন।'

‘ম্যাডাম, আপনি কি আমার সঙ্গে মজা করছেন?’

‘বিন্দুমাত্র না। আমার কথাটার মধ্যে আধ্যাত্মিক মানে খুঁজতে যেও না। একটু সহজ করে নাও। প্রায় অর্ধ শতাধী পেরিয়ে এসে হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, আমার রুট কোথায়? উত্তরটা আরও বেশি করে খুঁজছি এই কারণে যে, যাঁদের উপর বিশ্বাস করে এতটা রাস্তা পেরিয়েছি, তাঁরা আমাকে ঠকিয়েছেন।’

কালকেতু ছেলেটার প্রখর বুদ্ধি। বলল, ‘আপনি কি মিসেস গিনেসবেরির কথা বলছেন?’

‘তুমি কী করে বুঝলে?’

‘হাসপাতালে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যেদিন আমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, উনি আপনার সঙ্গে তঞ্চকতা করছেন। পরে রায়ান দেল বস্কে আমার কাছে ওঁর অনেক বদনাম করেছেন।’

‘রায়ানকে তুমি চিনলে কী করে?’

উত্তরে কালকেতু যা বলতে শুরু করল, তা শুনে লিলি অবাক হয়ে গেলেন। রোজিনা মেয়েটার মা হেমলতা আন্টি! আর বাবা রায়ান এখন না কি আলবুকার্কে একটা বিশাল র‍্যাঞ্চের মালিক। ওঁরা দু’জনই এখন এই নিউ ইয়র্ক শহরে! এর থেকে ভাল খবর আর কী হতে পারে? কানের মধ্যে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলেন লিলি। কালকেতু ছেলেটা বোধহয় ঈশ্বরের দূত হয়ে হাজির হয়েছে। রায়ানকে তিনি চিনতেন গর্ভনেস হেমলতা আন্টির বয়ফ্রেন্ড হিসেবে। মনে পড়ছে, এলসা আন্টির বাড়িতে গিয়ে রায়ান একবার ঝামেলাও করেছিলেন। তার কয়েকদিন পর হেমলতা আন্টি কোথায় যেন চলে যান। ড্যাডি তখন বলেছিলেন, হেমলতা চুরি করে পালিয়েছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া এ আর কী হতে পারে! সত্যিটা এতদিনে প্রকাশ পেয়ে গেল। প্রায় চল্লিশ বছর পর হঠাৎই লিলি সন্ধান পেলেন হেমলতা আন্টির।

উনি তা হলে চুরি করে পালাননি। রায়ানকে বিয়ে করার জন্যই চাকরি ছেড়েছিলেন।

এলসা আন্টি সম্পর্কে রায়ান কী বলেছেন, কালকেতু বলে যাচ্ছে। লিলি মিলিয়ে নিচ্ছেন, নিজের অতীতের ঘটনাবলির সঙ্গে। একজন লোভী, স্বার্থপর মানুষকে তিনি এতদিন চিনতে পারেননি, ভেবে লিলি মরমে মরে যাচ্ছেন। কথার ফাঁকে তিনি জানতে চাইলেন, 'শিউলির খোঁজ পাওয়ার ব্যাপারে তুমি কতদূর এগিয়েছ কালকেতু?'

'আগে আমি আপনাকে একটা ছবি দেখাতে চাই ম্যাডাম। তার পর বলব, কতটা এগিয়েছি।'

কথাগুলো বলে ব্রিফকেস থেকে একটা ছবি বের করে টেবলের উপর রাখল কালকেতু। দেখে চমকে উঠলেন লিলি। হুবহু তাঁর মুখ। বললেন, 'আমার এই ছবি তুমি পেলে কোথায়?'

'ম্যাডাম, এই ছবিটা কম্পিউটার গ্রাফিক্সে করা। শিউলিদিদি যখন হারিয়ে যান, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। এখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। চেহারারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাঁকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব মনে হচ্ছিল। কিন্তু রায়ানই আমাকে পরামর্শ দেন, কম্পিউটার গ্রাফিক্সের সাহায্য নিতে। ভাগ্যক্রমে জন রিড বলে একজন দক্ষ আর্টিস্টকে পাওয়াও গেল। উনিই প্রচুর পরিশ্রম করে এই ছবিটা তৈরি করেছেন। আপনার উত্তরটা কি পেয়ে গেছেন? না কি খুলে আমাকে বলতে হবে।'

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন লিলি। বললেন, 'তুমি কী বলতে চাইছ কালকেতু? আমিই সেই শিউলি?'

'অত উত্তেজিত হবেন না ম্যাডাম। এটা আমার অনুমান মাত্র। খোঁজ শুরু করার পর আমার হাতে খুব বেশি তথ্য ছিল না। পুরনো খবরের কাগজের কাটিংস ছাড়া আর কিছুই না। সেইসময় শিউলিকে নিয়ে যা লেখা হয়েছিল, তার উপর ভিত্তি করেই আমি তদন্ত শুরু করি। সূত্র বলতে ঢাকার

মেডিক্যাল হাসপাতাল, নার্স এলসা গিনেসবেরি, এবং রিচার্ড গাটম্যানের রিপোর্ট, আর তোলা একটা ছবি। এই দেখুন সেই ছবি, যা গাটম্যানকে পুলিৎজার পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছিল।' কথাটা বলেই কালকেতু ব্রিফকেস থেকে একটা ছবি বের করে আনল।

ছবিটা হাতে নিয়ে লিলি শিউরে উঠে বললেন, 'মাই গুডনেস, কখন তোলা হয়েছিল এই ছবি?'

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। নগ্ন অবস্থায় যে মেয়েটিকে দৌড়তে দেখছেন, সে-ই শিউলি ওরফে বেবি। গাটম্যান একেই ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করে এসেছিলেন। রেড ক্রশের এলসা গিনেসবেরির আন্ডারে। তখন অন্ধের মতো হাতড়াচ্ছিলাম। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর আমার কৌতূহল বেড়ে যায়। গুগল সার্চ করে জানতে পারি, আপনার শৈশব গোথেনবার্গে কাটলেও আপনি সুইডিশ নন। কিন্তু জন্মসূত্রে কোন দেশের, সে সম্পর্কে কোথাও কিছু লেখা নেই। মিসেস গিনেসবেরি ইচ্ছে করেই কোথাও উল্লেখ করেননি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, আপনার কর্মজীবন এবং ফাউন্ডেশন নিয়ে যত লেখা ইন্টারনেটে পেয়েছি, তার কণামাত্র নেই আপনার বাল্যকাল নিয়ে। ভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় রিচার্ড গাটম্যানের। ওঁর সঙ্গে কথা বলেই আমার ধারণা হয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে বেবি নামে যে মেয়েটি ভর্তি ছিল, সে আপনি হলেও হতে পারেন।'

'রিচার্ড গাটম্যানের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হয়েছিল?'

'রায়ানের র‍্যাঞ্চে। উনিও দেখলাম, এলসা গিনেসবেরির মিথ্যাচারণে বিরক্ত। ম্যাডাম, গুগল-এ আপনার প্রোফাইলে কেউ একজন লিখেছেন, আপনার পিঠ পুড়ে গেছিল, গোথেনবার্গে হ্যালোইন পার্টিতে ফায়ার ডান্সের সময়। আসলে কিন্তু তা নয়। গাটম্যানের ছবি কিন্তু অন্য প্রমাণ দিচ্ছে। আপনার পিঠ ঝলসে গেছিল, বম্ব ব্লাস্টে। ছবিটা ভাল করে দেখুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন।'

নিজের ছয় বছর বয়সের ছবিটার দিকে লিলি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। আতঙ্কিত মুখে তিনি ছুটে যাচ্ছেন নদীর পার দিয়ে। পিছনে ধোঁয়ার বিরাট কুণ্ডলী তাড়া করে আসছে। নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও বোমা পড়েছিল। সেই বিস্ফোরণের স্মৃতি হয়তো এখনও অবচেতন মনে রয়ে গেছে। তাই বিকট আওয়াজ শুনলেই ইদানীং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। ছবিটা দেখতে দেখতে লিলির চোখের কোণ ভিজে উঠল। এই সেই জায়গা, তাঁর সত্যিকারের জন্মভূমি। এই সেই মাটির ধুলো, যা তিনি ছোটবেলায় গায়ে মেখেছেন। বুকের ভিতর থেকে এক দলা আবেগে গলায় উঠে আসছে। স্বর রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই লিলি প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু ছবির এই মেয়েটাই যে আমি, তা কী করে প্রমাণ হবে?'

'ম্যাডাম, আমার এক বন্ধু চঞ্চল ঢাকায় খুব নামকরা রিপোর্টার। আমেরিকায় আসার আগে ওকে বেবি মেয়েটি সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছিলাম। প্রায় মাসদুয়েক খেটে ও মাত্র গতকালই আমাকে জানিয়েছে, বেবি মেয়েটাকে গোথেনবার্গে নিয়ে যাওয়ার সময় মিসেস গিনেসবেরি পাশপোর্টে ওর নাম দিয়েছিলেন লিলি। সবে বাংলাদেশ সরকার হয়েছে। তার উপর চিকিৎসা করানোর জন্য বেবিকে দ্রুত সুইডেনে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কেউ মেয়েটার নামবদল নিয়ে মাথা ঘামাননি। চঞ্চলের পাঠানো এই তথ্যটা হাতে আসার পর আমার অনুমানটা বিশ্বাসে গিয়ে দাঁড়ায়। সেটা আরও দৃঢ় হয়েছে, কম্পিউটার গ্রাফিক্সে বানানো এই ছবিতে। টু কাট ইট শর্ট, আপনিই পলাশভাইয়ের সেই হারিয়ে যাওয়া দিদি। আমার বিশ্বাসে অবশ্য কিছু এসে-যায় না। যতক্ষণ না আইন স্বীকৃতি দিচ্ছে।'

'এই ছবিটা কোথায় তোলা কালকেতু?'

'ঢাকার কাছাকাছি, আমোদপুরে। পলাশভাইয়ের দেশের বাড়ি। এ বার ঢাকায় গেলে আপনি নিশ্চয়ই জায়গাটা ঘুরে আসবেন। ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক যাদের, তারা কিন্তু আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছেন। তার

আগে, আপনাকে একটা অনুরোধ করব। আপনিই সেই শিউলি কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করান। পলাশভাইয়ের সঙ্গে যদি আপনার ডিএনএ ম্যাচ করে যায়, তা হলে বুঝব, আমার পরিশ্রম সফল হয়েছে।'

ঘরের বাইরে থেকে একসঙ্গে প্রচুর কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। লিলি ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। তিনি অফিসে থাকলে পিন পড়ার আওয়াজও পাওয়া যায় না। হঠাৎ কী হল? কথাটা মনে হতেই কাচের দরজায় বাম কিমের উল্লসিত মুখ। তাঁর পিছনে অফিসের বাকি সব কর্মী। বাম কিম বললেন, 'ম্যাডাম শিগগির টিভি খুলুন। স্টকহোলম থেকে এখুনি অ্যানাউন্সমেন্ট হল। শিশু কল্যাণের জন্য আপনাকে এ বার নোবেল পিস প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে।'

(ঊনপঞ্চাশ)

দুঃসংবাদটা কালকেতু পেল বেলা দশটায়। ফোনে কাঁদতে কাঁদতে হেমলতা ম্যাডাম বললেন, 'রোজিনা চইল্যা গেল কাইলকেতু।'

উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আছেন পলাশভাই। সবে ওঁরা একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করতে বসেছে। র‍্যাঞ্চ থেকে ফেরার পর এই প্রথম। পলাশভাই যেন শুনতে না পান, সেই কারণে কালকেতু উঠে বারান্দায় চলে গেল। তার পর ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন?'

'এই তো মিনিট দশেক আগে। কাইল হারা রাইত চিৎকার কইর‍্যা পলাশরে গাল পারতাসিল। আইজ থাইম্যা গেসে। আমার ফুলের মতো মাইয়াটা এইভাবে মরব, ভাবতেও পারি নাই। পলাশ কোথায়? ফোনডা হ্যারে দ্যাও। আমি জাইনতে চাই, হ্যায় গত দুইদিন হাসপাতালে আসে নাই ক্যান?'

শোকগ্রস্ত মায়ের হাহাকার। শুনতে মোটেই ভাল লাগছিল না। বিশেষ করে, পলাশভাইকে গালাগাল দেওয়ার কথা শুনে। ফোনটা পলাশভাইকে

এখন দেওয়া যাবে না। হেমলতা আন্টি হয়তো ওঁকে দু'চার কথা শুনিয়ে দিতে পারেন। তাই কালকেতু বলল, 'উনি এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি ম্যাডাম।'

'উইঠলে খবরডা দিও। আমরা বিকালের ফ্লাইটে রোজির বডি র‍্যাঞ্চে লইয়া যাম। ওখানেই গোর দিম। পলাশ যদি পারে, একবার য্যান হাসপাতালে আসে। হ্যার বিবেক যা কয়, কইরব।'

ফোন ছেড়ে দেওয়ার পর কালকেতু এসে ফের ব্রেকফাস্ট টেবলে এসে বসল। সঙ্গে সঙ্গে পলাশভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'ফোনডা হাসপাতাল থেইক্যা আইসিল, তাই না?'

ঘাড় নেড়ে কালকেতু বলল, 'হ্যাঁ। রোজিনা ম্যাডাম এক্সপায়ার করে গেছেন।'

'আপদ গেছে।' বিড়বিড় করে কথাটা বলে পলাশভাই কফির কাপটা হাতে তুলে নিলেন। চুমুক দিয়ে বললেন, 'এইবার দ্যাশে ফেরার সময় হইসে কাইলকেতুভাই। শিউলিদিদির সঙ্গে আফনে একবার কথা কইয়েন। হ্যায় যেইদিন ঢাকায় যাইব, আমরাও হেইদিন ফিরুম। আফনে কী ক'ন?'

কালকেতু বলল, 'তা হলে তো খুব ভাল হয়। দু'চার দিনের মধ্যে ডিএনএ পরীক্ষাটা করিয়ে নেওয়া যাক। রিপোর্টটা কালেক্ট করেই না হয় আমরা দু'জন মিস লিলির কাছে যাব।'

ব্রেকফাস্টে খাবার বলতে ব্রেড, বাটার, দুধ আর সেদ্ধ ডিম। কফি শেষ করে পলাশভাই ব্রেডে মাখন লাগাতে লাগলেন। দেখে কালকেতু একটু অবাকই হল। উনি একবারও জিজ্ঞেস করলেন না, রোজিনা ম্যাডাম কখন মারা গেলেন। গত পরশুদিন মেক্সিকান জ্যোতিষী সালিনাসের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে পলাশভাইকে অন্য রকম মানুষ বলে মনে হচ্ছে কালকেতুর। রাগে মুখ থমথম করছিল সেদিন। গাড়িতে উঠেই উনি বলেছিলেন, 'কারে বিশ্বাস করুম ক'ন তো ভাই। আফনে যারে আফনজন

মনে করতাসেন, হ্যায় পিছন থেইক্যা ছুরি মারতাসে। মানষের উফর বিশ্বাসই হারাইয়া গেল আইজ।'

ইমন তখন গাড়ি চালাচ্ছিল। তাই কোনও প্রশ্ন করার ইচ্ছে হয়নি কালকেতুর। পলাশভাই সহজ সরল টাইপের। হয়তো ইমনের সামনেই উগড়ে দিতেন, আপনজনটা কে, কেন মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়েছেন? হাসপাতালে যাওয়ার কথা ছিল। পলাশভাই সেখানে যেতে চাইলেন না। উল্টে, ইমনকে বললেন, 'চেলসির অ্যাপার্টমেন্টে আইজ যাম না। আমাকে নিউ জার্সিতে লইয়া চলো। ইসেলিনের বাংলোয় কাম আসে।' কেন জানে না, কালকেতুর মনে হয়েছিল, জ্যোতিষী সালিনাস পলাশভাইকে এমন কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যা শুনে মানুষটা একেবারে বদলে গেছেন। গত পরশুদিন থেকে উনি একবিন্দু মদ ছোঁননি। একবারও রোজিনা ম্যাডামকে নিয়ে হা হুতাশ করেননি। ইমনকে ঘরে ডেকে নিয়ে সারাদিন ধরে শুধু কম্পিউটারে মুখ গুঁজে রয়েছেন।

কাল সন্ধেবেলায় লিলি গডউইনের অফিস থেকে ফিরে আসার পর কালকেতু যখন সব খুলে বলে, এতদিন ধরে ওর পরিশ্রম সফল হওয়ার মুখে, তখন বিস্ময় ফেটে বেরোচ্ছিল পলাশভাইয়ের মুখ থেকে। উনি বলেছিলেন, 'লোগে ঠিগই কয়, এক কূল গেলে আরেক কূল পাওয়া যায়। এত বিরাট মাপের একডা মানুষ আমার শিউলিদিদি! ক'ন কী?' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উনি সব জানতে চেয়েছিলেন। লিলি ম্যাডাম ডিএনএ টেস্ট করতে রাজি হয়েছেন, শুনে পলাশভাই বলেছিলেন, 'উফফ, আমি যে বিশ্বাসই কইরতে পারতাসি না কাইলকেতুভাই। আফনে তো মিরাকল করসেন। মায়রে গর্ব কইর‍্যা কইসিলাম, কাইলকেতুভাই যহন কেসডা হাতে নিসেন, শিউলিদিদিরে খুঁইজ্যা বাইর কইরবেনই। অহন আমার বুড়া মায় যদি খবরডা হোনেন, তাইলে আনন্দে ফাগল হইয়া যাইব। আফনেরে আমি ছাড়তাসি না

কইলকেতুভাই। চলেন, শিউলিদিদিরে সাথে লইয়্যা হবাই ঢাকায় যাই। আফনে কিন্তু না কইরবেন না।'

ঢাকায় রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য লিলি অনাথ আশ্রম খুলতে চান জেনে, পলাশভাই লাফিয়ে উঠেছিলেন, 'ক'ন কী? হ্যারে কিছু কইরতে অইব না। আমি সাহায্য করুম। আমোদপুরে আমার একটা হাউসিং কমপ্লেক্স তৈরি হইয়া পইড়্যা আসে। শ'খানেক বিল্ডিং তো অইবই। শিউলিদিদিরে ক'ন, পুরা কমপ্লেক্স আমি হ্যার অনাথ আশ্রমের জন্য দান করুম। আফনে কাইল হকালেই হ্যার কাসে আমারে নিয়া চলেন।'

মিস গডউইন নোবেল পিস প্রাইজ পাচ্ছেন পলাশভাই কেঁদেই ফেলেছিলেন। তখনই গত দু'তিন দিন ধরে গুমড়ে থাকার কথাটা মুখ ফস্কে বলে ফেলেন। 'মি. সালিনাস তাইলে ঠিকই কইসিলেন। খুব শিগগির আফনে দুইডা খবর পাইবেন। একডা খুশির খবর। অন্যটা দুঃখের। কোনডা আগে হুনবেন, মনডা শক্ত কইর‍্যা লন। আমি কইলাম, দুঃখের খবরডা আগে ক'ন। মি. সালিনাস কইলেন, আফনের সব থেইক্যা প্রিয় মানুষ, আফনেরে এমন দাগা দিব, আফনে সুইসাইড করার কথাও ভাবতে পারেন। হ্যায় পিছন থেইক্যা ছুরি মারতাসে। আফনের ট্যাহাপয়সা গাপ কইর‍্যা দিতাসে। আফনে সতর্ক থাকেন।'

কালকেতু জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি রোজিনা ম্যাডামের কথা বলছেন? মি. সালিনাস বললেন, আর আপনি তা বিশ্বাস করে নিলেন?'

'তহনই বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু পরে মনে পড়সিল, ইমন আমারে কিন্তু ওয়ার্নিং দিসিল। র‍্যাঞ্চে ফোন কইর‍্যা আমারে কথাডা কইতে চাইসিল। কিন্তু, আমি হ্যারে ধমক দিসিলাম।'

'ইমন জানতে পেরেছিল কী করে?'

'আমাগো অ্যাকাউন্টস হ্যায় হ্যাক কইর‍্যা জানতে পারসিল। রোজিনা কী ডেঞ্জারাস মাইয়া হুনবেন? কাইল আফনে যহন এই বাসায় ছিলেন না, তহন

নিক বইল্যা যে সুইপার এহানে কাম করে, হ্যায় নিজে আইসিল ট্যাহা চাইতে। হালা অ্যালকোহলিক, ড্রাগ অ্যাডিক্ট বাস্টার্ড। কয় কি না, তুমি আমার ওয়াইফ রোজিনারে মাইর‍্যা ফেলার চেষ্টা করসো। অহনই হাজার ডলার দাও। নাইলে তোমার এগেইস্টে পুলিশের কাছে গিয়া কমপ্লেন করুম। আরও হুনবেন?'

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পলাশভাই আরও বলেছিলেন, রোজিনা ম্যাডাম না কি লকার থেকে নিকের ওয়েডিং রিং আনতে এই বাংলোতে পাঠিয়েছিলেন লারেইনাকে। সেই রিং আঙুলে পরে ম্যাডাম কবরে যেতে চান। বাংলোয় এসে লারেইনা শুধু রিং নেয়নি, পুরো লকার ফাঁকা করে পালাচ্ছিল। ইমন ওকে কায়দা করে পুলিশের হাত তুলে দিয়েছে। এতসব ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ কালকেতু কিছুই জানত না। যা বুঝতে পারছে, তাতে এখন পলাশভাই মারাত্মক রেগে আছেন ম্যাডামের উপর। এই অবস্থায় ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারছে না কালকেতু। কিন্তু, মুশকিলের কথা হল, লিলি ম্যাডামকে ও কথা দিয়ে এসেছে, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে হেমলতা আন্টির সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে।

পলাশভাই এখন কোনও কথা না বলে খেয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় ডোর বেলের আওয়াজ। উঠে গিয়ে দরজা খুলে কালকেতু দেখল, রেজওয়ানা দাঁড়িয়ে। ওর হাতে একটা প্যাকেট। বলল, 'গুড মর্নিং। পলাশছ্যার আছেন?'

কালকেতু বলল, 'হ্যাঁ। ভেতরে এসো।'

ব্রেকফাস্ট টেবলে গিয়ে পলাশভাইয়ের দিকে প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে রেজওয়ানা বলল, 'ছ্যার, রিপোর্টগুলান বাইর হইসে। আপনে যেভাবে কইছসিলেন, হেইভাবেই।'

'ইমনরে লইয়্যা খবরডা কবে ছাপসো?'

‘আজই ঢাকায় বাইর হইসে ছ্যার। এহনে আসার আগে ঢাকা থেইক্যা যা ফিড ব্যাক পাইলাম, খুউব ফেভারেবল। আফনের কথামতো খবরডা ফ্রন্ট পেজে ছাপা হইসে। এড্ডু দ্যাখবেন না হি?’

পলাশছ্যার আবার আগের মতো। স্নেহচ্ছলে বিরক্তি দেখিয়ে বললেন, ‘তোমার তো দেহি, কান্ডজ্ঞান বইল্যা কিসু নাই। এহানে ইন্ডিয়ার একজন টপমোস্ট জার্নালিস্ট প্রেজেন্ট থাইকতে, তুমি আমারে রিপোর্ট দ্যাখতে কইতাসো। কাইলকেতুভাই দ্যাখেন তো, কুসুম কীরম লিখসে?’

রেজওয়ানার ডাকনাম তা হলে কুসুম! ও একবার বলেছিল বটে, আমোদপুর গ্রামের সূত্রে পলাশভাইকে চেনে। ওর ডাকনামটা পলাশভাই জানতেই পারেন। রেজওয়ানা যুগযুগান্ত কাগজটা এগিয়ে দিতেই, কালকেতু দেখল, আটচল্লিশ পয়েন্টে হেডিং ‘সোনার বাংলার সোনার ছেলে।’ তার তলায় চোদ্দো পয়েন্টে লেখা ‘নিউ ইয়র্ক থেকে রেজওয়ানা চৌধুরী। তার নিচে ইমনের বড় একটা ছবি। খবরে দ্রুত চোখ বোলাল কালকেতু। গাজিপুরে জঙ্গিদের হাত থেকে কীভাবে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী বিলকিস বেগমের প্রাণ ইমন বাঁচিয়েছিল, তার বিস্তৃত বর্ণনা। বঙ্গবন্ধু ওয়ান গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনে যে ফিদাইন অ্যাটাক হতে পারে, সেই খবরটা বাংলাদেশ সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সকে প্রথম জানায় ইমন। মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার ইমন আমেরিকায় সামান্য একটা সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করে। মোটামুটি সব তথ্যই কালকেতুর জানা। রেজওয়ানা এমন সুন্দর ভাবে লিখেছে, বাংলাদেশে ইমনের জন্য সহানুভূতির বন্যা বইবে। একটা বক্স স্টোরিও আছে। পিএম বিলকিস বেগমের ইন্টারভিউ। উনি বলেছেন, ইমনকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। ওর জন্য সরকারি চাকরি অপেক্ষা করছে।’

কাগজটা টেবলে রেখে কালকেতু বলল, ‘খুব ভাল লিখেছ রেজওয়ানা। আমিও এত ভাল লিখতে পারতাম না। তোমাকে ফ্রুটজুস খাওয়ানো উচিত।’

শুনে পলাশভাই প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। বহুদিন পরে মানুষটার মুখে হাসি দেখতে পেল কালকেতু। পলাশভাই হাসি থামিয়ে বললেন, 'দেহো কুসুম, দেহো। বড় মাপের মাইনষেরাই হ্যায় কথা কইতে পারে। আমাগো দ্যাশে টালেন্ট কম নাই কাইলকেতুভাই। এই মাইয়াডারে আমি আমেরিকায় চাকরি দিয়া নিয়া আইসি। যুগযুগান্ত কাগজে আমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট শেয়ার আছে। আমারে যহন হ্যারা ফাইনান্স কইরতে কইল, তহন কুসুমের কথা আমার মাথায় ছিল। আমি কইলাম, ফাইনান্স করুম, যদি আমার গেরামের এক মাইয়্যারে আফনেরা রিপোর্টারের চাগরি দ্যান।'

ফ্রিজ থেকে ফ্রুটজুস নিয়ে এসে কালকেতু বলল, 'আপনি অনেকদিন ধরে চেনেন রেজওয়ানাকে?'

'হ্যার আববুরে চিনি ছোটবেলা থেইক্যা। বসরে এক দুইবার আমোদপুরে গেরামে যাই। তহন সবার সাথে দেখা হয়। হ্যার আববু একদিন কইসিল, মাইয়া বাংলায় এমএ পরীক্ষায় ফার্স্ট হইসে। আফনের এতবড় বিজনেস। একডা কোথাও চাকরি দ্যান। আমার ইমপোর্ট কোম্পানিতে আফতাবের কথা তো আফনে হুনসেন। হ্যার ডিপার্টমেন্টে দিম ভাবসিলাম। কিন্তু আফতাব কুসুমরে চিনত। ও-ই কইল, ছ্যার কুসুম ভালা কবিতা ল্যাখে। হ্যায় ল্যাখালেখির কাম পাইলে খুশি অইব।'

উল্টোদিকে চেয়ারে বসে রেজওয়ানা মিটিমিটি হাসছে। হালকাভাবেই কালকেতু জিজ্ঞাসা করল, 'পলাশভাই, ইমনকে আমেরিকায় আনার পিছনেও কি আপনি?'

'না। আহাম্মকডা শখ কইর‍্যা জিহাদি হইসিল। আমাগো গেরামের পোলা। হ্যার দাদামশয় মণিরুল সাহেবরে চিনতাম। অনেকেই কইত, ইমনের মতো ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট একশো মাইলের মধ্যে নাই। ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। একদিন হুনি, ফরেনে চাকরি লইয়্যা পোলাডা চইল্যা গেছে। আমাগো দ্যাশেও ভালা ভালা পোলা মাইয়ারা কেউ দ্যাশে থাইকতে

চায় না। আফনেগো দ্যাশের মতোন প্রবলেম। ইমন আমারে চিনত না। কিন্তু হ্যার কথা আমি প্রথম জাইনতে পারি, দুবাইয়ে আমি কিডন্যাপড হওয়ার পর। রফিকুল নামে এক জিহাদি দুবাইয়ে হ্যার কথা আমারে কইসিল। শুইন্যা আমি তো অবাক। অত বড় একডা বংশের পোলা শ্যাষে কী দুখখে জিহাদি হইল?'

'ওর সঙ্গে কি আপনার দুবাইতে দেখা হয়েছিল?'

'না মশয়। হ্যার খোঁজ নিতে আমারে কইসিল আফনের সামনে যে মাইয়াডা বইস্যা আসে, হ্যার আববু। আরে, পোলাগুলার আক্কেল দ্যাহেন কাইলকেতুভাই। জিহাদিই যহন হইবি মনস্থির করছস, তহন প্রেম করতে গেলি ক্যান। আমি তো বুঝি না। কুসুমের আববু একদিন আমার ঢাকার বাসায় আইস্যা কইল, আমার মাইয়ারে বাঁচান পলাশ মিঞা। মাইয়া নাওয়া-খাওয়া ছাইড়া দিসে। কী, তোমাগো লাভ স্টোরি আমারে কইতে অইব, না হি তুমি কইব্যা কুসুম?'

লজ্জায় মাথা নিচু করল রেজওয়ানা। পলাশভাই ফের বলতে শুরু করলেন, 'ইমনের খোঁজ দিসিল হ্যার দলের মাইনষেরাই। বাংলাদ্যাশের জামাইতিরা আমারে মাসকয়েক আগে আমারে ফোন কইর‍্যা কইল, ইমন কানাডা থেইক্যা আমেরিকায় গেসে একটা অপারেশন করতে। লাকিলি, হ্যায় আমার চোখেও পইড়্যা গেল, নায়গারা ফলস দ্যাখতে গিয়া বাফেলোর যে হোটেলে আমরা উঠসিলাম, সেহানে। তার পর হ্যায় নিজেই আইস্যা যোগাযোগ করে নিউ ইয়র্ক আসার পথে রেস্ট এরিয়ার ক্যাফেটোরিয়ায়। মুখ দেইখ্যাই মনে হইসিল, কষ্ট আর আতঙ্কের মধ্যে আসে। আমি ইচ্ছা কইর‍্যা হ্যারে আমার নেমকার্ড দিসিলাম। জানি, কামডা ভালা করি নাই। কিন্তু, এই মাইয়াডার মুখের দিকে তাকাইয়া আমারে কইরতে হইসিল। অহন আমার একডাই কাম বাকি। আহাম্মকডারে দ্যাশে নিয়া যাওয়া।'

রেজওয়ানার কাছে ফোন এসেছে। ও উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে। এমন সময় ফের ডোর বেল বাজার শব্দ। হাসপাতাল থেকে হেমলতা আন্টিরা কেউ এলেন না কি? কালকেতু দরজা খুলে দেখে, ইমন। আজ কোট প্যান্ট পরে বেশ সেজেগুজে এসেছে। খুব বিনীতভাবে বলল, 'ছ্যার আমারে আইতে কইসিলেন।'

ভিতরে ঢুকে পলাশছ্যারকে দেখে ইমন খুব কুণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'আমারে কোথায় যাইতে অইব না হি ছ্যার?'

'তোমার মুখে আর কোনও কথা নাই ইমন।' হঠাৎ ধমকে উঠলেন পলাশভাই। 'যহনই দেখা হয়, তুমি জিগাও, কোথায় যাইতে অইব না হি ছ্যার। তোমারে যা কইর‍্যা আনতে কইসিলাম, আনসো?'

'আনসি ছ্যার।' বলে পকেট থেকে একটা পেন ড্রাইভ বের করে ইমন এগিয়ে দিল। বলল, 'হ্যার মধ্যে সব হিসাব নিকাশ আছে। আফনের কী গেসে, আর কী আসে...সব ইনফর্মেশন।'

'হোনো, তোমার আম্মু কাইল আমারে ফোন করসিলেন। তুমি নাহি সুটি পাইলে ফতেমার নিকাহতে দ্যাশে যাইতে চাও? তোমারে আমি সুটি দিলাম।'

ইমনের মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও বলল, 'আম্মি আফনের নাম্বার পাইল কোত্থেকা ছ্যার?'

পলাশভাই ফের ধমকে উঠলেন, 'হারামজাদা, তুমি কি মনে করো, আমোদপুরে আমার আর কেউ নাই? হুইনা রাখো, তোমার দাদামশয় মণিরুল সাহেবরে আমি ভালা কইর‍্যা চিনতাম। আমার আববু যহন গারমেন্টস ফ্যাক্টরি স্টার্ট করেন, তহন তোমার দাদামশয় হ্যারে এক লাখ ট্যাহা লোন দিসিলেন। তহন থেইক্যা তোমার ফেমিলির হবাই রে আমি চিনি। তুমি আমারে দেহো নাই, হোস্টেলে পড়াশুনা করতা বইল্যা। জিহাদি

অইবার স্বপ্ন দেখসিলা। অহন মোহভঙ্গ হইসে তো? চলো, দ্যাশে ফিইর্য চলো।'

'কিন্তু আমি দ্যাশে ফিরুম কী কইর‍্যা? আমার উপায় নাই ছ্যার। জিহাদিরা আমারে ছাইড়ব না।'

'হেইডা আমার উফর ছাইড়্যা দাও। লজ্জা করে না তোমার? আববুর এহন-তহন অবস্থা। ফতেমার বিয়া হইয়া গেলে তোমার আম্মুরে দ্যাখব কে? দ্যাশে চলো, তোমার বিয়াও ওই একই দিনে দিম আমি। তোমার আম্মি হব ব্যবস্থা কইরা রাইখব কইসে।'

'ছ্যার, ফিইর‍্যা গেলে দ্যাশের পুলিশ আমারে অ্যারেস্ট কইরব।'

ফের ধমকে উঠলেন পলাশভাই। টেবল থেকে তুলে যুগযুগান্ত কাগজটা এগিয়ে দিয়ে উনি বললেন, 'ছবিটা চিনতে পারতাসো তো? বারান্দায় গিয়া ল্যাখাডা পড়ো। কেউ তোমারে অ্যারেস্ট কইরব না।'

পলাশভাই এ বার উঠে দাঁড়ালেন। তার পর বললেন, 'চলেন কাইলকেতুভাই। শিউলিদিদিরে বাসা থেইক্যা তুইল্যা একবার হাসপাতালে যাই। গিয়া দেহি, হ্যামলতা আন্টি হ্যারে চিনতে পারেন কি না। ততক্ষণ ইমন বলদডা বোঝাপড়া কইর‍্যা নিক কুসুমের সাথে। আমাগো থাকার দরগার নাই।'

অবাক কাণ্ড, কথাটা বলে ইয়াং ছেলেদের মতো পলাশভাই চোখ টিপলেন।

(পঞ্চাশ)

চোখের পাতা বুঁজে আছেন অনেকক্ষণ ধরে। অথচ ঘুম আসছে না। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে লিলি ঢাকায় যাচ্ছেন। একা নন, বিজনেস ক্লাসে তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে আছেন। মি. বাম কিম, পলাশ, কালকেতু, ইমন, রেজওয়ানা, মার্থা, সেও ইয়ুন ছাড়াও তাঁকে ঘিরে আছেন বাংলাদেশ

সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের তিনজন অফিসার, ডা. কিংসফোর্ড আর ডা. সুধা রামচন্দ্রন। ডিনারের পর বিমানের আলো নিভিয়ে দিয়েছেন ফ্লাইট অ্যাসিসট্যান্টরা। ঢাকা পৌঁছতে এখনও ঘণ্টা চারেক বাকি। যাত্রীরা প্রায় সবাই ঘুমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। নাক ডাকার আওয়াজ শুনে লিলি একবার উল্টো দিকের কিউবিকলে তাকিয়ে দেখলেন, শব্দদূষণটা করছে পলাশ। বোধহয় বহুদিন পরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। তাঁর আপনভাই! মানতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। এতদিন যাকে চিনতেনই না, তাকে প্রথম প্রথম ভাই বলে মানতে তো একটু অসুবিধে হবেই।

রাত ন'টার সময় হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে যখন প্লেনটা টেক অফ করে, তখনই ককপিট থেকে পাইলট যাত্রীদের বলেছিলেন, 'আমরা সৌভাগ্যবান, আজ আমাদের এই ফ্লাইটে একজন নোবেল লরিয়েট যাচ্ছেন। নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের তরফ থেকে আমরা মিস লিলি গডউইনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' সঙ্গে সঙ্গে হাততালির বন্যা বয়ে গেছিল প্লেনে। লিলি প্রথমে অ্যানাউন্সমেন্টটা শোনেননি। তখন তাঁর মাথায় ঘুরছিল মোজাম্বিকের আর্ত শিশুদের কথা। মরিশাস থেকে তাঁর পাঠানো ত্রাণসামগ্রীর জাহাজ আজ সকালে বেইরা বন্দরে পৌঁছেছে। কিন্তু তার পর না কি লুটপাট হয়ে গেছে। তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের নিয়ে এই সমস্যা। ধৈর্যের অভাব, তার ফলে অশান্তি, অরাজকতা। খবরটা শোনা ইস্তক মন খারাপ লিলির। যাদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী পাঠালেন, তাদের হাতেই পৌঁছল না।

ফ্লাইট অ্যাসিসট্যান্টদের একজন গোলাপের তোড়া হাতে দিয়ে যাওয়ার পর লিলি বুঝতে পারেন, তাঁকে দেখার জন্য যাত্রীরা খুব উৎসুক। বেশিরভাগই বাংলাদেশি, লন্ডন থেকে দেশে ফিরছেন। কয়েকদিন আগে হয়তো কাগজে খবরটা পড়েছেন। পিছন থেকে অনেকেই এসে তাঁকে দেখে গিয়েছেন। হাত মিলিয়েছেন, অটোগ্রাফ নিয়েছেন, সেলফি তুলেছেন। ডিনার সার্ভ করার পর উৎসাহটা অবশ্য কমেছে। রেজওয়ানা বলছিল, তিনি যাচ্ছেন

বলে ঢাকাতেও প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস। মহম্মদ ইউনিসের পর তিনিই না কি দ্বিতীয় নোবেল লরিয়েট যাঁর জন্ম বাংলাদেশে। দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর পর ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসছেন। পিএম বিলকিস বেগম গণসংবর্ধনার আয়োজন করেছেন রমনা ময়দানে। সংসদ ভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শিশু কল্যাণ নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। রাতারাতি আমোদপুর গ্রাম না কি এখন বিখ্যাত বাংলাদেশে।

ডিএনএ রিপোর্ট মিলে যাওয়ার পর পলাশের পাগলামিরও শেষ নেই। ব্যাবসার কাজ ছেড়ে মাসখানেক ধরে তাঁর অ্যাকোয়াটিকা রেসিডেন্সির বাড়িতে বেচারি ছুটে ছুটে এসেছে। ঢাকার আইটেনারি ঠিক হয়ে যাওয়ার পর পলাশ একদিন তাল তুলল, 'দিদিভাই, আমার অনুরোধ, আফনে দ্যাশে যাইবেন শাড়ি পইর‍্যা। কুসুম আফনেরে শিখাইয়া দিব, ক্যামন কইর‍্যা শাড়ি পরতে হয়। আগে থেইক্যা প্রাকটিস কইর‍্যা রাখেন। তাইলে দ্যাশে গিয়া নিজেরে ক্যারি করতে পাইরবেন।' ওর আবদার শুনে লিলি হাসতে শুরু করেছিলেন তখন। সত্যিই, এথনিক পোশাকের মর্যাদাই আলাদা। তাঁতের শাড়ি পরে রোকেয়া যখন দেখা করতে আসত, তখন ওকে বেশ ভাল লাগত। দিন চারেকের মধ্যে পলাশ কোত্থেকে গোটা দশেক জামদানি শাড়ি এনে হাজির করেছিল। সেইসঙ্গে গলাবন্ধ ব্লাউজ। প্রথমদিন রেজওয়ানা শাড়ি পরিয়ে দেওয়ার পর নিজেকে আয়নায় দেখে লিলি চমকে গেছিলেন। এত সুন্দর লাগছিল তাঁকে দেখতে।

হালকা নীল রঙের কারুকার্য করা জামদানি শাড়ি পরে প্লেনে উঠেছেন লিলি। না, একটু শীত শীত করা ছাড়া তাঁর কোনও সুবিধে হচ্ছে না। মার্থা একজন ফ্যাশন ডিজাইনারকে ধরে এনেছিল। ঢাকার আবহাওয়া বিচার করে, সে ঠিক করে দিয়েছে, কোন অনুষ্ঠানে তিনি কী পরবেন। মার্চের প্রথম সপ্তাহ। কালবৈশাখী না হলে, কোনও কোনও দিন নাকি ঢাকায় বেশ গরম লাগতে পারে। ঘাম হলে খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়বেন লিলি। তখন পিঠের

সুড়সুড়ানি বেড়ে যায়। ডা. কিংসফোর্ডকে এই কারণেই সঙ্গে এনেছে পলাশ। ডাক্তারি তো করবেনই, তা ছাড়া ভদ্রলোক খুব অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। পলাশ ওঁকে খৈয়াছড়ায় ঝরণা দেখাতে নিয়ে যাবে, হিচ হাইকিং করে। আমেরিকানরা এমন হুজুগেও হতে পারেন। এদিকে, কালকেতু একদিন কথায় কথায় বলেছিল, ম্যাডাম, শাড়ির সঙ্গে হাই হিল জুতোয় স্বচ্ছন্দবোধ করবেন না। তাই রেজওয়ানা শহরের ইন্ডিয়ান পাড়ায় গিয়ে ওয়েজ হিল জুতো কিনে এনেছে। আপাতত, সেটাই রয়েছে তাঁর পায়ে।

লিলির মনেই হচ্ছে না, তিনি নতুন কোনও জগতে যাচ্ছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝে গেছেন, পলাশ আর ওর চারপাশের মানুষগুলো কী কেয়ারিং। সবসময় যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়েই বসে আছে। ঘণ্টা দশেক আগে, হিথরোর এয়ারপোর্টে বসে গল্প করছিল কালকেতু। দলের একটা ছেলেটাকে দেখিয়ে ও বলেছিল, 'এর সঙ্গে কেউ কি আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ম্যাডাম? একে চেনেন?'

লম্বা, সুঠাম শরীরের ছেলেটাকে আগেও দেখেছেন লিলি। সবসময় কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে থাকে। পলাশের গাড়ি চালাতেও দেখেছেন তিনি মাঝে মধ্যে। লিলি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কে এই ছেলেটি?'

কালকেতু যা বলেছিল, তাতে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠেছিল লিলির। ইমন বলে এই ছেলেটা না কি একটা সময় জিহাদি ছিল। ও-ই প্রথম জানতে পারে, তাঁর ফাউন্ডেশনের টয় ডিভিশন থেকে প্রচুর অর্থ সরানো হয়েছে। পাল্টা হ্যাকিং করে সেই অর্থ আবার ফিরিয়েও এনেছে সে। ঈশ্বর না চাইলে এমনটা হতে পারে না কি? ছেলেটাকে ধন্যবাদ দেবেন বলে লিলি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগ পাননি। এয়ারক্রাফটে ওঠার পর ইমন আইল-এর একটা সিটে বসে পড়েছে। টয়লেটের খুব কাছাকাছি। ঘাড় ঘুরিয়ে লিলি ওকে দেখতে পাচ্ছেন। একটু আগেও ছোট আলোটা জ্বালিয়ে,

ও একটা বই পড়ছিল। ডেইল কার্নেগির লেখা, লার্নিং ফ্রম মিসটেকস। এখন আলো বন্ধ করে দিয়ে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

অন্য সময় লিলি যখন দূর পাল্লার কোনও ফ্লাইটে ওঠেন, তখন একটু বেশি পরিমাণেই রেড ওয়াইন খেয়ে নেন। চট করে চোখের পাতা বুঁজে আসে। কিন্তু এ বার নানা ভাবনা ঘুম আসতে দিচ্ছে না। সময় কাটানোর জন্য ইয়ারফোন লাগিয়ে কোনও সিনেমা দেখার ইচ্ছেটাও তিনি অনুভব করলেন না। মৃদু আলোয় সঙ্গী যাত্রীদের দিকে ফের একবার তাকালেন লিলি। কম্বল জড়িয়ে সবই ঘুমোচ্ছেন। পলাশের নাক ডাকা আপাতত বন্ধ। বেচারি আর কোনওদিন আমেরিকায় ফিরবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু এখন ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, যেন যুদ্ধজয় করে ফিরছে। রোজিনার কথাও ওর মনে নেই। বেশ কয়েকবার পলাশ বলেছে, 'আমার আর চাওনের কিছু নাই দিদিভাই। আফনেরে খুঁইজ্যা পাইসি, ব্যস। মায়ের মুখে হাসি ফুটসে। আর জীবনে কী চাই, কয়েন?'

গত কয়েকদিন ধরে পলাশ পরিবারের সবাইয়ের সম্পর্কে আন্দাজ দিয়েছে। গর্ভধারিণী মায়ের বয়স এখন পঁচাত্তর বছর। তাঁর সঙ্গে কথাও বলিয়ে দিয়েছে পলাশ। আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে মা কী বলছিলেন, লিলি অর্ধেক কথাই বুঝতে পারেননি। তবে, আক্ষেপের সুর ধরা পড়ছিল প্রতি কথায়। আমোদপুরে বোমা পড়ার পর তাঁর দুই ভাই ও এক বোনের মৃতদেহ না কি পাওয়া গেছিল নদীর পারে। কিন্তু মারাত্মক ভুল হয়েছিল সেদিন, বর্ডার পেরনোর তাড়ায় তাঁর খোঁজে পরিবারের কেউ হাসপাতালে যাওয়ার কথা ভাবেননি। কথায় কথায় মা আরও বলছিলেন, 'তর জইন্য আমসত্ত্ব আর নাইরকেল নাড়ু বানাইয়া রাখুম বড়কি। তুই খাইতে ভালবাসতি। তর হয়তো মনে নাই। কিন্তু আমি ভুলি নাই। তুই আমার প্রথম সন্তান। তরে ভুলুম কী কইর‍্যা? যত হিগগির পারস, দ্যাশে আয় মা।'

নারকেল নাড়ুর কথায় এখন হেমলতা আন্টিকে মনে পড়ছে লিলির। কোড়ানো নারকেলের মাঝে ভাজা ক্ষীরের বড়ির পুর দিতেন আন্টি। গোথেনবার্গে তো বটেই নিউ ইয়র্কেও করে খাইয়েছেন অনেকদিন। আন্টি বলতেন, টাট্টিসারের নাড়ু। খেতে দারুণ লাগত তখন। সেই হেমলতা আন্টির সঙ্গে চল্লিশ বছর পর ফের দেখা হল প্রেসবাইটেরিয়ান হসপিটালে। কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতিতে, যখন মেয়ের শোকে উনি পাথর। তবুও, চিনতে পেরে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন আন্টি। সবার সমানে বলেও ফেলেছিলেন, 'মামণি, এলসা ডাইনিটা তর উফর এত অত্যাচার করসে, শাস্তি একদিন ঠিকই পাইব। আমার আইজ দুঃখ করনের কিছু নাই। এক মাইয়া চইল্যা গেল, আরেক মাইয়ারে ভগবান ফিরত আইন্যা দিল।' রোজিনার কফিন তৈরি হওয়ার আগে অনেকক্ষণ ধরে ঢাকার হাসপাতাল আর আমোদপুরের গল্প করেছিলেন হেমলতা আন্টি।

যেন চোখের সামনে আমোদপুর গ্রামটাকে দেখতে পাচ্ছেন লিলি। কালীপুজোর সন্ধে। সাদা-লাল ডুরে শাড়ি পরে তিনি কালীমন্দিরের দিকে যাচ্ছেন। সঙ্গে পিঠোপিঠি দুই ভাই ও এক বোন। দূর থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। পুজো শুরু হবে রাতে, শেষ হবে ভোরবেলায়। বছরের এই একটা দিনই বাসার বাইরে রাত কাটানোর সুযোগ। পুজোর জোগাড়ে মা-কাকিরা ব্যস্ত। হাজার একটা মাটির প্রদীপ সাজানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে। বাবা-কাকারা ফানুস ওড়াচ্ছেন। কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া আতসবাজি পোড়াচ্ছেন। এর পরই তাঁরা ভিড় করবেন চাতালের মাঝে হাড়িকাঠের সামনে। ছাগবলি শুরু হয়ে যাবে। রক্তের স্রোত নালা বেয়ে ভেসে যাবে নদীর দিকে। লিলির সতর্ক চোখ ভাই-বোনদের দিকে। মা বলে দিয়েছেন, ওদের সামলে রাখতে। কেউ যেন জ্বলন্ত প্রদীপের ধারে-কাছে না যায়।

ভাইবোনদের কালীদর্শন করাচ্ছেন লিলি। গর্ভগৃহের দরজাটা হাট করে খোলা। হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোয়, বাইরে থেকে মা কালীর জিভের দিকে

তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। মায়ের হাতে নরমুণ্ড ঝোলানো। দেখে নিজে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। ভাইবোনদেরও হাতজোড় করে দাঁড়াতে বললেন। ঠিক সেইসময় মন্দিরের রোয়াক থেকে দাড়ি-গোঁফওয়ালা ভবা পাগলা তাঁকে দেখে বলে উঠল, 'দেইখ্যা নে। শ্যাষবারের মতো মায়রে দেইখ্যা নে। কেউ তোরা বাঁইচ্যা থাকবি না। ভয়ংকর দুর্দিন আইতাসে।' কথাগুলো বলে হুঙ্কার দিয়ে ভবা পাগলা রোয়াক থেকে লাফ দিয়ে নামল। তার পর চিৎকার করতে করতে নদীর দিকে ছুটে গেল। ভবার পাগলামি দেখে থরথর করে কাঁপছিলেন লিলি। পুজোর কাজ ছেড়ে এসে মা জড়িয়ে ধরেছিলেন ওকে। ভবা পাগলা যা বলে, তা না কি সত্যি হয়ে যায়। সঙ্গেসঙ্গে পূজোর আসরে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছিল। পাকিস্তানি সেনারা ঢাকায় গুলিগোলা চালাচ্ছে। ওরা কি আমোদপুরেও ঢুকবে?

সত্যিই এল সেই ভয়ংকর দিন। সকালে নুরুল চাচা বাসায় এসে বাবাকে বলল, 'হুনতাসি পাকিস্তানি সোলজাররা আমাগো গেরামে বোমা ফেলতে আইব। চৌধুরীদাদা, আফনেরা যত হিগগির পারেন কালী মন্দিরে গিয়া আশ্রয় লন। গেরামের হগলরে খবরডা আমি গিয়া দিতাসি।' কথাটা বলে নুরুলচাচা দৌড়ে বেরিয়ে গেছিলেন। সঙ্গেসঙ্গে মা-ঠাকুরমারা উলু দিতে শুরু করেছিলেন। মনে পড়ছে, খুঁটিনাটি সব মনে পড়ছে লিলির। সেই উলুর আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছিল এক বাসা থেকে অন্য বাসায়। অর্থাৎ কি না, সতর্ক হও, বিপদ আসছে। দুপুরের মধ্যে গেরামের সবাই গিয়ে উঠেছিলেন কালীমন্দিরের চাতালে। বাবা-কাকাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, দেশে থাকা নিরাপদ হবে না। সেইসময় হঠাৎ আকাশ চিরে গর্জন। বোমা ফেলার জন্য পাকিস্তানের প্লেন আসছে। নুরুলচাচাই চিৎকার করে সবাই পালাতে বলেছিলেন নদীর দিকে। তার পরেই বিশাল আওয়াজ করে, প্রথম বোমাটা ফেটেছিল কালীমন্দিরের কাছে। কানে তালা লেগে গেছিল লিলির। সারা শরীরে জ্বলন অনুভব করেছিলেন তিনি।

হঠাৎ ধুপ করে একটা শব্দ কানে এল। চোখটা লেগে এসেছিল। চোখ খুলে লিলি দেখলেন, আমোদপুর নয়। তিনি প্লেনেই বসে আছেন। শব্দটা কোত্থেকে এল, বোঝার জন্য তিনি এ দিক ওদিক তাকালেন। তখনই মৃদু আলোয় লিলি অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলেন। টয়লেটের কাছে দু'জন ধস্তাধস্তি করছে। একজনের হাতে সিরিঞ্জের মতো কিছু একটা আছে। তার সেই হাত মুচড়ে ধরেছে অন্য একটি লোক। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় তলপেটে লাথি মেরে সে সিরিঞ্জধারীকে টয়লেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। টয়লেটের ভিতরে ফের ধপাস করে একটা শব্দ। মারমুখী লোকটার মুখ দেখতে পাচ্ছেন না লিলি। বাইরে থেকে টয়লেট লক করে লোকটা মেঝেতে পড়ে থাকা সিরিঞ্জ, কম্বলে জড়িয়ে তুলে নিল। তার পর লম্বা পা ফেলে হেঁটে আসতে লাগল তাঁর দিকে। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেললেন লিলি। ফ্লাইটে যে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটতে পারে, তা কোনওদিন ভাবতেও পারেননি। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকটা কী যেন বলে গেল। লিলির মনে হল, লোকটা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে বলল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এত বড় ঘটনাটা। তিনি কি সত্যিই দেখলেন বা শুনলেন? না কি স্বপ্নের ঘোরে ছিলেন? এই তো একটু আগে তিনি আমোদপুরে কালীপুজো দেখতে পাচ্ছিলেন! ঢাকের আওয়াজ, প্রদীপের আলো, ফানুসের উড়ে যাওয়া, বোমা পড়া... সব। চোখ খোলার পর সব উধাও। এটা কি একটু বেশি রেড ওয়াইন পেটে যাওয়ার কুফল? লিলি নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগলেন এই বলে, না, না, টয়লেটের সামনে কিছুই ঘটেনি। কিন্তু, একবার নয়, দু'দু'বার শব্দটা হয়েছিল। লিলি দ্বিধায়, সত্যিই হলে, অন্য কেউ তা শুনতে পেলেন না কেন? বিশেষ করে ফ্লাইট অ্যাসিসট্যান্টরা। টয়লেটের ডান দিকে দু'হাতের মধ্যেই ওরা বসেন। মারপিট হলে সর্বপ্রথমে ওঁরা টের পেতেন। উত্তেজনা প্রশমনের জন্য লিলি গভীর নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। একটা কথা তিনি বুঝতে পারলেন না, কিছু

যদি হয়েই না থাকে, তা হলে একটু আগে কম্বলে ঢাকা লোকটা কেন তাঁর উদ্দেশে বলে গেল, 'আর কোনও ভয় নাই।' ওই লোকটাই বা কে?'

মানুষটার আশ্বাসেই হোক অথবা প্রাণায়ামের কারণে, লিলি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন। কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন, জানেন না। চোখ খোলার পর তিনি দেখতে পেলেন, বাম কিম তাঁর কিউবিকলের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন সেও ইয়ুনের সঙ্গে। আর কুণ্ঠিত মুখে মাথা নীচু করে তা শুনছে কোরিয়ান মেয়েটা। প্লেনের আলো সব জ্বলে উঠেছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভোর হয়ে গেছে। টয়লেটের সামনে একটা ছোটখাটো ভিড়। প্রায় সবাই তাঁর সফরসঙ্গী। ঘুম জড়ানো চোখে লিলি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে মি. কিম?'

বাম কিম বললেন, 'কাল রাতে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেছে মিস গডউইন। আমরা জানতামই না, স্ট্যানলি গর্ডন এই ফ্লাইটে আমাদের সঙ্গে ট্রাভেল করছে।'

স্ট্যানলি গর্ডন! মানে... এই মাসখানেক আগেও যে তাঁর সিকিউরিটি গার্ড ছিল? সে কেন ঢাকায় যাচ্ছে, লিলি প্রথমে বুঝতে পারলেন না। প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই বাম কিম বললেন, 'ম্যাডাম, আপনাকে আগেই বলেছিলাম, স্ট্যানলি চাকরি ছেড়ে দিয়ে মিচিগানে গিয়ে মুসলিম হয়েছিল। তখন থেকেই এফবিআই ওর উপর নজর রাখছিল। আপনাকে বলা হয়নি, স্ট্যানলি আইএস জিহাদিদের দলে যোগ দিয়েছে। আমার সন্দেহ, এই ফ্লাইটে ছদ্মবেশে ওকে পাঠানো হয়েছিল, কাউকে খুন করার উদ্দেশে।'

চমকে উঠে লিলি বললেন, 'ছদ্মবেশে মানে?'

'যাতে আমরা কেউ ওকে চিনতে না পারি। এই বিজনেস ক্লাসেই একেবারে পিছনের কিউবকলে ও বসেছিল। এক গাদা দাড়ি-গোঁফওয়ালা বৃদ্ধের সাজে। রাতে ওকে দু'একবার আমি দেখেওছি, স্টিকে ভর দিয়ে আপনার সিটের পাশ দিয়ে টয়লেটে যেতে। কিন্তু ওকে চিনতে পারিনি।

একবার মনেও হয়েছিল, লোকটা ঘনঘন টয়লেটে যাচ্ছে কেন? তখন ভেবেছিলাম, হয়তো সুগারের রোগী। কিন্তু ও যে স্ট্যানলি, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি।'

'ও কি গান ক্যারি করছিল?'

'না ম্যাডাম। স্টিকের ভিতর লুকিয়ে সিরিঞ্জ নিয়ে এসেছিল। তাতে হাইডোজের ইনসুলিন ভরা ছিল। ইনজেকশন দিয়ে কাউকে মেরে ফেলত। যে ওর টার্গেট ছিল, সে বোধহয় অনেক রাত অবধি জেগে ছিল। তাই ইনজেকশন পুশ করার সুযোগ পায়নি। ঘুমিয়ে পড়লে সে টেরও পেত না।'

শুনতে শুনতে লিলি শিউরে উঠলেন। তা হলে, জিহাদিরা এখনও তাঁর এবং কালকেতুর পিছু ছাড়েনি! তার মানে, কাল রাতে টয়লেটের সামনে যে দৃশ্য তিনি দেখেছিলেন, স্বপ্নের ঘোরে নয়, সেটা বাস্তব। কোনও রকমে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'স্ট্যানলি ধরা পড়ল কী করে?'

'সেটাই জানার চেষ্টা করছেন বাংলাদেশের সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের অফিসাররা। ওর সঙ্গে কথা বলছেন। টয়লেটের ভিতর অজ্ঞান অবস্থায় ও পড়েছিল। ম্যাডাম, এই স্ট্যানলি আপনার কিন্তু খুব ক্ষতি করেছে। এফবিআই অফিসারদের কাছ থেকে শুনেছি, এলসা গিনেসবেরিকে ও নিয়মিত আপনার সম্পর্কে খবর সাপ্লাই করত। আপনার কি মনে পড়ছে, নায়গারায় শ্যুট আউটের সময় ও আপনার ধারে কাছে ছিল না? এফবিআই অফিসাররা আমাকে বলেছেন, স্ট্যানলির সঙ্গে জিহাদিদের যোগাযোগ করিয়ে দেন এলসা গিনেসবেরিই। সেই কথা জেনে ওর বউ ওকে ছেড়ে চলে গেছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, স্ট্যানলি আজ আপনাকে খতম করার একটা শেষ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কে আপনাকে বাঁচালেন, জানি না।'

'আমি জানি দিদিভাই।' বলতে বলতে পলাশ কাছে এসে দাঁড়াল। ইমন বলে ছেলেটাকে ও ধরে এনেছে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে লিলি চমকে উঠলেন। ডানদিকের চোয়াল অস্বাভাবিক ফুলে রয়েছে। সেইসঙ্গে

রক্তক্ষরণের চিহ্নও স্পষ্ট। ইমনকে দেখিয়ে পলাশ বলল, 'স্ট্যানলি আফনেরে মারার জন্য আসে নাই দিদিভাই। হায় এই আহাম্মকরে খুন করতে চাইসিল। গদ্দারির শাস্তি দিব বইল্যা। বলদডা আমাগো কাউরে ডাকে নাই। দ্যাহেন, কী রিস্ক নিসিল। কাইল রাতে স্ট্যানলি যহন হ্যারে ইনজেকশন পুশ করতে যায়, তহন ইডিয়েটটা ফাল দিয়া উইঠা পড়ে। স্ট্যানলিরে আচ্ছা শিখখা দিসে। এমন রদ্দা মারসে, উইঠ্যা দাঁড়ানোর ক্ষমতা নাই। শূয়ারডার তহন মনে নাই, আর কয়দিন বাদে বিয়ার পিঁড়িতে দাঁড়াইব। দ্যাহেন, মুখের কী অবস্থা করসে। এয়ারপোর্টে হ্যার আম্মিও চিইনতে পাইরব না।'

কাল রাতের সেই মানুষটা তা হলে ইমন। যে নিশ্চিন্তে ঘুমোনোর পরামর্শ দিয়ে গেছিল! ফের একবার কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল লিলির। তিনি অভিজ্ঞ মানুষ। চট করে পরিস্থিতিটা বুঝে নিলেন। ইমন ছেলেটা বোধহয় জিহাদিদের সংশ্রব ছেড়ে ওর পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চায়। হয়তো... হয়তো কেন, নিশ্চিতভাবেই পলাশ ওকে সাহায্য করছে। ছেলেটাকে ও দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জিহাদিরা সেটা সহ্য করবে কেন? স্ট্যানলি যদি সত্যিই ইনজেকশনটা দিতে পারত, তা হলে ইমনের মৃতদেহ ঢাকায় নামত। লিলি জানেন, ইনসুলিনের ওভারডোজ কতটা ড্যামেজ করতে পারে, মানব শরীরে। দুঃস্বপ্নের কথা মুহূর্তে ভুলে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কার বিয়ার কথা কইতাসো তুমি পলাশ।'

পলাশ বলল, 'ক্যান, কেউ আফনেরে কয় নাই? হায় হায়। ইমনের বিয়ার কথা কইতাসি। পাত্রীও তো এই ফ্লাইটেই যাইতাসে।' বলে পলাশ এদিক ওদিক তাকাল। তার পর বলল, 'কুসুম... তুমি কই? এহানে আসো তো বইন। দিদিভাই তোমারে দ্যাখতে চাইতাসে।'

রেজওয়ানা কাছে এসে দাঁড়ানোর পরই ককপিট থেকে পাইলটের গলা শোনা গেল, 'বিমানের সব যাত্রীকে অনুরোধ করছি, যে যার নিজের সিটে গিয়ে বসুন। সবাই সিটবেল্ট বেঁধে নিন। আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা

ঢাকার হজরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামব। ঢাকার আকাশ এখন পরিষ্কার। তাপমাত্রা প্রায় বত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আশা করি, আপনাদের যাত্রা সুখকর হয়েছে।'

রেজওয়ানা আর ইমন পাশাপাশি নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনকে সুন্দর মানিয়েছে। আড়চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে লিলি মনে মনে আশীর্বাদ করলেন।

সমাপ্ত